প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রী নরেন্দ্রচন্দ্র সান্যাল
৮এ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম			পৃষ্ঠা

প্রবন্ধের নাম			পৃষ্ঠা

মেঘনাদবধ কাব্য

কবি-পরিচিতি

মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী ঃ

জন্ম ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ। জন্মস্থান যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম। রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র জীবিত সন্তান মধুসূদন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে অধ্যয়ন করেন। পিতা এক জমিদারকন্যার সহিত বিবাহের ব্যবস্থা করিলে এই বিবাহে আপত্তি করেন এবং অব্যাহতি লাভের জন্য ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। বিলাত যাওয়ার সুযোগ লাভের আশাও ধর্মান্তর গ্রহণের অন্যতম কারণ ছিল। খৃষ্টান হইবার পর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিশপ্‌স কলেজে ভর্তি হন। এখানে গ্রীক, লাটিন এবং সংস্কৃত ভাষা শিখিবার সুযোগ পান। পিতা অর্থসাহায্য বন্ধ করায় বিশপ্‌স কলেজে পড়া বন্ধ হয় এবং কয়েকজন মাদ্রাজী ছাত্রের সহিত মাদ্রাজে যান। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে মাদ্রাজ প্রবাসের শুরু। এখানে স্থানীয় সংবাদপত্রে এবং বিদ্যালয়ে কাজ করেন। রেবেকা ম্যাক্টাভিস নামে এক নীলকর-কন্যাকে বিবাহ করেন। মাদ্রাজের পত্র পত্রিকায় ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁহার বহু কবিতা এবং অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *Captive Ladie* প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে। ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কবিপ্রতিভা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে মাতৃভাষায় লিখিতে পরামর্শ দেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রেবেকার সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই এমিলিয়া হেনরিএটা সোফিয়া নাম্নী এক ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। প্রথমে পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসে কেরানী এবং পরে দোভাষীর পদে নিযুক্ত হন। ৩১ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্ক-রত্নের 'রত্নাবলী' নাটক অভিনীত হয়, অবাঙালী দর্শকদিগের জন্য মধুসূদন ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দেন। মধুসূদনের প্রথম বাঙলা রচনা 'শর্মিষ্ঠা'

প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। ইহার পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে 'পদ্মাবতী' নাটক প্রকাশিত হইল। পদ্মাবতীতে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হয়। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির প্রকাশকাল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১), 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬)। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ মধুসূদনই করিয়াছিলেন সমসাময়িক সাক্ষ্য হইতে ইহা জানা যায়। বিষয় সম্পত্তির বিধি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া কবি ৯ জুন ১৮৬২ তারিখে য়ুরোপ যাত্রা করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষদিকে ইংলণ্ডে পৌঁছান এবং ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য গ্রেজ্ ইন-এ প্রবেশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে কবির জীবনে সংকট দেখা দেয়। হেনরিএটা পুত্রকন্যাদের লইয়া কলিকাতায় ছিলেন। কিন্তু মধুসূদন যাহাদের সহিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন তাহারা টাকা দেওয়া বন্ধ করায় হেনরিএটা পুত্রকন্যাসহ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে স্বামীর নিকটে চলিয়া আসেন। ইতিমধ্যে সম্পত্তি তদারকের দায়িত্ব যাহারা লইয়াছেন তাঁহারাও কবিকে টাকা পাঠানো বন্ধ করিয়া দেন। ফলে বিদেশে তিনি সপরিবারে বিপদের সম্মুখীন হইলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে লণ্ডন হইতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ও পরে প্যারিস হইতে ভের্সাই-এ চলিয়া যান। বিদ্যাসাগর কবিকে এই সময়ে বিদেশে অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। বস্তুতঃ তাঁহার অর্থসাহায্যেই শেষ পর্যন্ত ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া দেশে ফেরা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সুদীর্ঘ প্রবাসকালে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা সম্পূর্ণ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় শুরু করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের চাকরী গ্রহণ করেন। জীবনের এই পর্বে সাহিত্যের প্রতি আর তেমন আগ্রহ ছিল মনে হয় না। এই পর্বের রচনার মধ্যে 'হেকটর বধ' (১৮৭১) এবং 'মায়াকানন' (১৮৭৪) উল্লেখযোগ্য। কবির মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ জুন তারিখে।

মধুসূদনের কাল ঃ

মধুসূদনের জন্ম ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে। ততদিনে এদেশে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের রাজধানীরূপে কলিকাতা মহানগরী সুসংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসরে অর্থাৎ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খুব সীমিত ভাবে হইলেও ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছিল। মুখ্যত ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবেই দেশের মধ্যে নতুন চিন্তা ভাবনার সূচনা হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এইকালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, শিক্ষাবিভাগ, সকলদিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।" মধুসূদনের ছাত্রজীবন এই কালপরিধির অন্তর্গত। বাংলাদেশে নবযুগের উন্মেষকালের ধ্যানধারণায় কবির মানসপ্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল। তাই কবিকে বুঝিবার জন্য এই কালের সাংস্কৃতিক পটভূমিতে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ ছিল আত্মকেন্দ্রিত, বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগহীন। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামকেন্দ্রিত ভারতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থার যে সুপ্রাচীন পদ্ধতি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ছিল ইংরেজরা তাহা উৎখাত করে। তাহাদের চেষ্টা হইল ইংলণ্ডের শিল্প-সমূহের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের এবং সেখানে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের একচেটিয়া বাজার রূপে ভারতবর্ষের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নতুন বিন্যাস। অর্থাৎ ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণের দিক হইতে নহে, ইংলণ্ডের স্বার্থেই এদেশে এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। বাস্তব জীবনে ভারতবর্ষ সুদূর ইংলণ্ডের ভাগ্যসূত্রের সহিত জড়িত হইল। ভারতবর্ষকে সর্বতোভাবে শোষণ করিয়া ইংলণ্ড পুষ্ট হইয়াছে এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রায় দুইশত বৎসরে এই শোষণের ফলে ভারতবর্ষ কিভাবে দেউলিয়া হইয়াছে তাহার প্রমাণ মেলে বিপর্যস্ত কৃষি এবং বিধ্বস্ত শিল্পোৎপাদন-ব্যবস্থার তথ্যে। তবুও এই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াই বহুকালের আত্মকেন্দ্রিত ভারতবর্ষ বাহিরের পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিয়াছে। বিশ্বে যে আধুনিকতার প্রগতির নতুন ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের

সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। বৃহৎ বিশ্বের সহিত আমাদের চিত্তের যোগ সূচিত হয় ইংরেজের মাধ্যমে। প্রধানত ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা আধুনিক মানুষের ধ্যানধারণার পরিচয় লাভ করিয়াছি। য়ুরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁশ হইতে যে আধুনিক সভ্যতার সূচনা হয় তাহার মূলে ছিল সর্বসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাধনা, সত্যসন্ধানের সততা। আপন শক্তিতে মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখায় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। স্বমহিমায় উদ্দীপিত এই নবযুগের মানুষের মহিমাই প্রতিফলিত হইয়াছে আধুনিক য়ুরোপীয় শিল্প-সাহিত্যে। ইংরেজ জাতি একদিকে যেমন ভারতের বৈষয়িক জীবনে মহাসর্বনাশ সাধন করিয়াছে অন্যদিকে তেমনই আধুনিক পাশ্চাত্ত্যের সাংস্কৃতিক জগৎ আমাদের চিত্তের সম্মুখে অবারিত করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মনের আকর্ষণ ছিল ইংরেজি সভ্যতার, বিশেষতঃ ইংরেজি সাহিত্যের সমুজ্জ্বল বৈদগ্ধ্যের প্রতি। তাঁহাদের রুচি গঠিত হইয়াছিল, ধ্যানধারণার বনিয়াদ প্রস্তুত হইয়াছিল ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে আধুনিক য়ুরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: "বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্র পরিচয়।······ তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেক্সপীয়রের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলেটিক্‌স সর্বমানবের বিজয় ঘোষণায়।··· মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলাম।" উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের শিক্ষিত বাঙালির মানসিকতার বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ এখানে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ইহাই মধুসূদনের ছাত্রজীবনের পরিপ্রেক্ষিত। মধুসূদন হিন্দু কলেজের প্রবেশের পর পুরাপুরি সাহেব হইয়া উঠিবার জন্য যে ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে অতিরেকজনিত বিকার থাকিলেও মূলে ছিল সভ্যতার এক নতুন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। জীবনে মিল্টনের মত মহাকবি হইবেন, ইংলণ্ডে গেলে আপন প্রতিভা বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ মিলিবে—প্রবলভাবে মধুসূদন

ইহা বিশ্বাস করিতেন। বস্তুত নিজের জীবনের সমস্ত বিফলতার মূলে আছে এই বিশ্বাসজনিত দুঃসাহসিক সব সিদ্ধান্ত।

মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে ছাত্রজীবন অতিবাহন করিতেছেন, তখন রামমোহন রায় প্রবর্তিত নানামুখী সংস্কার আন্দোলন, ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন, ভারতীয়দের জন্য কিছু কিছু রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মোদ্যোগে সমাজ আলোড়িত হইতেছিল। মধুসূদন হিন্দু কলেজে প্রবেশের কিছু পূর্বে হেনরি ভিভিয়ান্ ডিরোজিও সেখানে শিক্ষকতা করিতেন। যুবসমাজে স্বাধীন চিন্তার সাহস সঞ্চারে এই প্রতিভাশালী যুবকের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইঁহার ছাত্র এবং ভক্তবৃন্দই সেকালে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু তিনি যুবসমাজে যে বিচারশীল বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা উত্তরোত্তর ছড়াইয়া পড়ে। মধুসূদনের জীবনে এই নব্য যুবক সম্প্রদায়ের ভালমন্দ সকল প্রভাবই কার্যকর হইয়াছিল। চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতা সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে—ডিরোজিওর এই শিক্ষা যুবসমাজের মর্মে গ্রথিত হইয়াছিল। মধুসূদনের সময় পর্যন্ত এ শিক্ষার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। ছাত্রজীবনে মধুসূদন বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন-এর দ্বারা। ইনি অধ্যাপনাসূত্রে ছাত্রদের মনে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ জাগাইয়া তোলেন। মধুসূদনের সাহিত্যচর্চা অবশ্য শুধুমাত্র ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। নিজের চেষ্টায় তিনি একাধিক য়ুরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করেন এবং প্রত্যক্ষভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হন। তৎসহ গ্রীক এবং লাটিন ভাষা জানার ফলে য়ুরোপের ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের রসলোকে প্রবেশের দ্বার তাঁহার পক্ষে অবারিত ছিল। গ্রীক চিন্তার প্রভাবেই য়ুরোপে রেনেসাঁশ সম্ভব হয়। য়ুরোপের নবজাগরণের বীজমন্ত্র গ্রীক সাহিত্য হইতে আহরিত হইয়াছিল, মধুসূদন সেই আদি উৎসের সহিত প্রত্যক্ষভাবে, পরিচিত ছিলেন। অন্যপক্ষে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যও তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে তিনি বিস্ময়কর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। সাহিত্য সাধনার জন্য এমন ব্যাপক প্রস্তুতি বাঙলাদেশে আর কোনো কবি সাহিত্যিকের জীবনে দেখা যায় না।

ছাত্রজীবন শেষ না হইতেই তিনি পরিবারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে চলিয়া যান। দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সহিত তাঁহার যোগ ছিল না। মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে। আবার ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি য়ুরোপ যাত্রা করেন। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬২ পর্যন্ত সময় মধুসূদনের জীবনের সর্বাপেক্ষা ফলবান কাল। বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার বিস্ময়কর কীর্তিগুলি এই সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকে বলা যায় আধুনিক বাঙলার সৃষ্টিশীলতার কাল। ইংরেজি শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালির ধ্যানধারণায় যে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিল মাতৃ-ভাষা আশ্রিত আধুনিক সাহিত্যে। ইংরেজি বিদ্যা আমাদের মনের জগতে পুঞ্জিত অন্ধকার দূর করিয়াছে, কিন্তু ইংরেজি ভাষা কখনই বাঙালির আত্মপ্রকাশের, কীর্তি ও খ্যাতি অর্জনের অবলম্বন হইতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই বোধ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকৃতি পায়। উপেক্ষিত মাতৃভাষার প্রতি বাঙলার প্রতিভাবান সন্তানেরা আগ্রহ ও শ্রদ্ধা লইয়া আকৃষ্ট হন। মধুসূদনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *Captive Ladie* পাঠ করিয়া ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন লিখিয়াছিলেন, "He could render far greater service to his country and have a better chance achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write" এই বিদেশী শুভানুধ্যায়ী যাহা বলিয়াছিলেন দেশের মানসিকতাও সেই সুরেই তখন বাঁধা হইয়াছে। মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে দেশে ফিরিলেন, মানসিকভাবেও তিনি যেন সুদীর্ঘ প্রবাস যাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কলিকাতায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, রঙ্গমঞ্চ স্থাপন ও নতুন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টার মধ্য দিয়া যে নূতন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছিল—সেখানে তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন। সুদীর্ঘ প্রয়াসে তিনি এতকাল নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছেন, এবারে সৃষ্টির পালা। উপযুক্ত পরিবেশ, উদ্দীপিত করিবার মতো বন্ধুগোষ্ঠী প্রস্তুত ছিল। মধুসূদনের প্রতিভার শক্তি অকস্মাৎ পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিল। এবং এ আত্মপ্রকাশ মাতৃ-ভাষাতেই সম্ভব হইল, ইংরেজিতে নহে।

বাঙলা কাব্যধারা ও মধুসূদন :

ভারতচন্দ্র পর্যন্ত (ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে) বাঙলা কাব্যের যে পুরাতন ধারা তাহার বৈচিত্র্য কিছু কম নয়। খণ্ড কবিতায় বিষয়বস্তু সংহতভাবে প্রকাশ করার রীতি চর্যাপদ হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিদের সৃষ্টিতে, শাক্ত গীতিতে এবং নানাবিধ গ্রাম্য গানে এই খণ্ড কবিতার বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। পুরাতন বাঙলা কাব্যের অপর একটি প্রধান শাখা মঙ্গলকাব্য। নানা লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার এই সকল কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কাহিনী বর্ণনাত্মক এই মহাকায় কাব্যগুলিকে যে সব আখ্যান রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে বাঙলাদেশের মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার নানা প্রসঙ্গ। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ দেবতার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিতে গিয়াও মানুষেরই জীবনের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাব্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা ছিল চরিত-কাব্য, প্রধানত চৈতন্য চরিত ইহার উপাদান। এইসব কাব্যে বাঙলার জনজীবনকে নানা-ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন এমন একজন মানুষকে ঘিরিয়া কবিমনের বিনম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্যযুগের এইসব কাব্যগান সম্পূর্ণ মানব-সম্পর্কহীন এবং দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত স্তুতি—একথা সত্য নয়। তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যে প্রভেদ কোথায় ? প্রাচীন সাহিত্যেও কাব্যের বিষয় ছিল মানবজীবন, আর আধুনিক কালের কাব্য, সে তো মানবজীবনেরই জয়গান। তবুও উভয় কাব্যধারার মধ্যে প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ জীবনকে দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রভেদ। মধ্যযুগের কবিবৃন্দ জীবনকে দেখিয়াছেন ব্যাখ্যার অতীত কোনো এক অতিপ্রাকৃত শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনরূপে। এই মানসিকতায় বিশ্বের সকল ঘটনা দৈবাধীন। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য ও মর্যাদা বিষয়ে কোনো বিশ্বাসই সে যুগের মানুষের মনে ভিত্তি পায় নাই। কাব্যে গানে মানবজীবনের দুর্দশার কথা যেমন আছে, গৌরবের কথাও তেমনি আছে। কিন্তু দুর্দশা বা গৌরব—কিছুই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ফলরূপে গৃহীত হয় নাই। তাই চরম দুঃখের মধ্যে পীড়িত মানুষ দেখিয়াছে ঈশ্বরেরই দুঃখমূর্তি, আবার সমৃদ্ধিকেও ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কোনো-ক্ষেত্রেই আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মমর্যাদাবোধের আভাসমাত্র দেখা যায় না; নিতান্ত চেনা মানুষ, ঘরের ছেলে চৈতন্যদেবকেও তাই সর্বতোভাবে অবতারে রূপান্তরিত করা হয়। বুদ্ধির আলস্যে কল্পনার কুহকে আচ্ছন্ন সেকালের

মানসিকতার পক্ষে যথাপ্রাপ্তকে মানিয়া নেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। সেই আত্মকেন্দ্রিত সমাজকে বাহিরের কোনো শক্তির অভিঘাত সজাগ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "সমাজের চিত্ত যখন নিজের বর্তমান অবস্থা-বন্ধনে বদ্ধ থাকে এবং সমাজের চিত্ত যখন ভাবপ্রাবল্যে নিজের অবস্থার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় এই দুই অবস্থার সাহিত্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। সমাজ যখন নিজের চতুর্দিগ্‌বর্তী বেষ্টনের মধ্যে, নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখনো সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সে যেন কারাগারের ভিত্তিতে ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মতো সাজাইতে চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা, যে ব্যাকুলতা আছে তাহা বড়ো সকরুণ। সাহিত্যে সেই চেষ্টার বেদনা ও করুণা আমরা শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যে দেখিয়াছি। তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ-অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখে ক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইতে যাইতে পারে না।" নিজের অবস্থাবন্ধনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া আনন্দে আশায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার একটা দৃষ্টান্ত আছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। কিন্তু সেই সমুন্নতি কৃত্রিম। ভাবাবেগ চালিত দৃঢ় ভিত্তিহীন ফলে শাক্ত সাহিত্য বা বৈষ্ণব সাহিত্যে—কোথাও আত্মসচেতন প্রয়াসে, মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ববোধে সাহিত্য মুক্তি আসে নাই। মধ্যযুগীয় সমাজ-পরিবেশ এবং মানসিক বাতাবরণ হইতে সেরূপ মুক্তি অপ্রত্যাশিত বটে।

বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে আধুনিক যুগ, ইংরেজ আমলে যাহার সূচনা—সেইযুগেও যে সমাজ-কাঠামো সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছিল, গোটা দেশের ধ্যান-ধারণায় মৌলিক পরিবর্তন হইয়াছিল একথা বলা চলে না। বরং সেই মধ্যযুগীয় সমাজকাঠামোর উপরে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার চাপ সমাজকে এক কিম্ভূত অষ্টাবক্র রূপ দিয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যেই বাঙালি সমাজের একাংশ প্রধানত ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ধীরে ধীরে এক নূতন মূল্যবোধে আস্থা স্থাপন করিয়াছে

এই আধুনিকদের দৃষ্টিতে মানুষ আর রহস্যময় অব্যাখ্যাত দৈবশক্তির হাতে ক্রীড়নক নয়। মানবজীবন সম্পর্কে এই নূতন ধারণা, যাহাকে সাধারণভাবে বলা যায় মানবতাবাদ, এই মন্ত্রেই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের রস ও রূপে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। আর সে পরিবর্তন সাধন সুসম্পূর্ণ হইয়াছিল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে। বাঙলা ভাষার কাব্যধারায় এই পরিবর্তনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে একথা যখন সত্য তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন আমাদের সাহিত্য কিছু না কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনোমতেই হইতে পারে না; যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।

"মেঘনাদবধ কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যের রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে তাহার ত্যাগ ও দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথরোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র পৌত্র আত্মীয়-স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের

শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।" কাব্যের ভাব ও রসের মধ্যে এই যে পরিবর্তন, স্বাধীন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিকে মহৎ মর্যাদা দানের এই যে প্রয়াস ইহা আধুনিক মানবতাবাদী জীবনদৃষ্টিরই ফল। মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন তেমনই বীরাঙ্গনা কাব্যেও ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের চরিত্র উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হইয়াছে। তেমনই আবার চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কবি নিজেরই অন্তরের বাসনা-কামনা, ব্যক্তিত্বের নানা দিককেই কাব্যবিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে বাঙলা কবিতার ঐতিহ্যে মধুসূদন সম্পূর্ণ নূতন এক অধ্যায়ের সূচনা করিলেন।

কবিতার ভাব ও রসের ক্ষেত্রে যেমন **কাব্য-আঙ্গিকের দিক** হইতেও মধুসূদন সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। যে নূতন ভাব-ভাবনা প্রকাশের প্রেরণায় তিনি কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশের উপযুক্ত আঙ্গিক তাঁহাকে উদ্ভাবন করিতে হয়। কাব্যের আঙ্গিক বিষয়ে তাঁহার প্রখর সচেতনায় সাহিত্যিক দায়িত্ববোধেরই প্রমাণ পাই। তিলোত্তমাসম্ভবের পরীক্ষামূলক প্রয়াসে এই দায়িত্ববোধের প্রথম প্রমাণ মেলে, বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে ইহা সম্পূর্ণই অভিনব। পূর্বতন কোনো কবির কাব্যে (ভারতচন্দ্রই সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম) কাব্যপ্রকরণ সম্পর্কে সদা সতর্ক পরীক্ষার পরিচয় মেলে না। এ প্রসঙ্গে মোহিতলাল লিখিতেছেন, "একটা বিষয়বস্তু ঘটনা, বা চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া আদি, মধ্য ও অন্তযুক্ত কাহিনী রচনা—আমাদের দেশে এরূপ কাব্যের রীতি নয়। সে কাব্যে কাহিনীর দুই মুখ—আদি ও অন্ত খোলাই থাকে, গল্পের ধারা যেন বহিয়াই চলে, এবং তাহা যথাস্থানে সমাপ্ত হইলেই হইল। সে সমাপ্তির জন্য পূর্বাপর সকল অংশের সমান প্রয়োজনীয়তা নাই ; কাহিনীর কেন্দ্রটিকে ঘেরিয়া সকল উপাদান উপকরণকে সুপরিমিত ও সুবিন্যস্ত করার যে শিল্পচাতুর্য, সেদিকে আমাদের কবিদের—কি সংস্কৃতে কি ভাষায়—কোনো লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহাকাব্যে বিষয়ের একটা গাম্ভীর্য ও বিস্তৃতি এবং নানা রসের অবতারণা করিবার জন্য বর্ণনার বহুল বৈচিত্র্য থাকিলেই হইল ; কাহিনীকে সর্বপ্রকার অবান্তর বাহুল্যবর্জিত করিয়া তাহার অবয়বগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাঠকের চিত্তে একটি সুপরিস্ফুট

রসরূপ জাগ্রত করা—আমাদের কাব্যশিল্পের আদর্শ ছিল না।” বলা বাহুল্য পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন সাহিত্যের সহিত কবির অন্তরঙ্গ পরিচয় কাব্যপ্রকরণের পরীক্ষা এবং নূতন কাব্যরূপ উদ্ভাবনে বিশেষরূপে সহায়ক হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই ভিন্ন ভিন্ন কাব্য-আঙ্গিক মাতৃভাষায় প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ দেখা যায়। তিলোত্তমা, মেঘনাদবধ-এ সাহিত্যিক মহাকাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্যে ওড, বীরাঙ্গনায় পত্রকাব্য এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে সনেট—এই সব কাব্য-প্রকরণের সবগুলিই হয়তো বাঙলা কাব্যের পরবর্তী ধারায় সমান মর্যাদা পায় না। কিন্তু তিনি এইসব পরীক্ষার দ্বারা বাঙলা কবিতার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিবার যে সাহস সঞ্চার করিয়াছিলেন, কাব্যে প্রগতির দিক হইতে তাহা মহামূল্যময়। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা উচিত, শুধু কাব্যের গঠন নহে কাব্যভাষা এবং ছন্দের ক্ষেত্রেও তাঁহার সাহসিকতাপূর্ণ পরীক্ষা এবং সিদ্ধির দৃষ্টান্ত পরবর্তী কবিদের নিকট প্রেরণার উৎসস্বরূপ। মধুসূদন যখন বন্ধুদের নিকট নাটক রচনার প্রতিশ্রুতি দেন তখন তাঁহার অন্তরঙ্গরাও ইহা অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন। সত্যই বাঙলা ভাষায় লেখার কোনো অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। আবাল্য স্বপ্ন দেখিতেন মিল্টনের মতো মহাকবি হইবেন, ইংরেজি ভাষাই হইবে তাঁহার আত্মপ্রকাশের ভাষা। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, তিনি যখন বাঙলা রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন তখন পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়াই অগ্রসর হইলেন। বাঙলা ভাষার প্রকৃতির সহিত তাঁহার অভিনব কল্পনাকে সামঞ্জস্যে মিলাইবার জন্য পদে পদে কী পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে—বন্ধুদের নিকট লিখিত চিঠিপত্রে তাহার উল্লেখ আছে। বিশেষ করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য রচনার সময়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি পূর্ণবিকশিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস এবং এই কাব্যের গভীর ও বিস্তৃত জীবনাবেগ, সূক্ষ্ম অনুভূতির লীলা প্রকাশের প্রয়াসে বাঙলা কবিতার ভাষা তাঁহাকে আমূল সংস্কার করিতে হইয়াছিল। একদিকে সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার হইতে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন. দু একটি ক্ষেত্রে হয়তো সেই শব্দ নিতান্তই আভিধানিক, অপ্রচলিত, কিন্তু সতর্কভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ক্রমে মধুসূদন এই দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিয়াছেন। বাঙলা ভাষার মূল প্রকৃতির উপরেই তিনি নির্ভর করিয়াছেন। বাঙলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতভাবেই সংস্কৃত শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। ক্রমেই ভাষা নমনীয় হইয়াছে, সর্বপ্রকার

আবেগ প্রকাশের উপযোগী হইয়াছে। এইভাবে আধুনিক বাঙলা কবিতার ভাষা এবং প্রকাশশৈলী মধুসূদনের হাতে পরিচ্ছন্ন এবং পরিপূর্ণ প্রকাশ সামর্থ্য লাভ করে।

মেঘনাদবধ কাব্য-পাঠের ভূমিকা

মেঘনাদবধ কাব্য রচনার পরিকল্পনা :

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। ইহার কিছু পূর্ব হইতেই কবি নূতন রচনার বিষয়বস্তু সন্ধান করিতেছিলেন। মহাকাব্য রচনার দিকেই তাঁহার প্রবণতা, মহাকাব্যোচিত বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য তাই তাঁহার উদ্যোগ। ১৮৬০-এর ২৪ এপ্রিল তারিখে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন :

"The subject you propose for a national epic (সিংহল বিজয়) is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the 'art of poetry' to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit Do not be frightened, my dear fellow, I don't trouble my readers with *Vira ras* (বীররস)! I enclose the opening invocation of my 'মেঘনাদ'—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent."—তিলোত্তমা গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই মধুসূদন মেঘনাদবধের সূচনা-অংশ রচনা করেন, নূতন রচনায় হাত দেন। রচনা শুরু করিয়া মধুসূদন রামায়ণের এই কাহিনী লইয়া সার্থক কাব্য রচনা সম্ভব হইবে—এ বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করেন। পরের মাসে, অর্থাৎ মে মাসের ১৫ তারিখেই আবার রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন, "I am going on with Meghnad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. .. ..I don't care a pin's head of Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry." ১৪ জুলাই-এর একটি পত্র

হইতে জানা যায় ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সর্গের অর্ধাংশ লেখা শেষ করিয়াছেন। ওই পত্রে রাবণ-চরিত্র সম্পর্কে লিখিতেছেন, "He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our poetry had given Ram human companions I could have made a regular Illiad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity." রামচন্দ্র বানর বাহিনীর সহিত রাবণপক্ষীয়দের যুদ্ধবর্ণনা হাস্যকর হইত, একমাত্র সপ্তম সর্গের সামান্য অংশ ভিন্ন এ কাব্যে এইজন্যই কোনো বিস্তৃত যুদ্ধ-বর্ণনা নাই। রামায়ণের এই কাহিনীর সীমাবদ্ধতা বিষয়ে কবি পূর্ণ অবহিত ছিলেন, এই সীমাবদ্ধতার জন্য তাহার ইচ্ছামতো ঘটনা সংস্থান করা সম্ভব হয় নাই। প্রথম হইতেই কবি সম্পূর্ণ কাব্যটির পরিকল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। ৩ আগস্টের একটি চিঠিতে আছে, "I mean to extend it to 9 সর্গs." প্রয়োজনমতো তিনি চরিত্রের নামগুলি পরিবর্তন করিতেছেন, সর্বদা সংস্কৃত-নিয়ম মানা প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। কাব্যসৌন্দর্যের দিক হইতে যাহা প্রয়োজন গ্রহণ করিবেন, অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জন করিবেন—ইহা ভিন্ন অন্য কোনো কৃত্রিম নিয়ম অগ্রাহ্য করার পক্ষপাতী। লিখিতেছেন, "The name is 'বরুণানী', but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules." এইসব উক্তি কবির শিল্প-সচেতনতা এবং প্রখর কাব্যবোধেরই প্রমাণ।

মেঘনাদবধ কাব্য দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম পাঁচ সর্গ লইয়া প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি। অবশিষ্ট ৪ সর্গ লইয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধের মধ্যেই।

সমসাময়িক সমালোচকদের দৃষ্টিতে 'মেঘনাদবধ কাব্য':

'মেঘনাদবধ' পাঠকসমাজে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহার উল্লেখ মধুসূদনের চিঠিতেও পাওয়া যায়। একটি চিঠিতে আছে, "The poem is raising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than

Milton ; many say it licks Kalidasa ; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets ; Milton divine." অবশ্য সমসাময়িক কালে এই কাব্য নিরঙ্কুশ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল—একথা সত্য নহে। তাহা সম্ভবও ছিল না। কবি আমাদের প্রতিষ্ঠিত রসবোধ এবং প্রথাসিদ্ধ ধ্যানধারণায় প্রবল আঘাত করিয়াছিলেন। স্পষ্টতই রামচন্দ্রকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং রাবণ ও রাবণপক্ষীয়দের শৌর্য-বীর্যের বর্ণনা ছিল এই কবির বহুবিঘোষিত নীতি। তিনি আত্মপ্রত্যয়শীল মানুষের দুঃখাহত অথচ গৌরবদীপ্ত মূর্তিরূপে রাবণকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাব্য প্রথাসিদ্ধ হিন্দু-আদর্শ-বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইবে ইহা একান্তই স্বাভাবিক। মধুসূদনের ঘনিষ্টতম বন্ধু, যিনি পাণ্ডুলিপি অবস্থায়ই এ কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন এবং রচনাকালে কবি যাঁহার পরামর্শের জন্য অবিরত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন, সেই **রাজনারায়ণ বসু** এ কাব্যের বিরুদ্ধে কঠোরতম সমালোচনা করেন। তিনি লেখেন, "জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেরূপ অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোনো বাঙালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাহার কবিতাকে হিন্দু-পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট প্যাণ্টলুন দেখা যায়। আর্যকুলসূর্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্তই কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন, বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে।

"মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে প্রাঞ্জলতার অত্যন্ত অভাব। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল।"

রাজনারায়ণ যেভাবে এই কাব্যের অহিন্দু আদর্শের জন্য সমালোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা-ভাবনায় যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার প্রতিফলনরূপে এই কাব্যকে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অথচ রাজনারায়ণ নিজে আধুনিক শিক্ষায় পূর্ণ শিক্ষিত, তিনি মধুসূদনেরই সহপাঠী ছিলেন। এই দৃষ্টান্ত হইতে

প্রমাণিত হয় দেশে রুচির পরিবর্তন তখনও সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর প্রাঞ্জলতার অভাব সম্পর্কে যে অভিযোগ করিয়াছেন—ইহা বিশেষ পাঠকের মানসিক প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল। নিশ্চয়ই সেদিনের পাঠক শ্রেণীর একাংশের নিকট এ কাব্য সহজবোধ্য হয় নাই। অনেকে তো সঠিক পদ্ধতিতে এ কাব্য পাঠ করিতেও পারিতেন না। এই নতুন কাব্যের রসগ্রহণ সহায়তার জন্য কবি স্বয়ং কাব্যপাঠ এবং আলোচনার আয়োজন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

আবার অন্যদিকে **কালীপ্রসন্ন সিংহ** আয়োজিত বিদ্যোৎসাহিনীসভার কবি সংবর্ধনা এবং অন্যান্য বহু সমালোচকের কবিপ্রশস্তির কথাও স্মরণযোগ্য। কালীপ্রসন্ন মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, "বাঙলা সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধ হয়, সরস্বতীও জানিতেন না।...লোকে অপার ক্লেশ করিয়া জলধি-জল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্বক বহু মানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্নলাভে কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি, এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই।" এ অবশ্য কেবলই উচ্ছ্বাস, কাব্যের বিচার নহে। কিছু পরে **বঙ্কিমচন্দ্র** এই কাব্যের সমালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "The *Meghanadabadh* is Mr. Dutta's great work. The subject is taken from the *Ramayana*, the source of inspiration to so many Indian poets. In the war with Ravana, Meghanadha, the most heroic of Ravana's sons and warriors, is slain by Laksman, Ram's brother. This is the subject and Mr. Dutta owes a great deal more to Valmiki than the mere story. But nevertheless the poem is his own work from beginning to end. The scenes, characters, machinery and episodes are in many respects of Mr. Dutta's own creation. *In their conception and devlopment Mr. Dutta has displayed a high order of art*. ....To Homer and Milton, as well as to Valmiki, he is a largely indebted in many ways, but *he has assimiliated and made his own most of the ideas which he has taken and his poem*

is on the whole the most valuable work in modern Bengali literature. The characters are clearly conceived and capable of winning the reader's sympathy. The machinery including a great deal that is supernatural, is skilfully and easily handled The imagery is graceful and tender and terrible in turn. The play of fancy gives constant variety: The diction is richly poetic and the word so happily chosen as constantly to bring up by association ideas congruous to those which they directly express. Nor is the verse broken up into couplets complete in themselves, in the Sanskrit fashion, but abounding like Milton's in variety of pause, *it seems to us musical and graceful as well as a fitting vehicle of passionate feelings.*

মধুসূদনের কাব্য সমসাময়িকদের দ্বারা যেমন প্রশংসিত হইয়াছে তেমনি নিন্দিতও হইয়াছে। কিন্তু এ কাব্যের গুরুত্ব নিতান্ত নিন্দুকেরাও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। পরবর্তী কবিগণ এ কাব্যের প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী :

মেঘনাদকে সৈন্যাপত্যে অভিষেক হইতে তাহার অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত মেঘনাদ-বধের কাহিনীটি তিন দিন ও দুই রাত্রির কালসীমায় সম্পূর্ণ। কালের দিক হইতে নির্দিষ্ট সীমার বন্ধনে বাঁধিবার ফলে আখ্যানবস্তু সংহতিলাভ করিয়াছে।

[প্রথম সর্গ] বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে কাব্যের সূচনা হইয়াছে। লঙ্কার অধিপতি রাবণ পাত্রমিত্রবেষ্টিত রাজসভায় দূতমুখে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরপুত্র বীরবাহুর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং মৃত্যুর সংবাদ শুনিলেন। শোকাভিভূত রাবণ ইহার পর বীরবাহুজননী চিত্রাঙ্গদার তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছেন। লঙ্কা এখন বীরশূন্য, তাই রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে ইন্দ্রজিৎ ছিলেন লঙ্কার বাহিরে তাঁহার প্রমোদ-উদ্যানে। লঙ্কার

রাজলক্ষী ছদ্মবেশে সেই উদ্যানে গেলেন এবং ইন্দ্রজিৎকে লঙ্কার দুর্দশা ও রাবণের যুদ্ধোদ্যোগের সংবাদ দিলেন। ইন্দ্রজিৎ এই সংবাদে তৎক্ষণাৎ পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে নিরস্ত করিয়া নিজে সৈনাপত্যের দায়িত্ব ভিক্ষা করিলেন। ইন্দ্রজিতের অনুরোধে রাবণ তাঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষেক করিলেন, কিন্তু এক শর্তে। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে ইন্দ্রজিৎকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া ইষ্টদেবতার আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা, নিকুম্ভলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর প্রস্তাবনা এইভাবে প্রথম সর্গেই করা হইয়াছে। এই সর্গের নাম 'অভিষেক'। 'অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ'।

[দ্বিতীয় সর্গ] 'অস্ত্রলাভো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ'। এই সর্গে কাহিনীর পটভূমি স্থানান্তরিত হইয়াছে মর্ত হইতে স্বর্গে। মেঘনাদের হাতে ইন্দ্র লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। সুতরাং দেবরাজ প্রতিশোধের সুযোগ সন্ধান করিবেন ইহা একান্তই স্বাভাবিক। মধুসূদন এখানে ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে দেব-শক্তি সমাবেশ ঘটাইবার জন্যে ইন্দ্রের প্রতিশোধস্পৃহা কাজে লাগাইয়াছেন। শচী-সহ ইন্দ্রের পার্বতীর নিকট গমন, পার্বতী কর্তৃক মহাদেবের তপোভঙ্গ, মহাদেব কর্তৃক মেঘনাদবধের উপায় নির্দেশ এবং লক্ষণের জন্য সেই অস্ত্রের সংবাদ প্রেরণ ইত্যাদি এই সর্গের ঘটনা। দেবলোকের এই বর্ণনায় কবি ভারতীয় দেবদেবী চরিত্র গ্রীক পুরাণের দেবতাদের চরিত্রের আদর্শে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য দেবতাদের ব্যাপক ষড়যন্ত্রে মূলত প্রকারান্তরে ইন্দ্রজিতের অসীম শক্তিই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

[তৃতীয় সর্গ] 'সমাগমো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ'। প্রমীলার প্রমোদ-উদ্যান হইতে লঙ্কাপুরীতে সমাগম এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। প্রথম সর্গের শেষদিকে ইন্দ্রজিৎ প্রমোদ-উদ্যান হইতে লঙ্কার উদ্দেশে যাত্রার প্রাক্কালে প্রমীলাকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন অচিরেই আবার ফিরিয়া আসিবেন। ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন প্রমিলা নিজে রাজপ্রাসাদে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু লঙ্কার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে শত্রুসৈন্য। সেই শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। প্রমীলা নিজের নারীসৈন্যবাহিনী লইয়া যাত্রা করিলেন। অবশ্য রামচন্দ্র প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশে বাধা সৃষ্টি করেন নাই। নির্বিবাদে প্রমীলা রাজপ্রাসাদে আসিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। সমগ্র তৃতীয় সর্গে মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলার চরিত্রেই কবির মনোযোগ একান্তভাবে নিবিষ্ট। ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার দাম্পত্য সম্পর্ককে কবি এখানে প্রথাসিদ্ধ হিন্দু দাম্পত্য

বন্ধনের ঊর্ধ্বে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নারী ব্যক্তিত্বের নতুন রূপ সৃষ্টি হইয়াছে প্রমীলায়।

[চতুর্থ সর্গ] 'অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ'। এই সর্গে মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রক কোনো ঘটনা নাই। বরং এ কাহিনীর মধ্যে চতুর্থ সর্গে বর্ণিত বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কেই প্রশ্ন ওঠে। অশোকবনে সীতা বন্দিনী। এ কাব্যের সকল ঘটনার মূল হেতু সীতা অপহরণ। রাজপুরীতে দেশদ্রোহী বিভীষণ-পত্নী সরমা স্বভাবতই উপেক্ষিতা ও নিন্দিতা। সরমা মাঝে মাঝে সীতার নিকটে আসেন। সুখ দুঃখের কথা বলেন। এইরূপ একটি সাক্ষাৎকারের সুযোগে কবি সীতার মুখে তাঁহার অতীত দিনের কাহিনী বিবৃত করাইয়াছেন। সরমার কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে একে একে সীতা তাঁহার জীবনকাহিনী বলিয়াছেন। প্রসঙ্গত রাবণ কর্তৃক অপহরণের কথাও আসিয়াছে। প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদা সীতাহরণের জন্য রাবণকে ধিক্কার দিয়াছিলেন, সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ পরিপূর্ণরূপে বিবৃত হইয়াছে চতুর্থ সর্গে। এই সর্গের ঘটনাবর্ণনায় কবি রামায়ণ-কাহিনী বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। বিশেষভাবে তাঁহার দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে সীতার বেদনাবিনত, অশ্রুমুখী চরিত্র-চিত্রণে। পৃথিবীর কাহারো বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ নাই, এমন কি রাবণের বিরুদ্ধেও নহে।

"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাইলো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি।"

রামের বনবাস, নির্বাসিত জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা, রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণের ঘটনা ইত্যাদি সীতার স্মৃতিচারণসূত্রে বিবৃত হইয়াছে, এবং বর্ণনার প্রতিটি চরণে সীতার দুঃখাবেগ ও ক্ষমাশীল চরিত্রের স্নিগ্ধতা মিশ্রিত হইয়া আছে।

[পঞ্চম সর্গ] 'উদ্যোগো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ'। ষষ্ঠ সর্গে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম সর্গে ইহারই উদ্যোগ। এই সর্গের ঘটনাবলী স্বর্গ-মর্ত্যে বিস্তৃত। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রজিত বধের দায়িত্ব কর্তব্য লইয়া পরামর্শ চলিতেছে। মায়াদেবী লক্ষ্মণকে সাহায্য করিবার জন্য লঙ্কায় যাইবেন স্থির হইল। অন্যদিকে স্বপ্নে আদেশ পাইয়া লক্ষ্মণ চণ্ডীদেবীর মন্দিরে গিয়া পূজা এবং বরলাভ করিলেন। এখানে লক্ষ্মণকে নানাবিধ বিপদ বিঘ্ন

উত্তীর্ণ হইয়া নিজের মানসিক ও চারিত্রিক শক্তির প্রমাণ দিতে হইয়াছে। কবির প্রিয় নায়ক যাহার হাতে নিহত হইবে সে নিতান্ত সামান্য মানুষ নয়—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই সম্ভবত লক্ষ্মণকে দুরূহ পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হইয়াছে। এই সর্গের আর একটি ঘটনা যুদ্ধযাত্রার জন্য মন্দোদরীর নিকট হইতে ইন্দ্রজিতের বিদায়গ্রহণ। মন্দোদরী অনেক দ্বিধায় পুত্রকে বিদায় দিলেন এবং পুত্রবধূ প্রমীলাকে নিজের নিকটে রাখিয়া দিলেন। এই বিদায় ইন্দ্রজিতের শেষ বিদায়। স্বর্গ-মর্তে তাঁহাকে হত্যার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে, লক্ষ্মণ উপযুক্ত অস্ত্রলাভ করিয়াছে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎ-বধের আয়োজন কবি সম্পূর্ণ করিয়াছেন পঞ্চম সর্গে। পঞ্চম সর্গের প্রতিটি ঘটনাই কাব্য-কাহিনীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

[ষষ্ঠ সর্গ] 'বধো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ'। মেঘনাদবধ কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা ইন্দ্রজিৎ নিধন এই সর্গে সম্পন্ন হইয়াছে। কবি তাঁহাকে প্রতিভার সমস্ত শক্তিসামর্থ্য পূর্ণমাত্রায় নিয়োগ করিয়াছেন ষষ্ঠ সর্গ রচনায়। যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া ইন্দ্রজিৎ ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিলেন। প্রণামান্তে উঠিয়া দেখিলেন স্বয়ং অগ্নিদেবতা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। উপযুক্ত সম্ভাষণ জানাইয়া তিনি বর প্রার্থনা করিলেন। দেবতা নহে, লক্ষ্মণ যজ্ঞশালায় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত—ইন্দ্রজিৎ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণ আত্মপরিচয় দিলে ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে বীরধর্ম পালন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। নিরস্ত্র মানুষকে আক্রমণ করা বীরধর্ম নহে, তাই অস্ত্র লইয়া লক্ষ্মণের সম্মুখীন হইবার সুযোগ চাহিলেন। লক্ষ্মণ এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, ইতর ভাষায় তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন। অবশেষে নিরুপায় ইন্দ্রজিৎ পূজার উপকরণগুলি লইয়াই লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলে অস্ত্রসংগ্রহের জন্য বাহির হইতে গিয়া দেখিলেন খুল্লতাত বিভীষণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া আছেন। এতক্ষণে ইন্দ্রজিৎ বুঝিলেন কীভাবে, কাহার সহায়তায় লক্ষ্মণ এই সুরক্ষিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। হাজার মিনতি ও ধিক্কারেও বিভীষণের প্রতিজ্ঞা টলিল না, কিছুতেই দ্বার ছাড়িলেন না। এদিকে মায়াদেবীর শুশ্রূষায় লক্ষ্মণ ইতিমধ্যে চেতনা ফিরিয়া পাইয়াছেন। পূর্ণোদ্যমে তিনি ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অব্যর্থ অস্ত্রের আঘাতে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ, লঙ্কার বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ অসহায়ভাবে নিহত হইলেন। এই সর্গে অসহায় ইন্দ্রজিতের আচরণে

এবং উক্তিতে বীরত্ব এবং চারিত্রিক মহিমা সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। দেশবাসী এবং স্বদেশের জন্ম তাহার মমত্ববোধ, বীরের ধর্ম এবং নীতিজ্ঞান তাঁহার চরিত্রকে মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। অবস্থা সংকটে এক মহৎ চরিত্রের এই শোচনীয় পরিণাম পাঠকের চিত্তে সমুন্নত ট্র্যাজিক-রস জাগাইয়া তোলে।

[সপ্তম সর্গ] 'শক্তিনির্ভেদো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ। ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছেন, সর্বত্র এই বার্তা ছড়াইয়া পড়িল। স্বয়ং মহাদেব তাঁহার আশ্রিত ভক্ত রাবণের শোকে অভিভূত হইলেন। রাবণকে তিনি রুদ্রতেজে পূর্ণ করিলেন। শোকাভিভূত রাবণ পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ কাব্যে এই প্রথম যুদ্ধবর্ণনার সুযোগ ঘটিয়াছে; রাবণের লক্ষ্য আর কেহ নহে, পুত্রহন্তারক লক্ষ্মণ। কবি যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের মহাপরাক্রমের আশ্চর্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা শুধুই একজন যোদ্ধার বীরত্ব-পূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ মাত্র নয়। এক মহাপরাক্রমশালী বীর যিনি হৃদয়ের মধ্যে পুত্রশোকের নিদারুণ জ্বালা লইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন—সেই রাবণের পরাক্রমের বর্ণনা। রাবণ-চরিত্রের এই মর্মজ্বালার জন্যই যুদ্ধবর্ণনার প্রতিটি পঙক্তি মানব-রসের দ্যোতনায় গভীরতর তাৎপর্য পায়। রুদ্রতেজে পূর্ণ রাবণের সম্মুখে কোনো বীর দাঁড়াইতে পারিল না। স্বয়ং কার্তিক দূরে সরিয়া গেলেন। রামচন্দ্রের প্রধান সেনানায়কদের একে একে পর্যুদস্ত করিয়া শেষ পর্যন্ত রাবণ আক্রমণ করিয়াছেন লক্ষ্মণকে। শক্তি-অস্ত্রের আঘাতে লক্ষ্মণ ভূপতিত হইলে রাবণের ক্রোধ শান্ত হইল। মহাদেবের দূত বীরভদ্রের অনুরোধে রাবণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন।

[অষ্টম সর্গ] 'প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গঃ'। এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত কাব্যের মূল কাহিনীর বিশেষ কিছু সংযোগ নাই। যুদ্ধশেষে লক্ষ্মণের দুর্দশায় মর্মাহত হইলেন। শোকে তিনি বিকল। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া পার্বতী দুঃখিত হইলেন। মহাদেব পার্বতীর দুঃখের কারণ জানিয়া প্রতিকারের উপায় বলিয়া দিলেন। মায়াদেবী রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া প্রেতপুরীতে যাইবেন, সেখানে দশরথের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং দশরথ রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের জীবন-লাভের উপায় বলিয়া দিবেন। এই সূত্রে মধুসূদন প্রেতপুরীর এক সুদীর্ঘ বর্ণনা যোজনা করিয়াছেন। এ কাব্যের অন্যত্র স্বর্গ এবং মর্তের বর্ণনা আছে, অষ্টম সর্গে নরকের বর্ণনা যোজনা করিয়া কাব্যপটভূমিকে পূর্ণাঙ্গ করা হইয়াছে। এই প্রেতপুরীর বর্ণনায় দান্তে এবং অংশত মিল্টনের প্রভাব আছে। সুদীর্ঘ

নরক পরিক্রমার শেষে রামচন্দ্রের সহিত দশরথের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। ছায়াশরীরী দশরথ লক্ষ্মণের প্রাণ ফিরাইবার উপায় জানাইলেন। সুগন্ধমাদন গিরির শৃঙ্গদেশ হইতে বিশল্যকরণী নামক স্বর্ণাভ লতা আনিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। রামচন্দ্র সবিস্ময়ে পিতাকে প্রণাম করিয়া লঙ্কার উদ্দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

[নবম সর্গ] 'সংক্রিয়া নাম নবমঃ সর্গঃ'। মেঘনাদবধ কাব্যের অন্যান্য সর্গের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত এই নবম সর্গে একদিকে রামচন্দ্রে শিবিরের আশা ও আনন্দের উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে লঙ্কাপুরীতে সর্বব্যাপী হতাশা ও শোকের বর্ণনা আছে। নবম সর্গের সূচনা হইয়াছে বিষাদগ্রস্ত শোকাভিভূত রাবণের চিত্রে। সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি ভূতল আশ্রয় করিয়াছেন। আর ভরসার কোনো অবলম্বন তাঁহার নাই। নিয়তি যে তাঁহাকে অনিবার্যভাবে মহা সর্বনাশের দিকে আকর্ষণ করিতেছে তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন। চরম শক্তিপরীক্ষার পূর্বে মৃতপুত্রের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি রামচন্দ্রের নিকট সাতদিনের জন্য যুদ্ধবিরতি ভিক্ষা করিলেন। রামচন্দ্র এ প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। মধুসূদন তাঁহার প্রিয় নায়ক মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি বর্ণনায় অপূর্ব সংযম এবং গভীর রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। শোকযাত্রা মৃত-বীরকে বহন করিয়া সমুদ্রতীরের শ্মশানে উপস্থিত হইল। সহমরণের উদ্দেশ্যে প্রমীলা পতির সহিত শ্মশানে আসিয়াছেন। এই নিদারুণ ঘটনার তত্ত্বাবধান করিতেছেন স্বয়ং রাবণ। মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানে শত শত রথীসহ অঙ্গদ রামচন্দ্রের পক্ষ হইতে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। আকাশপথে দেবতাদের আবির্ভূত হইতে দেখা গেল। ক্রমে শাস্ত্রীয় কৃত্যাদি সমাপ্ত হইলে ইন্দ্রজিতের দেহ চিতায় স্থাপন করা হইল, সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রমীলাও চিতায় আরোহণ করিলেন। অসহ্য বেদনায় রাবণ পুত্র ও পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে শেষ বিদায়বাণী উচ্চারণ করিলেন। রাবণের দুঃখে কৈলাসে মহাদেব অধীর হইলে পার্বতী তাঁহাকে শান্ত করিলেন। অগ্নি-দেবতা মহাদেবের আদেশে চিতা প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলেন। সকলে সচকিত হইয়া দেখিল আগ্নেয় রথে আসীন মেঘনাদ পত্নীসহ আকাশপথে অদৃশ্য হইলেন। দুগ্ধধারায় চিতা নির্বাপিত করা হইল। চিতাভস্ম সকলে সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিল। লক্ষ রাক্ষসশিল্পী দ্রুত চিতার উপরে এক অভ্রভেদী মঠ নির্মাণ করিল।

"করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে. আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।"

রামায়ণ ও মেঘনাদবধ কাব্য ঃ

রামায়ণ কাহিনী যুগে যুগে ভারতবর্ষের কবিদের নিকট বিষয়বস্তুর অফুরন্ত উৎসরূপে বিরাজ করিয়াছে। আধুনিক কালের কবি মধুসূদনও বিষয়বস্তুর জন্য এই চিরায়ত কাহিনীর উপরে নির্ভর করিয়াছেন। মধুসূদন লিখিয়াছেন, "In the poem, I mean to give free scope to my inventing power (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki." সেকালে মেঘনাদবধ সম্পর্কে যতো আপত্তি উঠিয়াছিল তাহার অধিকাংশই রামায়ণ কাহিনীকে মধুসূদন বিকৃত করিয়াছেন এবং রামায়ণের শ্রদ্ধেয় চরিত্রগুলিকে হীনতায় মণ্ডিত করিয়াছেন—এই জাতীয় আপত্তি। এইরূপ আপত্তির কারণ বুঝাইবার জন্য এবং মধুসূদন এই পুরাতন কাহিনীর আধারে যে নতুন ভাব-ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য রামায়ণ ও মেঘনাদবধের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমে মেঘনাদবধের ঘটনাগুলি রামায়ণের সহিত মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে। মেঘনাদবধের কাব্যের সূচনায় আছে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ। বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকাভিভূত রাবণ নিজেই যুদ্ধে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। মেঘনাদ ইতিপূর্বে সৈনাপত্য করিয়াছেন, তাই তাঁহাকে আর আহ্বান জানানো হয় নাই। কিন্তু এই সংবাদে মেঘনাদ নিজেই পিতার নিকট যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহাকে সৈনাপত্যে বরণ করা হইল। বাল্মীকি-রামায়ণে বীরবাহুর মৃত্যুর পরে নহে, মকরাক্ষের মৃত্যুর পরে ইন্দ্রজিৎকে সৈনাপত্যে বরণের কথা আছে। বীরবাহুর মৃত্যু ইত্যাদি প্রসঙ্গ মধুসূদন বাল্মীকি নহে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে মধুসূদন বাল্মীকির পরিবর্তে কৃত্তিবাসকেই বেশি অনুসরণ করিয়াছেন দেখা যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে বর্ণিত ঘটনা কবি নিজে উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইহার জন্য বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের নিকট ঋণী নহেন। ঋণ যদি থাকে তবে পাশ্চাত্ত্যের কবিদের নিকট। চতুর্থ সর্গের সূচনায় কবি বাল্মীকিকে প্রণাম

জানাইয়াছেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের অপর বিখ্যাত কবিদের ন্যায় নিজেও যশোমন্দিরে প্রবেশের আশা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সর্গে সীতার স্মৃতিচারণসূত্রে বর্ণিত পূর্বকাহিনী বর্ণনায় মধুসূদন আর্য রামায়ণ অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অবশ্য সীতার ক্ষমাশীল, বেদনাবিধুর চরিত্র তাঁহার নিজেরই সৃষ্টি। প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি বর্ণনায় মধুসূদন ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

মধুসূদন রামায়ণের কাহিনীতে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন ইন্দ্রজিৎ বধের ঘটনাটিতে। বাল্মীকি রামায়ণে আছে, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া ইন্দ্রজিৎ প্রথমবার যুদ্ধে গেলেন এবং প্রবল বিক্রমে রামচন্দ্রের সৈন্যদের বিপর্যস্ত করিলেন। এই সময়ে তিনি মায়াসীতা দ্বিখণ্ডিত করেন। রামচন্দ্রের সৈন্যরা এ ঘটনায় বিমূঢ় হইয়া পড়িল। ইন্দ্রজিৎ এই সময়ে দ্বিতীয়বার নিকুম্ভিলা যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে বিভীষণ যজ্ঞসাঙ্গের পূর্বেই তাহাকে হত্যা করিবার পরামর্শ দেন। বাল্মীকির বর্ণনায় যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থল। লক্ষ্মণ সসৈন্যে এই যজ্ঞস্থল আক্রমণ করেন। এখানে তুমুল সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। নিজ সৈন্য বিনষ্ট হইতেছে জানিয়া ইন্দ্রজিৎও যুদ্ধ করিতে আসেন। লক্ষ্মণের সহিত বিভীষণকে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ তাহাকে নানাভাবে তিরস্কার করেন। বিভীষণ এই তিরস্কার উপেক্ষা করিয়া নিজে সৈন্যদের উৎসাহিত করেন। ইন্দ্রজিৎ রথে এবং লক্ষ্মণ হনুমানের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হন। শেষ পর্যন্ত ঐন্দ্রবাণে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের মস্তক দেহচ্যুত করিলেন। মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত ঘটনার সহিত রামায়ণের এই বর্ণনার মিল সামান্যই। মেঘনাদবধের বর্ণনায় নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার লঙ্কাপুরীতে অত্যন্ত সুরক্ষিত স্থানে। সেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। ইন্দ্রজিৎ এই যজ্ঞাগারে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে যজ্ঞ সমাপন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ বিভীষণের সহায়তায় গোপনে সেখানে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ নিধন ব্যাপারে লক্ষ্মণের চরিত্রে কোনোপ্রকার হীনতা দেখা যায় না,—মধুসূদন লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষ চরিত্রে দাঁড় করাইয়াছেন। মেঘনাদের মৃত্যুর শোচনীয়তা শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাকে অসহায় অবস্থায় স্থাপন করিয়া। ঘটনার এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে আধুনিক কবির উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাবণ-পক্ষীয়দের প্রতি পক্ষপাতই এই পরিবর্তনের হেতু।

সপ্তম সর্গে রাবণ ও লক্ষ্মণের যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে তাহা রামায়ণের অনুসরণে রচিত হইলেও হুবহু মিল পাওয়া যাইবে না। মধুসূদন নিজ পরিকল্পনা অনুসরণে রাবণ-চরিত্র গড়িয়াছেন, যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাও সাজাইয়াছেন রাবণ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। মধুসূদন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন লক্ষ্মণের জন্য বিশল্যকরণী সংগ্রহের প্রসঙ্গটিতে। মূল রামায়ণে এই ঔষধের কথা বলিয়াছে বানর-চিকিৎসক সুষেণ। মেঘনাদবধ কাব্যে মহাদেবের নির্দেশে মায়াদেবীর সহিত প্রেত-পুরীতে গিয়া রামচন্দ্র দশরথের নিকট হইতে ঔষধের কথা জানিয়া আসিয়াছেন। অষ্টম সর্গের গোটা প্রেতপুরী বর্ণনার সুযোগ সৃষ্টির জন্যই কবিকে এই ব্যতিক্রম ঘটাইতে হইয়াছে। নবম সর্গে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টির বর্ণনাও মধুসূদনের নিজস্ব পরিকল্পনা। দেখা যাইতেছে কাহিনীর কাঠামোর জন্য বাল্মীকিকে যতটুকু অনুসরণ করা প্রয়োজন, মধুসূদন সেইটুকু অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যের সুবৃহৎ পরিকল্পনার প্রায় সম্পূর্ণই স্বাধীন কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়া রচিত। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের গল্পধারা পদে পদে অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তিনি যে আধুনিক ধ্যান-ধারণা প্রকাশের প্রেরণায় এই কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই প্রেরণার বশেই আখ্যানবস্তুতে, চরিত্রের রূপে পরিবর্তনসাধন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক কবির হাতে রামায়ণ কাহিনীর এই রূপান্তর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণযোগ্য। **রবীন্দ্রনাথ** লিখিয়াছেন, : "য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নতমস্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে ; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণ কথার একটি নূতন-বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, এ কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল ? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি—তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।" নতুন যুগের নতুন বাণীর আধাররূপে রামায়ণ-কাহিনী মধুসূদনের হাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে বাল্মীকি বর্ণিত নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র বা

কৃত্তিবাস-বর্ণিত ভক্তের ভগবান রামচন্দ্র আর শ্রদ্ধেয় বিবেচিত হন নাই। তিনি সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন আদর্শ মানুষ বা অবতার রামচন্দ্রের প্রতিপক্ষ, বহুনিন্দিত রাবণের প্রতি, রাবণের পুত্রদের প্রতি। আত্মমর্যদাসম্পন্ন, আপন শক্তি বিষয়ে প্রত্যয়শীল, পরাক্রান্ত রাবণ আধুনিক কবির দৃষ্টিতে মহৎ মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। সমালোচক **মোহিতলাল** লিখিয়াছেন, "পাপপুণ্যের ফলাফল চিন্তা নয়, আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক ইষ্টসাধনও নয়—মানুষের স্বভাব-ধর্মের যে মনুষ্যত্ব—তাহা অপেক্ষা মূল্যবান আর কিছুই নহে; সেই মনুষ্যত্বের স্ফুরণে যদি কোনো ধর্মবিধি বা দেব-আরাধনা বাধা হইয়া দাঁড়ায়, এবং তজ্জন্য বিনাশপ্রাপ্ত হইতেও হয়, তথাপি তাহাও শ্রেয়ঃ; সুখদুঃখ, পাপপুণ্য ও জয়-পরাজয়ের অপূর্ব উল্লাস ও অপূর্ব বেদনা—ইহাই মানবতার নিদান। To be weak is miserable doing or suffering—মধুসূদনের প্রিয় কবি মিল্টনের এই মহাবাক্যই তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের অন্তর্নিহিত বাণী। মিল্টনের মহাকাব্য হইতে তিনি বোধ হয় এই মন্ত্রটিই লাভ করিয়াছিলেন।" অতিশয় সুস্থ সবল এক জীবনাদর্শ রূপায়ণের জন্যই তিনি রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। রামায়ণের কাহিনী এতকাল দেশের মানুষের চিত্তে যে জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—মধুসূদনের আদর্শ তাহা হইতে মূলত ভিন্ন। তাই তাঁহার হাতে এই কাহিনীর স্থূল ঘটনাগুলি অবিকৃত থাকিলেও মর্মগত রসাবেদন সম্পূর্ণই ভিন্ন।

মেঘনাদবধ কাব্যের গঠন ঃ

সুবৃহৎ কাহিনী পরিবেশনের উদ্দেশ্যে কাব্যরচনার দৃষ্টান্ত সংস্কৃত এবং বাঙলা সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু এই সকল রচনায় কোনো পূর্বনির্ধারিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আভাস মেলে না। কাহিনী শাখা-প্রশাখায় জটিল হইয়া এমন বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে যে কেমন করিয়া সমাপ্তিতে সকল ধারা সংবৃত হইবে বোঝা যায় না। অনেক সময়েই আকস্মিক, অলৌকিক ঘটনার সহায়তায় আখ্যান শেষ করিতে হয়। রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃত মহাকাব্য সম্পর্কে একথা যেমন সত্য বাঙলায় রচিত মহাকায় কাব্যগুলি সম্পর্কেও তেমনি সত্য। একটি প্রথাসিদ্ধ কাঠামোর মধ্যে যতো খুশি অবান্তর প্রসঙ্গ ভরাট করিয়া যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে গঠনগত পারিপাট্যের জন্য তাহার প্রশংসা করা চলে না। ভাস্করসুলভ নৈপুণ্যে কোনো

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে কাব্যের অংশগুলি যোজনা করিয়া সমগ্র কাব্যদেহকে সুঠাম সৌন্দর্যদানের আগ্রহ আমাদের কবিদের মধ্যে দেখা যায় নাই। ইহাতে উচ্চতর কলা-কুশলতা এবং শিল্পচেতনার অভাবই প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করিতে গেলে পদে পদে লেখকদের আঙ্গিক বিষয়ে সচেতনতা চোখে পড়ে। বোঝা যায় আঙ্গিকের সাধনাকে তাঁহারা শিল্পসিদ্ধির প্রধানতম উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মধুসূদনে যে আমরা আঙ্গিক বিষয়ে প্রখর বোধ এবং সদাসতর্ক পরীক্ষার দৃষ্টান্ত পাই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শিক্ষাই তাহার কারণ। তিনি নিতান্ত প্রাথমিক রচনাতেও প্রচলিত কাব্যরীতির, কাব্যভাষার অনুবর্তন করেন নাই। যাহা প্রকাশ করিতে চান, সেই বিষয়-বস্তুর উপযুক্ত আধারনির্মাণে তাহার অধ্যবসায় চিরদিন অক্লান্ত ছিল। এই কবির আন্তরিক প্রযত্নে বাঙলায় সর্বপ্রথম উন্নত শিল্পবোধসঞ্জাত সুঠাম কায়া-সম্পন্ন কাব্য রচিত হইয়াছে, সেই কাব্য মেঘনাদবধ।

মেঘনাদবধ কাব্যে বর্ণনীয় ঘটনা খুব বেশি নয়। এই সামান্য উপকরণ লইয়া সুবৃহৎ কাব্যরচনার আয়োজন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় প্রাধান্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এ কাব্য পাঠ করিলেই মনে হয় কবি যদৃচ্ছভাবে লেখনী চালনা করেন নাই। পূর্ব হইতে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা স্থির করিয়া লইয়াছেন এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে পর পর সর্গগুলি যোজনা করিয়াছেন। মধুসূদনের হাতে লেখা এই কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের নিকট লেখা চিঠিপত্র হইতে প্রমাণ করা যায়, এই পরিকল্পনা অনুসারে কাব্যটি সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে তিনি কতো সতর্কভাবে অগ্রসর হইয়াছেন। শুধু আখ্যান-বিন্যাসই নহে, এমনকি শব্দব্যবহার বিষয়েও তাঁহার সতর্কতা এবং কাব্যরসের দিক হইতে উপযোগিতা বিচারে বিস্মিত হইতে হয়। মধুসূদন এ কাব্যে অতিশয় মার্জিত শিল্পরুচি এবং সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় দিয়াছেন, এই বোধ বাঙলা কবিতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব।

মেঘনাদবধ-এর কেন্দ্রীয় ঘটনা সংঘটিত হয় ষষ্ঠ সর্গে। ইহার পূর্বের পাঁচটি এবং পরের তিনটি সর্গে যথাক্রমে এই ঘটনার প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া কবির বর্ণনীয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম সর্গ মেঘনাদ চরিত্রের অন্তর-বাহিরের রূপ উদঘাটনে এবং তাহার ভাগ্য-বিপর্যয়ের পটভূমি প্রস্তুতের জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। প্রথম সর্গে তাহাকে সৈনাপত্যে বরণ করা হয়, দ্বিতীয় সর্গে তাহাকে কৌশলে নিধনের জন্য দেবতাদের ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজনের

বর্ণনা, প্রকারান্তরে ইহাতে মেঘনাদের শৌর্যই প্রতিষ্ঠিত হয়; তৃতীয় সর্গে মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলার বীরত্বপূর্ণ প্রয়াসে দাম্পত্য সম্পর্কের এক নূতন রূপ পরিস্ফুটিত হয়; এবং পঞ্চম সর্গের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষভাবে মেঘনাদের মৃত্যুর সহিত সম্পৃক্ত। এই চারিটি সর্গের বিন্যাসে কবিচিত্তে কোনো দ্বিধা নাই। ইহার কোনো অংশকেই অবান্তর বলা যায় না। কেন্দ্রীয় ঘটনার যুক্তিসঙ্গতি রক্ষা এবং মেঘনাদের মৃত্যুকে ব্যাপক তাৎপর্যে মণ্ডিত করার জন্যই এই চারিটি সর্গের পরিসর প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে চতুর্থ সর্গ লইয়া। 'অশোকবন' নামক এই সর্গে কবি মূল প্রসঙ্গ হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। ইহার কারণ যাহাই হোক, কাব্যের গঠনের দিক হইতে চতুর্থ সর্গের উপযোগিতা অস্বীকার্য। রাবণ বিপন্ন কেন, মধুসূদন ইতিপূর্বে কোথাও খুব স্পষ্টভাবে তাহা বলেন নাই। একমাত্র চিত্রাঙ্গদা সীতাহরণের পাপের কথা উল্লেখ করিয়াছিল। রাবণ যে দুর্দশায় পতিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত দৈবের নিগ্রহ নয়, নিজেরই কৃতকর্ম ইহার হেতু। এই হেতু নির্দেশ করার প্রয়োজন ছিল না এমন কথা বলা যায় না। অন্তত মেঘনাদবধ কাব্যকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলেও সীতাহরণ প্রসঙ্গ কোনো-না-কোনো ভাবে বলা প্রয়োজন। রামায়ণ পাঠ করিয়া তবে এ কাব্য পড়িতে হইবে—এরূপ নির্দেশ নিশ্চয়ই দেওয়া চলে না। তাই এই কাব্যের মধ্যেই কোথাও রামচন্দ্র কর্তৃক লঙ্কা অবরোধের কথা বলা অপরিহার্য। কবি একটি সুন্দর সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। দেশদ্রোহী বিভীষণের স্ত্রী সরমার সহিত সীতার কথোপকথনের এই দৃশ্য নিতান্তই স্বাভাবিক। এইসূত্রে রামের বনবাস এবং সীতাহরণ প্রসঙ্গের প্রয়োজনীয় অংশটুকু কবি সুকৌশলে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং চতুর্থ সর্গের অবস্থিতি মেঘনাদবধ কাব্যে অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই; ইহার জন্য কাব্যটির গঠনে কিছু ত্রুটি ঘটিয়াছে এমন কথাও বলা যায় না। বরং নবউদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে শুধু সমারোহপূর্ণ যুদ্ধায়োজন বর্ণনার উপযোগী নয়, এই ছন্দে যে সূক্ষ্ম কোমল হৃদয়ানুভূতিও সমান দক্ষতায় প্রকাশ করা যায়, চতুর্থ সর্গে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই সর্গে মুখ্যত দুটি নারীর কথোপকথন গ্রথিত হইয়াছে। নারী চরিত্রের সংলাপ বলিয়াই মধুসূদন এখানে ভাষাব্যবহারে বাঙলা ভাষার দেশজ ভঙ্গির উপর নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই ভাষাভঙ্গি কোথাও বেমানান হয় নাই। ভাষা ও ছন্দ বিষয়ে এইসব পরীক্ষার সুযোগের দিক হইতেও চতুর্থ সর্গের গুরুত্ব স্বীকার্য।

ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুর পরে আরও তিনটি সর্গ যোজিত হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে লক্ষ্মণের উদ্দেশে মেঘনাদ বলিয়াছে,

"এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম ?...... ....
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে ?"

মেঘনাদের এই উক্তিতেই সপ্তম সর্গের ভূমিকা রচিত হইয়াছে। এ কাব্যে এই একবারমাত্র প্রত্যক্ষ যুদ্ধের বর্ণনা আছে। শোকাভিভূত রাবণ রুদ্রতেজে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, প্রবল শোকই এই যুদ্ধে তাহাকে পরাক্রান্ত করিয়াছে। ষষ্ঠ সর্গের তুলনায় সপ্তম সর্গ ঘটনাবহুল। যুদ্ধবর্ণনায় কবি রাবণের বীর্যবত্তা পরিপূর্ণরূপে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের পটভূমিতে ইন্দ্রজিতের চেয়ে রাবণের চরিত্রই প্রাধান্য পাইয়াছে। এ কাহিনী মূলত রাবণেরই দুঃখভোগের কাহিনী। পূর্বাপর সমগ্র ঘটনার লক্ষ্য রাবণের জীবন-নিয়তি পরিস্ফুট করা। এ কাব্যের নায়ক রাবণ। মেঘনাদের মৃত্যু রাবণের পক্ষে দুঃসহতম শাস্তি। তাহার শেষ ভরসার স্তম্ভস্বরূপ মেঘনাদ বিধ্বস্ত হওয়ায় এইবার সময় আসিয়াছে একাকি সর্বনাশের সম্মুখীন হওয়ার। সপ্তম সর্গে অবশ্য রাবণ জয়ী হইয়াছে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত লঙ্কাপুরীর ভাগ্যে আসন্ন দুর্যোগের ইঙ্গিত কাব্যের এই পর্যায়ে অত্যন্ত স্পষ্ট। রাবণ-চরিত্রকে যদি মেঘনাদবধ কাব্যে কেন্দ্রীয় পুরুষ রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে তাহার দিক হইতে এই সপ্তম সর্গটিকে মনে হয় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। কাব্যের প্রথম হইতে এই অমিত বলবীর্যসম্পন্ন পুরুষ সম্পর্কে যতো কথা বলা হইয়াছে, সপ্তম সর্গে প্রত্যক্ষ ঘটনায় তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন করার সুযোগ ঘটিয়াছে।

কিন্তু অষ্টম সর্গ সম্পর্কে খুব সঙ্গত কারণে আপত্তি উঠিতে পারে। মূল রামায়ণে লক্ষ্মণের জীবনলাভের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছিল সুষেণ নামক বানর চিকিৎসক। মধুসূদন তাঁহার কাব্যে মহাদেবের নির্দেশে দশরথের নিকট হইতে চিকিৎসাবিধি জানিবার ব্যবস্থা করিয়া প্রেতলোক বর্ণনার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। লক্ষ্মণের নিরাময় ব্যাপারটি মেঘনাদবধ কাব্যের পক্ষে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাঠক যেহেতু রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত সুতরাং লক্ষ্মণ সম্পর্কে কোনো কথা বলা না হইলেও কেহ অনুযোগ করিত না। এই

সর্গে নরকের বর্ণনা সংযোজিত হওয়ায় কাব্যের পটভূমি স্বর্গ-মর্ত-নরকে ব্যাপকতর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অষ্টম সর্গের স্বতন্ত্র কাব্যমূল্য যেমনই হোক—এই পটভূমি সম্প্রসারণ ভিন্ন কাব্যের গঠনগত দিক হইতে এই অংশ যোজনার আর কোনো কারণ দেখানো যায় না। মেঘনাদবধ কাব্যের পরিকল্পনার এই অষ্টম সর্গটিকেই একমাত্র দুর্বলতা বলা যায়।

নবম এবং শেষতম সর্গের বর্ণনীয় বিষয় ইন্দ্রজিতের অন্ত্যেষ্টি। রাবণ এই অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক। সমগ্র পরিবেশটি প্রথমাবধি বিষাদগম্ভীর। শত্রুপক্ষীয়দের আচরণেও পরম শালীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। রাবণের দিক হইতে, সমগ্র লঙ্কাবাসীর দিক হইতে এই অনুষ্ঠানে বস্তুত তাহাদের সৌভাগ্য-গর্বিত দিনের শেষ। এই চিতাগ্নিতেই লঙ্কার রাজশ্রী ভস্মীভূত হইয়াছে। যে চূড়ান্ত ট্র্যাজিডির দিকে এ কাব্যের ঘটনাবলী অগ্রসর হইতেছিল সমুদ্রতীরের শ্মশানের বিষাদগম্ভীর পরিবেশ তাহা সম্পূর্ণ হইল। রাবণের এক পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে কাব্যের সূচনা হইয়াছিল, আর যুবরাজ ইন্দ্রজিতের চিতাভস্ম সমুদ্রে বিসর্জন দিয়া কাব্যের সমাপন হইয়াছে। শুধু ঘটনার দিক হইতে নহে, আবেগগত পরিণতির দিক হইতেও এমন সুবলয়িত সুসম্পূর্ণ কাব্য ইতিপূর্বে বাঙলা ভাষায় আর একটিও রচিত হয় নাই।

মেঘনাদবধ কাব্যের গঠনশৈলী প্রসঙ্গে **মোহিতলাল** মন্তব্য করিয়াছেন, "মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন সর্বপ্রথম য়ুরোপীয় কাব্যকলাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। কাব্যের কেন্দ্র ও পরিধি গোড়া হইতে স্থির করিয়া নয়টি সর্গে তিনি পরপর যে বস্তু যোজনা করিয়াছেন; সামান্য আখ্যানটুকুকে যেরূপ সাবধানতার সহিত বিস্তারিত করিয়াছেন; সর্গগুলির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য ও যথাস্থানে যেভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন; এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মূল কাহিনীর গতিধারা যেরূপ অব্যাহত রাখিয়াছেন—তাহাতে কাব্যখানি, গঠনে ও গাঢ়বদ্ধতায়, প্রায় অনবদ্য হইয়াছে। ...মধুসূদনের কাব্যের সঙ্গে সে যুগের অপর মহাকাব্যগুলির তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কেবল কল্পনার স্রোত বা উপকরণ-বাহুল্যই কাব্যের গৌরব নয় এমন কি, ভাবের উচ্চতা বা বিষয়ের বিরাটত্বই কাব্যগত উৎকর্ষের প্রমাণ নয়; বিরাটই হউক, আর ক্ষুদ্রই হউক—কল্পনা যদি মেরুদণ্ডহীন হয়, এবং উপকরণের পরিমাণ অনুযায়ী গঠন-নৈপুণ্য না থাকে, তাহা হইলে রচনার সেই শিথিল, অসংলগ্ন মেদবহুল বপু সত্যকার রসরূপ ধারণ করিতে পারে না। যাঁহারা একটু মনোযোগের সহিত

মেঘনাদবধ কাব্যের এই গঠননৈপুণ্য লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, কেবল নূতন ভাষা, নূতন ছন্দ ও নূতন কল্পনাভঙ্গি নয়—মধুসূদন কাব্যরচনায় এই যে শিল্পীজনোচিত বিবেকবুদ্ধিকে মান্য করিয়াছিলেন—ইহাও বাঙলা কাব্যে কাব্যকলার এক নূতন ও অত্যাবশ্যক আদর্শ প্রতিষ্ঠার মত ইহা প্রকৃত সৃষ্টিশক্তিরও একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। সে যুগের আর কোন কবির—হেম, নবীন, বিহারীলাল, কাহারও—কবিত্ব যে পরিমাণেই থাকুক—এই শক্তি ছিল না।"

মহাকাব্যের লক্ষণ ও মেঘনাদবধ :

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা কাব্যের নবজন্মের দিনে মহাকাব্য রচনার ব্যাপক আয়োজন দেখা গিয়াছিল। মহাকায় কাব্য রচিত হইয়াছিল বেশ কিছু। কিন্তু সকল সমালোচনা অতিক্রম করিয়া আজ পর্যন্ত একমাত্র মেঘনাদ-বধ কাব্যই বাঙলা সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ মহাকাব্যরূপে স্বীকৃত। সাধারণ পাঠকেরা নিশ্চয়ই সমালোচনাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট লক্ষণ মিলাইয়া এই কাব্যকে মহাকাব্যরূপে সমাদর করিয়াছেন—এমন নয়। সাধারণভাবে আধুনিক বাঙলায় রচিত কাব্যের মধ্যে এই একটি রচনাতেই কল্পনার অসীম বিস্তার, সুবিস্তৃত পটভূমি, বলবীর্যে সুমহান্ চরিত্রের সমাবেশ এবং একটি সুপরিকল্পিত পারিপাট্যে বর্ণনীয় বিষয়ের বিন্যাস লক্ষ্য করিয়া ইহাকেই মহাকাব্যের সার্থক দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হয়তো বৃত্রসংহারের মতো কাব্যেও এই লক্ষণসমূহ বিদ্যমান। কিন্তু সে কাব্য আদৌ কাব্য হিসাবে পাঠকচিত্তকে স্পর্শই করে না। যাহা আদৌ কবিতাপদবাচ্য হয় নাই তাহা যথার্থ মহাকাব্য হইয়াছে কিনা—এ ভাবনা অবান্তর। এই কারণেই মহাকাব্যের লক্ষণের দিক হইতে শুদ্ধতর বৃত্রসংহার সমাদর পায় নাই, অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও মেঘনাদবধ সমাদর লাভ করিয়াছে। আধুনিক বাঙলায় একমাত্র মেঘনাদবধ ভিন্ন মহাকাব্য রচনায় সাফল্যের আর কোনো দৃষ্টান্ত নাই।

তবুও এই কাব্য প্রচলিত সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডে কতোটা মহাকাব্য নামের যোগ্য তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। এ বিচারে আবার মানদণ্ড বিষয়েই বিতর্ক সম্ভব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের আদর্শ এক নয়। কোন্ আদর্শে বিচার সঙ্গত সেও এক সংশয়িত প্রশ্ন। বিষয়টির সকল দিকই তাই আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

ভারতীয় সমালোচনায়, অলংকার শাস্ত্রে মহাকাব্যের আঙ্গিক সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সাহিত্যদর্পণ'-এ এ বিষয়ে বলা হইয়াছে, মহাকাব্য সর্গে বিভক্ত হইবে। কাব্যের নায়ক হইবে কোনো দেবতা বা সদ্বংশজাত ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয় পুরুষ। শৃঙ্গার, বীর বা শান্ত—ইহার মধ্যে একটি হইবে প্রধান রস, অন্যান্য রস প্রধান রসের অনুরূপে স্থানলাভ করিবে। সূচনায় থাকিবে নমস্কার আশীর্বাদ ও বস্তুনির্দেশ। সর্গ-সংখ্যা আট-এর বেশি হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সর্গে ছন্দের বৈচিত্র্য থাকিবে। কাব্যের নামকরণ হইবে কবি, নায়ক, বৃত্তান্ত বা অন্য কাহারও নামে। বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে নগর, বন, উপবন, শৈল-সমুদ্র, প্রভাত সন্ধ্যা, মন্ত্রণা ও যুদ্ধ প্রভৃতি স্থান পাইবে।—এই বিবরণে যে লক্ষণগুলি বলা হইয়াছে তাহা নিতান্ত বাহ্যিক। এইসব লক্ষণ মিলাইয়া বহু নিকৃষ্ট রচনাকেও অনায়াসে মহাকাব্যের পর্যায়ে ফেলা যায়। মনে হয় সংস্কৃত মহাকাব্যগুলিকে সামান্য লক্ষণসমূহ বিশ্বনাথ এখানে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। দু একটি ভিন্ন ইহার অনেকগুলি লক্ষণ মেঘনাদবধ কাব্যেও আছে। অষ্টাধিক সর্গে রচিত বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে বিশ্বনাথের তালিকার সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। নায়ক অবশ্য দেবতা বা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় নয়, যে রস এই কাব্যে প্রাধান্য পাইয়াছে তাহা করুণ। মিল এবং ব্যতিক্রমগুলির হিসাব করিয়া দেখিলে মেঘনাদবধ কাব্যকে পুরাপুরি না হোক মহাকাব্যেব লক্ষণযুক্ত রচনা বলিতে স্বয়ং বিশ্বনাথও আপত্তি করিতেন না। মধুসূদন অবশ্য বিশ্বনাথকে অক্ষরে অক্ষরে মানিতে সম্মত ছিলেন না। "I will not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of Sahitya Darpan."

পাশ্চাত্ত্যের সমালোচকদের দৃষ্টিতে মহাকাব্যের মধ্যে শ্রেণীভেদ ধরা দিয়াছে। যে অর্থে হোমারের রচনা বা বেদব্যাস বাল্মীকির রচনাকে মহাকাব্য বলা যায়, সেই অর্থে কালিদাস বা মিল্টনের রচনাকে মহাকাব্য বলা যায় না। হোমারের বেদব্যাস বাল্মীকির নামের আড়ালে বহু রচয়িতা বহুদিন ধরিয়া ওই প্রাচীন মহাকাব্যগুলির আয়তন বিপুলতর করিয়া তুলিয়াছেন। গ্রীস ও ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনের যতো কিছু ইষ্টচিন্তা শুভাশুভবোধ সকলই মূর্ত হইয়াছে ইলিয়াড-ওডিসি এবং রামায়ণ-মহাভারতে। অজ্ঞাত লুপ্ত ইতিহাসের অনেক উপকরণ এইসব মহাকাব্যের মধ্যে স্তূপীকৃত হইয়া আছে। পাশ্চাত্ত্য সমালোচনায় এই শ্রেণীর মহাকাব্যকে Authentic [illegible] বলা হইয়াছে।

কোনো একজন বিশেষ কবির চেষ্টায় এরূপ কাব্য রচনা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্ত্য সমালোচনায় অপর শ্রেণীর মহাকাব্য; যে কাব্যে কবিবিশেষের ব্যক্তিগত প্রতিভার সৃষ্টি—তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে Literary Epic। কালিদাস, ভার্জিল, টাসো, মিলটন প্রভৃতির রচনা এই শ্রেণীর। মধুসূদনের মেঘনাদবধ এই শ্রেণীর মহাকাব্যের আর একটি দৃষ্টান্ত। Literary Epic বা সাহিত্যিক মহাকাব্য বিভিন্ন যুগে রচিত হইয়াছে। বিশেষ যুগের ধ্যানধারণার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বহুবিদিত পৌরাণিক কাহিনীর পুনর্বিনাস করা হইয়াছে এই সকল কাব্যে। একদিকে দেশের এবং জাতির ঐতিহ্যের ধারা হইতে উপকরণ সংগ্রহ অন্যদিকে সেই উপকরণের সাহায্যেই সমসাময়িক যুগের মানসিকতা প্রতিফলন এই কাব্যগুলিকে প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্যকৃতির মর্যাদা দিয়াছে। এইদিক হইতে মেঘনাদবধ কাব্যের মূল্য বিচার করিয়া অধ্যাপক **শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** লিখিয়াছেন, "মহাকাব্যের সার্থক রচনা যুগমানসের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও কয়েকটি বিরল গুণের একাঙ্গিক (organic) সমাবেশের উপর নির্ভরশীল। যে বিরাট পটভূমিকার মধ্যে উহার ঘটনাবিন্যাস করিতে হয় তাহাকে পূর্বতন ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, আখ্যান-কিংবদন্তী, ধর্মবোধ ও সমাজচেতনার সমবায়ে গঠন করা প্রয়োজন। সুতরাং অতীত ইতিহাসের সহিত ব্যাপক ও অন্তরঙ্গ পরিচয়, কল্পনার দিগন্তব্যাপী প্রসার, ভাবসমুন্নতি সৃষ্টির জন্য অতীতের বিচিত্র-উপাদান-গঠিত প্রাণসত্তার এক বিশাল-আয়তন-ব্যাপ্ত, সহজ সম্প্রসারণ—মহাকাব্য রচয়িতার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় গুণ। প্রকাণ্ড প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের উপর প্রসারিত অসীম নীলাকাশের ন্যায় মহাকাব্য-বর্ণিত আখ্যায়িকার ঊর্ধ্বতন বায়ুস্তরে যেন জাতীয় জীবনের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা স্থিরভাবে আসীন এইরূপ অনুভূতি জাগাইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, এই পরিধির বিশালতা ও কল্পনা-প্রসারের উপযোগী উদাত্ত প্রকাশরীতির উপর সহজ ও অস্খলিত অধিকার থাকা চাই। এই মহিমান্বিত, ঊর্ধ্বচারী প্রকাশের জন্য যেমন চাই সুপ্রযুক্ত শিল্পকৌশল ও শব্দনির্বাচনের বিশিষ্ট আভিজাত্য প্রধান ভঙ্গী তেমনি চাই অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত সমুন্নতি। শুধু শিল্পকলা আনিবে নিষ্প্রাণ আলঙ্কারিক স্ফীতি; আর অলঙ্কারবর্জিত শুষ্ক অনুভূতি, যতই অকৃত্রিম হউক, আনিবে মহাকাব্যের মর্যাদাহীন সাধারণ কাব্যের ভাষা। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন কাব্যের তুলনায় মহাকাব্যে থাকিবে সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিবর্তে বড় তুলির টানে আঁকা একপ্রকার প্রকাণ্ড, সাধারণীকৃত রং

ও রেখার বিন্যাস, যাহার প্রধান লক্ষণ অন্তর্মুখী গভীরতা নহে, বহির্মুখী ব্যাপ্তি। মধুসূদনের কাব্যে এই সমস্ত গুণেরও আশ্চর্য সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। বীররস, করুণরসের সাধারণীকৃত রূপ, ঐশ্বর্য সমারোহ, বর্ণাঢ্য চিত্র-সৌন্দর্য, রণসজ্জা, যুদ্ধবিগ্রহের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও কোলাহলমুখরতা—এই সমস্ত কাব্য বর্ণনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ব্যক্তিত্বের নিগূঢ়তায় কোন মহাকাব্যকারই প্রবেশ করেন না, মধুসূদনও করেন নাই। তাঁহার নরনারী শ্রেণী-প্রতিনিধি। রাবণের রাজমহিমার অন্তরালে তাহার ব্যক্তি-হৃদয়ের স্পন্দন বিশেষ শোনা যায় না, ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার কণ্ঠে যে শৌর্য ও প্রণয়াবেশের মিশ্রিত স্বর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা রাজপরিবারের তরুণ-তরুণীর সাধারণ পরিচয়; চিত্রাঙ্গদা রাজমহিষীর সম্ভ্রম-সংযত শোকপ্রকাশে সন্তানহারা মাতৃহৃদয়ের হাহাকারকে সংবৃত করিয়াছে। চিতাশয্যায় শায়িত ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার ভস্মীভূত দেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাবণের যে শোকোচ্ছ্বাস তাহা রাজচরিত্রানুযায়ী, রাজ্যের কল্যাণচিন্তায় ব্যক্তিগত শোকের আতিশয্য নিয়ন্ত্রিত। মধুসূদনের মহাকাব্যের সর্বত্রই এই পরিমিতিবোধ ও কাব্যদর্শনের নিখুঁত অনুসরণ।”

মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব :

মধুসূদন যে যুগের মানুষ, সেই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালির ধ্যান-ধারণা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবেই মানবমুখী হইয়াছিল। এ কাব্যের প্রেরণা-মূল নিহিত আছে সেই আধুনিক মানবতাবাদে, ইহা একান্তভাবেই পাশ্চাত্ত্য হইতে আয়ত্ত জীবন-বোধ। সুতরাং সাধারণভাবে আধুনিক কালের কবি মধুসূদনের কাব্য ভাব এ রসের দিক হইতে যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবিত এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনার অবকাশ নাই। ইতিপূর্বে নানা প্রসঙ্গে ইহা আলোচিত হইয়াছে। এখানে মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনীবিন্যাসে, চরিত্রসৃষ্টিতে, উপমাচয়নে এবং ভাষাভঙ্গির দিক হইতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবেই বিশেষভাবে আলোচ্য।

ইতিপূর্বে মেঘনাদবধ কাব্যের গঠনশৈলী সম্পর্কিত আলোচনায় দেখানো হইয়াছে কাব্য-কায়ার অবয়ব সংস্থানে কবি যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্ত্য কাব্যচর্চার ফল। বাঙলা সাহিত্যে তো বটেই সংস্কৃত সাহিত্যেও কাব্যের নির্মাণকৌশল বিষয়ে কবিদের সচেতনতার দৃষ্টান্ত নিতান্তই দুর্লভ। রচনার আঙ্গিক বিষয়ে সচেতনতা উচ্চতর শিল্পচেতনারই ফল। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিস্তৃত চর্চায় এ বিষয়ে নিপুণতা অর্জন করিয়াছিলেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের ঘটনা-অংশ অতি সামান্য। রামায়ণের মূল কাহিনী হইতে কবি সামান্যই গ্রহণ করিয়াছেন, যেটুকু গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও অবিকৃত রাখেন নাই। ইচ্ছামত ইহার সহিত বিদেশী কাব্যনির্ভর কল্পনা যোজনা করিয়াছেন। মধুসূদন বহুবার মেঘনাদবধ কাব্যে গ্রীক আদর্শ অনুসরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বিঘোষিত নীতি, "I shall not borrow Greck stories, but write, rather try to write—as a Greek would have done." অর্থাৎ রচনাভঙ্গিতে গ্রীক আদর্শ অনুসরণ করিবেন। অন্যত্র আবার এই কাব্যকে 'three-fourths Greek' বলিয়াছেন। এই দাবি অবশ্যই স্বীকার করা যায় না। মেঘনাদ-বধ কাব্যে বিশেষভাবে গ্রীক অনুসরণ আছে দেবদেবী চরিত্র-কল্পনায় এবং মর্তব্যাপারের সহিত দেবদেবীর সংযোগ ঘটানোর পদ্ধতিতে।

মেঘনাদবধ কাব্যের দেবদেবী চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদন গ্রীক আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। দেববাদের মূলে ঐক্য থাকিলেও হিন্দু ও গ্রীক দেবদেবী চরিত্রের পরিকল্পনায় প্রভেদ আছে। গ্রীক কাব্যে দেবতাদের মূলধর্ম মানবিক, যদিও তাহারা মানবত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া মহত্তর শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে সক্ষম। গ্রীকরা দেবতাকে মানুষের অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া মনে করেন নাই। বিশেষতঃ দেবতারাও অদৃষ্টের কবলিত, ধর্মের বিচারে তাহাদের পক্ষে পরাস্ত হওয়াও অসম্ভব নয়। অন্যপক্ষে হিন্দুকাব্যে দেবদেবী চরিত্রের মূলধর্ম একান্তভাবে অলৌকিক দেবধর্ম। মেঘনাদবধ কাব্যে দেবতা-চরিত্রে মানবিক মহত্ত্ব ও নীচতা আরোপ করা হইয়াছে। কোনো দেবতাই এই অর্থে মানবিকতার ঊর্ধ্বে নহে। এই বৈশিষ্ট্য গ্রীক প্রভাবেরই ফল। দেবতারা সকলেই, এমনকি স্বয়ং মহাদেবও অদৃষ্টের বন্ধন অস্বীকার করিতে অক্ষম। এক সর্বায়ত নিয়তি-চেতনাও গ্রীক কাব্যেরই প্রভাবজাত।

"মেঘনাদবধের অধিকাংশ চরিত্র হোমারের সৃষ্ট চরিত্রের আদর্শ অনুযায়ী। শিব-উমা যেন জেউস-হেরা। মহামায়াকে স্বতন্ত্র দেবীকল্পনা মধুসূদনের নিজস্ব। ইনি হোমারের আথেনার অনুরূপ। ইলিয়দের আরেস মেঘনাদবধের স্কন্দ। মেঘনাদের পরিণাম হেক্তোরের পরিণামের মত। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের ব্যবহার কতকটা পাত্রোক্লোসের মৃত্যুতে আখিল্লেওসের এবং কতকটা হেক্তোরের মৃত্যুর পর প্রিয়ামোসের প্রচেষ্টার অনুরূপ। প্রমীলা কতকটা হেক্তোরের স্ত্রী আন্দ্রোমাখের এবং কতকটা তাস্সোর কাব্যের রণরঙ্গিনী

ক্লোরিন্দার মত। সর্বোপরি গ্রীক সাহিত্যের দৈবনির্বন্ধবাদ (নিমেসিস সমগ্র কাব্যটিকে ঘিরিয়া আছে।

"মেঘনাদবধের কোন কোন ঘটনাও গ্রীক ও লাটিন কাব্যের আদর্শে পরিকল্পিত। ইলিয়দে যেমন দেবদেবীরা ছদ্মবেশে আসিয়া গ্রীক অথবা ত্রোয়ানদিগকে পরামর্শ দিতেছে,মেঘনাদবধকেও তেমনি। মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গে উমার প্রসাধন এবং শিবকে ভুলাইয়া তাঁহাকে রাবণের বিরুদ্ধে লইবার চেষ্টা ইলিয়দের চতুর্দশ সর্গে বর্ণিত হেরার প্রচেষ্টা মনে করাইয়া দেয়। হোমারের মহাকাব্যে দেবী থেতিস্ দেবশিল্পী হেফাইসতোস্‌কে দিয়া দিব্য অস্ত্র গড়াইয়া পুত্র আখিল্লেওসকে দিলেন হেক্‌তোরকে বধ করিবার জন্য। মধুসূদনের কাব্যে ইন্দ্র মহামায়ার নিকট হইতে দিব্য অস্ত্র লইয়া দেবদূত গন্ধর্ব চিত্ররথকে দিয়া লক্ষ্মণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য। ইলিয়দে দেবতারা প্রথমে কেহ গ্রীক, কেহ বা ত্রোয়ানদের পক্ষাবলম্বন করিয়া অলক্ষ্যে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, পরে জেউস তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত করেন। মেঘনাদবধের দেবতারা পুত্রশোকাতুর দুর্জয় রাবণের আক্রমণ হইতে রামকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, শেষে বিষ্ণুর আদেশে গরুড় তাঁদের তেজ হরণ করায় তাঁহারা যুদ্ধে বিরত হন। মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গে বর্ণিত রামচন্দ্রের নরক ভ্রমণ ও পরলোকে পিতৃদর্শন ভার্জিলের এনেইদ হইতে গৃহীত। মেঘনাদ-বধের শেষ সর্গে ইন্দ্রজিতের সৎকার ইলিয়দের শেষ সর্গে বর্ণিত হেক্‌তোরের সৎকার-ব্যাপারের সম্পূর্ণ অনুরূপ" (সুকুমার সেন)।

অধ্যাপক সেন মেঘনাদবধের কিছু উৎপ্রেক্ষা যে ইলিয়দ হইতে গৃহীত তাহা দেখাইয়াছেন। কয়েকটি বিশেষণ শব্দ (শ্বেতভুজা, দেবাকৃতি, দেবকুল-প্রিয় ইত্যাদি) গ্রীক শব্দের অনুবাদ।

মেঘনাদবধ কাব্যের পদে পদে parenthesis-এর ব্যবহার দেখা যায়। কবি ইংরেজি বাক্যবিন্যাসরীতি অনুসারেই এইরূপ বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট কিন্তু ব্যাকরণগত সম্পর্কহীন শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন,

"বাহিরিল বেগে
বারি হতে (বারি স্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্বার) বারণযূথ ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্।"

বহুভাষাবিৎ, পাশ্চাত্তের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সুপরিচিত মধুসূদন কতো কাব্য হইতে কতো উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তুলনামূলক আলোচনায় সম্পূর্ণভাবে দেখাইবার মতো যোগ্য টীকাকার বাঙলা দেশে আজও জন্মে নাই; কিন্তু যেখান হইতে যে উপকরণই সংগ্রহ করিয়াছেন, সবই তাঁহার কাব্য পরিকল্পনার মধ্যে সুসঙ্গতরূপে, বাঙলার ভাষা প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উপকরণগুলি এ কাব্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হইয়া বাঙলা কবিতার ঐশ্বর্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কাব্যের সূচনায় কবি নিজেও তো বলিয়াছেন,

"কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

বিশ্বসাহিত্য হইতে এই মধুচক্র রচনার জন্য মধুসংগ্রহ করা হইয়াছিল, কিন্তু রচনার কৃতিত্ব কবির নিজের।

মেঘনাদবধ কাব্যে প্রাচ্য প্রভাব:

মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনায় এই কাব্যের উপরে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। কবি কাব্যটি পরিকল্পনার সময়ে বহুবার পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অনুসরণের অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়া সমালোচকদের মনে এ কাব্যের অভারতীয়-ত্ব বিষয়ে একটা সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন। চরিত্র পরিকল্পনায়, কাব্যের গঠনে, ভাববস্তুতে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সজ্ঞান অনুসরণ অবশ্যই আছে। মধুসূদন যে কালের কবি, সেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের ভাবসম্মিলনের যুগে বিশ্বসাহিত্যে দীক্ষিত এই কবির পক্ষে পাশ্চাত্ত্যের ভাব-প্রেরণা এবং কাব্যকলা আত্মসাৎ করার চেষ্টা আজ একান্তই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয়, মধুসূদন মানবিকভাবে স্বদেশের সহিত সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে যখন সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনায় যথার্থ আগ্রহ বোধ করিলেন, তখন ইংরেজি বা অন্য কোনো বিদেশী ভাষা নয়, মাতৃভাষাকেই তো একান্তভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুদ্ধ কবিত্বের প্রেরণায় মর্মের মধ্যে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন কাব্যে সিদ্ধির জন্য, যথার্থভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রয়োজন রক্তের চেনা ভাষা। জাতীয় ঐতিহ্যের পটভূমি ভিন্ন, দেশজ মৃত্তিকার আশ্রয় ভিন্ন কোনো শিল্পীই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না, এই

বোধই তাঁহাকে অনিবার্যভাবে মাতৃভাষা চর্চায় নিবিষ্ট করে। শুধু মাতৃভাষা নয়, স্বদেশের লোকমানস হইতে জাত পুরাণ হইয়া ওঠে তাঁহার বিশেষ চর্চার বিষয়। বাঙলা এবং সংস্কৃতের আধারে রক্ষিত জাতীয় পুরাণই হইয়া ওঠে তাঁহার কাব্য-বিষয়ের অফুরন্ত উৎস। ইহাই স্বাভাবিক ছিল। জাতীয় মানসই সেই মৃত্তিকা, যাহাতে দৃঢ়সংলগ্ন হইয়া প্রতিভা ডালপালা মেলিবার শক্তি অর্জন করে। তাই যতোই তিনি সরবে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের জয়গান করুন, সেই আদর্শ যে দেশের মাটির রসেই জারিত করিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন —একথা কখনো বিস্মৃত হন নাই। এবং এই আত্মীয়করণে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার রচনাবলী একটা কিম্ভূত অনাসৃষ্টি না হইয়া যথার্থ আধুনিক জাতীয় সাহিত্যের সূচনা করিয়াছিল।

অতএব, মেঘনাদবধ কাব্য আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য হইতে বিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টি নয়। এ কাব্যকে জাতীয় ঐতিহ্যের বিকাশধারার একটা স্তরের প্রতিনিধিস্থানীয় কাব্যরূপে দেখা এবং জাতীয় জীবন চেতনার ধারায় একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁক ফেরার সমকালীন মানসিকতার দ্যোতকরূপে বিচার করাই যথার্থ বিচার। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধে রামায়ণ কাহিনীর বিবর্তন ধারার মধ্যে জাতীয় মানসের বিবর্তনের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "রামায়ণ কথার যে ধারা আমরা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহারই একটা অত্যন্ত আধুনিক শাখা মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। এই কাব্য সেই পুরাতন কথা অবলম্বন করিয়াও বাল্মীকিও কৃত্তিবাস হইতে একটি বিপরীত প্রকৃতি ধরিয়াছে।

"আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, ইংরেজি শিখিয়া যে সাহিত্য আমরা রচনা করিতেছি তাহা খাঁটি জিনিস নহে। অতএব এ সাহিত্য যেন দেশের সাহিত্য বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য নয়।

"যে জিনিসটা একটা কোনো স্থায়ী বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার আর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটি জিনিস বলা হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধ্যে যে জিনিসটা কোথাও নাই।

"মানুষের সমাজে ভাবের সঙ্গে ভাবের মিলন হয় এবং সে মিলনে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতে থাকে।......যদি এমন হয় যে কেবল আমাদেরই মধ্যে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে, তবে সে আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা।...

"য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিতেছে

একথা যখন সত্য তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনোমতেই হইতে পারে না; যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।"

একই উপাদান বিশেষ কালের বিশেষ মানসিকতার ছাঁচে নূতন আকৃতি লইয়া দেখা দেয়, রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অনুসারে, মেঘনাদবধ কাব্যের ভাব ও রূপের পরিবর্তনও এইরূপ। সুতরাং মেঘনাদবধ কাব্য পুরাতন রামায়ণ কথার এবং অন্যান্য পুরাণের উপাদানকেই য়ুরোপীয় সংঘাত জাত এক নবজীবন চেতনার ধারক পুনর্বিন্যস্ত করিয়াছে বলা যায়। কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া এই আধুনিক যুগের পাশ্চাত্ত্য আদর্শসম্মত কাব্যেও কী ভাবে ভারতীয়ত্ব রক্ষিত হইয়াছে দেখানো যাইতে পারে।

মেঘনাদবধ কাব্যে কোথাও কোনো পাশ্চাত্ত্য কবির নাম নাই, কিন্তু চতুর্থ সর্গের সূচনায় কবি স্পষ্টতঃ বাল্মীকি, ভর্তৃহরি, ভবভূতি, ভট্টি এবং কালিদাসের নাম স্মরণ করিয়া আপন জাতীয় কাব্যঐতিহ্যের সহিত সহমর্মিতার প্রকাশ্য প্রমাণ দিয়াছেন। ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্য সতর্কভাবে পাঠ করিলে ইহার ভাষা-শৈলী, ছন্দ-সংগীত এবং বর্ণনাভঙ্গির গঠনে সংস্কৃত ও বাঙলা কাব্যের উপকরণ ব্যবহার নৈপুণ্য আমাদের বিস্মিত করে। মেঘনাদবধ কাব্যকে অবশ্যই কাব্যশৈলীর দিক হইতে পরীক্ষামূলক রচনা হিসাবেই দেখা উচিত। চরণান্তিক মিলবর্জিত এবং প্রবহমানতা সমন্বিত নূতন ছন্দের আদর্শ বিদেশের কাব্যেই পাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই আদর্শকে মাতৃভাষার প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত করিয়া তুলিবার সচেতন প্রয়াসেই তাঁহাকে বিচিত্র পরীক্ষামূলক প্রয়োগের পথে সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে হয়। চরণান্তিক মিলের অবলম্বন বর্জিত হওয়ায় কবিকে চরণে চরণে প্রবাহিত ধ্বনির তরঙ্গায়িত ধ্বনির সংগীত সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ভাবের এবং ছন্দধ্বনির ঘনত্বের প্রয়োজনে তিনি এমনকি অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। কোথাও কোথাও শব্দ ব্যবহারের এই ঝোঁক কৃত্রিম মনে হইলেও মূলত মেঘনাদবধের ভাষাভঙ্গি বাঙলা ভাষার নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গি ভিত্তিতেই গঠিত। চতুর্থ সর্গে, যেখানে সীতা ও সরমার কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে, সেই বর্ণনায় কবি যেন বাহিরের সমস্ত প্রভাব অতিক্রম করিয়া

অনায়াসে বাঙলা ভাষার অকৃত্রিম প্রাণময়তাকেই নূতন ছন্দে বাজাইয়া তুলিয়াছেন। চতুর্থ সর্গটি বিশেষভাবে প্রমাণ করে কবির মানস প্রকৃতির অন্তর্গত উপাদান দেশজ, বাহির হইতে আহরিত নয়। তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, আমাদের মাতৃভাষা যে এমন অফুরন্ত উপকরণ হাতে আনিয়া দিবে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। ভাব এবং চিত্রকল্পগুলি শব্দ শরীর লইয়া বাহির হইয়া আসে, যে সব শব্দ নিজে আগে জানিতেন বলিয়াও মনে হয় না। কবির এই উক্তি এবং কাব্যের অন্তর্গত সাক্ষ্যসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় তাঁহার কবিপ্রাণ দেশজ ভাষার মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ সংযোগ ভিন্ন কবিত্বে সিদ্ধি সম্ভব নয়। এই গভীর যোগটাই মেঘনাদবধ কাব্যের প্রাচ্যত্ব বা জাতীয়-স্বরূপের প্রধান কথা।

বাহিরের দিক হইতেও অবশ্য পূর্বতন কাব্য ঐতিহ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহের দৃষ্টান্ত কিছু কিছু বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। রাজসভার বর্ণনা, যুদ্ধের পরিবেশ এবং অস্ত্রচালনা বিবরণ রামায়ণ মহাভারতের অনুরূপ বর্ণনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মধুসূদন যে ভাবে বীরবাহুর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের বিবরণ দিয়াছেন তাহার পূর্বরূপ আছে কৃত্তিবাসের রামায়ণে। গোটা দ্বিতীয় সর্গের দেবলোকের ষড়যন্ত্রমূলক গতিবিধি অবশ্যই হোমারের ইলিয়াড-এর আদর্শে রচিত। কিন্তু কুমারসম্ভব কাব্যের প্রভাবে গঠিত মানসিকতার ভিত্তি ভিন্ন এ বর্ণনা প্রত্যয় সিদ্ধ করা সম্ভবপর হইত না। কাশীরাম দাসের মহাভারতে অশ্বমেধ পর্বে প্রমীলা চরিত্রের যে শৌর্য বর্ণিত আছে, সেই উপকরণকেই মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য আদর্শের নায়িকা চরিত্র পরিকল্পনায় ব্যবহার করিয়াছেন। বিশেষত চতুর্থ সর্গের সীতা-সরমা সংবাদ রচনায় কবি নিজেকে রামায়ণ কাহিনীর ঐতিহ্যের মধ্যেই সংবৃত রাখিয়াছেন, বাহিরের কোনো উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কাব্যের অন্তিমে শ্মশান দৃশ্যে শোকাহত রাবণও লঙ্কাবাসীদের মানসিকতা প্রকাশে কবি লেখেন,

> "করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
> ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
> বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!"

এই উপমা বাঙালির আবহমান এক শুদ্ধ অনুভূতির সহিত এ কাব্যের রস-পরিণামকে একাকার করিয়া দেয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের রসবিচার :

মহাকাব্য হইবে বীররসপ্রধান, কবি এই নীতি সম্ভবত স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই কাব্যের সূচনায় বেশ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, "গাইব, মা, বীররসে ভাসি মহাগীত।" আবার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন, "In the meantime I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with Viraras (বীররস)।" কাব্যসূচনার উক্তি এবং এই পত্রের উক্তির মধ্যে বৈপরীত্য আছে। এই বৈপরীত্য হইতে কবির সংশয়িত মনোভাব অনুমান করা যায়। কেন এই সংশয়? কবি যে কাহিনী নির্বাচন করিয়াছিলেন সেই কাহিনীর ছকের মধ্যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধজয়ে নায়কপক্ষের বীর্যবত্তা প্রতিষ্ঠার সুযোগ কম—ইহা নিশ্চয়ই রচনায় অগ্রসর হইয়াই অনুভব করিয়াছিলেন। মেঘনাদকে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে, রাবণকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে—ইহা তো পূর্বনির্ধারিত। আর এই কাব্যকে যদি কবির অন্তর্জীবনের আলেখ্য-রূপে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে প্রবল উৎসাহ, বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও জীবনে আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য অনায়ত্ত রহিয়া যাইবে—মধুসূদন মর্মের মধ্যে এই যে ব্যর্থতা অনুভব করিতেন, ইহারই প্রতিফলন ঘটিয়াছে মেঘনাদের শোচনীয় দুর্দশায়। সুতরাং বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধায়োজন যতোই হোক এ কাব্যে পূর্বাপর কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্টভাবে বিষাদ হতাশা এবং করুণ রসের ধারা বহিয়া গিয়াছে।

কাব্যের সূচনা হইয়াছে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে শোকাভিভূত রাবণ ও সভাসদ্‌দের বর্ণনায়। সেই স্তম্ভিত শোক দিক্‌দেশ প্লাবিত করিয়াছে বীরবাহুজননী চিত্রাঙ্গদার আবির্ভাবে। আর নবম সর্গে কাব্য সমাপ্ত হইয়াছে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টির দুঃসহ শোকাবহ দৃশ্যে। সূচনা এবং সমাপ্তি, কাব্যের এই দুই মুখে সংঘটিত ঘটনাই পাঠকের চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়। নীতিধর্ম প্রতিপাদন কাব্যের উদ্দেশ্য নয় তাই পাপপুণ্যের নিরিখে চরিত্রগুলির জীবনের পরিণাম বিচার করিবার মনোবৃত্তি পাঠকের কখনো হয় না। কবি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন রাবণ ও মেঘনাদের প্রতি। এই দুটি চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ, উদ্যোগ আয়োজন এবং পরিণাম পাঠকের অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইহাদের সাফল্য বা ব্যর্থতাই পাঠকের চিত্তে রসানুভূতির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। সূচনা এবং সমাপ্তির দুই শোকাবহ ঘটনা ভিন্ন মধ্যবর্তী

স্তরে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ আছে তাহার মধ্যে বীরত্বের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তৃতীয় সর্গে প্রমিলার যুদ্ধায়োজনে এবং সপ্তম সর্গে রাবণের যুদ্ধ-যাত্রায়। বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে তৃতীয় সর্গে প্রমীলার অভিযানে বীররস স্ফূরিত হইয়াছে মানা যায়। কিন্তু রাবণের পরাক্রমে যে বীরত্ব প্রকাশ পায় তাহা প্রকারান্তরে তাহার দুঃসহ শোকেরই প্রকাশ। ওই বর্ণনায় পদে পদে আমাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে রাবণের এই দুর্বার শক্তি শোকাবেগেই উদ্বোধিত সুতরাং তাহাকে অবিমিশ্র বীররস বলা যায় না। শেষ বিচারে তাই মানিতে হয় মধুসূদন বীররস নহে, এ কাব্যে করুণরসকেই আশ্রয় করিয়াছেন। সমালোচক মোহিতলাল এই সর্বব্যাপী করুণরসের তাৎপর্য সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন: "হোমার, ভার্জিল, ট্যাসোর কাব্যগৌরব বিফল হইল—বীর-বিক্রমের গাথা অশ্রুধারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; মাতা ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাস ডুবিয়া গেল—বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা বাঙালীর সহ-মরণ-যাত্রার করুণ দৃশ্যে, অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মত নিদারুণ হইয়া উঠিল। স্বর্গ, নরক, পৃথিবী ও সমুদ্রতলব্যাপী এই আয়োজন, রাজসভার ঐশ্বর্য, রণসজ্জার আড়ম্বর, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এবং অযুত যোধের সিংহনাদ সত্ত্বেও, অশোক-কাননে বন্দিনী নারী লক্ষ্মীর মূক শোক-ঝঙ্কারে সমস্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে; এবং শক্তিশেলে মূর্ছিত ভ্রাতার শ্মশান-শিয়রে রামের শোকোচ্ছ্বাস, অথবা সিন্ধুতীরে পুত্র ও পুত্রবধূর চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান রাবণের সেই মর্মান্তিক উক্তিকেও প্রতিহত করিয়া যে একটি অতি কোমল ক্ষীণ কণ্ঠের বাণী, লবণাম্বুগর্ভে নির্মল উৎস-বারির মত উৎসারিত হইয়াছে—

> সুখের প্রদীপ, সখি! নিবাইলো সদা
> প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমঙ্গলারূপী
> আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!

—কবির কাব্যলক্ষ্মীও সেই বাণী-মন্ত্রে কবির কণ্ঠে স্বয়ম্বর-মালা অর্পণ করিয়াছেন। ইহাই হইল বাঙালীর মহাকাব্য। আয়োজনের ত্রুটি ছিল না,—ছন্দ, ভাষা, ঘটনা-কাহিনী, হোমার-মিল্‌টনের ভঙ্গি, দান্তে-ভার্জিলের কল্পনা এবং সর্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবস্তু—এমন কি বাক্য-ঝঙ্কার পর্যন্ত আত্মসাৎ করিবার প্রতিভা—সবই ছিল; কিন্তু কবি সত্যকার কবি বলিয়া সৃষ্টিরহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন—তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙালী জীবনের গীতিকাব্য।" এবং এ কাব্যের মূল রস করুণ।

মেঘনাদবধ কাব্য করুণ রসের কাব্য। কিন্তু আমাদের অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত করুণ রসের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। এ কাব্যের সুগম্ভীর বিষাদ এবং জীবন সম্পর্কে একই সঙ্গে গৌরব ও ব্যর্থতার বোধ—ঠিক ভারতীয় করুণ রস নয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ট্র্যাজিডিগুলিতে করুণ রসের যে বিশেষ রসমূর্তি প্রসিদ্ধ, এ কাব্যে মধুসূদন তাহাই পরিবেষণ করিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে ভাবাবেগের তরল উচ্ছ্বাস নাই। মহাসর্বনাশের মধ্যেও যে শক্তি আত্মগরিমা ভুলিতে পারে না, কবি মৃত্যুর বেদীতে মানুষের সেই গৌরবোজ্জ্বল মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মোহিতলাল এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা চরিত্র আশ্রিত বিলাপাকুল করুণ রসের উচ্ছ্বাসকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু নবম সর্গের উপান্তে পৌছিয়া পাঠকের মন যে রসাস্বাদ লাভ করে তাহা গীতি-মূর্ছনাময় কারুণ্য নয়, সংহত ট্র্যাজিক রস।

মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ ঃ

বাঙলা কবিতার ছন্দের রীতি তিনটি, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত। প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত যতো কবিতা রচিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ অক্ষরবৃত্ত রীতির ছন্দে। সাধুভাষার ছন্দ, তানপ্রধান, পয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এই ছন্দকে অভিহিত করা হয়। সুপ্রাচীন এই পয়ার ছন্দই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিত্তি। সুতরাং পয়ারের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য এবং এই ছন্দোপ্রকৃতিতে কোথায় কোন্ পরিবর্তন সাধন করিয়া মধুসূদন তাঁহার নতুন ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাই আমাদের আলোচ্য।

> "আষাঢ়ে পুরিল মহী / নব মেঘে জল।
> বড় বড় গৃহস্থের / টুটিল সম্বল ॥"

উদ্ধৃত এই দুই চরণের ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে চরণ দুটির মধ্যে রহিয়াছে অন্ত্যমিল। প্রত্যেক চরণ মাত্রাসংখ্যা ১৪। ১৪ মাত্রা আবার দুটি পর্বে বিভক্ত। একটি ৮ মাত্রা এবং একটি ৬ মাত্রার পর্ব লইয়া সম্পূর্ণ ১৪ মাত্রার চরণ গঠিত হইয়াছে। কবিতা পাঠের সময়ে দুটি কারণে থামিতে হয়। প্রথমত স্পষ্টভাবে অর্থজ্ঞাপনের জন্য সাময়িক বিরতি প্রয়োজন, দ্বিতীয়ত সাময়িক বিরতি প্রয়োজন শ্বাসগ্রহণের জন্য। এই বিরতি বা যতি অনুসারে চরণগুলি বিভিন্ন অংশে বা পর্বে বিভক্ত হইয়া যায়। এখানে প্রচলিত পয়ারের দৃষ্টান্ত লওয়া হইয়াছে তাহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থ-

যতি এবং শ্বাসযতির সহাবস্থান। অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণের জন্য যেখানে থামিতে হইতেছে সেখানে অর্থের দিক হইতেও যতি পড়িতেছে। পয়ার ছন্দের ইহাই প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এই জাতীয় ছন্দে পাঠের সময়ে অক্ষরধ্বনির অতিরিক্ত একটা সুর জাগিয়া ওঠে। এই সুরের টান থাকে বলিয়াই নিতান্ত গুরু অক্ষর সমন্বিত শব্দও ইহার মধ্যে অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত-যোগে দেখাইয়াছিলেন 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে' আর 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' এই দুইটি ১৪ মাত্রার পয়ারের চরণ। তাঁহার মতে, এই ছন্দের অপরিসীম শোষণশক্তির জন্য যুক্তাক্ষর সমন্বিত গুরু শব্দ যোজনার সুযোগ ইহাতে সবচেয়ে বেশি।

মধুসূদন কৃত্তিবাস, কাশীরাম প্রভৃতির রচনার এই ১৪ মাত্রার পয়ার ছন্দকেই তাঁহার নতুন ছন্দের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে মধুসূদনের ছন্দের বৈশিষ্ট্য ইহার চরণান্তিক মিলের অভাব। চরণগুলির শেষে সাধারণ পয়ারের ন্যায় অন্ত্যমিল নাই বলিয়াই মিত্রতার অভাবসূচক 'অমিত্রাক্ষর' নামে এই ছন্দের নামকরণ করা হইয়াছে। কবি নিজেও তাঁহার 'মিত্রাক্ষর' নামক সনেট এই মিলহীনতার কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন :

> "বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
> লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
> মিত্রাক্ষররূপে বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
> পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
> স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!"

তবুও মিলনহীনতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য নয়। এ ছন্দের মূল প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য শ্বাসযতি এবং অর্থযতির মধ্যে সহাবস্থান নীতি অস্বীকার। অর্থাৎ পয়ারের মতো চরণগুলি ৮+৬ মাত্রার দুটি শ্বাসপর্বে বিভক্ত করা সম্ভব হইলেও মাত্রার দুই পর্বে বিভক্ত হইলেও অর্থযতির নতুন নিয়ম অনুসারে যতি পড়ে ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ১০, ১১, এমন কি ১২ মাত্রার পরে। পয়ারের সহিত তুলনা করিলে এ ছন্দের তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর হয়। (১) অমিত্রাক্ষরের চরণ পয়ারের মতোই ১৪ মাত্রায় গঠিত, (২) মিলহীনতা, (৩) ৮+৬ এর যতি ছাড়াও অর্থের দিক হইতে যতিবিন্যাসের নূতন পদ্ধতি। এই অর্থযতি স্পষ্টভাবে নির্দেশের জন্যই কবি প্রচুর পরিমাণে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন

ব্যবহার করিয়াছেন। মেঘনদবধ কাব্যে অবতারণা অংশটিই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়:

সম্মুখ সমরে পড়ি,/বীর চূড়ামণি
বীরবাহু,* চলি যবে/গেলা যমপুরে
অকালে, * কহ, * হে দেবি/অমৃতভাষিণি, *
কোন্ বীরবরে বরি/সেনাপতি-পদে*,
পাঠাইলা রণে পুনঃ/রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? * *

পুরাতন পয়ারের নিয়মে ইহার প্রত্যেক চরণকেই ৮+৬ মাত্রার হিসাবে ভাগ করা যায়। কিন্তু পয়ারে যেমন দুটি চরণে অর্থের পরিপূর্ণতা থাকে এখানে তাহা নাই। পঞ্চম চরণ পার হইয়া ষষ্ঠ চরণের চারটি মাত্রার পরে পূর্ণ অর্থযতি এখানে। পুরাতন পয়ার পড়িবার রীতিতে পড়িলে ইহার অর্থবোধ হইবে না। এই অংশটি **রবীন্দ্রনাথ** অনবদ্যভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। "এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটো বড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোন জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেননি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্যদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল, 'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি বীরবাহু'। তারপরে তার অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণ-পতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল—'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে'। তারপর ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে—'কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি'। তারপরে আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হল—'কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে, পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি'।"

যতিবিন্যাসের এই নতুন নিয়মের ফলে মধুসূদনের ছন্দে অসীম গতি-স্বাচ্ছন্দ্য আসিয়াছে। আবেগের বিস্তার ও সংকোচন অনুসারে ছন্দকে ইচ্ছামত মাপে চালাইতে কোথাও বাধা পান নাই। পয়ার ছন্দে চরণান্তিক মিলগুলি কবিতায় একটা মাধুর্য সঞ্চার করে, পড়িবার সময়ে কণ্ঠের বিরামের সহিত মিলজনিত মাধুর্যটুকু রমণীয় মনে হয়। মধুসূদন মিল বর্জন করায় পয়ার ছন্দের স্বাভাবিক মাধুর্য ব্যবহারের সুযোগ হারাইয়াছেন। এই অভাব পূরণের জন্য সতর্কভাবে শব্দ ব্যবহারে ধ্বনিস্রোতের গাম্ভীর্য সঞ্চার করিয়াছেন।

ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহকে উত্তাল করিবার জন্য প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

মধুসূদনের এই অমিত্রাক্ষর ছন্দবিন্যাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ইহার verse paragraph। এ বিষয়ে **মোহিতলাল** লিখিয়াছেন, "মধুসূদনের এই মিল্‌টন-অনুগামী অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহার verse paragraph বা পদ্যপঙ্‌ক্তি-ব্যূহ। বাঙলা নামটা একটু শ্রুতিকটু হইল, কিন্তু ঠিক অর্থটি বজায় রাখিতে হইলে নামটিকে আরও ছোট করা দুরূহ। আমি সংক্ষেপে পঙ্‌ক্তিব্যূহ বলিব। এই পঙ্‌ক্তিব্যূহ রচনাতেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর প্রকৃত ছন্দ-গৌরব লাভ করিয়াছে। ....এই verse paragraph-এর জন্য মধুসূনের ছন্দ মিল্‌টনের ছন্দের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে—এবং ইহারই গুণে, ওই এক ছন্দে একখানি বৃহৎ কাব্যে বিচিত্র সঙ্গীত স্রোতে প্রবাহিত হইয়া ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরের আবর্তন রক্ষা করিতে পারিয়াছে ; নতুবা, কেবল চরণ-মধ্যে যতি স্বাচ্ছন্দ্যের গুণেই ওই এক ছন্দে মহাকাব্য রচনা করা যাইত না। এই verse paragraph-এর আয়তন ছোট বা বড় হইতে পারে ; কিন্তু ইহা তিনটি বা চারটি পঙ্‌ক্তির ব্যাপার নয়। স্বল্প ও দীর্ঘ বিরামযুক্ত বহু বাক্য ও বাক্যাংশের সমাহার—বা, সঙ্গীত-সঙ্গতির সহায়ে, একটি ভাব, একটি চিত্র, বা একটি ব্যাখ্যান যে পূর্ণ ছন্দ-রূপ লাভ করে—তাহাই অমিত্রাক্ষরের পঙ্‌ক্তিব্যূহ। এ যেন ছন্দের এক একটি সৌরমণ্ডল—প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব গতি যেমন আছে, তেমনই, সকলে একটি এক-কেন্দ্রিক বৃহত্তর গতিচক্রের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া থাকে।" দৃষ্টান্ত :

"হাসি দেখা দিল উষা উদয়-অচলে
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে
দুঃখতমোবিনাশিনী ! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি ধাইল চৌদিকে
মধুজীবি ; মৃদুগতি চলিলা শর্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে ; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা শততারা তেজে !
ফুটিল কুণ্ডলে ফুল নব-তারাবলী।"

মেঘনাদবধকাব্যে নিয়তিবাদ ঃ

মেঘনাদের অসহায় মৃত্যু এবং রাবণের আসন্ন সর্বনাশ বর্ণনায় মেঘনাদবধ কাব্যের কবি তাঁহার সমগ্র মনোযোগ নিবিষ্ট করিয়াছেন। ট্র্যাজিডি রচনাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার উপযোগী আয়োজনে কবি কোনো ত্রুটি করেন নাই। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় বিয়োগান্ত আখ্যান-রচনায় কবির কল্পনা উদ্দীপিত হইয়াছে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অভিজ্ঞতার ফলে। উপযুক্ত ঘটনা এবং চরিত্রের সমাবেশে একটি সুবলয়িত বিয়োগান্ত আখ্যান রচনার জন্য যে সকল কলাকৌশল পাশ্চাত্ত্য কাব্য ও নাটকে প্রযুক্ত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে নিয়তির সর্বায়ত বন্ধনে চরিত্র ও ঘটনাগতি সংবদ্ধ করিয়া তোলার কৌশল সুপ্রসিদ্ধ। গ্রীক কাব্য ও নাটকে এই নিয়তি-ধারণার সুপ্রয়োগ কাব্য কৌশলের দিক হইতে ট্র্যাজিডি রচনায় বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। গ্রীক জীবন-বিশ্বাস হইতেই নিয়তিবাদের উদ্ভব, কিন্তু কবিবৃন্দ ইহাকে একটি উৎকৃষ্ট কাব্য-কৌশলে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। য়ুরোপীয় সাহিত্যের ধারায় নানাভাবে এই নিয়তিচেতনা প্রযুক্ত হইয়াছে। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে যে ভাবে নিয়তিবোধের ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট। মধুসূদনের কাব্যে যে নিয়তির কথা পাই তাহা ঠিক সহজ পাপ-পুণ্য বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। সীতা অপহরণ রাবণের পক্ষে পাপানুষ্ঠান সন্দেহ নাই, কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ বা দেবতাদের আচরণে এমন কিছুই নাই যাহা সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে পাপাত্মক। তবুও রাম-লক্ষ্মণ এবং দেবতারা সকলেই নিয়তি বা বিধি নামক এক দুর্জ্ঞেয় শক্তির পারবশ্য স্বীকার করিয়াছে। রাবণের মন্ত্রী সারণ বলে,

> "কুক্ষণে ভেটিল দোঁহে রিপুভাবে!
> বিধির নির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?"

যে বিধি পবনকে সমুদ্রের অরি করিয়াছেন, মৃগেন্দ্রকে গজরিপু করিয়াছেন—তাহারই মায়ায় রাবণ ও রামচন্দ্র পরস্পরের বৈরী। এ বৈরিতাও যেন বিধি-নির্দিষ্ট, রাম বা রাবণের ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা বড়ো নয়। সারণের এই উক্তিটি মেঘনাদবধ কাব্যের নিয়তি ধারণা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। রামচন্দ্রও নিজের দুর্ভাগ্যজনিত মর্মপীড়ায় বারংবার বিধির বিধানের কথা বলিয়াছেন :

> "কেবল আছিল
> অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে

(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট !'

লক্ষ্মণও সমান নিয়তিসচেতন। মেঘনাদের উদ্দেশে সে তাই বলিয়াছে 'মাটি কাটি কাটে সর্প আয়ুহীন জনে।' সাধারণভাবে যে পাপপুণ্যের বিচার করা হয়—সেই বিচারে রাম বা লক্ষ্মণের কোনো পাপ নাই। তবুও এক বিরুদ্ধ পরিবেশে নিয়ত অনিশ্চিতির মধ্যে তাহাদের কাল যাপন করিতে হইতেছে। স্বকৃত কর্মের ফল ছাড়াও মানুষের জীবনে তাহার আয়ত্তের অতীত কোনো শক্তির প্রভাব যে কাজ করে—এই বিশ্বাসই এখানে প্রকাশিত।

নিয়তিশক্তির শাসন হইতে দেবতাদেরও অব্যাহতি নাই। রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়াছে—সেও বিধির ইচ্ছায়। বসুন্ধরা বলেন, 'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে রক্ষোরাজ—'। মায়াদেবীকে বলিতে শোনা যায়—'বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?' রাক্ষসকুলের রাজলক্ষ্মীও বলেন—'প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?' সাধারণ দেবদেবীরা তো বটেই——এমনকি দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব পর্যন্ত নিয়তি পরবশ। দ্বিতীয় সর্গে তিনি পার্বতীকে শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন,

"হায় দেবি, দেবে কি মানবে
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?"

দেবতারা এখানে পাপপুণ্যের বিচারক নহে। যাহা বিধিনির্দিষ্ট—সেই পরিণামের দিকে সকল ঘটনা অগ্রসর করিয়া লইবার জন্যই তাঁহারা যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। মধুসূদন দেবতাদের মানবচরিত্র হইতে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেন নাই।

মেঘনাদবধ কাব্যকাহিনীর অন্তরে অন্তরে অনুস্যূত এই নিয়তিবোধ দেবলোক মানবলোকের সকল ঘটনাকে গ্রথিত করিয়া সুবলয়িত আকার দান করিয়াছে। আখ্যান রচনার কৌশলের দিক হইতে নিয়তির এই সর্বায়ত বন্ধন বিশেষ উপযোগী হইয়াছে মানিতে হয়। ঘটনাক্রম এবং চরিত্রগুলির পরিণতি-ধারা এইভাবে একই সূত্রে গ্রথিত হওয়ায় পরিণাম পরম্পরায় কোথাও যুক্তির ক্রমভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দেয় নাই। আদ্যন্তযুক্ত অখণ্ড প্লট রচনায় কবি অনায়াস সাফল্য অর্জন করিয়াছেন নিয়তি-সূত্রের ব্যবহারের ফলে। মধুসূদন কাব্যকৌশল হিসাবে নিয়তিবাদের এইরূপ ব্যবহারে গ্রীক কাব্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন। বিশেষভাবে গ্রীক নাটকে এইরূপ দুর্জ্ঞেয় নিয়তির আধিপত্য

সমগ্র নাট্যকাহিনীকে দৃঢ়সংবদ্ধ রূপ দেয়। সোফোক্লিস-এর 'রাজা ঈডিপাস' নাটকে দেশের দুর্গতিমোচনের শুভেচ্ছায় রাজা ক্রমে এক জটিল অবস্থাসংকটে পড়েন এবং উপলব্ধি করেন—বারবার নিয়তিকে প্রতিরোধ করিতে গিয়া তাহারই জালে বিজড়িত হইয়াছেন। জন্মাবধি রাজা যে নিয়তির দ্বারা তাড়িত—ওই নাটকের অন্তিমে তাহাকে সেই নিয়তির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া ভয়ঙ্কর পরিণাম স্বীকার করিতে হয়। সকল প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়, জীবনের উপরে নিয়তির প্রভাবের অনতিক্রম্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্নতর কাহিনীর ছকে রাবণকেও অনুরূপ উপলব্ধিতে উপনীত হইতে হইয়াছে। একদিকে বিধি নির্দিষ্ট পূর্বনির্ধারিত ছক, অন্যদিকে তাহারই বিরুদ্ধে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পুরুষকারের মহিমা প্রকাশিত। শেষ পর্যন্ত বিধিনির্দিষ্ট পরিণাম স্বীকার করিতেই হয়, তবুও ওই সংগ্রামের ঐকান্তিকতায় প্রকাশ পায় মানব-মহিমা। গ্রীক কাব্যে বা নাটকেও যেমন মেঘনাদবধেও সেইরূপ এক দুর্জ্জেয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানবিক শৌর্য ও মহিমা বেদনায় ও গৌরবে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

অবশ্য রাবণ-চরিত্রের দিক হইতে অদৃষ্টবাদের এ ব্যাখ্যা সত্য হইলেও সমগ্র কাব্যের পক্ষে সত্য কিনা সে বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ আছে। গ্রীক পুরাণের নিয়তি বা Nemesis ছিল "personification of a law and order as avenging itself on the violator." এই প্রতিহিংসাপরায়ণ নিয়তি শক্তি আর মেঘনাদবধ কাব্যের বিধি বা প্রাক্তন এক নয়। মেঘনাদবধ কাব্যে যে বিধির কথা বলা হইতেছে তাহার দুর্জ্জেয় বিধান দেবতারাও লঙ্ঘন করিতে পারে না। দেবলোক নরলোক সর্বত্র তাহার সমান প্রভাব। রাবণ চরিত্রের দিক হইতে এই বিধির ব্যাখ্যা যেমনই হোক, সমগ্র কাব্যে বিধির বিধান যেভাবে সর্বস্তরে অনুস্যূত হইয়া আছে তাহাতে ইহাকে শেষ পর্যন্ত হিন্দুর কর্মবাদ বলিয়াই মানিতে হয়। ইহা যেমন খৃষ্টান পাপতত্ত্ব নয়, তেমনি গ্রীক চিন্তার অহেতুক দৈব-স্বেচ্ছাচারও নয়। হিন্দু কর্মবাদের সহিত মেঘনাদবধের অদৃষ্টবাদের সঙ্গতি আছে। নিজ নিজ কর্মের গুণ বা দোষ অনুসারে জীবগণ সুফল বা কুফল, সুখ বা দুঃখ ভোগ করে—ইহাই কর্মবাদের মূল কথা। পূর্বসঞ্চিত কর্মের নাম দৈব বা অদৃষ্ট। এ কাব্যে রাবণ ভিন্ন আর সকলেই হিন্দু চিন্তার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ অদৃষ্ট বা দৈবের কথা বলিয়াছে। এ দৈব অখণ্ডনীয়! বিশেষত যে কর্মটির ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই প্রারব্ধ

কর্মের ফল হইতে তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষদেরও অব্যাহতি নাই। "হায়, দেবি, দেবে কি মানবে কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি" ইত্যাদি উক্তিতে এই কর্মবাদের ধারণাই অভিব্যক্ত হইয়াছে মন হয়।

মানবজীবনের অপরিহার্য এই অদৃষ্ট বা নিয়তিকল্পনায় হিন্দু ধারণাই ভিত্তি, তবুও কাব্যে ইহার প্রয়োগকৌশলে গ্রীক প্রভাব আছে। এই অদৃষ্ট বা নিয়তির চক্রে সমস্ত ঘটনা এবং চরিত্র আবর্তিত হইয়াছে। রাবণ ইহার বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে নাই, ইহার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু নিয়তিচক্রের আবর্তন রোধ করিতে পারে নাই। রাবণ বিনষ্ট হইবে তাহার সর্বনাশের ভূমিকা রচিত হইয়াছে এ কাব্যের সকল ঘটনায়। তবুও অনিবার্য ধ্বংসের মুখে দাঁড়াইয়া তাহার অমিত সাহস এবং বীর্যে মানুষের চারিত্রিক শক্তির প্রবলতা ও সেই শক্তির এমন করুণ বিনাশে যে মহা দুঃখের সঞ্চার হয় তাহাই এ কাব্যের ফলশ্রুতি। এ কাব্যের সকল চরিত্র, উপকাহিনীর সকল ধারা এই করুণ রসকেই গভীর ও ব্যাপক করিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্য-পাঠ

প্রথম সর্গের বিষয়-সংক্ষেপ :

সরস্বতী-বন্দনায় কাব্যের সূচনা করিয়াছেন কবি। এই বন্দনাসূত্রেই কাব্যে বর্ণনীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। মূল কাহিনী শুরু হইয়াছে রাজসভায় শোকমগ্ন রাবণের বর্ণনায়। সভাসদ্‌সহ রাবণ রাজসভায় আসীন। অপূর্ব শোভা এই রাজসভার। স্ফটিকে গঠিত গৃহ। স্বর্ণময় ছাদ ধারণ করিয়া আছে সারি সারি নানাবর্ণের স্তম্ভ। পূজামন্দিরে যেমন পল্লবের মালা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়—এ সভাগৃহ তেমনি দুর্মূল্য রত্নের মাল্যে শোভিত। সুসজ্জিত, শোভাময় 'ভূতলে অতুল সভায়' এই অমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী রাবণ এবং তাঁহার সভাসদেরা নতমস্তকে আসীন। তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ তরুর দেহ যেমন সিক্ত হইয়া ওঠে অবিরল অশ্রুধারায়, তেমনি রাবণের বসন-ভূষণ সিক্ত। সম্মুখে শোনিতাদ্র কলেবর দূত করযোড়ে দণ্ডায়মান। রণাঙ্গনে বীরবাহু এবং শত শত যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিয়াছে। একমাত্র মকরাক্ষ নামে এই দূত প্রাণ লইয়া

ফিরিতে পারিয়াছে। ইহার মুখে রাবণপুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়াছেন। রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো দুঃসহ সে সংবাদ। রাবণের বিস্ময়, সামান্য মানুষ রামচন্দ্র কী শক্তিতে কুম্ভকর্ণের মতো, বীরবাহুর মতো মহাবীরদের একে একে নিধন করিতেছে! সূর্পণখা কী কুক্ষণে পঞ্চবটি গিয়াছিল। সেই সব পুরাতন ঘটনা প্রবল আক্ষেপের সহিত রাবণের মনে আসিতেছে। এই আক্ষেপোক্তি শুনিয়া মন্ত্রী সারণ প্রবোধ দিতে উঠিল। সংসারে সবই অনিত্য মায়াময়। সুখ দুঃখ সবই বৃথা। সারণের এ প্রবোধ-বাক্যের উত্তরে রাবণ যাহা বলিয়াছে তাহাতে এক অবুঝ, মমতাপরায়ণ মানবহৃদয়ই প্রকাশ পায়। পদ্মটি ছিঁড়িয়া লইলে মৃণাল যেমন জলমগ্ন হয়, হৃদয়ের ভালোবাসার ধন কাল কবলিত হইলে হৃদয় যে তেমনি শোকসাগরে নিমগ্ন হয়।

অতঃপর রাবণের প্রশ্নের উত্তরে দূত বীরবাহুর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ আরম্ভ করিল। প্রমত্ত হস্তীর মতো প্রবল পরাক্রমে বীরবাহু শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ধনুর টংকার এবং ভয়ংকর শরক্ষেপণ বর্ণনার অতীত। নিজ সৈন্যগণসহ বীরবাহু অসংখ্য শত্রু সংহার করিলেন। কিছুকাল পরে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন স্বয়ং রামচন্দ্র। তাঁহার করে ইন্দ্রধনুর ন্যায় ভীমধনু, বিবিধ রতনে খচিত। রামচন্দ্র মহাতেজে বীরবাহুকে আক্রমণ করিলেন। চতুর্দিকে সমরতরঙ্গ উত্তাল হইয়া উঠিল। সেই ঘোর যুদ্ধে একমাত্র এই মকরাক্ষ ভিন্ন সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। এই যুদ্ধবিবরণ শেষ হইলে রাবণ রণক্ষেত্রে পতিত পুত্রকে দেখিবার জন্য প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। এখানে প্রাসাদশিখর হইতে দৃষ্ট স্বর্ণলঙ্কার অপূর্ব শোভা বর্ণিত হইয়াছে। জগতের সকল ঐশ্বর্য যেন এই লঙ্কাপুরীতে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। কৌশলে কবি এখানে লঙ্কার পরিবেশ এবং পুরীর চতুর্দিকে রামচন্দ্রের সৈন্যব্যূহের বর্ণনা করিয়াছেন। দূরে দেখা যাইতেছে রণক্ষেত্র। এখন শব-পরিকীর্ণ সেই রণাঙ্গনে মাংসলোভী প্রাণীদের অধিকার। কোথাও ভীষণাকৃতি হস্তীপুঞ্জ পড়িয়া আছে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে নানাবিধ অস্ত্র, ইহার মধ্যে সংখ্যাতীত শব। কৃষকের অস্ত্রের আঘাতে যেমন স্বর্ণচূড় শস্য কৃষিক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে সেইরূপ রামচন্দ্রের শরাঘাতে রাক্ষসবাহিনী ছিন্নভিন্ন হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া আছে। আর তাহার মাঝখানে দেখা যাইতেছে মহাকায় বীরবাহুকে। এই দৃশ্য রাবণের মনে মহাশোক সঞ্চার করিল। একদিকে শোক, অন্যদিকে বীরপুত্রের জন্য গৌরববোধ যুগপৎ

রাবণের অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিল। আক্ষেপান্তে দূরে দৃষ্টিপাত করিতে রাবণের চোখে পড়িল সমুদ্রের বুকে রামচন্দ্রের বাঁধা সেতু। এই সমুদ্র চিরদিন লঙ্কার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া লঙ্কাকে সুরক্ষিত রাখিয়াছে। আজ তাহার বুকে সেতু দেখিয়া রাবণ প্রবল ক্ষোভে সমুদ্রকে ধিক্কার দিল। তীব্র তীক্ষ্ণ এই ধিক্কার ; ইহার প্রতিটি শব্দে প্রকাশ পাইয়াছে রাবণের অন্তর্জ্বালা।

প্রাসাদশিখর হইতে ফিরিয়া রাবণ আবার সিংহাসনে বসিলেন। এমন সময় নূপুরধ্বনির সহিত রোদননিনাদ ভাসিয়া আসিল। সঙ্গিনীদলসহ বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদা রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। তাহার কবরীবন্ধন শিথিলিত, বেশ অবিন্যস্ত, শীতের পুষ্পহীন বল্লতার মতো রিক্ত তাহার রূপ। রাত্রির শিশিরে পূর্ণ পদ্মবর্ণের মতো অশ্রুপূর্ণ তাহার চোখ। পুত্রশোকে বিবশা রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা। তাহাকে দেখিয়া সভায় শোকের ঝড় বহিল। মাতা চিত্রাঙ্গদা রাবণের উদ্দেশ্যে অনুযোগবাণী উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রকে রাজার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, কাঙালিনীর সেই হৃদয়ের ধনটি আজ কোথায়। এ গঞ্জনার উত্তরে রাবণ বিলাপ করিলেন। বিধি রাবণের সর্বনাশ করিতেছে। চতুর্দিক হইতে আজ সে বিপন্ন। এমন বিপন্ন হতভাগ্যকে আর গঞ্জনা দেওয়া কেন। আর বীরপুত্র রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। সে তো গৌরবময় মৃত্যু। তাহার জন্য শোক না করিয়া গৌরববোধ করা উচিত। রাবণের এই খেদোক্তি এবং সান্ত্বনাবাক্য চিত্রাঙ্গদার সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। চিত্রাঙ্গদা আরও স্পষ্টভাবে, তীক্ষ্ণভাবে এই সকল দুর্দৈবের জন্য রাবণকেই দায়ী করিয়াছেন। দেশরক্ষার জন্য বীরবাহু প্রাণ দিয়াছে—চিত্রাঙ্গদার মনে এজন্য গৌরববোধ নাই। রামচন্দ্র সাধারণ শত্রু নয়। রাবণের রাজ্য অধিকার করিবার জন্য সে লঙ্কায় উপস্থিত হয় নাই। অপরাধ রাবণেরই। সীতা অপহরণের পাপে রাবণ সবংশে মজিতেছে। এই নিষ্ঠুর সত্যকথাটি চিত্রাঙ্গদার মুখে উচ্চারিত হইল। এ কাব্যে আর কোথাও রাবণকে এমন নিষ্ঠুর বাক্য শুনিতে হয় নাই।

চিত্রাঙ্গদা বিদায় নিলেন। শোকে জর্জর, তিরস্কারে ক্ষুব্ধ রাবণ এবারে কর্তব্যসচেতন হইয়া উঠিয়াছে। একে একে লঙ্কার সকল বীর যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে। এখন লঙ্কা বীরশূন্য। তাই রাবণ নিজে যুদ্ধে যাইবেন ঘোষণা করিলেন। রাবণের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। সৈন্যদের পদভরে কনকলঙ্কা টলিয়া উঠিল। তখন জলতলে বারুণী

মুক্তাফল দিয়া কবরী বাঁধিতেছিলেন। কোলাহল-চমকিত বারুণী সখিকে এই আকস্মিক উপপ্লবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন রাবণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই সংগ্রামের সংবাদ জানিবার জন্য বারুণী তাঁহার সখীকে রক্ষকুলরাজলক্ষ্মীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সখী মুরলা দ্রুত রাজলক্ষ্মীর আলয়ে গিয়া বারুণীর আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিল। রাজলক্ষ্মী মুরলাকে পূর্ব পূর্ব যুদ্ধের ফলাফল জানাইলেন এবং ছদ্মবেশে তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাবণের যুদ্ধায়োজন দেখিতে গেলেন। এখানে রাজলক্ষ্মী এবং মুরলার কথোপকথন প্রসঙ্গে মেঘনাদের কথা প্রথম উচ্চারিত হয়। লঙ্কাপুরীর বীর সৈন্যদের যে সমাবেশ হইয়াছে সেখানে মেঘনাদকে দেখা যাইতেছে না কেন—মুরলা এই প্রশ্ন করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর উত্তরে জানা গেল মেঘনাদ প্রমীলার সহিত প্রমোদ-উদ্যানে আছে। রাজলক্ষ্মী মুরলাকে বিদায় দিয়া মেঘনাদকে লঙ্কায় ফিরাইয়া আনিতে উদ্যোগী হইলেন। মেঘনাদের ধাত্রী প্রভাষা রাক্ষসীর বেশ ধারণ করিয়া লক্ষ্মী সেই প্রমোদ-উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট হইতে ইন্দ্রজিৎ বীরবাহুর মৃত্যু এবং যুদ্ধায়োজনের সংবাদ শুনিল। এ সংবাদে মহাক্ষুব্ধ ইন্দ্রজিৎ ফুলমালা ছিন্ন করিয়া ধিক্কার দিয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিল। যোদ্ধবেশ ধারণ করিয়া ইন্দ্রজিৎ রথে উঠিতেছে এমন সময় প্রমীলা তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য অনুরোধ জানাইল। জয় বিষয়ে সুনিশ্চিত ইন্দ্রজিৎ অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবে প্রমীলাকে এই আশ্বাস দিয়া বিদায় নিল।

মেঘনাদ রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজে সৈন্যাপত্যের দায়িত্ব ভিক্ষা করিলেন। ইন্দ্রজিৎ যুবরাজ। ইতিপূর্বে সে এই যুদ্ধে নায়কত্ব করিয়াছে। এই কাল সময়ে বারবার যুবরাজকে প্রেরণ করিতে রাবণ কুণ্ঠাবোধ করে। কিন্তু ইন্দ্রজিতের পক্ষে ইহা মর্যাদার প্রশ্ন। সে জীবিত থাকিতে যদি রাজা রাবণ যুদ্ধে যায় তাহা হইলে জগতে নিন্দা রটিবে। অনেক দ্বিধায় রাবণ শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিল। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া ইন্দ্রজিৎ সৈনাপত্য ভার গ্রহণ করিবে। ইন্দ্রজিৎকে সৈন্যাপত্যে অভিষিক্ত করা হইল। চতুর্দিকে আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল। বন্দীরা লঙ্কার গৌরব-গাথা গাহিয়া উঠিল। সে গানে বিঘোষিত হইল আশার বাণী। এই বন্দনাগানে প্রথম সর্গ শেষ হইয়াছে।

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণী
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা
আসিয়া

[১—৮] **বীর-চূড়ামণি**—বীরশ্রেষ্ঠ। **বীরবাহু**—রাবণের মহিষীদের মধ্যে অন্যতমা, চিত্রসেন নামক গন্ধর্বের কন্যা চিত্রাঙ্গদা। বীরবাহু চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্র। বীরবাহুর মৃত্যু এবং তাহার পরে ইন্দ্রজিৎকে সৈনাপত্যে বরণ এই ঘটনাক্রম মধুসূদন গ্রহণ করিয়াছেন কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে। **রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি**—রাঘব+অরি, অর্থাৎ রাক্ষসবংশশ্রেষ্ঠ রাবণ। **কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা ইত্যাদি**—ঊর্মিলাবিলাসী লক্ষ্মণ কী কৌশলে রাক্ষসকুলের শেষ ভরসাস্থল ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিয়া ইন্দ্রের শঙ্কা দূর করিলেন। লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ নিধন এই কাব্যের বিষয়বস্তু। লক্ষ্মণ ন্যায়সঙ্গত সম্মুখ যুদ্ধে মেঘনাদকে পরাস্ত করেন নাই। কৌশলে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা করিয়াছেন। 'কৌশলে' কথাটিতে লক্ষ্মণের ওই অন্যায় আচরণের প্রতি ইঙ্গিত আছে। রামায়ণের মূল কাহিনীতে অবশ্য সম্মুখ যুদ্ধের কথাই আছে। মধুসূদন লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ নিধন ব্যাপার বর্ণনায় মূল কাহিনী আদৌ অনুসরণ করেন নাই।

[৯—২১] **শ্বেতভুজে ভারতি**—কবি কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে সম্বোধন করিতেছেন। এই অংশে কবি যেভাবে সরস্বতী-বন্দনা এবং সরস্বতীর প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রাচ্য রীতি নয়। কাব্যের সূচনায় দেব-দেবী বন্দনার রীতি মঙ্গলকাব্যেও ছিল। এখানে মধুসূদন সেই রীতি অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার বন্দনার ভঙ্গিতে পাশ্চাত্ত্য কাব্যের invocation এর কথা মনে পড়ে। শ্বেতভুজা সরস্বতী ভারতীয় দেবী হইলেও এখানে তাহাকে কলালক্ষ্মী

বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি।
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর ২০
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে

Muse-এর মতো বর্ণনা করা হইয়াছে। হোমারের ইলিয়াড, ভার্জিলের ঈনিড মিল্‌টনের প্যারাডাইস লস্ট প্রভৃতি কাব্যের সূচনায় ঠিক এই ভঙ্গিতে Muse-বন্দনা আছে। পাশ্চাত্ত্যের প্রখ্যাত কাব্যসমূহের সেই Muse-বন্দনার পদ্ধতিই এখানে অনুসরণ করা হইয়াছে। **বাল্মীকির রসনায় ইত্যাদি**—আদিকবি বাল্মীকি যৌবনে অতি দুরাচার ও দুর্বৃত্ত ছিলেন। কোনো সময়ে ব্রহ্মা ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করায় তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন। একদা স্নান সমাপন করিয়া আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ব্যাধ তাঁহার সম্মুখে কামক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বধ করে। এইরূপ ক্রূর আচরণ দেখিয়া বাল্মীকি সেই ব্যাধের উদ্দেশ্যে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং'...ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করেন। ইহাই প্রথম শ্লোক, জগতের প্রথম কবিতা। এখানে মধুসূদন সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, তিনি যেমন ব্যাধকর্তৃক ক্রৌঞ্চ নিধনের সময়ে বাল্মীকির রসনায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তেমনি যেন তাঁহার প্রতিও অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। **নরাধম আছিল যে নরকুলে**- দস্যুবৃত্তিপরায়ণ বাল্মীকি। **তোমার প্রসাদে মৃত্যুঞ্জয়**—সরস্বতীর দয়ায় অমর হইয়াছেন। **মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি**—মহেশ্বর। বাল্মীকির কবিখ্যাতি কালজয়ী হইয়াছে। এই অর্থে তিনি অমর হইয়াছেন, যেমন অমর মহেশ্বর। **চোর রত্নাকর**—বাল্মীকির পূর্বনাম ছিল রত্নাকর। **কাব্যরত্নাকর**—রত্নাকর শব্দের অর্থ সমুদ্র। কাব্যরূপ রত্নের আলয় কবি বাল্মীকির মন, তাই তাঁহাকে কাব্য-রত্নাকর বলা হইতেছে।

[২২—৩২] **সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে**—বিষবৃক্ষও চন্দনবৃক্ষের ন্যায় সৌরভসম্পন্ন হইয়া ওঠে। নিহিতার্থ, সরস্বতীর প্রসাদে নিতান্ত গুণহীন প্রতিভাহীন ব্যক্তিও কবিখ্যাতি লাভ করিতে পারে। **কিন্তু যে গো গুণহীন**

মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে। গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত, উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু ৩০
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিক গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরল কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চে স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে

ইত্যাদি—কবি নিজের সম্পর্কে একথা বলিয়াছেন। সন্তানদের মধ্যে যে গুণহীন মাতার স্নেহ যেমন তাহার প্রতিই অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয় সেইরূপ কবি-সমাজে অখ্যাত, গুণহীন মধুসূদন সরস্বতীর আনুকূল্য সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা করেন। **উর**—উত্তরণ কর, আবির্ভূত হও। **বিশ্বরমে**—বিশ্বমোহিনী, বিশ্বকে যিনি মোহিত বা প্রীত করেন। **বীররস**—অলংকারশাস্ত্রে নয়টি রসের উল্লেখ আছে। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। এই নব রসের অন্যতম 'বীররস' শাস্ত্রানুসারে মহাকাব্যের মূল রস হইতে পারে। কবি এখানে বীররসের মহাকাব্য রচনার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য মেঘনাদবধ কাব্যকে শেষ পর্যন্ত বীররসপ্রধান কাব্য বলা যায় না, করুণরসই এ কাব্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। **মধুকরী কল্পনা**—সরস্বতীর সহিত 'কল্পনা'কেও কবি আহ্বান করিতেছেন। 'কল্পনা' এখানে একজন দেবীরূপে কল্পিতা। **কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু ইত্যাদি**—মৌচাক রচনার জন্য মৌমাছি যেমন উদ্যানের নানা পুষ্পের মধু সংগ্রহ করে, কবিও সেইরূপ বিশ্বের বিভিন্ন কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিজের রচনার সৌকর্যসাধন করিবেন। **গৌড়জন**—বাঙলাদেশের মানুষ।

[৩৩—৮১] **কনক-আসনে**—স্বর্ণ সিংহাসনে। **হেমকূট-হৈমশিরে ইত্যাদি**—স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন রাবণকে মনে হইতেছে হেমকূট নামক সুবর্ণময় পর্বতের শৃঙ্গের মতো। **স্ফটিক**—স্বচ্ছ শুভ্র প্রস্তরবিশেষ। **ফণীন্দ্র যেমতি, বিস্তারি অযুত ইত্যাদি**—অনন্তনাগ বাসুকির মণিদীপ্ত ফণার উপরে যেমন পৃথিবী বিধৃত, বিচিত্রবর্ণের স্তম্ভগুলির উপরে তেমনি সভা

ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে
মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে !
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায় ; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা ৫০
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে !—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মুরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি ! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি ! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে !
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা ৬০
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিবে পৌরবে ?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে

গৃহের ছাদ ধৃত রহিয়াছে। **পদ্মরাগ**—পদ্মবর্ণ মণি, Ruby, পলা। **মরকত**—সবুজবর্ণ মণি। **পল্লবের মালা ব্রতালয়ে**—ব্রতালয়ে বা পূজাগৃহে যেমন পল্লবের মালা ঝোলানো হয় সেইরূপ নানাবর্ণের মণিখচিত ঝালর দ্বারা সভাগৃহ সুসজ্জিত। **ক্ষণপ্রভা**—বিদ্যুৎ। **রতনসম্ভবা বিভা**—রত্নসমূহ হইতে উৎপন্ন আলোক। **হরকোপানলে কাম যেন ইত্যাদি**—রাজসভায় রাবণের যে ছত্রধর ছত্র ধারণ করিয়া আছে তাহার বর্ণনা। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে, কামদেব মদন মহাদেবের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হন। মধুসূদন এখানে কামদেব-এর সৌন্দর্যের সহিত ছত্রধরের সৌন্দর্যের তুলনায় লিখিয়াছেন, যেন কামদেব ভস্মীভূত হন নাই, তিনিই ছত্রধররূপে রাবণের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। **পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা**—কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের সময়ে স্বয়ং মহাদেব পাণ্ডব-শিবিরের দ্বার রক্ষা করিতেন। রাবণের দ্বারী সেই ত্রিশূলধারী রুদ্রেশ্বর বা মহাদেবের ন্যায় ভীষণাকৃতি। **হে দানবপতি ময় ইত্যাদি**—খাণ্ডব অরণ্য দহনের সময়ে অর্জুন ময়দানবের প্রাণরক্ষা করেন। ময়দানব দৈত্যদের শিল্পী, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার তুল্য প্রতিভা-সম্পন্ন। অর্জুন যে উপকার করিয়াছিলেন তাহার প্রতিদানস্বরূপ 'ময়' ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের জন্য এক অপূর্ব সুন্দর রাজসভা নির্মাণ করেন। রাবণের রাজসভা ময়-নির্মিত রাজসভা হইতেও সুন্দর। **পৌরব**—পুরুবংশীয়, পাণ্ডবাদি।

অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে ৭০
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ
বারতা, ৮০
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব-ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন
ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর
রাখিবে, ৯০
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!

[৬২—১১৩] তিতিয়া—ভিজিয়া। **তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে**—পুত্রশোকে কাতর রাবণ ক্রন্দন করিতেছেন। তাহার বসন অশ্রুসিক্ত। এখানে রাবণের এই দশার উপমা রূপে কবি শরাঘাতে নির্গত রসে সিক্ত তরুর উল্লেখ করিয়াছেন। উপমাটি তাৎপর্যপূর্ণ। মহাবৃক্ষ যেমন সমুন্নত, রাবণের মহিমাও সেইরূপ। তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে সমস্ত লঙ্কা এবং লঙ্কাবাসী। শত্রুপক্ষীয়দের হাতে একে একে রাবণের আত্মীয়স্বজন বিনষ্ট হইতেছে। এই ক্ষতি এই বেদনায় তাহার হৃদয় শোকজর্জর। **ভগ্নদূত**—যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ বহন করিয়া আনে যে দূত। **মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম**—সমরক্ষেত্রে বীরবাহুসহ আর সকল যোদ্ধাই প্রাণ হারাইয়াছে। একমাত্র এই ভগ্নদূত মকরাক্ষ প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মকরাক্ষ যক্ষপতি কুবেরের ন্যায় শক্তিশালী। **নৈকষেয়**—নিকষার পুত্র, অর্থাৎ রাবণ। রাবণের পিতা বিশ্রবা ঋষি। মাতা নিকষা রাক্ষসী। **শাল্মলী**—শিমুল। **ফুলদল দিয়া কাটিলা কি ইত্যাদি**—দেবতারাও বীরবাহুর শৌর্যে ভীত। সেই পরাক্রান্ত বীর সামান্য মানুষ রামচন্দ্রের হাতে নিহত হইয়াছে। রাবণ এই সংবাদে বিস্মিত। শিমুল

বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমনি দুর্ব্বল, দেখ করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, ১০০
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী; ১১০
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা

বৃক্ষকে ফুলের পাপড়ি দিয়া ছেদন করার মতোই বিস্ময়কর এই ঘটনা। **বনের মাঝারে যথা ইত্যাদি**—রাবণের প্রসঙ্গে কবি বারবার তরুর উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। কাঠুরিয়া কোনো বৃহৎ বৃক্ষ ছেদনের পূর্বে যেমন আগে শাখাপ্রশাখাগুলি কাটিয়া ফেলে প্রতিকূল দৈব সেইরূপ রাবণকে নির্মূল করিবার পূর্বে তাহার শাখাপ্রশাখাস্বরূপ আত্মীয়-স্বজনদের একে একে শেষ করিতেছে। **শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ**—নিকষার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ বিভীষণ এবং সূর্পণখার জন্ম। শৌর্যে কুম্ভকর্ণ ত্রিশূলধারী মহাদেবের তুল্য। **সূর্পণখা**—রাবণের বিধবা ভগিনী। **কালকূটে ভরা এ ভুজগে**—বিষপূর্ণ এই সর্পকে, রামচন্দ্রকে। **পাবকশিখারূপিণী জানকীরে**—অগ্নিশিখারূপিণী সীতাকে। সূর্পণখার প্ররোচনায়, সূর্পণখাকে যে অপমান করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধের জন্যই রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়াছিল। সীতার জন্য রামচন্দ্র লঙ্কা অবরোধ করিয়াছে। সীতার জন্যই লঙ্কার সর্বনাশ উপস্থিত। **রবাব**—সেতার জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। পূর্বে ইহার নাম ছিল রুদ্রবীণা। মুসলমান আমলে রবাব নাম দেওয়া হয়। **মুরজ**—মৃদঙ্গ। **মুরলী**—বাঁশী।

হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে ;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে !
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু
মনে ;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-
অধিপতি ;—১৩০
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে
চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে
পড়িল ১৪০
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী ?"

[১৪১—১৪১] **হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে ইত্যাদি**—দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন সঞ্জয় জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ শুনাইতেন। ভীমসেনের হাতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ নিহত হইতেছে, সঞ্জয়ের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র যেমন বিলাপ করিয়াছিলেন, ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাবণ সেইরূপ বিলাপ করিলেন। **সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ**—জ্ঞানীপ্রধান মন্ত্রী, সারণ সম্পর্কে প্রযুক্ত বিশেষণ। **অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে**—শোকগ্রস্ত রাবণকে মন্ত্রী সারণ প্রবোধ দিতে গিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছে। পর্বতের চূড়া যদি বজ্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া যায় তবুও পর্বত অটল থাকে। বীরবাহুর মৃত্যু যতোই শোকাবহ হোক রাবণকে পর্বতের ন্যায় অটল থাকিয়া রাজকর্তব্য পালন করিতে হইবে। **হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কুসুম**—পদ্মফুলটিকে ছিঁড়িয়া লইলে পদ্মের মৃণাল জলমগ্ন হয়। সেইরূপ হৃদয়বৃন্তে প্রস্ফুটিত কুসুম অর্থাৎ স্নেহের মমতার ধন যদি কালগ্রাসে পতিত হয় তাহা হইলে হৃদয় শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়। পুত্রের মৃত্যুতে রাবণের হৃদয়ও শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে। **কুবলয়**—পদ্ম।

প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে !
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে ; ১৫০
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে ; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি ১৬০
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে !—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্ ! কত ক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা, যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া ১৭০
পূর্বদুঃখ ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিলা
ভগ্নদূত, "কেমনে হে রক্ষঃকুলনিধি,

[১৭২—১৭৫] **মদকল করী**—মদমত্ত হস্তী। উত্তেজিত হস্তীর রগ ফাটিয়া যে পাটকিলা বর্ণের উৎকট গন্ধ জলস্রাব হয় তাহাকে মদ বলে। **ইরম্মদ**—বজ্রাগ্নি। **পবনপথ**—আকাশ। **কোদণ্ড-টংকার**—ধনুর ছিলা হইতে উত্থিত শব্দ। **পশিলা**—প্রবেশ করিল। **ঘন ঘনাকারে**—ঘন মেঘের আকারে। **কলম্বকুল**—বাণসমূহ। **নরেন্দ্র রাঘব**—রাজা রামচন্দ্র। **বাসবের চাপ যথা**—রামচন্দ্রের হস্তধৃত বিশাল ধনু ইন্দ্রধনুর মতো নানাবর্ণের রত্নখচিত। **বাসব**—ইন্দ্র। **চাপ**—ধনু। **সন্দেশবহ**—সংবাদবহনকারী, দূত। **দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ**—দশানন অর্থাৎ রাবণের বীরপুত্রকে দশরথের পুত্র রাম কিরূপে হত্যা করিল রাবণ তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে।

কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া ১৮০
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে ! ভাতিল আসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত ! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে !—
আর কি কহিব, দেব ? পূর্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি ! হায় রে বিধাতঃ
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ?
কেননা শুইনু আমি শরশয্যোপরি, ১৯০
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে? কিন্তু নাহি নিজ দোষে দোষী
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।”
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ; “সাবাসি, দূত ! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ? ২০০

[১৭৬—২০৪] **হর্য্যক্ষ**—পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু যাহার, সিংহ। **সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ুসহ**—ঝড়ের সময়ে সমুদ্রের তরঙ্গ আর বায়ুর সংঘর্ষে যেমন ভীষণ গর্জন উত্থিত হয় বীরবাহু ও রামচন্দ্রের বাহিনীর সংঘাতে উত্তাল সমরক্ষেত্রে সেইরূপ উচ্চ নিনাদ উত্থিত হইল। **ভাতিল**- দীপ্তিমান হইল। **ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে**—চর্ম অর্থ ঢাল। ধূম্রবর্ণ ঢালের মাঝে। **কম্বু**—শঙ্খ। **অম্বুরাশি রবে**—কল্লোলিত সমুদ্রের মতো। রণশঙ্খের শব্দ সমুদ্রের গর্জনের মতো শোনাইল। **ক্ষত বক্ষঃস্থল মম…পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা**—মকরাক্ষ একা জীবিত অবস্থায় রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে কাপুরুষের মতো পলায়ন করে নাই। পলায়ন করিলে তাহার পৃষ্ঠদেশে শত্রুর আঘাত-চিহ্ন থাকিত। আঘাত যাহা আছে সবই বক্ষদেশে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে সে সম্মুখ সমরেই আহত হইয়াছে। **ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী ইত্যাদি**—দূতমুখে বীরবাহুর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী শুনিয়া রাবণের মনে উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে। সর্প যেমন ডমরুধ্বনি শুনিলে বিবরের বাহিরে ছুটিয়া আসে, এই যুদ্ধের আখ্যান শুনিতে শুনিতে সেইরূপ রণরঙ্গে মাতিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী। চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীরচূড়ামণি
বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা
পুরী!—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল-আলয় সরঃ; উৎস
রজঃ-ছটা; ২১০
তরুরাজী; ফুলকুল—চক্ষু-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা ২২০
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর; তথা

[২০৫—২১৭] **কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন, ইত্যাদি**—যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। অংশুমালী (সূর্য) যখন উদয়শিখরে আবির্ভূত হয় তখনকার শোভার সহিত তুলনা করা হইতেছে স্বর্ণময় প্রাসাদশীর্ষে আরোহিত রাবণকে। দিনমণি ও অংশুমালী উভয় শব্দের অর্থ সূর্য। এখানে পুনরুক্তি এড়াইবার জন্য অংশুমালী বিশেষণ পদ করা হইয়াছে। অর্থাৎ অংশু বা কিরণজাল যাহার গলদেশে মালার ন্যায় বিরাজিত। **কাঞ্চন-সৌধ-কিরিটিনী লঙ্কা**—কাঞ্চন নির্মিত সৌধ অর্থাৎ অট্টালিকা যে লঙ্কার কিরীট (মুকুট) স্বরূপ হইয়াছে। **হেমহর্ম্ম্য**—স্বর্ণনির্মিত অট্টালিকা। **কমল-আলয় সরঃ**—পদ্মের আলয়রূপ সরোবর। **উৎস রজঃ-ছটা**—রূপার মতো উজ্জ্বল জল নিঃসৃত হইতেছে এমন ফোয়ারা। **এ জগৎ যেন আনিয়া বিবিধ ধন ইত্যাদি**—লঙ্কার অতুলনীয় বৈভব বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন যেমন পূজার উপকরণ সাজাইয়া রাখা হয় সেইরূপ জগতের যতো ঐশ্বর্য এই সুন্দর লঙ্কাপুরীতে সাজানো হইয়াছে। কবি লঙ্কাকে বিশ্বের সকল ঐশ্বর্যে পূর্ণরূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই ঐশ্বর্য বর্ণনাতেও রাবণের মহিমাই প্রকাশ পাইতেছে। **জগত-বাসনা তুই**—জগতের আকাঙ্ক্ষিত এই লঙ্কা।

[২১৮—২৬৮] **শৃঙ্গধরোপরি সিংহ**—পর্বতের উপরে সিংহ। **উন্নত** প্রাচীরের উপরে বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে রক্ষীদল পদচারণা করিতেছে। মনে

জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব দ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক- ২৩০
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে !
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি, ২৪০
বেড়ে জালে সাবধানে
কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র ! শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা
বিবাদে ;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে
রক্তস্রোতে !
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ; ২৫০
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে !
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূরী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি

হইতেছে যেন পর্বতের উপরে সিংহ বিচরণ করিতেছে। **বৈদেহীহর**—বৈদেহী বা সীতাকে যে হরণ করিয়াছে, রাবণ। **রিপুবৃন্দ**—শত্রুদল। **বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা**—সমুদ্রতীরের বালু যেমন সংখ্যায় গণনা করা যায় না, তেমনি শত্রুও অসংখ্য। **করভ**—হস্তীশাবক। **কঞ্চুক**—সাপের খোলস। **হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ ফণা ইত্যাদি**—শীতের শেষে সর্প নতুন বল পায়, ফণা উঁচু এবং ত্রিশূলের মতো জিহ্বা বিক্ষেপ করিয়া ফেরে। অঙ্গদ এই হিমান্তের সর্পের ন্যায় ভয়ংকর। **অবলেপে**—গর্বে **কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন শশাঙ্ক**—কৌমুদী অর্থ জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নাহীন চন্দ্র। সীতা বিরহে রামচন্দ্রকে এইরূপ দেখাইতেছে। **প্রসরণে**—বেষ্টনে। **ভীমাসম**—চণ্ডীর সদৃশ।

শিবাকুল শৃগালের দল। **গৃধিনী**—শকুনী জাতীয় পাখি। **পাকশাট**—পাখার ঝাপট। **কুঞ্জরপুঞ্জ**—হস্তীদল। **নিষাদী**—হস্তী-চালক। **সাদী**—

একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গার, পরশু,
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডঘাতে
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে,
যেমতি ২৬০
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা
রাবণ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ,
কুমার ২৭০
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত
ধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
যে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি
হে তুমি ২৮০
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে
দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি
তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে

অশ্ব, গজ বা রথারোহী যোদ্ধা। **ভিন্দিপাল**—ক্ষেপ্য অস্ত্রবিশেষ। **পরশু**—একটি যষ্টির মস্তকে অর্ধচন্দ্রাকার লৌহফলক-বিশিষ্ট অস্ত্র। **কিরীট**—মুকুট। **যেমতি স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত**—কৃষকদের অস্ত্রের আঘাতে শস্যক্ষেত্রে যেমন স্বর্ণচূড় শস্যরাশি শায়িত হয়, রামচন্দ্রের শরাঘাতে সেইরূপ রাক্ষস-বাহিনী রণক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে। **হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড় ঘটোৎকচ, ইত্যাদি**—রণক্ষেত্রে পতিত বীরবাহুর উপমা। ভীমসেন ও হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ। গরুড়ের ন্যায় শক্তিশালী সেই ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রাত্রিকালে যখন কৌরব সৈন্য দলন করিতেছিল তখন কর্ণ একাঘ্নী বাণে তাহাকে নিহত করে। **কালপৃষ্ঠ**—কর্ণের ধনু।

সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর, ২৯০
উথলিছে নিরন্তর,গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম
প্রশস্ত ; বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি ;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার
ভূষণ, ৩০০
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে
তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী,

[২৬৯—৩১৬] **মেঘশ্রেণী যেন অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল বাঁধা দৃঢ় বাঁধে**—রামচন্দ্র নির্মিত সেতুর বর্ণনা। সমুদ্রের বুকে কৃষ্ণপ্রস্তর-গুলিকে পর্বতের মতো দেখাইতেছে। পরস্পর দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা প্রস্তরগুলি জলে ভাসিয়া আছে। **ফণিবর**—বাসুকী। **বীরকুলর্ষভ**—বীরকুলের অগ্রগণ্য। **কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে**—প্রাসাদশিখর হইতে রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রের শোকাবহ দৃশ্য দেখিবার পর সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই সেতুবন্ধ চোখে পড়িল। যে প্রবল ক্ষোভ তাহার অন্তরে সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা ফাটিয়া পড়িয়াছে সমুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত এই ধিক্কারসূচক উক্তিতে। "এই পংক্তিটির মধ্যে প্রবহমান ধ্বনিস্রোত অবশেষে 'প্রচেতঃ' এই শব্দটিতে আসিয়া যেভাবে ধাক্কা খাইয়া তাল রাখিয়াছে, তাহাতে এবং ঐ একটিমাত্র শব্দের প্রয়োগে, পাঠকের চিত্তে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা অর্থ অপেক্ষা ফলপ্রদ—বিপুল-বিশালের সম্মুখীন, তেমনই বিশালবক্ষ ও দুর্দ্ধর্ষচেতা এক পুরুষবীরের উন্নতশির নিমেষে আমাদের নয়নগোচর হয়" (মোহিতলাল)। এখানে 'মালা' বলিতে সমুদ্রের বুকের সেতুকে বোঝানো হইয়াছে। **প্রচেতঃ**—সমুদ্রের অধিপতি বরুণ দেবতা। এখানে সমুদ্রকেই প্রচেতঃ বলা হইয়াছে। **প্রভঞ্জনবৈরী**—ঝড়ের শত্রু। **বীতংস**—মৃগ বা পক্ষীদের বন্ধনের উপকরণ, ফাঁস। **অধম ভালুকে ইত্যাদি**—ভালুককে শৃঙ্খলিত করিয়া যাদুকর

শোভে তব বক্ষঃস্থল, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে, ৩১০
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি ; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি ; পাত্র মিত্র, সভাসদ-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে !
হেন কালে চারি দিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন !
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,

ইচ্ছামত চালনা করিয়া খেলা দেখায়, কিন্তু সিংহকে শৃঙ্খলিত করিতে পারে না। সমুদ্রের পরাক্রমের সহিত সিংহের পরাক্রমের তুলনা করা হইয়াছে। সিংহের মতো পরাক্রম যাহার সেই সমুদ্র কেন সেতুরূপ বন্ধন মানিয়া লইয়াছে। **কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে**—কৌস্তুভমণি কৃষ্ণের বক্ষোভূষণ। কৃষ্ণের বক্ষোভূষণ যেমন কৌস্তুভ, লঙ্কাপুরীও সেইরূপ সমুদ্রের বক্ষোভূষণ। **জাঙাল**—মাটির বাঁধ। **ভালে এ কলঙ্ক-রেখা**—সমুদ্রের বুকে রচিত সেতুবন্ধকে কলঙ্করেখা বলা হইতেছে।

[৩১৭—৩৫৫] **হেন কালে চারিদিকে ইত্যাদি**—বীরবাহু জননী চিত্রাঙ্গদা রাজসভায় আসিতেছেন। নেপথ্য হইতে তাঁহার অঙ্গাভরণের শব্দের সহিত ক্রন্দনরোল ভাসিয়া আসিল। **কিঙ্কিণীর বোল**—ঘুঙুরের শব্দ। **চিত্রাঙ্গদা**—রাবণের মহিষীদের মধ্য অন্যতমা। বাল্মীকি রামায়ণে এই চরিত্রের উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাসে উল্লেখমাত্র আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের এই চরিত্র মধুসূদনের নিজস্ব কল্পনার সৃষ্টি। **হিমানীতে যথা কুসুমরতনহীন ইত্যাদি**—শোকসন্তপ্ত চিত্রাঙ্গদার বর্ণনা। বনস্থলী সুশোভিত করিয়া রাখে যে পুষ্পিত লতা, শীতের সময়ে পুষ্পহীন সেই লতাকে যেমন রিক্ত দেখায়, প্রসাধন এবং সাজসজ্জাহীন চিত্রাঙ্গদাকেও সেইরূপ দেখাইতেছে। **নিশার শিশির-পূর্ণ পদ্মপর্ণ**—চিত্রাঙ্গদার অশ্রুপূর্ণ নয়নের উপমা। রাত্রির শিশির সঞ্চিত হইয়াছে এমন

যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি
নেত্রনীরে ৩৪০
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে ; দৌবারিক
নিষ্কোষিলা অসি
পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি ৩৫০
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ
তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন-
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ; তুমি

পাপড়ির মতো চিত্রাঙ্গদার চোখ। **বিহঙ্গিনী যথা**—বাসায় প্রবেশ করিয়া সাপ পক্ষীশাবক গ্রাস করিলে পক্ষীমাতার অবস্থা যেমন হয় পুত্রহারা চিত্রাঙ্গদার অবস্থা সেইরূপ। **আসার**—বৃষ্টিপাত, জলস্রাব। **জীমূত-মন্দ্র**—মেঘের গর্জন-ধ্বনি। **নিষ্কোষিলা**—খাপ হইতে বাহির করিল। **একটি রতন মোরে ইত্যাদি**—বিধাতা আমাকে একটিমাত্র রত্ন দিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদার একটিমাত্র পুত্র বীরবাহু। তরুর কোটরকে নিরাপদ স্থান জানিয়া পক্ষীমাতা যেমন সেখানে শাবকটিকে রাখিয়া দেয়, রাবণের নিকট সেইরূপ পুত্র বীরবাহুকে চিত্রাঙ্গদা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। **দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম**—গরিবের ধন রক্ষা করা রাজার ধর্ম। একমাত্র পুত্রের জননী চিত্রাঙ্গদা নিজেকে দরিদ্র বলিতেছে। রাজা রাবণ সেই গরিবের ধনটিকে রক্ষা করিবেন ইহাই প্রত্যাশিত, কিন্তু তিনি গচ্ছিত ধন বিনষ্ট করিয়াছেন। অর্থাৎ বীরবাহুর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে রাবণের জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া। অনুযোগের এই ভঙ্গিতে স্বামীর সহিত চিত্রাঙ্গদার সম্পর্কের শিথিলতাই প্রকাশ পায়। এই অংশটির ব্যাখ্যায় মোহিতলাল লিখিয়াছেন, "পুত্রশোকে অধীর হইলেও রাবণ সিংহাসনে রাজ-মহিমায় আসীন, সেই সিংহাসনের তলে দীন প্রজার মতো দাঁড়াইয়া চিত্রাঙ্গদার এই যে অভিযোগ তাহাতে চিত্রাঙ্গদার শুধুই শোক নয়, তাহার সমগ্র জীবন—

রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছে,
কাঙালিনী আমি, রাজা, আমায়
সে ধনে ?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী ;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন
দেহ মোরে !
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে,
সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ
কনকপুরী, ৩৬০
দেখ, বীরশূন্য, এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি ! হায় দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে, ৩৭০
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু

স্বামীর সহিত তাহার সম্পর্ক, তাহার অসহায় একক অবস্থার দুঃখ, মুহূর্তে আমাদের হৃদয়গোচর হয়। রাবণের বিশাল পুরীতে এই অবহেলিতা নারীর একটিমাত্র সম্বল ছিল—তাহার সেই পুত্র। রাবণের সুখ-দুঃখ তাহার সুখ-দুঃখ নয়—পুত্রের মৃত্যুতে তাহার যাহা হইয়াছে, তাহাতে স্বামীর সহিত ব্যবধান কিছুমাত্র ঘুচে নাই।"

[৩৫৬—৩৮৫] **বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা** মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ চরিত্র নিজের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন নয়। সীতাহরণকে সে কোথাও পাপ বলিয়া স্বীকার করে নাই। বারবারই তাহার দুর্দশার জন্য বিধাতা ও নিয়তিকে দায়ী করিয়াছে। যেন কোন অজ্ঞাত নিষ্ঠুর নিয়তি তাহাকে এমনভাবে নির্যাতিত করিতেছে। **নিদাঘে**—গ্রীষ্মকালে। **বরজে সজারু পশি ইত্যাদি**—বরজ—পানগাছ লাগানো হয় যেখানে সেই জায়গাটি চারিদিকে বেড়া এবং উপরে আচ্ছাদন দিয়া সুরক্ষিত করা হয়। ইহাকে বরজ বলে। বারুই—বারুজীবী, পান চাষ ও পানের ব্যবসায় করেন যাঁহারা। পানের বরজে সজারু প্রবেশ করিয়া যেমন গাছগুলি নির্মমভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, রামচন্দ্র লঙ্কারাজ্যের অবস্থা সেইরূপ করিয়াছেন। **আপনি জলধি পরেন শৃঙ্খল পায়ে**—সমুদ্র রামচন্দ্রের অনুরোধে পায়ে শিকল পরিয়াছে অর্থাৎ রামচন্দ্র সেতুদ্বারা সাগরকে বাঁধিয়াছেন। **শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে**—বাতাসে

বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে
অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি
পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ-দাশরথি-অরি ;—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি
তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব ৩৮০
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিতি অশ্রুনীরে ?
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রী দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা
লঙ্কা তব ; ৩৯০
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের
কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা,
এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,

শিমুলের শিম ফাটিয়া তাহার ভিতরের তুলা যেমন চারদিকে উড়িয়া যায় যুদ্ধে রাক্ষসবীরেরা সেইরূপ বিক্ষিপ্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। **গন্ধর্ব্বনন্দিনী**—চিত্রসেন নামক গন্ধর্বের কন্যা চিত্রাঙ্গদা। গন্ধর্বেরা স্বর্গের গায়ক। পুরাণে ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। **ইন্দুনিভাননে**—ইন্দু বা চাঁদের মত মুখ যাহার, চিত্রাঙ্গদা।

[৩৮৬—৪০৫] **প্রসূন**—পুষ্প। **প্রসূ**—জননী। **কিসের কারণে, কোন্ লোভ, ইত্যাদি**—রাবণ লঙ্কাপুরীর দুর্দশার জন্য বিধাতার প্রতি দোষারোপ করিলে চিত্রাঙ্গদা রাবণের নিজের অপরাধের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছে। চিত্রাঙ্গদার বক্তব্য এই যে, রামচন্দ্র রাজ্যলোভে লঙ্কা আক্রমণ করিতে আসেন নাই। রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছে তাহার জন্যই লঙ্কার আজ এই দুর্দশা। রাবণের পাপে দেশ ডুবিতে বসিয়াছে। রামচন্দ্রকে দেশের শত্রু বা দেশ আক্রমণকারীও বলা যায় না। এ যুদ্ধে বীরবাহুর মতো যে সকল বীর প্রাণ দিয়াছে তাহাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী একমাত্র রাবণ। এ কাব্যে এমন স্পষ্টভাবে রাবণকে আর কোথাও অভিযুক্ত হইতে হয় নাই। "রাবণের উপস্থিত বিপদ তাহাকে (চিত্রাঙ্গদাকে) কিছুমাত্র ব্যাকুল করে না ; রাবণের শোকেও তাহার সহানুভূতি নাই। যাহার জন্য তাহার সর্বস্ব

অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে! তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!"
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া

গিয়াছে, সেই রাবণের কোনও সান্ত্বনা-বাক্যে সে আশস্ত হইবে না ; রাবণের পাপকেই সে বড় করিয়া দেখিতেছে। বিধাতার ন্যায়দণ্ডকে বুক পাতিয়া লইবার মত ধীরতা, কিম্বা তাহার আঘাতে পাপীর যে যন্ত্রণা, তাহা নিজেরও বক্ষে অনুভব করিবার মত প্রেম—কোনটাই তাহার নাই। তাই শোকে মুহ্যমানা বিবশা রাবণ-বধূর অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডলে যেন বিধাতার রোষানলকেই প্রদীপ্ত হইতে দেখি" (মোহিতলাল)। **রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি**—লঙ্কা সমুদ্র-বেষ্টিত। রৌপ্যাভ জলের এই বেষ্টনকে রজত প্রাচীরের মত দেখায়। **হৈমসিংহাসন-আশে, ইত্যাদি**—রাবণের স্বর্ণময় সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য রামচন্দ্র (দাশরথি=দশরথের পুত্র) আসেন নাই। **কাকোদর সদা নম্রশির**—সাপ (কাকোদর=সাপ) সর্বদা মাথা নিচু করিয়া থাকে, কিন্তু কেহ তাহাকে আঘাত করিলে ফণা তুলিয়া আঘাতকারীকে দংশন করে। রামচন্দ্র সম্পর্কে এই কথা বলা হইয়াছে। সীতা হরণ করিয়া রামচন্দ্রকে রাবণ আঘাত করিয়াছে বলিয়াই তিনি লঙ্কা আক্রমণ করিয়া রাবণকে পর্যুদস্ত করিতেছেন। **কে, কহ, এ কাল-অগ্নি ইত্যাদি**—অর্থাৎ রাবণই এই কাল অগ্নি জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। **নিজ কর্ম্মফলে ইত্যাদি**—মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ এবং রাবণ-পক্ষীয় সকলকে যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে তাহা রাবণেরই কৃতকর্মের ফল। কিন্তু এ কাব্যে রাবণ কোথাও ইহা স্বীকার করে নাই। সে এক অদৃষ্ট নিয়তিকেই সকল দুর্ভোগের জন্য দায়ী করিয়াছে। এখানে চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে রাবণের কৃতকর্মের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

অশ্রুবারি। "এতদিনে" (কহিলা
ভূপতি) ৪১০
"বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি, ৪২০
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,

[৪০৬—৪৪০] **বীরশূন্য লঙ্কা মম**—কুম্ভকর্ণ বীরবাহু প্রভৃতি বীরবৃন্দ সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তাই রাবণের এই উক্তি। অবশ্য মেঘনাদ এখনো জীবিত আছেন। **অরাবণ, অরাম বা**—পৃথিবীতে হয় রাম না হয় রাবণ একজন থাকিবেন, দুইজন নহে। **নিকষানন্দন**—নিকষার গর্ভজাত সন্তান রাবণ। **শূর**—শৌর্যশালী, বলবান। **দুন্দুভি**—ঢাক। **জীমূতমন্দ্র**—মেঘের গর্জন। **ভৈরব রবে**—ভীষণ শব্দে। **কর্ব্বুরবৃন্দ**—রাক্ষসসমূহ। **বারী**—গজগৃহ। **বারণযূথ**—হস্তীদল। **মন্দুরা**—অশ্বালয়। **বাজিরাজী** অশ্বসমূহ। **বক্রগ্রীব**—বাঁকা ঘাড়। **মুখস**—লাগাম। **রড়**—দৌড়, ছুট। **স্বর্ণচূড়, বিভায় পূরিয়া পুরী**—সুবর্ণময় চূড়াবিশিষ্ট রথ বাহির হইল, সেই সুবর্ণময় রথচূড়ার দীপ্তিতে লঙ্কাপুরী দীপ্ত হইয়া উঠিল। **ব্রজ**—সমূদয়। **কনক শিরস্ক**—স্বর্ণময় পাগড়ি। **ভাস্বর পিধানে**—উজ্জ্বল আবরণে। **অসিবর**—তরবারি। **চর্ম্ম**—ঢাল। **আয়সী**—লৌহ আবরণ। **আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে ইত্যাদি**—নিষাদী বা হস্তীচালককে দেখাইতেছিল মেঘপৃষ্ঠারোহী ইন্দ্রের ন্যায়। হস্তীর দেহবর্ণ মেঘের ন্যায়। **বজ্রপাণি**—ইন্দ্র। **সাদী**—অশ্বারোহী। **অশ্বিনী-কুমার**—উত্তর কুরুবর্ষে সূর্যের ঔরসে অশ্বিনীরূপা সূর্যপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে আশ্বিন ও রেবন্ত নামে দুই যমজ পুত্র জন্মে। এখানে অশ্বারোহী সৈনিককে অশ্বিনীকুমারের সহিত তুলনা

ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়বূহ হ্রেষিল উল্লাসে, ৪৪০
গরজিল গজ শঙ্খ নাদিল ভৈরবে;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্‌ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে!

টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে;—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী চাহিলা
চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি ৪৫০
মধুস্বরে;—"কি কারণে, কহ, লো
স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?

করা হইয়াছে। **ভিন্দিপাল**—ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। **বিশ্বনাশী পরশু**—পরশু অর্থ কুঠারজাতীয় অস্ত্র। এই অস্ত্রের দ্বারা পরশুরাম ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। পরশুর সহিত 'বিশ্বনাশী' বিশেষণ সংযুক্ত হওয়ায় এই পৌরাণিক অনুষঙ্গ ফুটিয়াছে। **উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে ইত্যাদি**—রাবণের বিপুল বাহিনী নানা ধরনের অস্ত্র লইয়া বাহির হইতেছে, তাহাদের অস্ত্রের দীপ্তি আকাশকে আলোকিত করিয়া তুলিল। দাবানলের আলোর সহিত অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্ছুরিত আলোকের তুলনা করা হইয়াছে। **রক্ষঃকুলধ্বজ**—রাক্ষস-বংশের পতাকা। **কেতন**—পতাকা। **বিস্তারিয়া পাখা ইত্যাদি**—বাতাসে উড্ডীন বিস্তারিত পতাকা দেখিয়া মনে হইল যেন গরুড় পাখা মেলিয়া উড়িতেছে। **অম্বরে**—আকাশে। **হয়বূহ**—অশ্বসমূহ। **হ্রেষিল**—হ্রেষা অর্থ অশ্বের ডাক। অশ্ব ডাকিয়া উঠিল। **নাদিল**—শব্দ করিল। **ভৈরবে**—ভীষণভাবে। **কোদণ্ড**—ধনু।

[৪৪৪—৪৮২] **বারীশ**—সমুদ্র। **বারুণী**—বরুণ দেবতার স্ত্রী বরুণানী, এই শব্দটি ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া কবি 'বারুণী' শব্দ গঠন করিয়াছেন। একটি পত্রে এই প্রসঙ্গে মধুসূদন লিখিয়াছেন, "The name is 'বরুণানী', but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী"। **আরাব**—রব, ধ্বনি। **জলেশ**—বরুণ। **পাশী**—পাশ অস্ত্রধারী অর্থাৎ বরুণ। এখানে দুটি শব্দেরই

দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে; কারাগারে রোধিতে
সবারে। ৪৬০
হাসিয়া কহিলা দেব,—'অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা';—তখনি,
স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে
কেন আজি
আইলা পবন মোরে দিতেএ যাতনা?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে; কিন্তু
ঝড়াকারে ৪৭০
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ;—'সত্য, লো
স্বজনি,

অর্থ বরুণ। একটি শব্দকে বিশেষ্য, অপরটিকে বিশেষণ ধরিয়া লইতে হইবে। বারুণী-মুরলার এই কথোপকথনের অংশটি সম্পূর্ণ ই মধুসূদনের কল্পনার সৃষ্টি। রামায়ণে এরূপ কোনো প্রসঙ্গ নাই। লঙ্কায় রাবণ যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। মেঘনাদ আছেন লঙ্কার বাহিরে প্রমোদ উদ্যানে। লঙ্কার সংবাদ মেঘনাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার একটা উপায় সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গ যোজিত হইয়াছে। কাব্যকাহিনীর প্রয়োজনে মেঘনাদকে লঙ্কায় ফিরাইয়া আনা প্রয়োজন। বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গটি রচনায় কবি পাশ্চাত্ত্য কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। মিল্টনের *Comus* কাব্যে নদীর অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীচরিত্র আছে নাম সাব্রিনা। সাব্রিনা ও তাঁহার সখী লিজিয়ার আদর্শেই মধুসূদন বারুণী এবং মুরলা চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন মনে হয়। পরবর্তী অংশ সমুদ্রের সহিত বায়ুদলের যুদ্ধ গ্রীক পুরাণে বর্ণিত Aeolus and Winds-এর কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। ভবভূতির উত্তররামচরিত-এর তৃতীয় অঙ্কে দুটি নদীর কথোপকথন বৃত্তান্ত আছে। নদী দুটির নাম তমসা এবং মুরলা। মধুসূদন হয়তো সেখান হইতে মুরলা নামটি গ্রহণ করিয়াছেন। **লাঘবিতে**—লাঘব করিতে। নামধাতু। **সত্য, লো স্বজনি ইত্যাদি**—কৌশলে কবি এখানে একটি ঘটনাপর্যায় সূচনা

বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে, ৪৮০
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুমরাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজি যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—
হীনতেজাঃ ৫০০
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা
পূর্ণ শশী-তেজে!
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা

করিতেছেন। বারুণীর কৌতূহলের জন্যই মুরলাকে রাজলক্ষ্মীর নিকট যাইতে হইবে। **আঁধারি জলধিগৃহ**—দুর্বাসার শাপে স্বর্গ লক্ষ্মীহীন হয়। লক্ষ্মী সমুদ্রে রহিলেন। সমুদ্র মন্থনে উঠিয়া আবার নিজ আলয়ে যান। এখানে লক্ষ্মীকে বর্তমানে লঙ্কায় অধিষ্ঠিতা করা হইয়াছে।

[৪৮৩—৫০৮] **সফরী**—পুঁটিমাছ। **রজঃকান্তি-ছটা-বিভ্রম বিভাবসুরে**—সদ্য জল হইতে উত্থিত সফরীর দেহকান্তি দেখিলে মনে হয় তাহার শরীর রৌপ্য দিয়া গড়া। বিভাবসুকে (বিভাবসু = সূর্য) নিজ অঙ্গকান্তি দেখাইবার জন্য সফরী যেন জলত্যাগ করিয়া উঠিল। **উতরিলা**—উত্তীর্ণ হইল। **ধনদের হৈমাগার**—কুবেরের স্বর্ণপুরী। **অগুরু**—পীত সুগন্ধ কাষ্ঠবিশেষ। **স্বর্ণদীপাবলী দীপিছে ইত্যাদি**—দীপের শিখা লক্ষ্মীর রূপের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে যেমন ম্লান হয় জোনাকির (খদ্যোতিকা = জোনাকি) দীপ্তি পূর্ণচন্দ্রের আলোয়। **বসেন যেমতি……বিন্যাসিয়া কপোল**—লক্ষ্মী মুখ

করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে ;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে ?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা ; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে ৫১০
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা।
"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো
মুরলে,
পতি তব ? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম ? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা
ভুলিতে ?
রমার আশার বাস হরির উরসে ;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে।
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী ?" উত্তরিলা মুরলা
রূপসী ;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সখি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা
পা দুখানি ;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা
কমলা, ৫৩০
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না ;—"হায় লো
স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-
আঘাতে !
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী

ঘুরাইয়া বসিয়া আছেন। দেখিয়া মনে হইতেছে বাঙলার দুর্গোৎসবের আজ যেন বিজয়াদশমী। লঙ্কাপুরীতে বিপর্যয় ঘটিতেছে, লক্ষ্মী এ পুরী ত্যাগ করিয়া যাইবেন। আসন্ন বিদায়ের ব্যঞ্জনার জন্য বিজয়াদশমীর দুর্গাপ্রতিমার সহিত বিষণ্ণ লক্ষ্মীর উপমা দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্মী হাতের উপর কপোল (গণ্ডদেশ, গাল) বিন্যাস করিয়া বা রাখিয়া আছেন।

[৫০৯—৫৭৪] **রমা**—লক্ষ্মী। **রমার আশার বাস...স্নেহৌষধগুণে**—দুর্বাসার শাপে স্বর্গ লক্ষ্মীহীন হয়। লক্ষ্মী এই সময়ে সমুদ্রে ছিলেন। এই সময়ের কথা বলিতেছেন। হরির সান্নিধ্যে বঞ্চিত হইয়া লক্ষ্মী যে জীবন ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন সে শুধু সখী বারুণীর স্নেহেই সম্ভব হইয়াছিল। **বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না**—বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্নাস্বরূপা যিনি অর্থাৎ লক্ষ্মী। **যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে**—যাদঃপতি—সাগর। রোধ—

ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী।"
সুধিলা মুরলা;—"কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ, ৫৫০
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকুল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশকটিদেশে।
দেউলদুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে ৫৬০
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্বণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে,
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল-সঙ্গে করি,

তট। চল—চঞ্চল। ঊর্মি—তরঙ্গ। সমুদ্রের তটদেশ যেমন চঞ্চল তরঙ্গের আঘাতে নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় রাবণ তেমনি দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, হীনবল হইতেছে। **প্রমদা-কুল-রোদন**—যুদ্ধে নিহত রাক্ষসবীরদের পত্নীগণের রোদন। **কাঞ্চী**—মেখলা বা কটিভূষণ। **দুকুল**—পট্টবস্ত্র। **কাঞ্চী**—কটিভূষণ। **চক্রনেমি**—চক্রের নেমি বা পরিধি। **দন্তী**—হস্তী। **আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা**—যম যেরূপ কালদণ্ড আস্ফালন করেন, হাতিগুলি সেইরূপ তাহাদের শুঁড় আস্ফালন করিতেছে। **নিক্বণ**—যন্ত্রধ্বনি। **কুসুম-আসার**—পুষ্পবৃষ্টি। **ত্রিদিব-বিভব**—স্বর্গপুরীর ঐশ্বর্য। **বাসব আপনি, স্বরীশ্বর**—স্বর্গের (স্বর—স্বর্গ) অধিপতি ইন্দ্র।

প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে ?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না ;—
"হায়, সখী, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী !
মহারথীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি !
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড় রথে, ৫৮০
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃদল-পতি,
প্রক্ষেড়নধারী বীর, দুর্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি !
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি ! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন ! অন্যান্য যত কত আর কব ?
শতশত হেন যোধ হত এ সমরে, ৫৯০
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী ; "কহ, দেবীশ্বরী
কি কারণে নাহি হেরী মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষবিগ্রহে ?
হত কি সে বলী, সতি, একাল সমরে ?"

[৫৭৫—৬১২] **মহারথীকুল ইন্দ্র**—ইন্দ্র এখানে শ্রেষ্ঠার্থবাচক। মহারথীদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ ছিল। অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী যে নিপুণ যোদ্ধা একাই দশ হাজার ধনুকের সহিত যুঝিতে পারেন তিনিই মহারথী। এখানে কুম্ভকর্ণ বীরবাহু প্রভৃতি যুদ্ধে পতিত বীরদের কথা বলা হইতেছে। **বিরূপাক্ষ, কালনেমি, তালজঙ্ঘা, প্রমত্ত**—ইহারা রাক্ষসবীর। রাবণের নায়কত্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়াছে। **প্রক্ষেড়ন**—লৌহনির্মিত ধনু। **রিপুকুল-কাল**—শত্রুদের যমস্বরূপ। **ভিন্দিপালপাণি**—ভিন্দিপাল এইরূপ ক্ষেপণাস্ত্র। ভিন্দিপাল হাতে রহিয়াছে যাহার। **গদাধর যথা মুরারি**—তালজঙ্ঘার বিশেষণ, তাহাকে দেখিতে গদাধারী বিষ্ণুর মতো। **বৈশ্বানর**—অগ্নি। রাজলক্ষ্মী সম্মুখবর্তী বীরদের পরিচয় দিয়া কহিতেছেন, এইরূপ আরও শত শত বীর ছিল তাহারা সকলেই রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে। বিশাল বৃক্ষশ্রেণী যেমন দাবানলে শেষ হইয়া যায় লঙ্কার বীরকুলও সেইরূপ বিনষ্ট হইয়াছে। **নাহি হেরি মেঘনাদ রথী**—এ কাব্যের সূচনা হইতে এ পর্যন্ত মুখ্যত রাবণ এবং গৌণত লঙ্কার অন্যান্য বীরদের কথাই বলা হইয়াছে, মেঘনাদের কথা এই প্রথম উল্লেখ করা হইল। মেঘনাদ লঙ্কার বাহিরে প্রমোদকুঞ্জে আছেন। তাহাকে লঙ্কার সংবাদ দিয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য

উত্তর করিলা রমা
সুচারুহাসিনী ;—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
যুবরাজ, নাহি জানি হত
আজি রণে ৬০০
বীরবাহু ; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও
চলি, সখি,
প্রবাল আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে!
উতরি জলধি কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল অম্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃকুল-
লক্ষ্মী, দূরে ৬২০
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কতক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড় ; চারিদিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্ম্মরিছে পাতা ;
বহিছে বাসন্তানিল ; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে

রাজলক্ষ্মী ছদ্মবেশে যাত্রা করিলেন। **সমলা যথা কর্দ্দম উদ্গমে**—লঙ্কা এখন কর্দমাক্ত জলের মতো হইয়াছে। রাবণের পাপেই লঙ্কার এই দশা। এখানে লক্ষ্মীর অবস্থান আর সম্ভব নয়। **প্রাক্তনের**—অদৃষ্টের।

[৬১৩—৬৫৩] **শিখণ্ডিনী**—ময়ূরী। **আখণ্ডল**—ধনু। **বিবিধ-রতন-কান্তি ইত্যাদি**—ইন্দ্রধনু। (আখণ্ডল=ইন্দ্র) যেমন নানাপ্রকার রত্ন-আভা লক্ষিত হয় সেইরূপ আভায়। **হেথা কেশব-বাসনা পদ্মাক্ষী**—লঙ্কায় লক্ষ্মী মেঘনাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। **বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী**—ইন্দ্রপুরীর মতো মেঘনাদের প্রমোদ ভবন। **অলিন্দ**—দ্বারের সম্মুখবর্তী বারান্দা।

ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে
রত্নরাজী, তূণে মণিময় ফণী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর ৬৪০
আয়ত-লোচন শর। নবীন যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে
বিশাল নিতম্ববিম্বে; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী;
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ
উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কিম্বা, রে
যমুনে, ৬৫০
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে!
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বাসনা।

ভীমরূপী বামাবৃন্দ—তৃতীয় সর্গে প্রমীলার নারীবাহিনীর বর্ণনা আছে। প্রমোদভবন প্রমীলার অধিকারে। এখানে নারীরক্ষীরাই প্রাসাদে প্রহরীর কাজ করে। **শরাসন**—ধনু। **নিষঙ্গ** তূণ। **তূণে শর মণিময় ফণী**—মণির দীপ্তিতে দীপ্তিমান সর্পের ন্যায় তীরে তূণপূর্ণ। **কবচ**—বর্ম। **রবি-কর-জাল যথা ইত্যাদি**—এই নারী-প্রহরীদের উচ্চ স্তনযুগলের উপরে বর্ম যেন পদ্মের উপরে রবির কিরণজালের মতো শোভা পাইতেছে। **কিন্তু খরতর আয়ত-লোচন শর**—তাহাদের তূণে তীক্ষ্ণশর, কিন্তু এই সুন্দরীদের আয়ত-লোচনের কটাক্ষ আরও তীক্ষ্ণ। **কাঞ্চী**—ধাতুনির্মিত কটিবন্ধ, মেখলা। **শিঞ্জিত**—অলংকার হইতে উত্থিত ধ্বনি। **সপ্তস্বরা**—কাংস্য প্রভৃতি ধাতুময় সাতটি পাত্রে নির্দিষ্টমাত্রা অনুসারে জল পূর্ণ করিয়া প্রান্তে কাঠির আঘাত দ্বারা বাজাইবার বাদ্যযন্ত্র; জলতরঙ্গ। **রজনীনাথ...লয়ে**—মেঘনাদ প্রমদাবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া বিহার করিতেছেন। দক্ষের কন্যা সাতাশটি নক্ষত্র, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি। তাহাদের লইয়া রজনীনাথ (=চন্দ্র) যেমন বিহার করেন। **যমুনে, ভানুসুতে**—যমুনা, সূর্যের কন্যা। সূর্যের দুই সন্তান। পুত্র যম, কন্যা যমুনা। যমুনাকূলে রাখালরূপী কৃষ্ণ গোপবধূসহ বিহার করেন। ইন্দ্রজিৎ চন্দ্রের মতো, কৃষ্ণের মতো বিহার করিতেছিলেন। এখানে একটি উপমেয় মেঘনাদের দুইটি উপমান—চন্দ্র ও কৃষ্ণ, সুতরাং ইহাকে মালোপমার দৃষ্টান্ত বলা যায়।

কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।" ৬৬০
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলি!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু ৬৭০
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান; এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি।'
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইয়া কনক-বলয় ৬৮০
দূরে; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে

[৬৫৪—৬৭৮] **যুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা**—হাতে লাঠি, পরিধানে সাদা কাপড়। বৃদ্ধ বিধবার মূর্তি। লক্ষ্মী মেঘনাদের ধাত্রীর এই ছদ্মবেশে মেঘনাদকে লঙ্কার সংবাদ দিতে আসিয়াছেন। **অম্বুরাশি-সুতা**—সমুদ্রমন্থনে উত্থিতা লক্ষ্মীদেবীকে এখানে সমুদ্র (অম্বুরাশি = সমুদ্র) কন্যা বলা হইয়াছে। **নিশা-রণে সংহারিনু আমি ইত্যাদি**—বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড ৭৩ সর্গে বর্ণিত আছে দেবান্তক, ত্রিশিরা, অতিকায় প্রভৃতি বীরদের মৃত্যুর পরে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যান। নিকুম্ভিলা যজ্ঞান্তে অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে থাকেন। এই অদৃশ্য যোদ্ধাকে পরাস্ত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া রামচন্দ্র বিনা প্রতিরোধে ইন্দ্রজিতের বাণ-বর্ষণ সহ্য করাই স্থির করেন। রামলক্ষ্মণ হর্ষরোষ ত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিলেন। অস্ত্রজালে অভিভূত রামলক্ষ্মণের এই দশায় হৃষ্টচিত্তে জয়ী ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট গিয়া বিজয়সংবাদ নিবেদন করিলেন। এখানে সেই যুদ্ধের কথাই বলা হইয়াছে।

[৬৭৯—৭১৩] **ছিঁড়িলা কুসুমদাম**—প্রমোদ-উদ্যানের সামান্য বর্ণনা পূর্বে পাওয়া গিয়াছে। ইহার অবশিষ্ট বর্ণনা তৃতীয় সর্গে বিরহিণী প্রমীলার প্রসঙ্গে মিলিবে। এই প্রমোদ-উদ্যানের কল্পনা কবি Tasso বিরচিত

আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে ৬৯০
মহাসুর; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্রসহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী; "কোথা, প্রাণসখে, ৭০০
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?

Jerusalam Delivered কাব্যের Armida's Paradise হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে রম্য বনরাজিতে বয়স্তবায়ু প্রবাহিত। Rinaldo সংগ্রাম ভুলিয়া সেখানে আর্মিডার প্রেমে আবদ্ধ রহিয়াছে। ওই কাব্যে যুদ্ধের জন্য প্রমোদ-উদ্যান হইতে Rinaldo-কে ফিরাইয়া আনিয়াছে Charles ও Ubaldo। এখানে বৃদ্ধা ধাত্রীবেশিনী লক্ষ্মী সেই কাজ করিয়াছেন। Tasso কাব্যে Armida মায়াবিনী, এখানে প্রমীলা ইন্দ্রজিতের স্ত্রী। **সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ ·· মহাসুর**—হিমালয়কন্যা হৈমবতী বা পার্বতীর সুত অর্থাৎ পুত্র কার্তিকের তারকাসুর বধের সময়ে যেমন রণ-সাজে সজ্জিত হইয়াছিলেন, রথীবরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ সেইরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। **কিরীটী**—অর্জুন। **বৃহন্নলারূপী ···· শমীবৃক্ষমূলে**-পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময়ে অর্জুন ক্লীব বৃহন্নলার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। বিরাট রাজার গোগৃহে কৌরব কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বিরাট-পুত্র উত্তর গোগৃহে রক্ষার অগ্রসর হইলেন, তাহার সারথি হইল ছদ্মবেশী অর্জুন। উত্তর মূর্ছিত হইয়া পড়িলে মুহূর্তমধ্যে অর্জুন শমী-বৃক্ষমূলে লুকায়িত তাঁহার অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া যোদ্ধবেশ ধারণ করেন। বিরাট রাজ্যের প্রবেশমুখে শমীবৃক্ষে অর্জুন অস্ত্রগুলি গোপনে রাখিয়াছিলেন। প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় যেমন মুহূর্তে মধ্যে অর্জুন ক্লীবের ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া বীরবেশ ধারণ করিয়াছিলেন ইন্দ্রজিৎও সেরূপ কুসুমাভরণ ত্যাগ করিয়া রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। **হেমলতা আলিঙ্গয়ে ইত্যাদি**—

কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?" হাসি
উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"
উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িল মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি !
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি !
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে
মাতি ;—৭২০
বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ;
হ্রেষে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী ;
উড়িছে কৌশিক ধ্বজ ; উঠিছে
আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিলা কর্ব্বূরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা ; "হে রক্ষঃ-কুল-পতি,

স্বর্ণলতা যেমন তরুকে আলিঙ্গন করে প্রমীলা সেইরূপ ইন্দ্রজিৎকে বিদায়কালে আলিঙ্গন করিলেন। **হায়, নাথ, গহন ……পদাশ্রয়ে যূথনাথ**—করি, মাতঙ্গ, যূথনাথ এই তিনটি শব্দেরই অর্থ হস্তী। চলমান হস্তীর পদ যদি কোন লতা (ব্রততী = লতা) জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে থামিতে অনুনয় করে হস্তী হয়তো সে অনুরোধ রক্ষা করে না, কিন্তু লতাকে পায়ে স্থান দেয়, অর্থাৎ ছিন্ন লতা হাতির পায়ে জড়াইয়া থাকে। প্রমীলা একথা ইন্দ্রজিৎকে বলিতেছে। ইন্দ্রজিৎকে সে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তাই তাহার সঙ্গী হইতে চাহিতেছে।

[৭১৪—৭৪২] **হৈমপাখা বিস্তারিয়া…উজলি**—হিমালয় ও মেনকার জ্যেষ্ঠ সন্তান মৈনাক পর্বত। পৌরাণিক বিশ্বাস, পূর্বে পর্বতের পক্ষ ছিল। ইন্দ্রই পর্বতের পক্ষচ্ছেদ করেন। এখানে মেঘনাদের রথের উপমায় উড়ন্ত মৈনাকের উল্লেখ করা হইয়াছে। **পক্ষীন্দ্র**—গরুড়। **কৌশিকধ্বজ**—রেশমী কাপড়ে তৈরী পতাকা। **কাঞ্চন-কঞ্চুক**—সোনার সাঁজোয়া।

শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না
পারি! ৭৩০
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস: তুমি
রাক্ষস-কুল ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি। ৭৪০
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ
বাঁচে?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-
রিপু;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর এক বার পিতঃ,দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি
ঔষধে!" ৭৫০
কহিলা রাক্ষসপতি; "কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-
তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের
সাথে।" ৭৬০
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া হায় রতন-মুকুট,

[৭৪৩—৭৮৫] **অসুরারি রিপু**—অসুরদের অরি বা শত্রু ইন্দ্র, ইন্দ্রের রিপু বা শত্রু অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ। **মেঘবাহন**—ইন্দ্র। **এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে**—ইতিপূর্বে নিশাযুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ যখন রামলক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের পক্ষীয় সকলকে শরজালে অভিভূত করেন তখন হনুমান হিমালয় হইতে ওষধিশৃঙ্গ আনয়ন করে এবং শৃঙ্গজাত ওষধের ঘ্রাণে রাম-লক্ষ্মণ শল্যমুক্ত হন। এখানে সেই প্রসঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। **নিকুম্ভিলা যজ্ঞ**—লঙ্কার যজ্ঞ-স্থলের নাম নিকুম্ভিলা। বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনায় মনে হয় নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থল

আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি,
সতি
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টংকারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণি-গুণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে
অরিন্দম ৭৮০
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।”
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল
রাক্ষস;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।৭৮৪

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ

যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরে ছিল। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে প্রতিবার ইন্দ্রজিৎ তাঁহার ইষ্টদেবতা অগ্নির পূজা করিতেন। এই আভিচারিক কার্যবলে ইন্দ্রজিৎ অন্যের অদৃশ্য হইয়া শত্রুগণকে বধ করিতে পারিত। **গঙ্গোদক**—গঙ্গাজল। **বন্দী**—স্তুতি-পাঠক। **নয়নে তব ইত্যাদি**—বন্দীদের এই স্তুতিপাঠে লঙ্কাপুরীর দুর্দশা-গ্রস্ত ম্লানদশা এবং ইন্দ্রজিৎ সৈনাপত্যে বৃত হওয়ায় এই দশা হইতে আশু মুক্তি সম্ভাবনায় উল্লাস প্রকাশ পাইয়াছে। **কোদণ্ড টঙ্কারে......আখণ্ডল**—যাহার ধনুর টঙ্কার শুনিলে বৈজয়ন্তধাম বা ইন্দ্রপুরীতে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র (আখণ্ডল=ইন্দ্র) ভীত হন। **পশুপতি**—শিব। **পাশুপত**—শৈব অস্ত্র-বিশেষ। **আকাশ-দুহিতা**—আকাশ হইতে প্রতিধ্বনি আসে, তাই প্রতি-ধ্বনিকে আকাশদুহিতা বলা হইতেছে। **অরিন্দম**—শত্রুদমনকারী। **রক্ষঃ-কুল-কালি**—দেশদ্রোহী বিভীষণ রাক্ষস বংশের কলঙ্কস্বরূপ। **দণ্ডক অরণ্যচর**—দক্ষিণ ভারতের দণ্ডকারণ্য হইতে রামচন্দ্র বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো—মেঘনাদবধ কাব্যের প্রত্যেক সর্গের শেষে সংস্কৃতে ওই সর্গের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম সর্গের নাম অভিষেক। ইন্দ্রজিৎ সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন, ইহাই প্রথম সর্গের মুখ্য ঘটনা।

দ্বিতীয় সর্গের বিষয়-সংক্ষেপ

প্রথম সর্গের শেষে ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতি-পদে বরণের সময়ে রাবণ বলিয়াছে, "দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে ; প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।" অর্থাৎ, সন্ধ্যা সমাগত—এইরূপ কাল-নির্দেশ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সর্গের সূচনায় ওই সূত্র অনুসারেই বলা হইয়াছে 'অস্তে গেলা দিনমণি'। আগামী প্রভাতে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাহাকে পরাভূত করা অসম্ভব। সুতরাং এই রাত্রির মধ্যেই এমন কিছু উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন যাহাতে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ না পায়, তৎপূর্বেই নিহত হয়। তীব্র নাটকীয় একটি পরিস্থিতি এইভাবে সৃষ্টি করা হইল। এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়াছেন স্বর্গের দেবতারা। রাম-লক্ষ্মণের সাহায্যে ইন্দ্রজিৎ-নিধন করিতে পারিলে দেবকুল, বিশেষত দেবরাজ ইন্দ্রের সর্বক্ষণের আশঙ্কা দূর হয়।

সন্ধ্যাসমাগমে সমস্ত পৃথিবীর কর্মচাঞ্চল্য স্তিমিত হইয়া আসিল। গাভীবৃন্দ গোষ্ঠে ফিরিল। সন্ধ্যাতারাটি একটি রত্নের মতো ফুটিয়া উঠিল। ক্রমে চন্দ্র-তারকা শোভিত রাত্রির আবির্ভাব হইল। জীবকুল নিদ্রায় অভিভূত হইল।

স্বর্গেও এখন রাত্রি। দেবসভায় ইন্দ্র সিংহাসনে আসীন। তাঁহার বামে শচীদেবী। গীত-নৃত্যে মুখরিত প্রমোদসুখে মগ্ন দেবসভায় রাক্ষসকুলের রাজলক্ষ্মী আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন। ক্রমে লক্ষ্মী দেবসভায় আবির্ভাবের কারণ বিবৃত করিয়াছেন। বহুকাল তিনি রাবণের রাজপুরীতে আছেন। সেখানে যত্নের কিছু অভাব নাই। কিন্তু এতদিনে বিধি রাবণের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। কর্মদোষে পাপী রাবণ সবংশে ডুবিতে বসিয়াছে। লক্ষ্মী সেই পাপপুরীতে আর থাকিতে চান না, কিন্তু রাবণ যতদিন জীবিত আছে ততদিন থাকিতেই হইবে। লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধের সাম্প্রতিক ঘটনা, অর্থাৎ মেঘনাদকে সেনাপতি-পদে বরণের সংবাদ দিয়া লক্ষ্মী রামচন্দ্রের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে ইন্দ্রকে সতর্ক করিয়া দিলেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে রামচন্দ্রের পক্ষে চরম বিপদ ঘটিবে।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, রাবণের সর্বনাশসাধনের জন্য তাহার একমাত্র ভরসা

মেঘনাদকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই নিহত করিবার প্ররোচনা লক্ষ্মীর উক্তিতে খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যে দেবচরিত্রগুলির আচরণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ নীচতা দেখা যায়।

ইন্দ্র মেঘনাদকে যে ভয় পান একথা গোপন করেন নাই। তাহার সহিত সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সাহস ইন্দ্রের নাই। তাই মেঘনাদ নিধনের উপায় জানিবার জন্য মহাদেবের নিকট প্রার্থী হইবার প্রস্তাব করিলেন। লক্ষ্মী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। মহাদেবকে সম্মত করাইবার জন্য রাবণের পাপের ভারে বসুন্ধরার ক্লেশ, অনন্তনাগের ক্লান্তি এবং বিশেষভাবে বৈকুণ্ঠধাম ছাড়িয়া নিজের লঙ্কায় থাকিবার দুঃখের কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন। মহাদেবকে না পাইলে পার্বতীর নিকট যেন ইন্দ্র এই দুঃখের কথা নিবেদন করেন। লক্ষ্মী বিদায় নিলেন। মাতলি রথ প্রস্তুত করিল। শচীকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্র কৈলাস উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

রথ হইতে অবতরণ করিয়া ইন্দ্র এবং শচী পদব্রজে পার্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। যথাবিধি সম্মান প্রদর্শনের পর লঙ্কার সংবাদ নিবেদন করিলেন। ইন্দ্রজিৎ যে যুদ্ধে সেনাপতি, সে যুদ্ধে দেবতারা নিরুপায়। তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের সাহস অন্য দেবতা দূরে থাক, স্বয়ং ইন্দ্রেরও নাই। পার্বতী দয়া না করিলে, অর্থাৎ মহেশ্বরের নিকট হইতে মেঘনাদকে হত্যার কৌশল জানিয়া না দিলে রামচন্দ্রকে রক্ষা করিবার উপায় নাই।

রাবণ মহেশ্বরের উপাসক। মহেশ্বর তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। সুতরাং রাবণের অনিষ্টসাধন পার্বতী কিরূপে করিবেন ভাবিয়া পান না। পার্বতীর সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য ইন্দ্র রাবণের অন্যায় আচরণের বিবরণ দিলেন। সেই দুরাচার পিতৃসত্য রক্ষাহেতু বনবাসী রামচন্দ্রের পত্নীকে অপহরণ করিয়াছে। শক্তিপ্রমত্ত এই দুর্বৃত্ত দেবসমাজকে গ্রাহ্য করে না, ন্যায় নীতি পদদলিত করিয়া চলাই তাহার ধর্ম। বন্দিনী সীতার দুঃখের কথা পার্বতীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন শচীদেবী। কার্যোদ্ধারের জন্য শচীদেবী স্বামীর সহিত যোগ দিয়াছেন।

পার্বতীর উক্তিতে ইন্দ্রের অসূয়া এবং স্বামীর নিরাপত্তার জন্য ইন্দ্রজিৎ-নিধনে শচীর ব্যাকুলতার প্রতি কিঞ্চিৎ শ্লেষই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু পার্বতী একাজে নিতান্ত নিরুপায়। মহেশ্বর-আশ্রিত জনের অনিষ্টসাধন কাহারো সাধ্য নয়। বিশেষতঃ মহাদেব এখন যোগাসন নামক শৃঙ্গে যোগে মগ্ন

রহিয়াছেন। তাঁহার যোগ-ভঙ্গ করা দুঃসাধ্য। এ কথার পরেও ইন্দ্র পুনরায় অনুরোধ করিয়াছেন।

এমন সময় পার্বতীর কনকাসন টলিয়া উঠিল। তিনি অনুভব করিলেন, কোন ভক্ত বিপদে তাঁহাকে পূজা করিতেছে। বিজয়া সখী গণনা করিয়া জানাইল, রামচন্দ্র পার্বতীর পূজা করিতেছেন, পার্বতীর নিকট অভয় ভিক্ষা করিতেছেন। এতক্ষণ ইন্দ্রের অনুরোধে যাহা সম্ভব হয় নাই ভক্তের পূজায় তাহা সম্ভব হইল। পার্বতী যোগাসন শৃঙ্গে যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

পার্বতী কীভাবে, কীরূপে মহেশ্বরের মনোহরণ করিতে যাইবেন চিন্তা করিলেন। তিনি কাম-বধূ রতিকে স্মরণ করিলেন। রতি পরম যত্নে পার্বতীকে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিলেন। তখন আহ্বান করা হইল মদন দেবতাকে। পার্বতী মদন দেবতাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলে মদনের চিত্তে মহা আশঙ্কা দেখা দিল। একবার মহেশ্বরের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়া তাহাকে রোষানলে ভস্মীভূত হইতে হইয়াছিল। সেই দুঃখ-স্মৃতিই তাঁহার আশঙ্কার কারণ। পার্বতী মদনকে অভয় দিলেন। মহাদেবের ক্রোধ হইতে কিন্তু পার্বতী যে অসামান্য সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছেন, এইরূপে বাহির হইলে,—মদনের আশঙ্কা, জগতে ওই রূপমাধুরী অকল্পনীয় প্রমত্ততা জাগাইয়া তুলিবে। মদনের এই আশঙ্কার কথায় পার্বতী মায়া আবরণ সৃষ্টি করিয়া নিজের রূপরাশি আবৃত করিলেন। মেঘাবৃতা ঊষার মতো তিনি মদনের সঙ্গে যাত্রা করিলেন।

ভয়ঙ্কর যোগাসন শৃঙ্গে, উপস্থিত হইলে মদন মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে পুষ্পশর নিক্ষেপ করিলেন। যোগমগ্ন মহাদেবের দেহে চাঞ্চল্য দেখা দিল। ভীত মদন পার্বতীর বক্ষে আশ্রয় লইলেন। মহাদেব নয়ন মেলিয়াছেন দেখিয়া পার্বতী মায়া আবরণ ত্যাগ করিয়া ভুবনমোহিনী রূপ লইয়া পূর্ণ সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করিলেন। মুগ্ধ মহেশ্বর আদরে পার্বতীকে অজিন-আসনে বসাইলেন। চারিদিকে অকস্মাৎ বসন্ত-সমারোহ দেখা দিল। কামদেবতা মদনের প্রভাবে মহাদেব প্রেমামোদে প্রমত্ত হইলেন।

পার্বতী কেন আসিয়াছেন মহাদেবের তাহা অজ্ঞাত নহে। পার্বতী কিছু বলিবার পূর্বে তিনি নিজেই সব কথা বলিলেন। বলিলেন, রাবণের কথা মনে হইলে দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাঁহার শ্রেষ্ঠতম ভক্ত আজ সর্বাধিক দুঃখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু "নিজ কর্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।" কৃতকর্মের

ফল দেবতা বা মানব সকলকেই ভোগ করিতে হয়। সুতরাং রাবণ নিজের দোষেই বিনষ্ট হইবে; তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় নাই। মায়ার প্রসাদে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবে, ইন্দ্র যেন মায়াদেবীর সহিত যোগাযোগ করেন—কামদেবতাকে দিয়া এই সংবাদ পাঠাইতে নির্দেশ দিলেন।

মদন ফিরিয়া গেলেন। রতি এতক্ষণ স্বামীর জন্য মহা আশঙ্কায় দিন যাপন করিতেছিলেন। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়া কোনো বিপদ ঘটে নাই, নিরাপদে মদন ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে রতির আনন্দের সীমা রহিল না। রতিকে সঙ্গে লইয়া মদন ইন্দ্রের নিকট গেলেন এবং মহাদেব-প্রেরিত বার্তা নিবেদন করিলেন।

ইন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া মায়াদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। শিবের আদেশ জানাইলে মায়াদেবী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মেঘনাদবধের উপায় বলিলেন। তারকাসুর যখন স্বর্গ অধিকার করিয়াছিল তখন দেবতাদের পক্ষে কুমার কার্তিকেয় তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে কুমারকে স্বয়ং মহেশ্বর মহাতেজপূর্ণ নানা অস্ত্রে সজ্জিত করেন। কার্তিকেয়-ব্যবহৃত সেইসব অস্ত্র মায়াদেবী ইন্দ্রকে দেখাইলেন। এই অস্ত্র ভিন্ন মেঘনাদের নিধন সম্ভব নয়। কিন্তু এই অস্ত্র লাভ করিয়াও কোনো দেবতা বা মানব মেঘনাদকে ন্যায়যুদ্ধে বধ করিতে পারিবে না। লক্ষ্মণকে এইসব অস্ত্র প্রেরণ করা হোক। কিন্তু তাহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। মায়াদেবী স্বয়ং লক্ষ্মণের সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে সাহায্য করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে ইন্দ্র মহানন্দে অস্ত্রগুলি লইয়া বিদায় হইলেন। অতঃপর ইন্দ্র চিত্ররথকে দিয়া রামচন্দ্রের নিকট অস্ত্র এবং বার্তা প্রেরণ করিলেন। কী কৌশলে লক্ষ্মণ এই অস্ত্রের সাহায্যে মেঘনাদকে হত্যা করিবে তাহা মায়াদেবী জানাইয়া দিবেন—চিত্ররথ এই বার্তা এবং দিব্য অস্ত্র বহন করিয়া দূতরূপে লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। ইন্দ্রের ব্যবস্থায় প্রবল দুর্যোগ লঙ্কার আকাশ আবৃত করিল, তাহার অন্তরালে চিত্ররথ নিরাপদে রামচন্দ্রের শিবিরে উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব সমস্ত কথা জানাইলেন। এইভাবে রাত্রির অবসরে দেবতাদের ব্যাপক উদ্যোগে মেঘনাদবধের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। রামচন্দ্রের আশঙ্কা দূর হইয়াছে। চিত্ররথ কার্যসাধন করিয়া দেবলোকে ফিরিয়া গেলেন। আকাশ আবার মেঘমুক্ত হইল।

অস্ত্রলাভ নামক দ্বিতীয় সর্গের এইখানেই সমাপ্তি।

তৃতীয় সর্গের বিষয়-সংক্ষেপ

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুটি সর্গের ঘটনাকাল একই রাত্রি। মেঘনাদকে রাবণ সেনাপতি-পদে বরণ করিয়াছে যে সন্ধ্যায় তাহারই পরবর্তী রাত্রির পটভূমিতে তৃতীয় সর্গের ঘটনা সংঘটিত। প্রমোদ-কাননে প্রমীলার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়ে মেঘনাদ বলিয়াছিল, "ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে, রাঘবে।" তাহার পর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিয়াছে। মেঘনাদ এখনো লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসে নাই। প্রিয়বিরহিতা প্রমীলার কাতরতার বর্ণনায় তৃতীয় সর্গের সূচনা।

মেঘনাদের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উদ্বিগ্ন প্রমীলা আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। বিরহিণী রাধা যেমন বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে ক্রন্দন করিয়া ফিরিত—প্রমীলা সেইরূপ উদ্যানে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ঘর-বাহির করিতেছে। কখনো বা গৃহচূড়ায় উঠিয়া দূরে চাহিয়া দেখিতেছে। প্রমোদভবনে গীতবাদ্য নীরব হইয়াছে। সখীরাও প্রমীলার সহিত সমান দুঃখিত।

প্রমোদ-উদ্যানে রাত্রি হইল। আশঙ্কায় শিহরিত প্রমীলা সখী বাসন্তীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিয়াছে, এই তিমির রাত্রি যে কালসর্পের মতো দংশন করিবে। মেঘনাদ কোথায় গেলেন। এখনি আসিবেন বলিয়া গেলেন, তবু এত বিলম্ব কেন। বাসন্তী তাহাকে প্রবোধ দেয়। অচিরেই বীর মেঘনাদ রামচন্দ্রকে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন। তিনি ফিরিলে তাঁহাকে বরণের জন্য মালা গাঁথার জন্য দুই সখী পুষ্পকাননে গেল। আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিল। প্রমীলার চোখের জলে ফুলগুলি সিক্ত। সূর্যমুখী ফুলের নিকট গিয়া প্রমীলা বলিল, সূর্য-বিরহে এই রাত্রিকালে তাহারও প্রমীলারই মতো দশা। প্রমীলার জীবনের সূর্য যিনি সেই মেঘনাদ দূরে যাওয়ায় তাহার অন্তরও দুঃসহ বেদনায় আচ্ছন্ন। প্রভাতে সূর্য উঠিলে সূর্যমুখীর বিরহযন্ত্রণা দূর হইবে, কিন্তু প্রমীলা আর কি কখনো সুখের মুখ দেখিবে? ফুল তোলা হইল, সুন্দর মালা গাঁথা হইল। কিন্তু যাহাকে অঞ্জলি নিবেদনের জন্য এই আয়োজন সে কি আর ফিরিবে? ব্যাকুল প্রমীলা বাসন্তীর নিকট সকলে মিলিয়া লঙ্কায় যাইবার প্রস্তাব করিয়াছে। মধুসূদনের বর্ণনা অনুসারে মেঘনাদের প্রমোদ-উদ্যানে লঙ্কা-পুরীর বাহিরে কোনো স্থানে অবস্থিত। লঙ্কার চারিদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী। প্রমোদ-উদ্যান হইতে অবরুদ্ধ লঙ্কায় প্রবেশ তাই

দুঃসাধ্য। বাসন্তী এই কথাই প্রমীলাকে বলিয়াছে। এই বাধার কথা শুনিয়া প্রমীলা ভীত হয় নাই। তেজস্বী প্রমীলা বাসন্তীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, রক্ষ-কুল-বধূর পক্ষে, মেঘনাদের পত্নী এবং রাবণের পুত্রবধূর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই। ভিখারী রামচন্দ্রকে সে ভয় পায় না। বাধার কথাতেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা যেন কঠোর হইয়াছে। বাহুবলে অর্থাৎ প্রয়োজন হইলে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া লঙ্কায় প্রবেশের অভিপ্রায় প্রমীলা ঘোষণা করিল।

তাহার আহ্বানে প্রমোদ ভবনেব সকল নারী-সৈনিক প্রমীলার সহিত লঙ্কা-প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইল। চতুর্দিকে সমরসজ্জাব সাড়া পড়িয়া গেল। একশত চেড়ী অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রস্তুত। তাহাদের নায়িকা নৃ-মুণ্ড-মালিনী। প্রমীলাও মহাক্রোধে সমরসজ্জা করিতে গেল। প্রমীলা এবং বাহিনীর অঙ্গে যে অস্ত্রের কথা কবি বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সবই পুরুষ যোদ্ধাদের ব্যবহারের অস্ত্র। এইসব অস্ত্রের কথা এ কাব্যে বহুবার বহুস্থানে পাওয়া যায়। সমরসজ্জা শেষ করিয়া প্রমীলা বড়বা নাম্নী এক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিল এবং সখীদের আহ্বান করিল। সখীদের উদ্দেশ্যে বলিল, তাহার স্বামী লঙ্কা হইতে ফিরিতেছেন না কেন জানিবার জন্য রামচন্দ্রের সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতে হইবে। এ কার্যে মৃত্যুপণ। রণাঙ্গনে রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া প্রমীলা দেখিতে চায় তাহার কতো শক্তি আর রূপই বা কেমন। সূর্পণখা পঞ্চবটী বনে কী রূপ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল, প্রমীলা দেখিতে চায়। মত্ত হস্তিনী যেমন নলবন দলন করে সেইভাবে শত্রুদলনের জন্য বিদ্যুতোপম সুন্দরী সখীদের পুনরায় আহ্বান জানাইয়া সে অগ্রসর হইল।

কিছুক্ষণের মধ্যে নারী-বাহিনীসহ প্রমীলা লঙ্কার পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইল। শত চেড়ী শত শঙ্খে সমর ধ্বনি তুলিল, তাহাদের ধনুতে টংকার দিল। পশ্চিম দুয়ার রক্ষা করিতেছিল মহাবীর হনুমান। এই রাত্রে যুদ্ধোদ্যোগ দেখিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিল। আত্মপরিচয় ঘোষণা করিয়া কহিল, রামচন্দ্র-লক্ষ্মণ-বিভীষণ সকল বীর জাগ্রত প্রহরায় নিযুক্ত। এমন সময়ে কাহার মরণের সাধ হইয়াছে? তাহার ধারণা, মায়াবী রাক্ষসেরা নারীর ছদ্মবেশে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। প্রমীলার সেনানায়িকা নৃ-মুণ্ড-মালিনী হনুমানের প্রতি পরম উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ আর দেশদ্রোহী বিভীষণকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছে। প্রমীলার আবির্ভাব ঘোষণা করিয়াছে। হনুমান অগ্রসর হইয়া দেখিল সত্যই নারীসেনাদের মধ্যে অসামান্যা সুন্দরী প্রমীলা উপস্থিত।

পূর্বে যখন রামচন্দ্রের আদেশে সীতার অন্বেষণে সে লঙ্কায় আসিয়াছিল তখন রাবণের পুরীর নারীদের অনেককেই দেখিয়াছিল। কিন্তু এই প্রমীলার রূপের সহিত তাহাদের কাহারো তুলনা হয় না। বিস্মিত হনুমান সৌজন্য সহকারে প্রমীলার আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রামচন্দ্র বহু আয়াসে এই লঙ্কাপুরীতে আসিয়াছেন, রাবণের সহিত তাহার বিবাদ। কিন্তু পুরনারীদের প্রতি তো রামচন্দ্রের কোনো বিদ্বেষ নাই। প্রমীলার কী প্রার্থনা জানিতে পারিলে রামচন্দ্রকে সে জানাইবে।

প্রমীলা উত্তর দিল। প্রমীলার সে কথা হনুমানের কানে শুনাইল যেন বীণাধ্বনি। প্রমীলার উত্তরেও যথোচিত সৌজন্য প্রকাশ পাইয়াছে। সে বলিয়াছে, রামচন্দ্র তাহার স্বামীর শত্রু। স্বামী মেঘনাদ নিজ বাহুবলে ভুবন-বিজয়ী। সুতরাং তাহার শত্রুর সহিত বিবাদ করিবার উৎসাহ প্রমীলার নাই। হনুমান যদি নৃ-মুণ্ড-মালিনীকে দূতরূপে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া যায় তাহা হইলে সে-ই রামচন্দ্রকে প্রমীলার আগমনের হেতু জ্ঞাপন করিবে।

প্রমীলার অনুরোধ রক্ষিত হইল। শত্রুসৈন্যের মধ্য দিয়া হনুমানের সহিত নৃ-মুণ্ড-মালিনী রামচন্দ্রের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার রূপ দেখিয়া রামচন্দ্রের সেনাবৃন্দ বিস্মিত। লক্ষ্মণ-বিভীষণ আর অন্যান্য বীর পরিবৃত হইয়া রামচন্দ্র তখন ইন্দ্রপ্রেরিত দেবঅস্ত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, অস্ত্রের প্রশংসা করিতেছেন। (দ্বিতীয় সর্গের শেষে চিত্ররথ দেবঅস্ত্র রামচন্দ্রকে দিয়া বিদায় লইলেন এইরূপ বর্ণনা আছে। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উদ্দেশ্যে যাত্রার ঘটনাটি, অতএব, ইহার অব্যবহিত পরেই সংঘটিত। তখনো রামচন্দ্রের শিবিরে সকলে সদ্য-পাওয়া অস্ত্র লইয়া আলোচনা করিতেছিল)। এমন সময় বাহিরে অকস্মাৎ সৈন্যরা রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিভীষণ বাহিরে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, রাত্রিতেই কি উষা আবির্ভূত হইল? বিভীষণ-নৃ-মুণ্ড-মালিনীর অঙ্গদ্যুতিকেই উষার আলো মনে করিয়াছেন। সকলেই সেই ভীমারূপিণী দূতকে দেখিতে পাইলেন। রামচন্দ্র যেন কিঞ্চিৎ আতঙ্কের সহিতই বিভীষণের নিকট কী ঘটিতেছে জানিতে চাহিলেন। এমন সময়ে দূতী শিবিরে প্রবেশ করিয়া রামচন্দ্রকে প্রণাম করিল। তাহার বক্তব্য নিবেদন করিল। প্রমীলা লঙ্কায় প্রবেশ করিতে চায়। হয় তাহার পথ ছাড়িয়া দাও, নয়তো যুদ্ধ কর। রামচন্দ্রের বাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রমীলার নারী সৈনিকেরা অধীর হইয়া আছে, প্রমীলাই তাহাদের সংযত করিয়া রাখিয়াছে। দূতের

এইরূপ উক্তি শুনিয়া রামচন্দ্র সৌজন্যপূর্ণ উত্তর দিলেন। নির্বিবাদে তিনি প্রমীলাকে লঙ্কায় প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন এবং অপূর্ব পতিভক্তির জন্য প্রকাশ্যেই প্রমীলাকে আশীর্বাদ করিলেন।

দূতী বিদায় নিলে বিভীষণ রামচন্দ্রকে বাহিরে আসিয়া প্রমীলার বীরপনা দেখিতে আহ্বান করিলেন। এখানে রামচন্দ্রের একটি উক্তিতে চরম কাপুরুষতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রমীলার দূতীর ভয়ংকর রূপ দেখিয়া রামচন্দ্র যুদ্ধ করিতে চান নাই। ইহার পরে প্রমীলা তাহার বাহিনী লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতেছেন—এই দৃশ্যের সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে। রামচন্দ্র পরম বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখিয়া বিভীষণকে বলিলেন, এ যে স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। ত্রিভুবনে রামচন্দ্র এমন দৃশ্য কখনো দেখেন নাই। না কি চিত্ররথ যে বলিয়াছিলেন মায়াদেবী মেঘনাদবধের কৌশল জানাইতে আসিবেন—সেই মায়াদেবীই এমন বেশে লঙ্কায় অবতীর্ণ হইলেন? রামচন্দ্রের বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে বিভীষণ বলিয়াছেন, মায়াদেবী নহে, কালনেমি নামক দৈত্যের কন্যা মেঘনাদের পত্নী প্রমীলাই এমন-ভাবে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। মহাশক্তির অংশে এই অসামান্যা সুন্দরীর জন্ম। এমন শক্তিমতী না হইলে ইন্দ্রও যাহার বলে পরাভূত সেই মেঘনাদকে বশ করিবে কিরূপে! এই রূপসীর প্রেমে মেঘনাদ সম্মোহিত হইয়া থাকে বলিয়াই দেব-নর সুখে-শান্তিতে আছে। রামচন্দ্র ইন্দ্রজিতের শৌর্যের কথা অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করিলেন। কিন্তু এবার যে সিংহের সহিত সিংহী আসিয়া মিলিত হওয়ার মত মেঘনাদের সহিত প্রমীলা মিলিত হইল। রামচন্দ্রের পক্ষে এ আর এক নতুন বিপদ। তিনি বিভীষণের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন। লক্ষণ রামচন্দ্রকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন, স্বয়ং ইন্দ্র যাহাদের সহায় তাহাদের ভয়ের আর কী কারণ থাকিতে পারে? আগামীকাল অবশ্যই মেঘনাদ নিহত হইবে। অধর্মচারী রাবণের পাপেই মেঘনাদকে মরিতে হইবে। চিত্ররথ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার অন্যথা হইতে পারে না। বিভীষণ বলিলেন, লক্ষ্মণের কথাই ঠিক। শেষ পর্যন্ত ধর্মের জয় হইবেই। তবুও প্রমীলা লঙ্কাপুরীতে আসিয়াছে, সুতরাং সতর্ক থাকা উচিত। রামচন্দ্র প্রহরার ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা, সকল বীর জাগ্রত আছে কিনা ঘুরিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাত্রি যদি নিরাপদে অতিবাহিত হয়, আগামীকাল সকালে হয়তো মেঘনাদকে হত্যা করা সম্ভব হইবে।

এদিকে প্রমীলা বাহিনীসহ লঙ্কার স্বর্ণময় দ্বারদেশে উপনীত হইল।

দ্বাররক্ষীরা শত্রুসমাগম হইয়াছে ভাবিয়া আক্রমণ করিতে আসিল। নৃ-মুণ্ড-মালিনী তাহাদের উদ্দেশ্যে আত্মপরিচয় দিল। প্রহরীরা আশ্বস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিল, প্রমীলাসুন্দরী লঙ্কায় প্রবেশ করিল। সকলের অভিনন্দন কুড়াইয়া সে আনন্দে মেঘনাদের আলয়ে উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎ কৌতুক করিয়া প্রমীলাকে বলিল, এ কি রক্তবীজকে নিহত করিয়া পার্বতী আবির্ভূতা হইলেন? প্রমীলা উত্তর দিয়াছে, সে বিশ্বজয় করিতে পারে কিন্তু মদনকে জয় করিতে অক্ষম। প্রেমের আকর্ষণেই এমনভাবে আসিতে হইয়াছে। এইরূপ কথোপ-কথনের পর প্রমীলা বেশ পরিবর্তন করিল। আবার আদরিণী বধূর রূপ ধারণ করিল। মেঘনাদের সহিত সিংহাসনে গিয়া বসিলে নৃত্যগীতে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

বিভীষণ আর লক্ষ্মণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রহরার ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করিলেন। দেখা গেল সকলেই কর্তব্যনিষ্ঠভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিতেছে। উত্তরদ্বারে সুগ্রীব, পূর্বদ্বারে নীল, দক্ষিণদ্বারে অঙ্গদ সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত রহিয়াছে। হৃষ্টচিত্তে দুইজনে রামচন্দ্রের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

কৈলাসে উমা বিজয়াকে সম্বোধন করিয়া প্রমীলা এবং প্রমীলার নারীবাহিনীর প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বলিলেন, সত্যযুগে দানবনিধনের জন্য তিনি নিজে এইরূপ অপূর্ব সমরসজ্জা করিয়াছিলেন। বিজয়াও বলিলেন, জগতে প্রমীলার মতো রূপ আর কাহার? কিন্তু তেজস্বিনী প্রমীলা মেঘনাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এখন মেঘনাদ-নিধন কি আর সহজে হইবে? রামচন্দ্রকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব পার্বতীর, তাহা বিজয়া স্মরণ করাইয়া দিলেন। পার্বতী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন, তাঁহারই অংশে প্রমীলার জন্ম। আগামীকাল তিনি প্রমীলার তেজ হরণ করিবেন। লক্ষ্মণের পক্ষে কোনো বিপদের কারণ ঘটিবে না। অচিরেই মেঘনাদ প্রমীলা-সহ স্বর্গে আসিবে (মৃত্যুর পরে)। তখন প্রমীলাকে যত্নে তুষ্ট করিলেই চলিবে।

এইরূপ কথোপকথনের পরে উমা স্ব-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কৈলাসে নিদ্রা নামিল। শিব-ললাটের চন্দ্রের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় কৈলাসধাম দীপ্তি পাইতে লাগিল।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে, মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে, ১০

[১—১৬] **প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী**—প্রথম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে, বীরবাহুর মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ রাবণ যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করিতেছে লঙ্কার রাজলক্ষ্মী মেঘনাদ-ধাত্রী প্রভাষার রূপ ধারণ করিয়া এই সংবাদ মেঘনাদকে জানান। মেঘনাদ তখন প্রমীলার সহিত প্রমোদকাননে ছিলেন। মধুসূদনের বর্ণনা অনুসারে এই প্রমোদকানন লঙ্কাপুরীর বাহিরে কোনো স্থানে অবস্থিত। এখান হইতে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিতে হইলে রামচন্দ্রের বাহিনী পুরীর চারিদিকে যে ব্যূহ রচনা করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। প্রমোদ-উদ্যানে মেঘনাদ এই সংবাদ পাইয়া মহাক্ষোভে ফুলসাজ ছিন্ন করিয়া অস্ত্র তুলিয়া লন এবং প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়া লঙ্কায় আসেন। বিদায়কালে মেঘনাদ প্রমীলাকে বলিয়াছিলেন, "ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে, রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।" মেঘনাদের বিদায় গ্রহণের পর খুব বেশি সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে এমন নয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি হইয়াছে। এই সামান্য সময়ের মধ্যেই মেঘনাদ রামচন্দ্রকে বধ করিয়া জয়ীরূপে ফিরিয়া আসিতে পারেন, প্রমীলার এইরূপ ধারণায় মেঘনাদের শৌর্যের প্রতি অপরিসীম অবস্থাই প্রকাশ পায়। **দানব-নন্দিনী**—এই কাব্যে প্রমীলা কালনেমি নামক দৈত্যের কন্যারূপে বর্ণিত। **ব্রজবালা……অধরে মুরলী**—প্রমীলা প্রমোদকাননে কাঁদিয়া ফিরিতেছেন। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া গেলে ব্রজবালা অর্থাৎ রাধা যেমন পীতবসনধারী, মুরলীধারী কৃষ্ণকে কদম্বমূলে না দেখিয়া বিরহদুঃখ বোধ করিয়াছিলেন, মেঘনাদের বিরহে প্রমীলার দুঃখও সেইরূপ। **কভু বা মন্দিরে……যেমতি বিবশা**—মেঘনাদ গৃহে নাই তাই শূন্যগৃহ। সঙ্গী নীড়ে না থাকিলে কপোতী যেমন একবার নীড়ে প্রবেশ করে

অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে !—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে ?
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী ?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-
উদ্যানে।
সিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে
লাগিলা ;—২০

"ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি ! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে ?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না
পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,—"কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি ?৩০
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমান্তিনি !

আবার পরক্ষণেই বাহিরে আসে, প্রমীলাও সেইরূপ ঘর বাহির করিতেছেন। **মন্দিরা**—ছোট খত্তাল। **কে না জানে····· তাপে বনস্থলী**—মধু অর্থাৎ বসন্ত বিদায় লইলে সমস্ত বনস্থলী বিরহ-তাপে (আসলে বসন্তের পরে আসে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের তাপে) যখন দগ্ধ হয় তখন ফুলগুলিও শুষ্ক হইয়া থাকে। সেইরূপ মেঘনাদ-বিরহে প্রমীলা দুঃখিত হওয়ায় তাহার সখীরাও নিরানন্দ হইয়া রহিয়াছে।

[১৭—৪৭] **তিমির যামিনী**—দ্বিতীয় সর্গ আর তৃতীয় সর্গের ঘটনাকালে একই রাত্রি। চিত্ররথ রামচন্দ্রের শিবিরে ইন্দ্রপ্রেরিত দেব-অস্ত্র দিয়া ফিরিয়া গেলে ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল ; সেখানে মধুসূদন লিখিয়াছেন,

"হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনক লঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময় ;"

অর্থাৎ এই রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। অথচ প্রমীলা তিমির যামিনী বলিতেছে। তিমির কথাটি সম্ভবত এখানে দুঃখের দ্যোতক। না হইলে বর্ণনায় অসঙ্গতি আছে বলিতে হয়। **কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে ইত্যাদি**—শূন্যগৃহে বিরহ-যন্ত্রণাময় এই রাত্রি যেন সর্প-দংশনের জ্বালা সঞ্চার করিবে। **ব্যাজ**—বিলম্ব।

ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তারে আঁটিবে
বিগ্রহে? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায়
কৌতুকে?"
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা
কাননে ৪০
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে; গাইছে ভ্রমরী;
কুহরিছে পিকবর; কুসুম ফুটিছে;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে
কহিতে?
কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী, ৫০
মলিনা-বদনা, মরি, মিহির বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে;—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর
নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে
যাতনা!
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে!

সুরাসুর-শরে অভেদ্য শরীর যাঁর—দেবতা বা দানব কেহ ইন্দ্রজিতের কোনো ক্ষতি করিতে পারে না। কাহারো শর তাহার শরীর বিদ্ধ করিতে পারে না। **বিগ্রহে**—সংগ্রামে। **চিকণিয়া**—কারুকার্য করিয়া। **বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমিত বিজয়-পতাকা**—বিজয়ীর রথচূড়ায় বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দেওয়ার মতো বিজয়ী ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে মালা দুলাইয়া দিও। **দাম**—মালা। **কৌমুদী**—জ্যোৎস্না।

[৪৭—৬৮] **প্রমীলার আঁখি মুক্তিল শিশির-নীরে**—দুই সখী পুষ্প চয়ন করিল। প্রমীলার চোখের জল মুক্তার মতো সেই ফুলগুলির উপরে ঝ'রয়া পড়িয়াছে। ফুলগুলি মনে হইতেছে যেন শিশিরের জলে ভেজা। **মলিন বদনা ..... বিরহে**—সূর্যমুখী ফুল সকালবেলার আলোতে ফোটে এবং সর্বদা সূর্যের দিকে মুখ করিয়া থাকে। রাত্রিতে এই ফুল মলিন হইয়া যায়। সূর্যের বিরহেই যেন এই মলিনতা। **তোর লো যে দশা ইত্যাদি**—সূর্যের বিরহে সূর্যমুখীর যে দশা, মেঘনাদের বিরহে প্রমীলার অবস্থাও সেইরূপ। মেঘনাদ প্রমীলার

যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি!
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই)
প্রাণেশ্বরে ?" ৬০

অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী, "এই ত তুলিনু
ফুল-রাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে!
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।"

কহিল বাসন্তী সখী ; "কেমনে
পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলজ্ঘ্য
সাগর-৭০
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে ?
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"

রুষিলা দানব বালা প্রমীলা রূপসী!
"কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার
গতি ?
দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী
রাঘবে ? ৮০
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?"
এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ মন্দিরে।

যথা যবে পরন্তপ পার্থ-মহারথী,

জীবনে সূর্যস্বরূপ। **যে রবির ছবি পানে**—প্রমীলার জীবন-সূর্য অর্থাৎ মেঘনাদ। **উষার প্রসাদে পাইবি যেমতি ইত্যাদি**—প্রত্যূষে আবার সূর্যমুখী তাহার প্রাণনাথ সূর্যকে ফিরিয়া পাইবে, কিন্তু মেঘনাদ কি আর ফিরিয়া আসিবেন। **অবচয়ি**—চয়ন করিয়া। **মৃগরাজে**—সিংহকে। মেঘনাদ সম্পর্কে উক্তি।

[৬৯—১০১] **পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি……তার গতি**—এই অংশে প্রমীলার তেজস্বিতা অপূর্বভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। পর্বত হইতে বাহির হইয়া নদী দুর্বার বেগে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলে, তাহার গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। প্রমীলার গতিও সেইরূপ অপ্রতিরোধ্য। প্রমীলা লঙ্কায় স্বামীর নিকট যাইতে চায়। পথে প্রতিরোধ রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী। এই উক্তিতে রামচন্দ্রের প্রতি প্রবল উপেক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। **যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী ইত্যাদি**—পরন্তপ অর্থাৎ শত্রুনিগ্রহকারী মহাবীর পার্থ বা অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বের সহিত এক নারীপ্রধান রাজ্যে উপস্থিত হন।

যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদলে বীরমদে মাতি, ৯০
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে ! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী।
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝণঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে ! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা
অমনি ;—১০০
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
নৃ-মুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক
শত চেড়ী।
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল
ঝণ্ঝণি।
নাচিল শীর্ষক-চূড়া ; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে, ১১০

এই রাজ্যের সাহসী রাণী প্রমীলা যজ্ঞাশ্ব ধরিয়া রাখেন। যজ্ঞের অশ্ব ধরার অর্থ অশ্ব প্রেরণকারী রাজার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার এবং ইহার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য। অর্জুন প্রমীলার সাহস ও শৌর্যে মুগ্ধ হন। পরিশেষে প্রমীলা অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করেন। এখানে সেই মহাভারতের রাণী প্রমীলার সহিত মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলার যুদ্ধসজ্জা ও শৌর্যের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। **কার্ম্মুক**—ধনু। **ফলক**—ঢাল। **কাঞ্চন কঞ্চুক**—সোনার ঢাল। **মন্দুরা**—অশ্বশালা। **বারী**—হস্তীশালা। **ঘনপতি**—মেঘ। **রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে……জাগিলা অমনি**—অস্ত্রশস্ত্রের ঝংকারে এবং অলংকারে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল এই কথাটি একটু বিচিত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিধ্বনিরা যেন নিদ্রিত ছিল। এই শব্দেই জাগিয়া উঠিল। গিরিশৃঙ্গ, কানন, কন্দর প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কন্দর—পর্বত গুহা।

[১০২—১৩৪]—**বাজী**—ঘোড়া। **বিবিধ সাজনে**—নানাপ্রকার সজ্জায়। **অলিন্দ**—বারান্দা। **শীর্ষকচূড়া**—শিরোভূষণ। **তূণীর**—তীরাধার। **হাতে শূল, কমলে কণ্টকময়**—নারীসেনাদের হাতে শূল ধৃত রহিয়াছে। তাহাদের হাত পদ্মের মতো, সেই হাতে ধরা শূলকে দেখাইতেছে পদ্মের মৃণালের মতো।

দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি !
বাজিল সমর-বাদ্য ; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে !
রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা ! উচ্চ কুচ আবরি কবচে ১২০
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে ।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি যেন ধাঁধিয়া নয়নে !
ঝকঝকি ঊরুদেশে (হায় রে, বর্ত্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা !) হৈমময় কোষে
শোভে খরসান অসি ; দীর্ঘ শূল করে ;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ !—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর
রণে, ১৩০
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মদ বীর-মদে ।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ । চড়িলা সুন্দরী

দানব দলনী……যেমতি—নারীসেনারা অশ্ব আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের পদযুগল অশ্বের বক্ষদেশ স্পর্শ করিয়া আছে এবং উচ্চস্বরে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। দানব-দলনী বা কালীর পদ বক্ষে ধারণ করিয়া বিরূপাক্ষ বা মহাদেবের উল্লাসধ্বনির সহিত অশ্বগুলির হ্রেষা উপমিত হইয়াছে। **কাদম্বিনী-শিরে ইন্দ্রচাপ**—মেঘের উপরে ইন্দ্রধনু। খোঁপার উপরে মুকুট পরায় দেখাইল যেন মেঘের উপরে ইন্দ্রধনু উদিত হইয়াছে। **লেখা ভালে……শশিকলা**—ললাটে টানা কাজলের রেখা দেখিতে দুর্গার ললাটের চন্দ্রকলার মতো। **কবচে**—বর্মে। **স্বর্ণ-সারসনে**—সোনার কটিবন্ধে। **নিষঙ্গ**—তীরাধার। **ফলক**—ঢাল। **রবির পরিধি**—সূর্যমণ্ডল। **বর্ত্তুল যথা রম্ভা বন-আভা**—নারীর ঊরুর সহিত কদলী-কাণ্ডের উপমা সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। **হৈমবতী**—দুর্গা। **শুম্ভ নিশুম্ভ**—কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে জাত দুই দানব-ভ্রাতা। ইহাদের কনিষ্ঠ নমুচি। স্বর্গ অধিকার করিতে গিয়া নমুচি ইন্দ্রের হাতে নিহত হইলে শুম্ভ নিশুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে। ব্রহ্মা বর দেন, কোনো পুরুষ শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করিতে পারিবে না। এই মহাপরাক্রম-শালী বীরদ্বয়ের মৃত্যু হয় দেবী ভগবতীর হাতে। **ডাকিনী যোগিনী ইত্যাদি**—দুর্গার সহচরী ডাকিনী-যোগিনীর মত চেড়ীবৃন্দ প্রমীলাকে ঘিরিয়া সমবেত

বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা !
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে ; "লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি
বুঝিতে ? ১৪০
যাইব তাঁহার পাশে , পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠ ;—এ প্রতিজ্ঞা বীরাঙ্গনা, মম ;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি ;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে !
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা। ১৫০
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে ;
দেখিল লক্ষ্মণ শূরে ; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে !

হইল। **বামী**—স্ত্রী-অশ্ব। বড়বা শব্দের অর্থও ঐ। তবে এখানে প্রমীলার বামীর নাম। এই বামী বাড়বাগ্নিশিখাসদৃশ্য তেজস্বিনী।

[১৩৫—১৬৬] **কাদম্বিনী**—মেঘমালা। **অরিন্দম**—শত্রুদমনকারী। **বন্দী-সম এবে**—প্রমীলার আশঙ্কা, ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই বন্দী হইয়াছেন। **বিকট কটক কাটি**—ভয়ংকর সৈন্যবাহিনী (রামচন্দ্রের) ভেদ করিয়া। **দ্বিষত-শোণিত নদে**—শত্রুর রক্তনদীতে। **অধরে ধরি লো ইত্যাদি**—আমাদের বচন মধুর কিন্তু কটাক্ষে বিষ। **যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী মাতিল ইত্যাদি**—বাল্মীকি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে আছে, একদিন গোদাবরীতে স্নান করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম আশ্রমে ফিরিলে সেখানে সূর্পণখা (রাবণের সহোদরা মেঘনাদের পিসী) উপস্থিত হয় এবং নানাভাবে সীতার নিন্দা করিয়া রামচন্দ্রের প্রেমভিক্ষা করে। রাম হাসিয়া বলিলেন, আমি কৃতদার, আমাকে কেন, তুমি লক্ষ্মণকেই ভজনা কর। লক্ষ্মণ কৌতুক করিয়া বলিলেন, আমি তো রামচন্দ্রের দাস, তুমি দাসের ভার্যা হইতে চাহ কেন। এইরূপ বাক্যালাপে ক্রুদ্ধ সূর্পণখা সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ খড়্গাঘাতে তাহার নাসা এবং কর্ণ ছেদন করে। ভগিনীর অপমানের শোধ লইবার জন্যই রাবণ সীতা হরণ করেন। প্রথম সর্গে রাবণ একবার ক্ষোভের সহিত বলিয়াছে,

দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুত-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে!"
নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনী যুথ যথা—মত্ত মধু-কালে!
যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-
গতি ১৬০
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ;
কাঁপিল ১৭০
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ ; বন-হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত!
পবন-নন্দন হনূ ভীষণ দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা,—
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি
মরিতে ?
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি

"হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ?"

এখানে প্রমীলা সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়াছে। রামচন্দ্রের রূপ কেমন যে সূর্পণখা সেই রূপ দেখিয়া কামোন্মত্ত হইয়াছিল। **মাতঙ্গিনী**—হস্তিনী। **মাতঙ্গিনী যুথ যথা—মত্ত মধু-কালে**—বসন্তকালের প্রমত্ত হস্তিনী দলের মত। **কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে আবরিতে ইত্যাদি**—এই নারীবাহিনী যাত্রা করিলে মেঘের মতো ধূলা উড়িল, কিন্তু রূপসীদের রূপ তাহাতে আবৃত হইল না। রাত্রিকালে ধূমপুঞ্জ যেমন অগ্নিশিখাকে আবৃত করিতে পারে না, সেই উড্ডীন ধূলারাশিও সেইরূপ নারীসৈন্যদের রূপ আবৃত করিতে পারিল না।

[১৬৭—২০১] **বিধুমুখী**—চন্দ্রবদনী। **মাতঙ্গে নিষাদী**—হস্তীপৃষ্ঠে হস্তীচালক। **অবরোধে**—অন্তঃপুরে। **তুরঙ্গমে সাদীবর**—অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহী সৈনিক। **হনূ**—মহাবীর হনুমান। ইনি বায়ুর ঔরসজাত পুত্র।

থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে
সিংহাসনে ! ১৮০
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি ?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে ;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা
ধনী !)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা
হুঙ্কারে ;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর
সীতানাথে ১৯০
বর্ব্বর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী !
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?
দিনু ছাড়ি ; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি।
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ?
যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী ! ২০০
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে
তাঁহারে ?"
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনূ, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে ;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু রাশি
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি !

কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ইত্যাদি—এই সৈনিকদের নারীবেশ দেখিয়া হনুমান মনে করিয়াছে, নিশ্চয়ই রাক্ষসেরা নারীরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। বিভ্রান্ত করাই এই মায়াবীদের উদ্দেশ্য। **তুই ক্ষুদ্রজীবী**—হনুমানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া 'ক্ষীণপ্রাণ' বলা হইতেছে। **শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে**—সিংহী যেমন শৃগালের সহিত বিবাদ করে না সেইরূপ প্রমীলার সৈন্যরা হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহে। **বাহু-বলে প্রবেশিবে**—নৃ-মুণ্ড-মালিনী এইভাবে প্রমীলার আবির্ভাবের কারণ ঘোষণা করিয়াছে।

[২০২—২৩৪] **বলীন্দ্র পাবনি**—বীরশ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনুমান। **বীরাঙ্গনা মাঝে**—শক্তিমতী চেড়ীদের দ্বারা পরিবৃত প্রমীলা। **ক্ষণ-প্রভা......কিরীটে**—মুকুটে বিদ্যুৎ-চমকের মতো ঔজ্জ্বল্য। **শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম**—সুন্দর দেহ বর্ম শোভা পাইতেছে। **সৌর-অংশু......যেমনি**—সৌর অংশু (সূর্যের কিরণ) মণির নিজস্ব আভার সহিত মিশিলে যেমন দেখায়, বর্মের আভা

বিস্ময় মানিয়া হনূ, ভাবে মনে মনে ;—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে ; কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে!
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে ২২০
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী!"
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;
"বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরী, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর, তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ ; হনূমান্ আমি

প্রমীলার দেহকান্তির উপরে পড়িয়া সেইরূপ দেখাইতেছে। **বিস্ময় মানিয়া**—
—প্রমীলার অসামান্য রূপদৃষ্টে বিস্মিত হইয়া। **অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি ইত্যাদি**—সীতার সন্ধানে সাগর লঙ্ঘন করিয়া ইতিপূর্বে যেমন হনুমান লঙ্কায় আসিয়াছিলেন তখনকার কথা মনে হইতেছে। **ভীমারে**—লঙ্কার পুররক্ষীদেবী কালীকে। **খর্পর**—মাথার খুলি। **দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি ইত্যাদি**—লঙ্কাপুরীতে হনুমান সর্বত্র সীতাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিবার সময়ে অন্তঃপুরের রাক্ষস-কন্যা আর রাক্ষস-বধূদের দেখিয়াছিলেন। **রঘুকুল কমলেরে**—রঘুবংশের পদ্মস্বরূপা সীতাকে। **যে মেঘের পাশে প্রেম-পাশে ইত্যাদি**—মেঘের যেমন সৌদামিনী, সেইরূপ মেঘনাদের এই সৌদামিনী স্বরূপা পত্নী। এমন সৌদামিনী যাহার প্রেমপাশে বাঁধা সেই মেঘ ধন্য। অর্থাৎ মেঘনাদ ধন্য যে প্রমীলার মতো রূপসী তাহার প্রেমপাশে ধরা দিয়াছে। **অঞ্জনা-নন্দন**—হনুমান অঞ্জনার গর্ভজাত। অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুঞ্জিকস্থলা অভিশপ্ত হইয়া বানরেন্দ্র কুঞ্জরের দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার গর্ভে বায়ুর ঔরসে মহাশক্তিমান হনুমানের জন্ম হয়। **প্রভঞ্জন স্বনে**—ঝড়ের গর্জনের মতো। **বন্দীসম শিলাবন্ধে ইত্যাদি**—শিলা বা প্রস্তর-নির্মিত সেতু দ্বারা সমুদ্রকে বন্দীর মতো বাঁধিয়া রবিকুল (=সূর্যবংশ) শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র লঙ্কায় আসিয়াছেন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাহার শত্রু। কিন্তু লঙ্কার নারীদের সহিত রামচন্দ্রের কোনো শত্রুতা নাই।

রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি। ২৩০
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ;
কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।”
উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনূর কানে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা !—“রঘুবর পতি-বৈরী মম ;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ;২৪০
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে !
লও সঙ্গে, শূর তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।”
নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরি,২৫০
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী।
আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে ! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
ভীমাকার শূলকরে, চলে নিতম্বিনী ২৬০

[২৩৫—২৭০] **রঘুবর পতি বৈরী মম**—রামচন্দ্র আমার স্বামীর শত্রু। **যুঝি তাঁর রিপু সহ**—তাঁর শত্রুর সহিত অর্থাৎ মেঘনাদের শত্রু রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া। **যে বিদ্যুৎ-ছটা……পরশে**—যে বিদ্যুৎ মানুষের চোখে প্রীতিপ্রদ, রমণীয়, তাহারই স্পর্শে যেমন মানুষকে মরিতে হয় সেইরূপ সুন্দরী এই রাক্ষসপুরনারীরা শত্রুনাশ করিতেও সক্ষম। প্রকারান্তরে প্রমীলা হনুমানকে তাহার নারীবাহিনীর তেজস্বিতার কথা বলিতেছে। **বিবরিয়া**—বিবৃত করিয়া। **গরুৎমতী**—যাহার পক্ষ আছে। তরীর পালকে এখানে পক্ষ বলা হইতেছে। **তরঙ্গনিকরে রঙ্গে করি অবহেলা ইত্যাদি**—পালতোলা নৌকা যেমন তরঙ্গমালা উপেক্ষা করিয়া অনায়াসে বহিয়া যায়, নৃ-মুণ্ড-মালিনী সেইরূপ ভঙ্গিতে তরঙ্গিত শত্রুসেনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। **চমকে গৃহস্থ……অগ্নি-শিখা ঘরে**—ঘোর রাত্রিকালে ঘরে আগুন লাগিলে গৃহস্থ যেমন সেই অগ্নিশিখা দেখিয়া চমকিত হয় সেইরূপে সৈন্যগণ

জরজরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময়, নাচে কুতূহলে;
ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-
মাঝে! ২৭০

শিবিরি বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম অঞ্জলি-
আবৃত; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে;
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে
দেউটী। ২৮০
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ; চর্ম্মবর কেহ,

নৃ-মুণ্ড-মালিনীর অগ্নিশিখাতুল্য রূপের প্রতি চাহিল। **শীর্ষকের চূড়া**—মাথার মুকুটের উপরে চূড়া। **চন্দ্রক—কলাপময়**—কলাপ অর্থ ময়ূরপুচ্ছ। চন্দ্রের ন্যায় চিহ্নযুক্ত ময়ূরপুচ্ছের চূড়া। **ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে**—স্তন-দ্বয়ের মধ্যে রত্নময় হার ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। **কামের পতাকা ..... মধু-কালে**—তাহার পৃষ্ঠে দোদুল্যমান রত্নখচিত বেণী যেন বসন্তকালের মদন দেবতার পতাকার মতো। পুষ্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত বসন্তের শোভা। এই সময়ে মানুষের মনে কামনা উদ্ভবের সহিত তাহার বেণীর শোভা ও তাহা দৃষ্টে সেনাদের মধ্যে বাসনাচাঞ্চল্য দেখা দেওয়ার উপমা। **মাতঙ্গিনী গতি**—হস্তিনীর মতো গতি। **কৌমুদী যেমতি, কুমুদিনী সখী**—কুমুদিনী (শালুক ফুল) রাত্রে ফোটে, তাই জ্যোৎস্নাকে (কৌমুদী) কুমুদিনী সখী বলা হইয়াছে। **অংশুময়ী**—কিরণময়ী, উষার বিশেষণ।

[২৭১—২৯৩] **রুদ্র-কুল-সমতেজঃ**—রুদ্রকুল বলিতে এগারো জন রুদ্রকে (অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী, অজৈকপাদ, সুরেশ্বর) বোঝানো হইয়াছে। ইহাদের সমান তেজ-সম্পন্ন বীরবৃন্দ। **বিস্ময়ে চাহেন সব দেব-অস্ত্র-পানে**—এই রাত্রেই কিছুক্ষণ পূর্বে ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত দেব-অস্ত্র চিত্ররথ দিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত ঘটনা। চিত্ররথ বিদায় লইবার কিছুক্ষণ পরেই প্রমীলার দূত রামচন্দ্রের শিবিরে আসিয়াছে। এখনও রামচন্দ্রের পক্ষীয় বীরবৃন্দ সদ্যপ্রাপ্ত অস্ত্র সম্পর্কে

সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ ; তূণীর কেহ বা ;
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি ! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব ;
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে !
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে ?"
সহসা নাদিল ঠাট ; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা ! ত্রস্তে রক্ষোরথী, ২৯০
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী :—
'চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ?
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে ;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি ;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে ৩০০

আলোচনায় রত। এই অংশটি দ্বিতীয় সর্গের শেষ অংশের সহিত মিলাইয়া পড়িলে কালক্রম সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়। **বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে**—জনককন্যা সীতা (বৈদেহী) বীর্যশুল্কা হন। বীরত্বপ্রকাশস্বরূপ পণ দিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে স্থির হয়। জনক রাজা উত্তরাধিকার-সূত্রে হরধনু (পিনাক) লাভ করিয়াছিলেন। মহাদেব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিবার সময়ে এই ধনুর জ্যা আকর্ষণ করিয়া যজ্ঞভাগ দাবি করেন এবং না পাওয়ায় দেবতাদের শিরশ্চেদ করিবেন বলিয়া ভয় দেখান। ভীত দেবতারা মহাদেবের স্তুতি করায় তিনি দেবতাদিগকে সেই ধনু দান করিয়াছিলেন। দেবতারা জনকের পূর্বপুরুষ দেবরাজের নিকট এই ধনু গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। সীতাকে যেসব রাজা বিবাহ করিতে আসেন তাঁহারা কেহ এই ধনু তুলিতে পারেন নাই। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া জনকের নিকট উপস্থিত হইয়া হরধনু আনিতে বলেন। পাঁচ হাজার বলিষ্ঠ পুরুষ এক অষ্টচক্র শকটে সেই ধনু বহন করিয়া আনিল ; রামচন্দ্র অনায়াসে সেই মহাকায় ধনু তুলিয়া লন এবং জ্যা রোপণ করিতে গেলে বজ্রনিনাদের তুল্য শব্দে ধনু ভাঙিয়া যায়। **নাদিল ঠাট**—সৈন্যদল রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি করিল। **নিশীথে কি উষা আসি, ইত্যাদি**—নৃ-মুণ্ড-মালিনীর জ্যোতির্ময়ী রূপ শিবিরের সম্মুখভাগ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। মনে হইল যেন রাত্রিতেই উষার আবির্ভাব হইয়াছে।

[২৯৪—৩২৮] **কাম-রূপী তবাগ্রজ**—তোমার অগ্রজ (বিভীষণের অগ্রজ রাবণ) ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সক্ষম।

আমি। তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!"
হেন কালে হনূসহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে!)
কহিলা; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে,—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী, ৩১০
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা; "কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী; "বীর শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে;
নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পুজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে;
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে, ৩২
বীরেন্দ্র রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত!
যথারুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী

ছত্রিশ রাগিণী ইত্যাদি—নৃ-মুণ্ড-মালিনীর কণ্ঠস্বরে যেন ছত্রিশ রাগিণীএকসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্ব ব্যঞ্জিত হইতেছে। **বিশেষিয়া**—বিশদ-ভাবে। **আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে; নতুবা ছাড়হ পথ**—প্রমীলা লঙ্কায় প্রবেশ করিতে চান। হয় তোমার সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইয়া তাঁহার পথ ছাড়িয়া দাও, নতুবা তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর। **বধেছ অনেক রক্ষঃ…মাগে রণ**—রামচন্দ্র, তুমি নিজ হাতে অনেক রাক্ষস বধ করিয়াছ, এবার এক রাক্ষস-বধূ তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। **যাহে চাহ, যুঝিবে সে একাকিনী**—প্রমীলার শত জন চেড়ীর মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধ করিতে পার, এককভাবেই তাহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। **ধনুর্ব্বান ধর, ইচ্ছা যদি ইত্যাদি**—যে অস্ত্র তোমার ইচ্ছা তাহা লইয়াই এই নারীসৈন্যেরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। ধনুর্বাণ অথবা তলোয়ার এবং ঢাল, কিংবা গদা—যে কোন অস্ত্র লইয়া, এমন কি মল্লযুদ্ধেও তাহারা প্রস্তুত। **চিত্রবাঘিনীরে যথা ইত্যাদি**—মৃগদল দেখিলে বাঘিনী ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করিতে গেলে ব্যাধপত্নী যেমন সেই

আতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে।"
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত) ৩৩০
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে!
উত্তরিলা রঘুপতি; শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি; তোমরা সকলে
কুলবালা; কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত। ৩৪০
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে!
ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী!
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি বিড়ম্বনে,
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ
করি!"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি
সাবধানে, ৩৫০
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"

বাঘিনীকে সংবৃত করে, প্রমীলাও সেইরূপ রামচন্দ্রের বাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য অধীর তাহার নারী সৈনিকদের সংযত করিয়া রাখিয়াছে।

[৩২৯—৩৫১] **রামা**—নারী। **নোমাইলা**—নত করিল। **সুকেশিনি**—সুন্দর কেশ যাহার। সম্বোধনে 'নি'। **কোন্ অপরাধে বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে**—রামচন্দ্র বলিতেছেন, রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত তাহার শত্রুতা, কিন্তু রাক্ষস-বধূ বা রাক্ষস-কন্যাদের সহিত তাঁহার বিবাদের কোনো কারণ নাই। রামচন্দ্রের এই উক্তিতে যে স্নিগ্ধ মমত্বে মণ্ডিত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সবটুকু সত্য নয়। কিছু পরেই বিভীষণের নিকট রামচন্দ্র বলিয়াছেন, 'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে, রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি।' দেখা যাইতেছে নির্বিরোধে প্রমীলাকে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে দিবার ইচ্ছা রামচন্দ্রের ছিল না। ভীত হইয়াই পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন। **জনম রামের রামা, রঘুরাজ-কুলে**—সূর্যবংশের রাজা দিলীপ-পুত্র রঘু, রামচন্দ্রের এই পূর্বপুরুষের নামেই তাঁহাদের বংশের নাম রঘুবংশ। রঘুবংশে রামের জন্ম। **ভিখারী রাঘব......আশীর্ব্বাদ করি!**—সকলেই জানে বনবাসী রামচন্দ্র ভিখারী। বিধির বিড়ম্বনার ধনহীন। তোমার যোগ্য উপহার কিছুই নাই। শুধু আশীর্বাদ করি, সুখে থাক। **অতি সাবধানে......বামা দলে**—রামচন্দ্র

প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ ; "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া
রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ?" কহিলা রাঘব ;
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি ! ৩৬০
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে !
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ !"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,

হনুমানকে আদেশ দিলেন যেন যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া এই নারীদের লঙ্কায় প্রবেশের পথ করিয়া দেওয়া হয় !

[৩৫২—৩৭৭] **ভীমারূপী, বীর্যবতী… রক্ত-বীজ-কুল-অরি**—দানব-রাজ রম্ভের মৃত্যু হইলে যক্ষরা মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করে। রম্ভের স্ত্রীও সহমরণের জন্য চিতারোহণ করেন। চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলে রম্ভ-পত্নীর কুক্ষিভেদ করিয়া মহিষাসুর নির্গত হয়। তখন পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ রম্ভও রূপান্তর গ্রহণ করিয়া চিতা হইতে উত্থিত হয়। এই রূপান্তরিত রম্ভেরই নাম রক্তবীজ। রক্তবীজ দৈত্যরাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি। যুদ্ধকালে ইহার দেহ-নিঃসৃত রক্তবিন্দু মাটিতে পড়িলে প্রতি রক্তবিন্দু হইতে তৎক্ষণাৎ তাহারই মতো শক্তিসম্পন্ন দৈত্য উদ্ভূত হইত। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা রক্তবীজকে হত্যা করিতে গেলে শত শত রক্তবীজের উদ্ভব হইয়াছিল। শেষে ভগবতী নিজের অঙ্গনির্মিতা ও অঙ্গীভূতা কালীকে রসনা বিস্তার করিয়া দেহ-নিঃসৃত রক্ত পান করিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। এইভাবে নিস্তেজ হওয়ায় রক্তবীজ ভগবতীর হাতে নিহত হয়। চামুণ্ডা—ভগবতীর রূপভেদ। চণ্ড ও মুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করায় দেবীর নাম হয় চামুণ্ডা। রক্তবীজ-কুলের শত্রু চামুণ্ডার মতো শক্তিমতী প্রমীলা। **দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু**—রামচন্দ্র ইতিপূর্বে শিষ্টবচনে নৃ-মুণ্ড-মালিনীকে বিদায় দিয়াছেন এবং রক্ষো-নারীদের সহিত তাঁহার কোনো বিবাদ নাই বলিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত সৌজন্যবশত একথা বলেন নাই। নৃ-মুণ্ড-মালিনীকে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়াই ওইরূপ বলিয়াছিলেন। এখন বিভীষণের নিকট রামচন্দ্র সে কথা স্বীকার করিতেছেন। এই উক্তি নিতান্ত কাপুরুষোচিত। **বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে**—প্রমীলা তাঁহার বাহিনী

স্বর্ণ বারিদ-পুঞ্জে! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-
লহরী! ৩৭০
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরি চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে!
উপত্যকা পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পুরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।

সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
কৃষ্ণ হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময়; তার পাছে চলে বাদ্যকরী, ৩৮০
বিদ্যাধরী-দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্বণে!
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা!
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ; মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা ৩৯০

লইয়া যাইতেছে। সেই সুন্দরী জ্যোতির্ময়ী রমণীদের রূপের জ্যোতি নির্মল আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। **স্বর্ণি বারিদ-পুঞ্জে**—প্রমীলা এবং তাহার সঙ্গিনীদের দেহের বিভায় আকাশের মেঘপুঞ্জ (বারিদ-পুঞ্জ) স্বর্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। **কোদণ্ড**—ধনু। **সে রোলের......কাকলী লহরী**—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, ধনুর টংকার, অশ্বপদ-উত্থিত শব্দ ইত্যাদি বিচিত্র ধ্বনির মধ্যে বাজনার শব্দকে মনে হইল যেন ঝড়ের শব্দের মধ্যে পাখির কাকলি শোনা যাইতেছে। **আস্কন্দিছে**—একপ্রকার অশ্ব-গতি বা অশ্বের চলন ছন্দ। **গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট ইত্যাদি**—পর্বতচূড়ার মতো অটলভাবে রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী দুইপাশে দণ্ডায়মান, তাহার মধ্য দিয়া প্রমীলার বাহিনী উপত্যকা-পথে হস্তিনীদের দলের ন্যায় চলিয়াছে।

[৩৭৮—৪০১] **কৃষ্ণ হয়ারূঢ়া**—কালো ঘোড়ায় আরোহিতা। **বিদ্যাধরী**—কিন্নরী। ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানে যে। **তারার পাশে শশিকলা যথা**—নারীসেনাদের মধ্যে প্রমীলাকে তারাদের মধ্যবর্তী চন্দ্রকলার মতো দেখাইতেছে। **রতন সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম**—রত্নরাজি হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতি বিদ্যুতের মতো। **অন্তরীক্ষে সঙ্গে......কুসুম-শরে**—মর্তে নারী-বাহিনী চলিয়াছে, আর তাহাদের সঙ্গে অন্তরীক্ষে মদনদেবতা তাহার পুষ্পধনু

মহিষ-মৰ্দ্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্র রমা উপেন্দ্র-রমণী,
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে;
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল; কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি;
আস্ফালিলা শূলে কেহ; হাসিলা কেহবা
অট্টহাসে টিটকারি; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,৪০০
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী!

লক্ষ করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব,
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয়? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে!
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রক্ষোত্তম।
না পারি বুঝিতে কিছু; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, কহো না আমারে
চিত্ররথ-রথী-মুখে শুনিনু বারতা
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে? কহ, বুধ, কার এ ছলনা?"

হইতে পুষ্পশর নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়াছেন। অর্থাৎ এই সৌন্দর্যময়ী রমণীরা কামনা উদ্রেক করিতে করিতে চলিয়াছে। **মহিষ-মৰ্দ্দিনী দুর্গা**—বড়বা নামক তেজস্বিনী স্ত্রী-অশ্বের পৃষ্ঠে আসীন প্রমীলাকে মহিষ-মৰ্দ্দিনী দুর্গার মতো দেখাইতেছে। মহিষাসুর নামক দৈত্য বিনাশ করায় দুর্গার আর এক নাম মহিষমর্দিনী। ব্রহ্মার বরে পুরুষজাতীয় কাহারো পক্ষে মহিষাসুরকে বধ করা সম্ভব ছিল না। দেবতাদের মিলিত প্রার্থনায় এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী অষ্টাদশ-হস্তা নারী সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেবতার তেজ হইতে বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্ট। যুদ্ধে ইনি মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া মহিষাসুরকে হত্যা করেন। **ঐরাবতে শচী**—অশ্বারূঢ় প্রমীলার উপমা। সমুদ্রমন্থনের সময়ে অন্যান্য জিনিসের সহিত ঐরাবত নামক হস্তী উত্থিত হয়। ইরাবৎ অর্থাৎ জল হইতে উদ্ভূত, তাই ইহার নাম ঐরাবত। ইন্দ্র এইহস্তীকে নিজ বাহন করেন। **খগেন্দ্রে রমা**—গরুড়ের পৃষ্ঠে লক্ষ্মী। **বড়বার পিঠে বড়বা**—প্রথম 'বড়বা' শব্দ প্রমীলার অশ্বার নাম। দ্বিতীয় 'বড়বা' অর্থ বাড়বাগ্নি; দ্বিতীয় শব্দটি প্রমীলা সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থ, বড়বার পৃষ্ঠে বাড়বাগ্নি সদৃশ প্রমীলা। **বামী-ঈশ্বরী**—অশ্বাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

[৪০২—৪৩১] **নৈকষেয়**—নিকষার পুত্র, বিভীষণ। **প্রপঞ্চ**—মায়া **পাতিয়া এ ছল ইত্যাদি**—নারীবাহিনীসহ প্রমীলাকে দেখিয়া রামচন্দ্র বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি জানেন এই আশ্চর্য রমণী ইন্দ্রজিৎ-পত্নী প্রমীলা,

উত্তরিলা বিভীষণ ; "নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমী নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে? দম্ভোলী-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে
সংগ্রামে, ৪২০
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল হস্তী! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক!

তবুও যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। ইতিপূর্বে দেবদূত চিত্ররথ বলিয়া গিয়াছেন মায়াদেবী লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধের উপায় জানাইতে আসিবেন। রামচন্দ্রের মনে হইয়াছে হয়তো বা মায়াদেবীই এইভাবে ছল করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। **মহাশক্তি-অংশে দেব ইত্যাদি**—প্রমীলা এমন তেজস্বিনী এমন জ্যোতির্ময়ী রূপসম্পন্ন কেন তাহা বিভীষণের এই উক্তিতে জানা গেল। কালনেমি নামক দৈত্যের এই কন্যার জন্ম মহাশক্তি অর্থাৎ পার্বতীর অংশে। সেইজন্যই রূপে এবং শৌর্যে সে এমন অসামান্যা। এই সর্গের শেষদিকে (৬০০তম চরণ) পার্বতীর সংলাপে আছে, 'মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী।' **দম্ভোলি-নিক্ষেপী**—বজ্র-নিক্ষেপকারী, অর্থাৎ ইন্দ্র। **হর্য্যক্ষ**—হরি (পিঙ্গল বর্ণ)+অক্ষি (চক্ষু) যাহার, সিংহ। মেঘনাদ সম্পর্কে প্রযুক্ত। **দিগম্বরী যথা দিগম্বরে**—কালী যেমন শিবকে পায়ের নীচে রাখেন, তেজস্বিনী প্রমীলাও সেইরূপ ইন্দ্রের ত্রাস মেঘনাদকে আপনার বশীভূত করিয়া রাখে। **জগতের রক্ষা-হেতু......কাল হস্তী**—এই নারীর প্রেমে মহাশক্তিমান, উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় বলশালী মেঘনাদ সম্মোহিত থাকে বলিয়াই জগৎ রক্ষা পাইতেছে। মেঘনাদের পরাক্রম হইতে জগৎকে রক্ষার জন্যই বিধাতা প্রমীলারূপ শৃঙ্খল (নিগড়) সৃষ্টি করিয়াছেন। **যথা বারি-ধারা......কালাগ্নি**—জলধারা যেমন কাননের শত্রু দাবানলকে নির্বাপিত করে, কালাগ্নি-সদৃশ মেঘনাদকে সেইরূপ প্রমীলা প্রেম-আলাপনে নিস্তেজ করিয়া রাখে। **যমুনার ...দংশক**—কাল ফণী অর্থাৎ কালীয় নাগ যেমন যমুনার জলে ডুবিয়া থাকে মেঘনাদরূপ কালসর্পও সেইরূপ প্রমীলার প্রেম-যমুনায় নিমজ্জিত আছে

সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে
দেবতা, ৪৩০
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে !"
কহিলেন রঘুপতি ; "সত্য যা
কহিলে,
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে !
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে ! কিন্তু শুভ ক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে !
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি ?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;
কে রাখে এ মৃগ-পালে ? দেখ হে
চাহিয়া, ৪৪০
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু ! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি
রক্ষিত।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল সর্প তেজে

বলিয়াই জগতে বিপদ ঘটিতেছে না। **ভৃগুরামে**—ভৃগুবংশ-জাত পরশুরাম। রামচন্দ্র জনকের হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন জানিয়া তাহার শক্তি-পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হন এবং আর একখানি ধনু দিয়া তাহাতে জ্যা রোপণ করিতে বলেন। এই ধনু বিষ্ণুর নিকট হইতে পরশুরামের পূর্বপুরুষ ঋচীক পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র অনায়াসে পরশুরাম প্রদত্ত ধনুতেও জ্যা রোপণ করেন। রামচন্দ্র এই অস্ত্র হাতে লইয়া পরশুরামের তেজোহরণ করিয়াছিলেন। বাল্মীকি-রামায়ণের বাল-কাণ্ডে ইহা বর্ণিত আছে। **ভৃগুমান্ গিরি-সদৃশ**—পরশুরাম উচ্চশিখর সমন্বিত পর্বতের ন্যায় (ভৃগুমান্) যুদ্ধে অটল। **সিংহ সহ-সিংহী আসি ·· মৃগপালে**—সিংহ অর্থাৎ মেঘনাদের সহিত সিংহী অর্থাৎ প্রমীলা আসিয়া মিলিত হইল। রামচন্দ্র মৃগপাল বলিয়াছেন নিজের সৈন্য-বাহিনীকে। সিংহ ও সিংহীর মিলিত পরাক্রমের সম্মুখে মৃগপালের অসহায় অবস্থার মতো রামচন্দ্র-পক্ষীয়দের অবস্থাও অসহায়। রামচন্দ্রের পক্ষে এই উক্তি নিতান্ত কাপুরুষোচিত হইয়াছে। **দেখ হে চাহিয়া……সিন্ধু**—রামচন্দ্রের সমূহ বিপদ, প্রমীলা লঙ্কাপুরীতে আসায় সেই বিপদ আরো বর্ধিত হইল। তাহার বিপদ সমুদ্রের মত দুস্তর, সেই সমুদ্রে নতুন আশঙ্কার কারণ সৃষ্টি হইল। যেন ভয়ংকর সমুদ্রে আবার বিষ (হলাহল) উদ্গীরণ শুরু হইল। **নীলকণ্ঠ যথা……তোমারি রক্ষিত**—নীলকণ্ঠ (মহাদেব) যিনি নিস্তারিণীর (দুর্গা) মনোহরণ করেন, তিনি যেমন বিষপান করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেইরূপ তুমি (বিভীষণ) আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমারই

তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে;
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু
তোমারে।" ৪৫০
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ
নোমাইয়া
ভ্রাতৃপদে; "কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে
জয় লাভে?
অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে ৪৬০

রক্ষিত। রামচন্দ্র এইভাবে বিভীষণের আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন। **কাল-সর্প তেজে······ইন্দ্রজিৎ**—তোমার অগ্রজ রাবণ কালসর্পের মতো, আর ইন্দ্রজিত তাহার বিষদন্ত। অর্থাৎ রাবণের প্রধানতম শক্তি মেঘনাদ। **যদি পারি······হবে**—এই বিষদাঁতটি যদি ভাঙিতে পারা যায়, অর্থাৎ রাবণের প্রধানতম ভরসা ইন্দ্রজিৎকে যদি বিনষ্ট করা যায়, তাহা হইলে স্বয়ং রাবণকেও শেষ করিতে পারা যাইবে। সীতা-উদ্ধারও সম্ভব হইবে।

[৪৫১—৪৭৬] **সৌমিত্রি**—লক্ষ্মণ। **সুরনাথ সহায় যাহার**—স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র যাহার সহায়। কিছু পূর্বে ইন্দ্র লক্ষ্মণের জন্য দেবঅস্ত্রসমূহ প্রেরণ করিয়াছেন। সেই কথা মনে রাখিয়াই লক্ষ্মণ এইরূপ বলিতেছে। **অধর্ম্ম-আচারি······জনকের পাপে**—মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্রজিৎ-চরিত্র সত্যই নিষ্পাপ। পাপপুণ্য বিষয়ে তাহার চিত্তে কোনো সংশয় বা প্রশ্নও নাই। সে কখনো পিতার কার্যের সমালোচনা করে নাই। "এ চরিত্র নিদাঘ-দিবার মত দীপ্ত ও নির্মল, কোনোখানে মেঘ বা কুয়াশার লেশমাত্র নাই। ইহার অন্তঃকরণে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রশ্ন সংশয় নাই, নৈরাশ্য নাই; প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রস্ফুট কুসুমে কোথাও চিন্তাকীট প্রবেশ করে নাই। আর্ষ রামায়ণের মেঘনাদের সেই দৃপ্ত পশুবল, মধুসূদনের মেঘনাদে অপর সকল মহৎ গুণের সমবায়ে এই অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। মেঘনাদের বীরত্বের মূলে উপাদান হইয়াছে—তাহার নিরতিশয় ভয়শূন্যতা; শক্তিমদমত্ততা নয়—অসীম বাহুবল ও হৃদয়বলের অমোঘতায় বিশ্বাসই ইহার কারণ" (মোহিতলাল)। মেঘনাদকে কেন বিনষ্ট হইতে হইল তাহার কোনো কারণ এ চরিত্রে মেলে না। সুতরাং 'কৃতকর্মের ফলভোগ' এই নীতি এখানে প্রয়োগ করা যায় না। বস্তুত

কাশি, কহিলেন, চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?"
উত্তরিলা বিভীষণ; "সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষ:-কুল পতি!
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী;
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
রণ-প্রিয়া! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে, ৪৭০
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে!
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিবে প্রভাতে।"
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে;
"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে;
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী; ৪৮০
কোথা বা সুগ্রীব মিতা? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে।"
"যে আজ্ঞা," বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
ঊর্ম্মিলা-বিলাসী শূরে। সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি!—

রাবণের পাপের জন্যই মেঘনাদকে বিনষ্ট হইতে হইয়াছে; 'মরে পুত্র জনকের পাপে', মেঘনাদ সম্পর্কে লক্ষ্মণের এই উক্তি আক্ষরিকভাবে সত্য। গ্রীক সাহিত্যের নানা কাহিনীতে যেমন পুরুষানুক্রমিক ফলভোগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, মেঘনাদের পরিণতি অনেকটা সেইরূপ বিশ্বাস আভাসিত করে। **স্বরীশ্বর অরি**—ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ মেঘনাদ। **নৃ-মুণ্ড-মালিনী যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী**—নৃ-মুণ্ড-মালিনী নাম্নী প্রমীলার প্রধানা সেনানায়িকা শক্তিতে সাক্ষাৎ কালীর (নৃ-মুণ্ড-মালিনী কালীর অপর নাম) মতো।

[৪৭৫—৫০০] **মহাক্লান্ত সবে বীরবাহু সহ রণে**—প্রমীলা লঙ্কায় মেঘনাদের সহিত মিলিত হওয়ায় বিভীষণ রামচন্দ্রকে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন। রামচন্দ্র বিভীষণকে লক্ষ্মণ সহ প্রহরার ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। বীরবাহুর সহিত প্রচণ্ড সংগ্রাম করিয়া সকলেই ক্লান্ত, সুতরাং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে ক্লেশ হইতে পারে। কেহ নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে কি না দেখা প্রয়োজন। **সুরপতি-সহ তারক-সূদন**—রামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণ লক্ষণকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। যেন ইন্দ্র কার্তিকেয়কে

লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা! ৫০০
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষ্বেড়ন করে;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত! হ্রেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্ফালিল;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পুরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।—
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী;
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে?
নহি রক্ষোরিপু মোরা রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে!
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
পৌর জন; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি, ৫১০
বরষি কুসুমাসারে; যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী; হ্রেষি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ; ঝন্‌ঝনিল কৃপাণ পিধানে!
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কতক্ষণে বামা ৫২০

সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন এইরূপ মনে হইল। তারকসূদন=তারকাসুরের বিনাশক অর্থাৎ কার্তিকের। **ইন্দু**—চন্দ্র। **গরজিলা......করিযূথ যথা**—প্রমীলা লঙ্কার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে দ্বাররক্ষী রাক্ষসেরা শত্রু-সমাগম হইয়াছে মনে করিয়া ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিল। তাহাদের সেই গর্জন মেঘ-গর্জন বা হস্তীদলের (করিযূথ) গর্জনের ন্যায়। **কৌন্তিক-কুল**—কুন্তধারী যোধদল। **কুন্ত**—একপ্রকার শূল। **নারাচ**—লৌহময় বাণবিশেষ। **আচ্ছাদিয়া নিশানাথে**—নিক্ষিপ্ত বাণে নিশানাথ (চন্দ্র) আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

[৫০১—৫৩৩] **নহি রক্ষোরিপু মোরা**—লঙ্কার দ্বাররক্ষীরা আক্রমণ করিতে উদ্যত দেখিয়া নৃ-মুণ্ড-মালিনী আত্মপরিচয় দিল। বলিল, আমরা রাক্ষসদের শত্রু নই। **পতঙ্গ আবলী**—পতঙ্গসমূহ। **কুলবধূ দিলা হুলাহুলি, ইত্যাদি**—সর্বজনপ্রিয় মেঘনাদের প্রেয়সী লঙ্কায় যে সম্বর্দনা লাভ করিল

উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে।" হাসি, কহিলা
ললনা;
"ও পদ-প্রাসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে; বিরহ-অনলে ৬৩০
(দুরূহ) ডরাই সদা; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে।
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী!"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।

তাহার বর্ণনা। **মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে**—প্রমীলা ইন্দ্রজিৎকে সাময়িকভাবে হারাইয়া তাহার জন্য এতদূরে ছুটিয়া আসিয়াছে। এতক্ষণে মিলন সম্ভবপর হইল। প্রমীলা মেঘনাদকে ফিরিয়া পাইল। মণিহারা সর্প মণি পুনরায় ফিরিয়া পাইল। **অরিন্দম**—শত্রুদমনকারী। **রক্তবীজে বধি বুঝি ইত্যাদি**—পূর্বে ৩৫৭-চরণের টীকা দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রজিৎ প্রমীলাকে রণবেশে দেখিয়া বলিতেছে, ভগবতী বুঝি রক্তবীজ নিধন করিয়া কৈলাস ধামে ফিরিয়া আসিল। **কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে**—প্রমীলার উক্তি। প্রমীলা মেঘনাদের পদপ্রসাদে অনায়াসে বিশ্বজয় করিতে পারে কিন্তু মদন দেবতার প্রভাব অস্বীকার করার শক্তি তাহার নাই। প্রেমের জন্যই তাহাকে রণসজ্জা করিতে হইয়াছে। **নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, ইত্যাদি**—সর্বক্ষণ যাহাকে মন চায় তাহার নিকট আসিয়াছে। **সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী**—তরঙ্গিণী বা নদী যেমন সাগরে মেশে, প্রমীলা সেইরূপ মেঘনাদের সহিত মিলিত হইল। এখানে স্মরণীয় প্রমোদকানন হইতে রণসাজে বাহির হইবার পূর্বে প্রমীলা মহাতেজে বাসন্তী সখীকে বলিয়াছিল, 'পর্বত-গৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে, কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?' যাত্রারম্ভের এই উপমা এবং যাত্রাশেষ আবার সেই নদী ও সাগরের উপমায় সমস্ত বর্ণনাটি সুডৌল হইয়া উঠিয়াছে।

[৬৩৩—৬৭২] **প্রবেশি মন্দিরে ইত্যাদি**—প্রমীলা এবারে বেশ পরিবর্তন করিয়া আবার কমনীয় বধূবেশ ধারণের জন্য গৃহে প্রবেশ করিল। **দুকূলে রতনময় আঁচল**—রত্নময় আঁচল সমন্বিত বস্ত্র। **কাঁচলি**—কঞ্চুলিকা। নারীর বুকের আবরণ। **পীন-স্তনী**—স্থূল-স্তনা সমন্বিতা। **শ্রোণিদেশে**—নিতম্বে। **ভাতিল**—শোভা পাইল। **মেখলা**—কটিভূষণ। রৌপ্যাদি নির্মিত বিছা।

দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে। ৫৪০
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
মেঘনাদ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী।
গাইল গায়ক-দল; নাচিল নর্ত্তকী;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি।
বহিল বাসন্তানিল মধুর স্বস্বনে, ৫৫০
যথা যবে ঋতুরাজ বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে!
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মূরতি;
বৃথা নিদ্রা-দেবী তথা সাধিছেন তারে!
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে।
শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমতি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
—চারি দ্বারে বীর ব্যূহ জাগে; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীর-ব্যূহ

মুকুতা-আবলী—মুক্তাসমূহ। **উরসে**—বুকে। **সিঁথি**—সীমন্তের গহনা। **কুণ্ডল**—কর্ণভূষণ। **বিদ্যাধর বিদ্যাধরী**—কিন্নর-কিন্নরী। **সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি**—চাঁদের কিরণে সমুদ্রের মতো। **ঋতুরাজ**—বসন্ত। **বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা**—বিন্ধ্যপর্বতের শৃঙ্গসমূহের মত সুগ্রীব তাঁহার দলবল লইয়া প্রহরায় নিযুক্ত। **নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে**—অঙ্গদ জাগিয়া আছেন, কৈলাস পর্বতে শূলহস্তে প্রহরায় রত শিবের অনুচর নন্দীর মতো এই বীর অঙ্গদ। **শত শত……নভঃস্থলে**—লঙ্কার চতুর্দিক বেড়িয়া রামচন্দ্রের সৈনিকেরা শত শত মশাল জ্বালিয়া পাহারা দিতেছে। এইসব মশালের আলোয় বেষ্টিত লঙ্কাকে দেখাইতেছে তারকাবেষ্টিত চন্দ্রের মতো। **যথা যবে……তৃণজীবী জীবে**—মেঘ হইতে বর্ষিত (বারিদ=মেঘ) জলে পুষ্ট শস্য যখন বাড়িতে থাকে তখন শস্যরক্ষার জন্য কৃষক খেতের পাশে উঁচু মাচা প্রস্তুত করিয়া সাবধানে জাগিয়া থাকে। তাহারা হরিণ দল, ভীষণ মহিষ বা তৃণজীবী

রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।৪৭০
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্র, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নর-
লোকে? ৫৮০
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিছে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে!"
উত্তরে বিজয়া সখী; "সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-
লোকে? ৫৯০
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি?
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিত তেজে;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল

প্রাণীদের দূরে বিতাড়িত করিয়া শস্যগুলি রক্ষা করে। মধুসূদন পাহারায় নিযুক্ত রামচন্দ্রের প্রহরীদের উপমায় এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

[৫৭৩—৬১৩] **সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা**—সোনার বর্ম হইতে বিচ্ছুরিত আলো। **হেন রূপ কার নর-লোকে**—পৃথিবীতে প্রমীলার মতো রূপবতী আর কে আছে। **সাজিনু এবেশে সত্যযুগে**—পার্বতী বলিতেছেন, প্রমীলা আজ যে বেশে সাজিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলে সত্যযুগে দানবদলনের জন্য তাঁহাকে এইরূপ বেশ ধারণ করিতে হইয়াছিল। **ঠাট**-সৈন্যদল। **তুরঙ্গম-আস্কন্দিছে**—অশ্বগুলি নৃত্য করিতেছে। **উঠিছে পড়িছে......মানস-সরসে**—অশ্বের চলায় আন্দোলনে গৌরাঙ্গী প্রমীলার দেহ উন্নত-অবনত হইতেছে, মনে হইতেছে যেন মানস সরোবরে পদ্ম তরঙ্গ-হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতেছে। **কিন্তু ভাব......ভবানি**—বিজয়ার উক্তি। ভবানী বা পার্বতী প্রমীলার রূপ এবং শৌর্যের প্রশংসা করিতেছিলেন। বিজয়া তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল মেঘনাদের সহিত প্রমীলা সম্মিলিত হওয়ায় নতুন বিপদ দেখা দিল। রামচন্দ্রকে রক্ষা করিতে হইলে মেঘনাদের মৃত্যুর উপায় করিতেই হইবে। পার্বতী রামচন্দ্রকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতবদ্ধ, সুতরাং তাহার উপায়

বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ !
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি ?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?"
ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী ;
"মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী, ৬০০
বিজয়ে ; হরিব তেজঃ কালি তার
আমি ।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে ;
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে ।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে । পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে রাবণি ;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা ।"
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে ।
মৃদুপদে নিদ্রাদেবী আইলা
কৈলাসে ; ৬১০
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম ; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা,
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে ।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে সমাগমো নাম তৃতীয় সর্গঃ ।

চিন্তা করা কর্তব্য । **মম অংশে জন্ম .... তার আমি**—পূর্বে বিভীষণ একবার বলিয়াছে পার্বতীর অংশে প্রমীলার জন্ম । পার্বতীও তাহাই বলিতেছেন । আগামীকাল লক্ষ্মণ যখন মেঘনাদকে হত্যা করিতে যাইবে তখন তিনি প্রমীলার তেজ হরণ করিবেন । তাহা হইলে প্রমীলার দিক হইতে আর বিপদের কোনো কারণ থাকিবে না । **রবিচ্ছবি-করস্পর্শে.....করিব বামারে**—যে সকল মণি সূর্যের কিরণে দীপ্তি পায় দিনে সূর্য অস্ত গেলে যেমন তাহারা ম্লান হইয়া আসে সেইরূপ পার্বতীর তেজে তেজস্বিনী প্রমীলাও আগামীকাল নিস্তেজ হইয়া পড়িবে । **পতি সহ আসিবে প্রমীলা এ পুরে**—মৃত্যুর পরে প্রমীলা মেঘনাদের সহিত শিবধামে আসিবে । নবম সর্গে সমুদ্রতীরে চিতাসজ্জায় শায়িত মেঘনাদ এবং তাহার পাশে সহমরণ-গামিনী প্রমীলাকে দেখিয়া স্বয়ং শিব অগ্নিদেবতাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, "পবিত্রি, হে সর্বশুচি তোমার পরশে, আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষস-দম্পতি ।" অগ্নি মেঘনাদ-প্রমীলাকে রথে তুলিয়া দ্রুত শিবলোকে লইয়া গেলেন । **শিবের সেবা করিবে রাবণি**—রাবণি অর্থাৎ রাবণ-পুত্র মেঘনাদ শিবলোকে আসিয়া শিবের সেবক হইবে । **ভবের ভালে— ......রজোময় তেজে**—শিবের ললাটে দীপ্তিমান চন্দ্র শুভ্র জ্যোৎস্নায় সুখ-ধাম অর্থাৎ শিবলোক ভরিয়া তুলিল ।

সমাগমো নাম—এই তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কায় সমাগম বর্ণিত হইয়াছে । তাই এ সর্গের নাম সমাগম ।

চতুর্থ সর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষেপ

মেঘনাদবধ কাব্যে চতুর্থ সর্গ রচনার উদ্দেশ্য, সীতা ও সরমার কথোপকথনের মাধ্যমে সীতাহরণ এবং রামচন্দ্রের যুদ্ধায়োজনের বিবরণ উপস্থাপন করা। এই পূর্বকথা সংযোজিত হওয়ায় মেঘনাদবধ কাব্য কাহিনীগতভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে।

এই সর্গের সূচনায় মধুসূদন বাল্মীকিকে প্রণাম নিবেদন করিয়া আদিকবির আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বাল্মীকির প্রসাদে ভারতে যুগে যুগে বহু কবি অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন। ভর্তৃহরি, ভবভূতি, কালিদাস, মুরারি, কৃত্তিবাস—প্রভৃতি অমর কবিদের সমপর্যায়ে স্থান লাভের জন্য মধুসূদন বাল্মীকির দাক্ষিণ্য কামনা করিয়াছেন।

ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতি মনোনীত করা হইয়াছে। লঙ্কাবাসীর মনে আর কোনো আশঙ্কা নাই। তাহারা নিশ্চিত জানে, এবারে রামচন্দ্র পরাস্ত এবং বিতাড়িত হইবে। তাই সমগ্র লঙ্কা আজ রাত্রিতে উৎসব যাপন করিতেছে। উৎসব মুখরিত লঙ্কার এক প্রান্তে অশোক কাননে শুধু একটি মানুষ নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছেন, তিনি বন্দিনী সীতা। প্রহরায় রত চেড়ীর দল তাঁহাকে একাকী রাখিয়া উৎসবে যোগ দিতে গিয়াছে। এই সুযোগে শত্রু-পুরীতে সীতার একমাত্র সহমর্মী, বিভীষণ পত্নী সরমা আসিয়া সীতার পায়ের কাছে বসিলেন। সরমা সীতার ললাটে সিঁদুর পরাইয়া দিলেন, যেন গোধূলির ললাটে একটি তারা ফুটিয়া উঠিল। সীতার অঙ্গে একটিও অলংকার নাই। সরমা অলংকার অপহরণের জন্য রাবণকে ধিক্কার দিলে সীতা বলেন, রাবণ অলংকার অপহরণ করে নাই। রাবণ যখন তাঁহাকে অপহরণ করিয়া আকাশপথে লঙ্কায় লইয়া আসিতেছিল, তখন তিনি নিজেই অলংকারগুলি ফেলিয়া দেন। ওই চিহ্ন ধরিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে রামচন্দ্র আসিতে পারিবেন, এই আশাতেই দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া সরমা জানিতে চাহিলেন কী কৌশলে দুরাচার রাবণ সীতাকে পঞ্চবটী হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে।

মধুরভাষিণী সীতা পঞ্চবটীবনে রাম-লক্ষ্মণের সহিত অতিবাহিত তাঁহার পরম সুখের দিনগুলির কথা বিবৃত করিলেন। গোদাবরী নদীতীরে সেই

পঞ্চবটী বনে কুটির নির্মাণ করিয়া রাম-সীতা বাস করিতেন। লক্ষ্মণ সর্বদা তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। দণ্ডকারণ্যে আহার্যের কোনো অভাব ছিল না। লক্ষ্মণ নিয়ত প্রচুর ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, রামচন্দ্র কখনো কখনো মৃগয়ায় বাহির হইতেন। অরণ্যপ্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য রাজনন্দিনী রাজবধূ সীতার মন হইতে রাজপ্রাসাদের সুখস্মৃতি মুছিয়া দিয়াছিল। কোকিলের মিষ্টিগানে সকালবেলায় ঘুম ভাঙিত। ময়ূর-ময়ূরী দরজায় আসিয়া আনন্দে নৃত্য করিত। হস্তীশাবক, মৃগশিশু, বিচিত্র বর্ণের সব পাখি প্রত্যহ আসিয়া জুটিত। ফুলের অলংকারে সাজিয়া সীতা সরোবরের জল নিজের রূপ দেখিতেন। নির্বাসিত অরণ্যবাসের সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়া সীতা ব্যথিত বোধ করেন। তবুও না বলিয়া পারেন না। দুঃখী মানুষ নিজের দুঃখের কথা সহকর্মীকে না বলিয়া পারে না।

অরণ্যে সমাজ সংসার ছিল না ঠিকই। কিন্তু অরণ্যবাসী ঋষিদের পত্নীরা মাঝে মাঝে সীতার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। সীতার এক খেলা ছিল তরুর সহিত লতাদের বিবাহ দেওয়া। লতায় ফুল ফুটিলে ফুলগুলিকে নাতিনী বলিয়া আদর করিতেন। ফুলের কাছে ভ্রমর আসিলে ভ্রমরকে বলিতেন নাতনী জামাই। কখনো রামচন্দ্রের পায়ের কাছে বসিয়া নানা শাস্ত্রকথা শুনিয়া তৃপ্ত হইতেন। এমনি করিয়া সুখের দিনগুলি কাটিয়া যাইত।

নিরবচ্ছিন্ন সুখে এমনভাবে কতদিন কাটিয়া গেল। তারপর দেখা দিল দুর্যোগ। একদিন সরমার ননদিনী, রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা আসিয়া রামচন্দ্রকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। লক্ষ্মণ তাহাকে বিতাড়িত করিলে রাক্ষসেরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাম লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিতে আসিল। ঘোর যুদ্ধ শুরু হইল। ভয়ে সীতা তখন অচৈতন্য হইয়া পড়েন। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী রামচন্দ্র সীতাকে সাদর সম্ভাষণে জাগাইয়া তুলিলেন। রামচন্দ্রের সেই মধুর সম্ভাষণের কথা মনে পড়ায় সীতা তীব্র মনোকষ্টে সরমার কোলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। চেতনা লাভ করিয়া পুনরায় পূর্বকাহিনী শুরু করিলেন।

মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া আসিলে সীতা ওই মৃগ ধরিয়া দিতে রামচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র সিংহের মতো দ্রুতগতিতে সেই পলায়নপর মৃগের পিছনে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অকস্মাৎ দূর হইতে রামচন্দ্রের আর্তকণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি কালে? মরি আমি।" সীতা আকুল হইয়া লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের সন্ধানে যাইতে

অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে একাকী রাখিয়া যাইতে সম্মত হন নাই। কিন্তু সীতার তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া রামের সন্ধানে গেলেন। অনেক বেলা হইয়া গেল, রাম বা লক্ষ্মণ কেহ ফিরিলেন না। এমন সময়ে এক যোগী কুটির দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা চাহিল। সীতা তাহাকে রাম-লক্ষ্মণ ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইল। অগত্যা সীতা ঘরের বাহির হইয়া ভিক্ষা দিতে গেলেন। এ যোগী আর কেহ নয়, স্বয়ং রাবণ। সীতা ঘরের বাহিরে আসামাত্র সে ছদ্মবেশ ফেলিয়া বলপূর্বক সীতাকে রথের উপরে তুলিয়া লইল। ভয় দেখাইয়া, প্রলোভন দেখাইয়া সীতাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিল। ঝড়ের বেগে তাহার রথ আকাশপথ অতিক্রম করিয়া চলিল। রক্ষা লাভের উপায় নাই। সীতা অঙ্গের অলঙ্কারগুলি একে একে খুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ওই চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার সন্ধানে অগ্রসর হইতে পারিবেন, এই আশায় পথে পথে অলংকার ছড়াইয়া দিলেন। সীতা আকাশকে, বাতাসকে, ভ্রমরকে, কোকিলকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহার সংবাদ রামচন্দ্রের নিকট লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

বহুক্ষণ পরে অকস্মাৎ দেখা গেল প্রলয়ের কালো মেঘের মতো আকাশ আবৃত করিয়া পক্ষীরাজ জটায়ু রাবণের পুষ্পকরথের গতি রোধ করিতে আসিলেন। রাবণকে তিনি ধিক্কার দিয়া এই পাপকার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। সীতাকে ছাড়িয়া রাবণ জটায়ুর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইল। সীতা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না। মাটিতে পড়িয়া গেলেন। এ ঘোর বিপদে সীতা মাতা বসুন্ধরাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার অঙ্কে আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। পুনরায় তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

[এখানে মধুসূদন এক দীর্ঘ স্বপ্নবৃত্তান্ত যোগ করিয়াছেন। সীতা স্বপ্নে দেখিলেন, বসুন্ধরা আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন। এবং ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, সেই ঘটনা সীতার সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইল। প্রত্যক্ষভাবে সীতা যাহা জানেন না, সেইসব ঘটনা সীতার মুখ দিয়া বলানো অসঙ্গতি হইত। তাই কবি কৌশলে সীতার স্বপ্নবৃত্তান্তের মাধ্যমে ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়াছেন।]

অচেতন অবস্থায় সীতা দেখিলেন, মাতা বসুন্ধরা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। বসুন্ধরা বলিলেন, বিধির ইচ্ছাতেই রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে। পাপী রাবণের পাপের ভার দুঃসহ হওয়ায় বসুন্ধরা রাবণের বিনাশের জন্যই সীতাকে জন্ম দিয়াছিলেন। সীতা নির্যাতনের পাপে রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইবে, বসুন্ধরা ভারমুক্ত হইবে। এই কথা বলিয়া বসুন্ধরা ভবিতব্যদ্বার খুলিয়া দিলেন। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, সীতা তাহা দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে অপমানিত, রাজ্যচ্যুতি সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইল। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীকে হত্যা করিয়া রামচন্দ্র সুগ্রীবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুগ্রীব রামচন্দ্রকে সাহায্য করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বানর সেনা প্রস্তুত করিলেন। সেই বিপুল সৈন্যবাহিনী সমুদ্রের কূলে উপস্থিত হইল। বরুণ-দেবতা রামচন্দ্রের আদেশে সমুদ্রের উপরে সেতু নির্মাণ করিতে দিতে সম্মত হইল। বানর সেনারা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিল, শিল্পীদল মিলিয়া এক অপূর্ব সেতু নির্মাণ করিল। সেই সেতুর উপর দিয়া বিশাল বাহিনী সমুদ্র অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইল। রাবণের রাজসভায় বিভীষণ রাবণকে রামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাবণ তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া অপমান করিল। তারপরে সীতা যুদ্ধের দৃশ্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখেন। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া রাবণ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে আদেশ দিল। অকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ করিতে গেল। কিন্তু রামচন্দ্রের শরাঘাতে তাহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইল। লঙ্কায় শোকের ছায়া নামিল। সীতা তাঁহার শত্রুদের এ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া মাতা বসুধার নিকট কাতর অনুনয় করিয়াছিলেন। আবার নয়ন মেলিয়া সীতা দেখিলেন, সুরবালারা তাঁহাকে ডাকিয়া রাবণের মৃত্যু সংবাদ জানাইতেছে। তাহারা সীতাকে সাজসজ্জা করিয়া প্রস্তুতি হইতে অনুরোধ করিতেছে। সীতা বলিলেন, সাজসজ্জায় প্রয়োজন নাই। কাঙালিনী বেশেই সীতা স্বামীর নিকট যাইবেন। সুরবালারা সে নিষেধ শুনিল না। সাজিয়া প্রস্তুত হইতে অদূরে উদয়াচলের সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। ছুটিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন। সেই মুহূর্তেই স্বপ্ন শেষ হইয়া গেল।

বীণার তার ছিঁড়িয়া গেলে বীণা যেমন নীরব হইয়া যায়, সীতাও স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে তেমনি নীরব হইয়া গেলেন।

সরমা সীতাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, এ স্বপ্ন সত্য হইবে। রামচন্দ্রের সহিত সীতার মিলন হইবে। ইতিমধ্যে যুদ্ধে দেবদৈত্যনরত্রাস কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছে। বিভীষণ সর্বপ্রকারে রামচন্দ্রকে সাহায্য করিতেছেন। রামচন্দ্র জয়ী হইবেন। রাবণ অবশ্যই সবংশে বিনষ্ট হইবে।

সরমার আশ্বাসবাক্য শেষ হইলে সীতা আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া গেলেন। চোখ মেলিয়া সীতা দেখিলেন, সম্মুখে রাবণ দাঁড়াইয়া আছে, আর মহাপরাক্রমশালী জটায়ু বজ্রাঘাতে চূর্ণ গিরিশৃঙ্গের মতো মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছেন। গর্বিত রাবণ বলিল, দেখ, জগৎবিখ্যাত জটায়ু আজ আমার পরাক্রমে হীনায়ু। মুমূর্ষু জটায়ু মৃদু স্বরে বলিলেন, আমি ধর্মের পক্ষে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিতেছি। সম্মুখ সমরে মৃত্যুবরণ করিয়া স্বর্গে যাইতেছি। কিন্তু তোর কী দশা হইবে একবার ভাবিয়া দেখ। শৃগাল হইয়া তুই সিংহীকে কামনা করিয়াছিস। কে তোকে রক্ষা করিবে? এ নারীরত্ন চুরি করিয়া তুই ঘোর সংকট ডাকিয়া আনিয়াছিস।

এই কথা বলিয়া বীর জটায়ু নীরব হইলেন। রাবণ আবার সীতাকে রথের উপরে তুলিয়া লইল। সীতা জটায়ুকে বলিলেন, আমি জনকদুহিতা, রামচন্দ্রের দাসী। যদি রামচন্দ্রের সহিত দেখা হয়, তাহাকে বলিও এই পাপী আমাকে শূন্য ঘরে পাইয়া অপহরণ করিয়াছে।

রথ আকাশে উঠিল। সম্মুখে সমুদ্র দেখা গেল। সীতা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলেন। রাবণ তাঁহাকে বাধা দিল। আকাশপথে রথ ছুটিয়া চলিল। অবিলম্বে সম্মুখে লঙ্কাপুরী দেখা গেল। সমুদ্রের বুকে অপূর্ব সুন্দর এই লঙ্কাপুরী। কিন্তু যতোই সুন্দর হোক, সীতার পক্ষে এ কারাগার মাত্র।

সরমা সীতার বিবরণ শুনিয়া, চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, বিধির নির্বন্ধ কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। তবে বসুন্ধরা সীতাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সত্য হইবে। বিধির ইচ্ছাতেই রাবণ সীতাকে স্বর্ণলঙ্কায় আনিয়াছে। এই পাপে রাবণ সংবংশে বিনষ্ট হইবে। বীরপ্রসবিনী লঙ্কা আজ বীরশূন্য। ত্রিভুবন বিজয়ী যোদ্ধারা সব বিনষ্ট হইয়াছে। শবভুক পশুদের আজ উল্লাসের অন্ত নাই, লঙ্কায় শবদেহের অভাব নাই আজ।

ঘরে ঘরে বিধবার ক্রন্দন জাগিতেছে। সীতার দুঃখরজনী প্রভাত হইতে আর দেরি নাই। সীতা অচিরেই রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবেন। এই লঙ্কায় আসিয়া সীতা বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু সরমার কোনো অপরাধ নাই।

সীতা বলিলেন, সরমার মতো তাঁহার আর কে হিতার্থী আছে। সরমা মূর্তিমতী দয়া।

সরমা এবার সীতার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। সীতাকে ছাড়িয়া যাইতে মন চায় না। কিন্তু সরমার স্বামী রামচন্দ্রের অনুগত, সরমা আসিয়া সীতার সহিত কথা বলেন—একথা শুনিলে রাবণ মহাক্রুদ্ধ হইবে। সরমা সংকটে পড়িবেন সীতা সরমাকে দ্রুত ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। দূর হইতে কাহাদের পদশব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। হয়তো বা চেড়ীদল আবার ফিরিয়া আসিতেছে। আতঙ্কিতা হরিণীর মতো সরমা দ্রুত চলিয়া গেলেন। অরণ্যে একটিমাত্র ফুলের মতো সীতা একাকী সেই বনে বসিয়া রহিলেন।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মিকী! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!
তব পদ চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,

[১—২০] **পদাম্বুজে**—পদপদ্মে। অম্বুজ—পদ্ম। **বাল্মীকি**—ভারতবর্ষে বাল্মীকিকে আদি-কবি এবং তাঁহার রামায়ণকে আদি-কাব্য মনে করা হয়। অবশ্য প্রচলিত রামায়ণের সবই বাল্মীকির রচনা নয়, পরবর্তীকালে মূল রচনার সহিত নানা অংশ সংযুক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বাল্মীকি-রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। মধুসূদন যে সব কবির রচনা পাঠ করিয়া আনন্দ এবং প্রেরণালাভ করিতেন বাল্মীকি তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন: "I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante, Tasso and Milton. These কবিকুলগুরুs ought to make a fellow a first rate poet." রামায়ণ কাব্য হইতেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনেকদিন পরে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র একটি সনেটে কবি লেখেন:

"স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে:মোর; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে!
কে সে মূঢ় ভভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে!"

বিশেষভাবে মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা-চরিত্র চিত্রণে মধুসূদন

দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত-শমনে—
অমর ! শ্রীভর্তৃহরি ; সুরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর,কালিদাস—সুমধুর-ভাষী ; ১০

বাল্মীকিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। **দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে**—বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালের কতো কবি অমরত্বলাভ করিয়াছেন, 'ভব' বা পৃথিবীকে দমন করে যে দুরন্ত যম (শমন) সেই যমকে দমন করিয়া অমরত্বলাভ করিয়াছে। ভারতীয় কাব্য সাহিত্যে যুগে যুগে বাল্মীকি রামায়ণে নানা কাহিনী কবিবৃন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক যুগের কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' সেই কাহিনীরই এক আধুনিক যুগোচিত কাব্যরূপ। **শ্রীভর্তৃহরি**—প্রসিদ্ধ 'ভট্টিকাব্যে'র রচয়িতা, সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। 'ভর্তৃ' শব্দের প্রাকৃত রূপ 'ভট্টি', কবির নাম অনুসারেই কাব্যের নাম 'ভট্টি'কাব্য। চার কাণ্ডে বিভক্ত, বাইশ সর্গে সম্পূর্ণ এই কাব্যে রামের জন্ম হইতে সীতা উদ্ধার, লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজ্যে অভিষেক পর্যন্ত রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত আছে। মুখ্যতঃ কাব্যের মাধ্যমে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ভর্তৃহরি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাই সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই দুরূহ কাব্যের রসগ্রহণ সম্ভব নয়। ভর্তৃহরির আবির্ভাবকাল নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। অনুমান করা হয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগ হইতে সপ্তম শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো সময়ে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। **সুরী**—জ্ঞানী, বিদ্বান্। **ভবভূতি**—প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার। উৎকর্ষের বিচারে কালিদাসের পরেই ভবভূতির স্থান। ভবভূতির আত্মপরিচয় অনুসারে তাঁহার পিতার নাম নীলকণ্ঠ, মাতা জাতুকর্ণী। তাঁহার গ্রন্থাবলীর রচনাকাল ৭৩৬ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে—এইরূপ অনুমান করা হয়। রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'উত্তররামচরিত'। ইহা ভিন্ন 'মালতীমাধব' এবং 'মহাবীর-চরিত' উল্লেখ্য রচনা। 'উত্তররামচরিত' নাটকে সীতার বনবাস হইতে সীতার সহিত রামের পুনর্মিলন পর্যন্ত বারো বৎসরের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। **শ্রীকণ্ঠ**—ভবভূতি নিজের নাম শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন। টীকাকারেরা মনে করেন,শ্রীকণ্ঠ পরে ভবভূতি উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। **কালিদাস**—অভিজ্ঞান-শকুন্তল, বিক্রমোর্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব

মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর, কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার!—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে

মহাকাব্য এবং মেঘদূত ও ঋতুসংহার নামক খণ্ডকাব্য রচয়িতা বিখ্যাত কবি কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম ছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, কিন্তু যথার্থ ঐতিহাসিক পরিচয় আজও জানা যায় নাই। মধুসূদন ইঁহাকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়াছেন। বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন কালিদাসের কাব্য হইতে আপন রচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন ('দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী'), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে কয়েকটি কালিদাসের কাব্য ও নাটকের প্রশস্তি আছে, মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে পার্বতী কর্তৃক শিবের ধ্যানভঙ্গ স্পষ্টতঃ কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের বর্ণনা অনুসরণে রচিত। **মুরারি……মুরারি**—'অনর্ঘরাঘব' নাটক রচয়িতা কবি মুরারি সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাঁহার রচনা শ্রীকৃষ্ণের (মুরারি) বাঁশির ধ্বনির মতো মনোহর। মুরারি সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর শেষ বা দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার 'অনর্ঘরাঘব' রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত সপ্তাঙ্ক নাটক। **কৃত্তিবাস**—বাঙলা রামায়ণের কবি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা 'শ্রীরামপাঞ্চালী' বাল্মীকির রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। রামায়ণের গল্প বাঙলাদেশে যে রূপে প্রচলিত ছিল তাহাই কৃত্তিবাস বর্ণনা করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের জীবৎকাল সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় নাই। তবে তাঁহার জীবৎকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে নয়—এইটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের কোনো কোনো অংশে কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়াছিলেন; যেমন, কাব্যের সূচনায় বীরবাহুর বীরত্বের বিবরণে। **কীর্ত্তিবাস**—কীর্তি বা সুকৃতির আবাস যাহাতে, কবি কৃত্তিবাসের বিশেষণরূপে শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। **কবিতা রসের……তুমি**—কাব্যরসের সরোবরে যে সব মহাকবি রাজহংসের মতো খেলা (=কেলি) করেন, তুমি (বাল্মীকি) শিখাইয়া না দিলে তাঁহাদের সহিত মিলিয়া খেলা করিব কী উপায়ে।

তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি
নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর
অকিঞ্চনে।—২০
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা ! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক ; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে !
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে !
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা
ফল-ফুলে ;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি ;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে
কল্লোলে, ৩০
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে
চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,

রত্নাকর—সমুদ্র। অথবা, বাল্মীকি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুসারে কবিত্ব-লাভের পূর্বে বাল্মীকি দস্যু ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল রত্নাকর। **অকিঞ্চনে**—যার কিছুই নাই, দরিদ্র।

[২১—৩১] **ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে**—কাহিনীর পূর্বসূত্র স্মরণীয়। বীরবাহুর মৃত্যুতে লঙ্কার উপরে যে শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে। মেঘনাদ সৈন্য পরিচালনার দায়িত্বলাভ করিয়াছে। সকলের নিশ্চিত ধারণা এবারে রামচন্দ্র পরাজিত এবং বিতাড়িত হইবে। তৃতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে, মেঘনাদের সহিত প্রমীলা আসিয়া মিলিয়াছে। তাই লঙ্কাবাসীদের আনন্দের সীমা নাই। এই গীতবাদ্যমুখরিত আনন্দময় পরিবেশের বৈপরীত্যে অশোককাননে বন্দিনী সীতার বিষণ্ণতা মর্মস্পর্শী হইয়া ওঠে। বৈপরীত্য সৃষ্টির জন্যই কবি বিশেষভাবে লঙ্কার আনন্দ উৎসবের কথা বলিয়াছেন। **রত্নহারা**—রত্নময় হার যাহার। **নায়কী**—নায়িকা। **সুরতে রত**—রতিক্রীড়ায় রত। **শীধু**—মদ। **গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ**—গৃহশীর্ষে পতাকা (ধ্বজ) উড়িতেছে।

[৩২—৪৫] **ফিরেন নিদ্রা……আলয়ে**—উৎসবমত্ত লঙ্কাবাসীর চোখে আজ নিদ্রা নাই। 'নিদ্রা' যেন দরজায় ঘুরিতেছে, কিন্তু কেহ তাহাকে গৃহে

বিরাম-বর প্রার্থনে !—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিত কালি রামে, মারিবে লক্ষণে ;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে ; আনিবে
বাঁধিয়া
বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া
চাঁদেরে
রাহু ; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে ;" আশা,
মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-
সলিলে ? ৪৫
একাকিনী শোকাকুলা,
অশোক-কাননে;

প্রবেশ করিতে আহ্বান করিতেছে না। **পলাইবে......রাহু**—লঙ্কাপুরীকে চাঁদের সহিত উপমা দিয়া বলা হইতেছে রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত লঙ্কা আজ যেন রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতো। আগামীকাল ইন্দ্রজিৎ এই শত্রুদের বিতাড়িত করিয়া লঙ্কাকে রাহুমুক্ত করিবে। **সুধাংশু**—চাঁদ।

[৪৬—৫৫] **একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে**—রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিয়া লঙ্কার অন্তর্গত অশোক-কাননে বন্দী করিয়া রাখেন। বাল্মীকি-রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অশোক-কাননে বন্দিনী সীতার বিবরণ আছে। হনুমান সীতা অন্বেষণে লঙ্কায় আসিয়া সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়া শেষে অশোক-কাননে প্রবেশ করে। বিবিধ বৃক্ষ এবং সর্বঋতুর পুষ্পে সুশোভিত বিশাল বনের মধ্যে একস্থানে অকস্মাৎ হনুমান সীতাকে দেখিতে পায় ? "সহসা হনুমান দেখতে পেলেন, সেই বৃক্ষের মূলে রাক্ষসী পরিবেষ্টিত এক রমণী বসে আছেন, তাঁর দেহ উপবাসে কৃশ, রূপ ধূমজালমণ্ডিত অগ্নিশিখার ন্যায়, পরিধানে একটিমাত্র মলিন পীত বসন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিষণ্নবদনে বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। তিনি যেন সন্দেহাকুল স্মৃতি, নিপতিত সমৃদ্ধি, বিহত শ্রদ্ধা, প্রতিহত আশা, মিথ্যা-অপবাদগ্রস্ত কীর্তি। হনুমান অনুমান করলেন, ইনিই সীতা, কারণ, রাম যে সকল ভূষণের কথা বলেছিলেন তা এঁর সঙ্গে রয়েছে, অন্যান্য ভূষণ ও উত্তরীয় যা ঋষ্যমূকে ফেলে দিয়েছিলেন তা নেই।......বাষ্পাকুল নয়নে হনুমান ভাবতে লাগলেন, স্বভাব বয়স ও আভিজাত্যে ইনি রামেরই যোগ্যা।......সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত রাম যদি শশাগরা পৃথিবী বিপর্যস্ত করেন তাও উচিত হবে। সীতার অংশমাত্রের সঙ্গেও ত্রিলোকের সমস্ত রাজ্যের তুলনা হয় না" (রাজশেখর বসু অনূদিত)।

কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে ! দুরন্ত চেড়ী সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী ৫০
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে !
মলিন-বদনা দেবী,হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি,
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপি যথা ! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে যেন তরু,তাপি মনস্তাপে, ৬০
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,

চেড়ী—নারী প্রহরী। **হীন-প্রাণা হরিণীরে......দূর বনে**—বাঘিনী হরিণীকে আহত করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যেমন নিশ্চিন্ত মনে দূর বনে যায়, অর্থাৎ হরিণীর পক্ষে পলায়ন আর সম্ভব নয় জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, প্রহরায় নিযুক্ত রাক্ষসীরাও সেইরূপ সীতাকে একাকী রাখিয়া উৎসবে যোগ দিতে গিয়াছে। প্রহরী নাই, এই সুযোগে বিভীষণ-পত্নী সরমা সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। **খনির তিমির গর্ভে···সূর্যকান্ত মণি**—সূর্যকান্ত মণি বা আতস মণি যখন অন্ধকার খনিগর্ভে থাকে তখন তাহাকে যেমন মলিন দেখায়, সীতাকে সেইরূপ মলিন দেখাইতেছে। বাল্মীকি বন্দিনী সীতার মলিন রূপের উপমা দিয়াছিলেন ধূমজালমণ্ডিত অগ্নিশিখার সহিত। **বিম্বাধরা ......তলে**—বিম্ব বা তেলাকুচা ফলের মতো লাল ঠোঁট যাহার সেই লক্ষ্মী (=রমা) যখন সমুদ্রের তলে ছিলেন তখন তাঁহার স্ত্রী যেমন মালিন্যমণ্ডিত ছিল, বন্দিনী সীতাকে সেইরূপ মলিন বলা হইয়াছে। পুরাণ অনুসারে দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র ত্রিভুবন জয়ে বঞ্চিত হইলে সর্ব সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করেন। সমুদ্রমন্থনের সময়ে লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে উত্থিতা হন এবং বিষ্ণুর সহিত মিলিত হন।

[৫৬—৭১] **স্বনিছে**—শব্দ করিতেছে। **বিলাপী যথা**—দুঃখী মানুষ যেমন রহিয়া রহিয়া বিলাপ করে, তেমনি রহিয়া রহিয়া বাতাস শব্দ করিতেছে। **তাপি মনস্তাপে সাজ**—গাছের নিচে রাশি রাশি ঝরা ফুল পড়িয়া আছে। যেন মনের দুঃখে গাছ নিজের অঙ্গসজ্জা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ,ফুলগুলি ঝরাইয়া ফেলিয়াছে। **প্রবাহিণী**—নদী। **বীচি-রবে**—তরঙ্গের শব্দে।

কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী!
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর
বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী—৭০
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে!
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর-স্বরে; "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে
নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি
নিশা-কালে;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার
কি সাজে
এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট
লঙ্কাপতি! ৮০
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ! কেমনে হরিল

বারীশে—বারি বা জলের ঈশ্বর, অর্থাৎ সমুদ্রকে। **না পশে সুধাংশু অংশু**—সেই ঘোর অশোকবনে চাঁদের কিরণ প্রবেশ করে না। **সরমা**—রাবণের সহোদর বিভীষণের স্ত্রী সরমা গন্ধর্ববরাজ শৈলুষ-এর কন্যা। মানস সরোবরের তীরে সরমার জন্ম হয়। বর্ষায় ক্রমবর্ধমান সরোবরের জল নবজাত কন্যার কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া শৈলুষ-এর স্ত্রী বলিয়া ওঠেন, সরঃ মা বর্দ্ধত। অর্থাৎ, সরোবর, আর তুমি বর্ধিত হইও না। এইজন্য কন্যার নাম হয় সরমা। রাক্ষসপুরীতে সরমা রাবণের আদেশে সীতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি সীতার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতেন এবং সীতার হিতার্থী ছিলেন। বাল্মীকি-রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে বর্ণিত আছে, রাবণ সীতাকে রামচন্দ্রের মায়া-মুণ্ড দেখাইয়া রামচন্দ্রের মৃত্যুর কথা জানাইলে এই মিথ্যা সংবাদে সীতা কাতর হন। সেই সময়ে সরমা সীতাকে সান্ত্বনা দেন এবং বলেন রাবণ ছলনা করিয়া সীতাকে বিমোহিত করিয়াছেন। রামচন্দ্রের মৃত্যু হয় নাই। তিনি সসৈন্যে সমুদ্রের দক্ষিণ-তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে, সরমা আকাশপথে অদৃশ্যভাবে সর্বত্র বিচরণ করিতে পারিতেন।

[৭২—৮৩] **এয়ো তুমি**—সরমা সীতাকে বলিতেছেন, তুমি সধবা, তোমার

ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিল ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে,আহা! তারা-রত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি ৯০
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশ দিশ। মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী ;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে ?" ১০০

এমন বেশে থাকা উচিত নয়। সরমা সিন্দুর আনিয়াছেন সীতাকে পরাইবার জন্য। **বরাঙ্গ**—সুন্দর অঙ্গ।

[৮৩—১০০] **সীমন্তে**—সিঁথিতে। **সুবর্ণ দেউটি যেন**—সরমা সীতার পায়ের কাছে বসিলেন। যেন তুলসীতলায় সোনার দীপটি জ্বালাইয়া রাখা হইল। **বিধুমুখী**—চন্দ্রমুখী বা চন্দ্রের মতো সুন্দর মুখ যাহার, সরমা। **ছড়াইনু পথে সে সকলে**—সরমা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, রাবণ কী দুষ্টমতি, সীতার এমন সুন্দর অঙ্গ হইতে সে সব অলংকার হরণ করিয়াছে। সীতা বলিতেছেন, অলংকার রাবণ হরণ করে নাই। রাবণ যখন তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া আসে তখন সীতা নিজেই একে একে সব অলংকার খুলিয়া ফেলেন। ওই চিহ্ন অনুসরণ করিয়া অনুসন্ধানকারীরা তাঁহার সন্ধান করিবে—এই উদ্দেশ্যে তিনি অলংকার পথে পথে ছড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যে সীতার এই উক্তির সমর্থন মেলে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের বিবরণে। সেখানে আছে, "জনশূন্য অরণ্য প্রদেশের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সীতা একটি পর্বতশৃঙ্গে পাঁচটি বানর দেখতে পেলেন। তারা রামকে সংবাদ দেবে এই আশায় তিনি তাঁর কনকবর্ণ উত্তরীয় ও আভরণ সকল ফেলে দিলেন, রাবণ তা জানতে পারলেন না" (রাজশেখর বসু অনূদিত)। **যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে**—সীতা বলিতেছেন পৃথিবীতে এমন কি মণি-মুক্তা আছে যাহা রামচন্দ্রকে পাইবার জন্য অবহেলা করা না যায়।

কহিলা সরমা ; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে !
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর ? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে ১১০
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে ১২০
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।

[১০১—১১১] **কেমনে হরিল তোমারে রক্ষেন্দ্র**—মধুসূদনের উদ্দেশ্য চতুর্থ সর্গে এই কাব্যের বর্ণনীয় আখ্যানের পূর্বসূত্রটি ধরাইয়া দেওয়া। রামচন্দ্র ও সীতার সমগ্র জীবনী নয়, শুধু রাবণ-কর্তৃক সীতা হরণের ঘটনাটিই এই কাব্যের পক্ষে প্রাসঙ্গিক পূর্বসূত্র। তাই সীতার স্বয়ংবর বা বনে যাওয়ার ঘটনা নয় রক্ষেন্দ্র (রাবণ) কীভাবে সীতাকে হরণ করিয়াছিল আজ তাহাই সরমা শুনিতে চাহিলেন।

[১১২-১২৮] ··**গোমুখরী মুখে···মধুরভাষিণী সীতা**—গোমুখী হিমালয়স্থিত গোরুর মুখের মতো একটি গহ্বর, এই গহ্বর দিয়া গঙ্গানদী প্রবাহিত। গোমুখী হইতে যেমন মধুর শব্দে (=সুস্বনে) পবিত্র (=পূত) বারিধারা ঝরে, সেইরূপ সীতার মুখে উচ্চারিত বাণী সেইরূপ পবিত্র ও শ্রুতিমধুর। **গোদাবরী তীরে···নাম পঞ্চবটী**—"রাম পঞ্চবটীতে এসে আশ্রম নির্মাণের উপযুক্ত একটি স্থান মনোনীত ক'রে লক্ষ্মণের হাত ধরে বললেন, এই স্থান সমতল এবং পুষ্পিত তরুতে বেষ্টিত, এখানেই আশ্রম নির্মাণ কর। নিকটেই পদ্মশোভিত সরোবর রয়েছে। ওই দেখ গোদাবরী নদী অধিক দূরে, অতি নিকটেও নয়।...শাল তাল তমাল খর্জুর

সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে !
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে, ১৩০
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি !
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী।
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোহার সম, রামা আছে কি জগতে ? ১৪০
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,

পনস পুন্নাগ আম্র অশোক চম্পক চন্দন প্রভৃতি বহুপ্রকার বৃক্ষ রয়েছে, মৃগ-পক্ষীও প্রচুর, আমরা এই রমণীয় স্থানে জটায়ুর সহিত বাস করব।" (রাজশেখর বসু অনূদিত রামায়ণ)। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, আমলকী ও অশোকবৃক্ষের বনকে বলা হয় পঞ্চবটী। **দণ্ডক**—দণ্ডকারণ্য।

[১২৯—১৫২] **রঘু-কুল-বধূ-আমি**—সূর্যবংশীয় রাজা দিলীপের পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ, অজ-এক পুত্র দশরথ। এই রঘুর নামেই রামচন্দ্রের বংশের নাম রঘুবংশ। সীতা আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে নিজেকে রঘুবংশের বধূ বলিতেছেন। **পিক**—কোকিল। **বৈতালিক**—স্তুতিপাঠক। **শিখী**—ময়ূর। **রামা**—সুন্দরী নারী। **করভ**—হস্তিশাবক। **যথা বাসবের ধনু**—মেঘের (=ঘন) উপরে ইন্দ্রের (=বাসব) ধনুর মতো। সীতার কুটিরে বিচিত্র বর্ণের পাখিরা আসিত। এইসব পাখির দেহবর্ণ ইন্দ্রধনুর বর্ণের মতো। **মরুভূমে স্রোতস্বতী**—নদী যেমন মরুভূমিতে তৃষার্তদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত করে, সীতা

আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে
(অমূল রতন-সম) পরিতাম
কেশে; ১৫০
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব
প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছাড় জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজিব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার
সমীপে?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা
নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি
রক্ষোবধূ ১৬০
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে; কি কাজ
স্মরিয়া?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা!); "এ অভাগী, হায়, লো,
সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এজগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর
অতিক্রমি, ১৭০
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছ সীতার আর এ অরক্ষ-
পুরে?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর
-বালা-কেলি ১৮০
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ

সেইরূপ এই বন্যপ্রাণীদের যত্নে পালন করিতেন। **সরসী আরসি মোর**—সরোবরের স্বচ্ছ জল ছিল আমার আয়না। **কুবলয়**—পদ্মফুল।

[১৫৩—১৭৪] **আশার সরসে রাজীব**—আশার সরোবরে পদ্ম অর্থাৎ রামচন্দ্র। **তিতি**—ভিজিয়া। **কাদম্বা**—কলহংসী। **অরক্ষপুরে**—শত্রু-পুরীতে।

[১৭৫—২০২] **কান্তার-কান্তি**—কান্তারের বা নিবিড় অরণ্যের সৌন্দর্য। **সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা কেলি পদ্মবনে**—পদ্মবনে সূর্যকিরণ খেলা

সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে ১৯০
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে
আদরে ২০০
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা
কেমনে?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী;—
শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,

করিত, মনে হইত যেন দেবকন্যারা পদ্মবনে খেলা করিতেছে। **সুধাংশুর অংশু যেন**—সীতার কুটিরে কখনো কখনো ঋষি-পত্নীরা আসিতেন। তাহারা অন্ধকার (নিরানন্দ) কুটিরে যেন চাঁদের কিরণ বহন করিয়া আনিতেন। **অজিন**—মৃগচর্ম, পশুচর্ম। **কুরঙ্গিণী**—হরিণী। **আনন্দে সম্ভাষি নাতিনী বলিয়া সবে**—তরুর সহিত লতার বিবাহ দিতাম। ফুল ফুটিলে ফুলগুলিকে নাতনী বলিয়া আদর করিতাম। **নাতিনী-জামাই**—ফোটা ফুলের কাছে ভ্রমর আসিলে ভ্রমরদের বলিতাম নাতনী-জামাই। **ব্রততী ....মূলে**—বিরাট আমগাছের (=রসল) মূলে লতার (ব্রততী) মতো আমি রামচন্দ্রের পদমূলে বসিতাম।

[২০৩—২২০] **ব্যোমকেশ**—শিব। **আগম**—তন্ত্রশাস্ত্র। **আয়ত-লোচনা**—বড় চোখ যাহার। **রাঘব-রমণি**—রাঘব বা রামের স্ত্রী, সম্বোধনে-

ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবী, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে! ২২০
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্ব জন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি ২৩০
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেখ সুধানিধি!
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"
কহিলা রাঘব-প্রিয়া; "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে!

'পি'। **রবিকর যবে, দেবী……সমাগমে**—সরমা বলিতেছেন, সীতার বনবাসের এ অপূর্ব কাহিনী শুনিয়া রাজপ্রাসাদের সুখভোগে ঘৃণা জন্মে, ওই আনন্দময় বনবাস কাম্য মনে হয়। কিন্তু সীতার মতো নারীর উপস্থিতিতেই বনভূমি অমন সুখময় হইয়া উঠিয়াছিল। সূর্যের রশ্মি অন্ধকার বনে প্রবেশ করিয়া বনকে যেমন আলোকিত করে, সীতাও তেমনি বনভূমিতে আনন্দের আলো বিকিরণ করিয়াছিলেন। তুলনায়, সরমা নিজেকে মনে করেন অন্ধকারময় রাত্রির মতো। রাত্রি যেমন যেখানেই যায়, বিষণ্ণ অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, সেইরূপ সরমা যদি আনন্দময় দেশেও যান—সেখানে হয়তো অন্ধকারের মালিন্য সঞ্চারিত হইবে।

[২২১—২৫০] **শুনিয়াছি বীণাধ্বনি……কভু এ জগতে**—সরমা বলিতেছেন, তিনি বীণা শুনিয়াছেন, বসন্তে নবপল্লবের ভিতর হইতে ভাসিয়া আসা কোকিলের গান শুনিয়াছেন, কিন্তু সীতার কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণীর মতো মাধুর্য আর কিছুতে অনুভব করেন নাই। এমন কি আকাশের চাঁদ, যে নিজেই সুধার আধার, সেও সীতার বাক্যসুধা পান করিয়া তৃপ্ত হইতেছে। **সূর্পণখা**—রাবণ ও কুম্ভকর্ণ সূর্পণখার

শয়নে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা! ধিক তারে! নারী-কুল-
কালি। ২৪০
চাহিল মারিয়া মোরে বধিতে বাঘিনী
রঘুবরে। ঘোর রোষে সৌমিত্রী কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টংকারে, সখি, কত যে কাঁদিনু
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু
ভূতলে। ২৫০
"কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে!) কহিল কান্ত; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ! এই কি শয্যা সাজে হে
তোমারে,

বড়ো এবং বিভীষণ তার ছোট ভাই। তার স্বামীর নাম বিদ্যুৎজিহ্ব। রাবণ দিগ্বিজয়ের সময়ে ভুল করিয়া বিদ্যুৎজিহ্বকে হত্যা করে। ভগিনীর বৈধব্যের কারণ হওয়ায় অনুতপ্ত রাবণ সূর্পণখাকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিহারের অনুমতি দেয় এবং খর ও দূষণ নামে দুই সেনাপতিকে তাহার রক্ষার্থে নিযুক্ত করে। বাল্মীকি-রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে আছে, একদিন সূর্পণখা রামচন্দ্রকে দেখিয়া মোহিত হয় এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করে। রাম কৌতুক করিয়া বলেন সূর্পণখার উচিত অবিবাহিত লক্ষ্মণকেই বিবাহ করা। লক্ষ্মণ ফিরিয়া রামচন্দ্রকে বিবাহ করিতে বলে। এই কৌতুক বুঝিতে না পারিয়া রুষ্ট সূর্পণখা ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তখন লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে বিতাড়িত করে। অপমানিত সূর্পণখা খর ও দূষণকে সংবাদ দিলে রাক্ষসদের দ্বারা রামচন্দ্র আক্রান্ত হন এবং এই যুদ্ধে দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসেরা সকলে নিহত হয়। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ রাবণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সীতাহরণের আয়োজন করে। সীতাহরণ হইতেই রামায়ণের মূল ঘটনা রাম-রাবণের বিরোধ-এর উৎপত্তি।

[২৫১—২৬০] **রঘুশ্রেষ্ঠ**—রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ রামচন্দ্র। **স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম কাননে বসন্তে**—যেমন বসন্তকালে কুসুম কাননে মৃদু বাতাসের শব্দ ওঠে সেইরূপ মৃদুস্বরে রামচন্দ্র সীতাকে সংবোধন করিয়াছিলেন।

হেমাঙ্গি ?' সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি ?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী ; ধরিল সরমা ! ২৬০
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ি ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে !
কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি ; "ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি ! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি !" উত্তর করিলা
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-
বাসনা ;—২৭০
"কি দোষ তোমার, সখি ? শুন মনঃ
দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি !)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি ! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুৎ-আকৃতি
পলাইলা মায়ামৃগ, কানন উজলি,

[২৬১—২৮১] **যথা যবে……সরমার কোলে**—পূর্বকথা বর্ণনা করিতে করিতে রামচন্দ্রের আদরপূর্ণ ব্যবহারের স্মৃতি সীতাকে বেদনায় অধীর করে, তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন। সীতার মূর্চ্ছার ঘটনাটির উপমায় কবি বলিতেছেন, বনের মধ্যে ব্যাধ পাখির সুমধুর স্বর শুনিয়া সেই স্বর লক্ষ করিয়া তীর হানিলে পাখি যেমন আঘাতে ছটফট করিতে করিতে মাটিতে পড়ে, সেইরূপ পূর্ব সুখ-স্মৃতি স্মরণ করিয়া যন্ত্রণা-কাতর সীতা সরমার কোলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। **মৈথিলি**—মিথিলার রাজকন্যা সীতা, সম্বোধনে 'লি'। **মারীচ**—হিরণ্যকশিপুর বংশে সুন্দ নামক অসুরের পুত্র মারীচ রাবণের অনুচর ছিল। যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদনকারী মারীচকে দমন করিবার জন্য দশরথ রামচন্দ্রকে পাঠান এবং রাম তাহাকে পর্যুদস্ত করেন। রামচন্দ্রের বনবাসকালে মারীচ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তীক্ষ্ণশৃঙ্গধারী মৃগের ছদ্মরূপে রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণকে আক্রমণ করে। রামের শরাঘাতে মারীচের সঙ্গী অপর দুই রাক্ষস নিহত হয়, মারীচ কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া যায়। ইহার পর মারীচ তপস্বী সাজিয়া আশ্রম নির্মাণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করিত। সীতাহরণে উদ্যত রাবণ তাহার সাহায্য চাহিলে রামচন্দ্রের ভয়ে সে প্রথমে সম্মত হয় নাই। রাবণ তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইলে সম্মত হয়। মারীচ রাবণকে এই দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, বলিয়াছিল, এই কাজের ফলে আপনার পুত্র রাজ্য অমাত্য সকলই

বারণারি-গতি নাথ ধাইলা
পশ্চাতে—২৮০
হায়রে নয়ন-তারা আমি অভাগিনী।
"সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-
কালে ?
মরি আমি।' চমকিলা সৌমিত্রী
কেশরী !
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি ;—
'যাও বীর ; বায়ু-গতি পশ এ কাননে ;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া
উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি !'

কহিলা সৌমিত্রি ; 'দেবি, কেমনে
পালিব ২৯০
আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে
কহিতে ?
কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে
হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে ?'—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ ; 'মরি আমি ! এ বিপত্তি-
কালে
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই ? কোথায়
জানকি ?'

বিনষ্ট হইবে। রাবণ সৎ পরামর্শে কর্ণপাত করে নাই। অবশেষে রাবণের ভীতিপ্রদর্শনে মারীচ নিতান্ত অনিচ্ছায়, 'রামের হাতে মরিলে আমি কৃতার্থ হইব' —এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বর্ণমৃগের ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া সীতাহরণে রাবণকে সাহায্য করে। **বারণারি গতি**—'বারণ' অর্থ 'হস্তী'। হস্তীর অরি বা শত্রু সিংহ। বারণারি=সিংহ, সিংহের গতি। রামচন্দ্র সিংহের মতো দ্রুতগতিতে মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটিলেন।

[২৮২—৩১৬] **হিংসিতে**—হিংসা করিতে। **রঘুবংশ অবতংশ**—রঘু-বংশের অলংকার, অর্থাৎ, রামচন্দ্র। **ভৃগুরাম-গুরু বলে**—শক্তিতে ভৃগুবংশ-জাত রাম বা পরশুরামের গুরুতুল্য। বাল্মীকি-রামায়ণের বালকাণ্ডে আছে মহেন্দ্র পর্বতে তপস্যারত পরশুরাম রামচন্দ্র কর্তৃক হরধনু ভঙ্গের বার্তা পাইয়া রামচন্দ্রের কাছে আসেন এবং নিজের ধনু দিয়া তাহাতে শর যোজনা করিতে আহ্বান করেন। রামচন্দ্র পরশুরামের তেজ হরণ করিয়া ব্রহ্মলোক ইত্যাদি বিভিন্ন লোকে বাস করিবার শক্তি বিনষ্ট করেন। পরশুরাম রামচন্দ্রকে বলেন, তুমি আমার ধনু গ্রহণ করা মাত্র বুঝিতে পারিয়াছি তুমি সুরেশ্বর মধুসূদন।

ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি!
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু
কুক্ষণে :— ৩০০
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি
তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি!
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে?' ক্রোধ-ভরে, আরক্ত নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া
কহিলা; - ৩১০
'মাতৃ সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম! তেঁই সহি বৃথা এ গঞ্জনা!
যাই আমি! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ
মম;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু
তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া
বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর
তোমারে?
বাড়িতে লাগিলা বেলা; আহ্লাদে
নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত, ৩২০

তোমার কাছে এ পরাজয়ে আমার কোনো লজ্জা নাই। **সুমিত্রা শাশুড়ী মোর …… দূর বনে**—মারীচ রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া আর্তনাদ করিলে সীতা উতলা হইয়া লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের সাহায্যে যাইতে বলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে একাকী রাখিয়া যাইতে অসম্মত হইলে সীতা তাঁহাকে তিরস্কার করেন। মধুসূদন সীতার মুখে যে তিরস্কারের ভাষা দিয়াছেন বাল্মীকি-রামায়ণে ইহার চেয়ে অনেক বেশি কটূক্তি আছে। সীতা বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ তুমি আমাকে পাইবার লোভে রামচন্দ্রের মৃত্যু কামনা করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি ভরতের প্ররোচনায় পাপ অভিপ্রায় গোপন করিয়া আমাদের সহিত বনে আসিয়াছ। তোমার বা ভরতের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। রামচন্দ্র যদি নিহত হন, আমিও আত্মহত্যা করিব, পরপুরুষ স্পর্শ করিব না। এইরূপ উক্তি করিয়া সীতা আপন উদরে করাঘাত করিয়া রোদন করেন। তখন মর্মাহত ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ তাঁহাকে একাকী রাখিয়া রামচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মধুসূদন সীতার আশঙ্কা ব্যাকুলতাই প্রকাশ করিয়াছেন, সীতার মুখে কোনো অশালীন কথা দেন নাই। **শূর**—বীর।

সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লোটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?
"কহিল মায়াবী; 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।' ৩৩০
আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে ৩৪০
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?

[৩১৭—৩৩০] **চমকি দেখিনু যোগী···শিরে জটা**—লক্ষ্মণ চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছদ্মবেশধারী রাবণ উপস্থিত হয়। রাবণের তপস্বীর বেশ। তাহাকে অগ্নি (=বৈশ্বানর) দেবতার মতো তেজস্বী দেখাইতেছিল। তাহার অঙ্গ ভস্মে (=বিভূতি) লিপ্ত। হাতে কমণ্ডলু। মাথায় জটা। এখানে মূল রামায়ণের বর্ণনা স্মরণীয়: "রাবণ পরিব্রাজকের রূপ ধরে সীতার কাছে এলেন, যেন মহাতম সূর্যহীন সন্ধ্যায় সন্নিহিত হল। তার পরিধানে সূক্ষ্ম কাষায় বস্ত্র, মস্তকে শিখা, হস্তে ছত্র, পদে পাদুকা, বাম স্কন্ধে যষ্ঠি ও কমণ্ডলু। তাকে দেখে বৃক্ষসকল নিস্পন্দ হল, বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হল, শীঘ্রস্রোতা গোদাবরী নদী ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চলতে লাগল।" **ফুল-রাশি······কালসাপ-বেশে**—কোমল সৌন্দর্যে পূর্ণ ফুলের রাশির মধ্যে যেমন কালসাপ লুকাইয়া থাকে, যোগীবেশের অন্তরালেও তেমনি ছিল ভয়ঙ্কর রাবণ।

[৩৩১—৩৪৮] **অজিনাসনে**—মৃগচর্ম বা পশুচর্মের আসনে। **সৌমিত্রি**

দেহ ভিক্ষা ; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায়
লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু
ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে ; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি ;
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে ; দূর গুল্ম-
পাশে ৩৫০
চরিতেছিল হরিণী ! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ , ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে ?
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তু'লি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে !
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-
কালে। ৩৬০
পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি ; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা !
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন ! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ ; বারি-ধারা দমে কি
তাহারে ?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে
হিয়া ?
"দূরে গেল জটাজূট ; কমণ্ডলু দূরে !
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর
স্বরে, ৩৭০
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা !
"চালাইলা রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভাগে,

—সুমিত্রার পুত্র, লক্ষ্মণ। **সীতাকান্ত অরি**—সীতার কান্ত=রাম, রামের অরি বা শত্রু=রাবণ। **ভাসুর তব**—সরমার ভাসুর অর্থাৎ রাবণ।

[৩৪৯—৩৭১] **ইরম্মদাকৃতি**—বজ্রাগ্নির আকৃতি। **হুতাশন তেজে... তাহারে**—আগুনের (=হুতাশন) তীব্র দাহিকা শক্তিতে লোহা গলিয়া যায়, বৃষ্টিধারা সে তেজময় আগুনের শক্তি দমন করিতে পারে না। সেইরূপ সীতার বিবাদে বনদেবীরা ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে ক্রন্দন রাবণের শক্তিকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। **শরমে ইচ্ছি মরিতে**—লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

[৩৭২—৩৯০] **কাল-সর্প-মুখে কাঁদে যথা ভেকি**—সাপে ব্যাঙ ধরিলে ব্যাঙ যেমন অসহায় ক্রন্দন করে, রাবণ কর্তৃক ধৃত সীতাও তেমনি বৃথা অসহায়

বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজি, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদে; প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি,
কণ্ঠমালা, ৩৮০
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চি; ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি,
রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা
সরমা,—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি;
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা;
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো
ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর
শুনিবে? ৩৯০
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি।
"হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা

ক্রন্দন করিলেন। **প্রভঞ্জন বলে…কপোতী**—ঝড়ের (=প্রভঞ্জনের) বেগে যখন গাছ মড় মড় শব্দে আন্দোলিত হইতে থাকে তখন যেমন পায়রার ডাক (=কুহর) শোনা যায় না, সেইরূপ রাবণের রথের প্রচণ্ড গর্জনে সীতার ক্রন্দন স্বর কেহ শুনিতে পাইল না। **ফাঁফর**—হতবুদ্ধি। **কুণ্ডল**—কানে পরিবার গহনা। **কাঞ্চী**—কোমরের অলংকার, বিছা। **তেঁই লো দশাননে**—অপহৃতা সীতা গায়ের গহনাগুলি একে একে খুলিয়া পথে ফেলিয়াছিলেন। ওই চিহ্ন দেখিয়া তাহার অনুসন্ধান করা সহজ হইবে এইজন্যই পথে অলংকার ফেলিয়া দিয়াছেন। রাবণ অলংকার অপহরণ করে নাই। সরমাকে সীতা বলিতেছেন, অলংকার না থাকায় তাই রাবণের কোনো দোষ নাই। **নীরবিলা**—নীরব হইল, চুপ করিল। **শশিমুখী**—চাঁদবদনী। **এখনও তৃষাতুরা এ দাসী**—সরমার তৃষ্ণা এখনও মেটে নাই, তিনি আরও শুনিতে চান। **শ্রবণ কুহর**—কানের ছিদ্র। **ইন্দুনিভাননা**—ইন্দু বা চাঁদের মতো আনন বা মুখ যাহার। সীতা।

[৩৯১—৪১২] **নিষাদ**—ব্যাধ। **হে আকাশ ইত্যাদি**—সীতা একে

ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষণ মোর, ভুবন-বিজয়ী !
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি ; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা
করি ৪০০
যথায় ভ্রমেন প্রভু ! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে !
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি ; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল ! শুনিবে প্রভু তুমি হে
গাইলে !'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।
"চলিল কনক-রথ ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ,
নদী, ৪১০
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ
বর্ণিয়া ?—
"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর ! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল

একে আকাশকে, বাতাসকে (=সমীর), মেঘকে (=বারিদ), ভ্রমরকে, কোকিলকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহার দুঃখের কথা রাম এবং লক্ষ্মণের নিকট পৌঁছিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। **এড়াইয়া দ্রুতে**—দ্রুত গতিতে এড়াইয়া। **পুষ্পক**—রাবণের রথের নাম। ব্রহ্মা কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া কুবেরকে এই সর্বত্রগামী রথ দান করিয়াছিলেন। রাবণ কুবেরকে পরাস্ত করিয়া পুষ্পক অধিকার করে। রামচন্দ্র রাবণকে হত্যা করার পর আবার কুবের এই রথ ফিরিয়া পান। বাল্মীকি রামায়ণে সীতা অপহরণের সময়ে রাবণ সীতাকে বলিয়াছে, "আমি কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা মহাপ্রতাপশালী রাবণ। লোকে আমাকে মৃত্যুর তুল্য ভয় করে। আমি কুবেরের আকাশগামী পুষ্পক রথ সবলে হরণ করেছি, আমার রুষ্টমুখ দেখলে ইন্দ্রাদি সকল দেবতা ভয়ে পলায়ন করে।" (রাজশেখর বসু অনূদিত)।

[৪১৩ – ৪২৮] **সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে**—সীতা-অপহরণকারী রাবণকে জটায়ু বাধা দেয়। এখানে আক্রমণোদ্যত জটায়ুর গর্জনের কথা বলা হইয়াছে। পুরাণ অনুসারে গরুড়ের বড়ো ভাই সূর্য-সারথি অরুণের দুই ছেলে সম্পাতি ও জটায়ু। পক্ষীরাজ জটায়ু সকল পক্ষীর উপরে আধিপত্য করিত। দশরথের সহিত জটায়ুর বন্ধুত্ব ছিল। অপহৃতা সীতা ধাবমান পুষ্পক হইতে একটি বৃক্ষের উপরে নিদ্রিত জটায়ুকে দেখিয়া রাম-লক্ষ্মণকে সংবাদ দিতে অনুরোধ করেন। সীতার

বাজি-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে !
দেখিনু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ ! 'চিনি তোরে,' কহিলা
গম্ভীরে
বীর-বর,'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি,
দুর্ম্মতি ? ৪২০
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম,
জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে ! আর মূঢ়মতি !
ধিক্ তোরে রক্ষোরাজ ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-
মণ্ডলে ?
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা
সুরেন্দ্র
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে !
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে
রক্ষোরথী ৪৩০
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন !
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,

দুরাবস্থা দেখিয়া জটায়ু রাবণকে এই দুষ্কর্ম হইতে নিরত করিতে চেষ্টা করিয়া বলেন, আমি ষাট হাজার বৎসরের বৃদ্ধ আর তুমি রথারূঢ় বর্মধারী সশস্ত্র যুবা। তবুও আমি জীবিত থাকিতে তুমি সীতাকে অপহরণ করিতে পারিবে না ! জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধে রাবণের অস্ত্রাঘাতে আহত হয়। রাম এবং লক্ষ্মণ আহত মুমূর্ষু জটায়ুর নিকট প্রথম সীতার সন্ধান পান এবং জানিতে পারেন রাবণ তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। **বাজীরাজি**—অশ্বসমূহ। **চিনি তোরে····· চোর তুই লঙ্কার রাবণ**—জটায়ু রাবণকে তিরস্কার করিয়া এই উক্তি করিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যে কবি রাবণকে এক অমিত শক্তির অধিকারী, মানবিক মহিমায় মহিমান্বিত পুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সুতরাং রামায়ণে যেমন রাবণ সকলের দ্বারা নিন্দিত, এ কাব্যে তেমন নয়। শুধু প্রথম সর্গে বীরবাহুজননী চিত্রাঙ্গদা এবং চতুর্থ সর্গের আলোচ্য অংশে জটায়ু তাহার কাজের তীব্র সমালোচনা করিয়াছে। **সুরেন্দ্র**—বীরশ্রেষ্ঠ। **স্যন্দনে**—রথে।

সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর ; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে
দাসীরে ! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে !
আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন
দেশে, ৪৪০
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি ! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা ? এস শীঘ্র করি !
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট ; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে,
পর-ধন ! আসি মোরে তরাও, জননি !'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি;
কাঁপিল বসুধা ; দেশ পূরিল আরবে !
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো
ললনে, ৪৫০
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার ! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী,—

[৪২৯—৪৪১] **অরি মোর**—আমার শত্রু, রাবণ। **বিপিনে**—বনে। **আরাধিনু বসুধারে**—বসুধা বা ধরিত্রীই সীতার জননী। ধরিত্রীর বক্ষ হইতে সীতার জন্ম হইয়াছিল। **দ্বিধা হয়ে তব বক্ষঃস্থলে লহ অভাগীরে**—সীতা মাতা ধরিত্রীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানাইলেন, তুমি দ্বিধা হইয়া আমাকে তোমার বুকে স্থান দেও, এ লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা কর। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকির সহিত রামচন্দ্রের সভায় প্রত্যাগত সীতা এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার প্রার্থনায় ধরণী বিদীর্ণ হইয়া এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হয়। সেই সিংহাসনে সীতা পাতাল প্রবেশ করেন। **তস্কর আইসে ফিরি**—সীতাকে রাখিয়া রাবণ জটায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। আবার সে ফিরিয়া আসিবে। সীতা ধরিত্রীকে বলিতেছেন, চোর যেমন যেখানে অপহৃত ধন-রত্ন পুঁতিয়া রাখে রাত্রিকালে আবার সেখানে ফিরিয়া আসে, রাবণও সেইরূপ যেখানে সীতাকে রাখিয়া গিয়াছে সেখানে ফিরিয়া আসিবে।

[৪৪৮—৪৭২] **আরবে**—শব্দে। **শুন গো......অপূর্ব কাহিনী**—কবি এখানে রাবণের অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে পাঠকদের পূর্বাভাস দিবার জন্য এক চমৎকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। সীতা অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন এবং সেই অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন মাতা বসুন্ধরা আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, দুরাচার রাবণের

'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা
বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্মতি
রাবণ, জানিনু আমি; সুপ্রসন্ন
বিধি ৪৬০
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিনু
তোরে!
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি; দেখ চেয়ে।'
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি;
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন! হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার? বীর
পঞ্চ জনে ৪৭০
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল
সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইলা চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে!
সভয়ে মুদিনু আঁখি! কহিলা হাসিয়া

পাপে জর্জরিতা হইয়া তিনি রাবণের বিনাশের জন্যই সীতাকে জন্ম দিয়াছেন। এই কথা বলিয়া বসুন্ধরা ভবিতব্য দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং সীতা ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে সব একে একে প্রত্যক্ষ করিলেন। **জননীর জ্বালা দূর করিলি**—বসুন্ধরা বলিতেছেন, সীতাকে অপহরণ করিয়া রাবণ নিজের বিনাশ নিশ্চিত করিয়াছে। আর রাবণের বিনাশ হইলে বসুন্ধরা ভারমুক্ত হইবেন। তাই প্রকারান্তরে সীতা তাহার জননী বসুন্ধরার জ্বালা দূর করিল। **পঞ্চজন বীর তথা নিমগ্ন সকলে দুঃখের সলিলে**—বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে আছে, সুগ্রীব প্রভৃতি পাঁচজন বানর পর্বতে উপবিষ্ট ছিল। সেই সময়ে তাহারা সীতা এবং রাবণকে দেখিতে পায়, সীতার আর্তনাদ শুনিতে পায়। সীতা যে সব বস্ত্রালঙ্কার নিচে নিক্ষেপ করেন, তাহার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং রামচন্দ্রের সহিত সুগ্রীবের মৈত্রী হইলে সুগ্রীব সেগুলি রামচন্দ্রকে দেখায়। এখানে সেই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

[৪৭৩—৪৯০] **মারি যে দেশের রাজা**—এখানে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ঘটনা বলা হইতেছে। বালী এবং সুগ্রীব দুই ভাই।

মা আমার, 'কারে ভয় করিস
জানকি ? ৪৮০
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর এই। ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিনু
চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন; শুখাইল নদী;
ভয়াকুল-বন-জীব পলাইল দূরে;
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর
নির্ঘোষে। ৪৯০
"উতরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে;
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা; শৃঙ্গধরে ভরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক।

বালী সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত এবং সুগ্রীব পত্নী রুমাকে অধিকার করে। রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যায় আসিলে সুগ্রীব তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া রাজ্য ও স্ত্রী উদ্ধারে রামের সাহায্য প্রার্থনা করে। রাম সুগ্রীবকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে বলেন। যুদ্ধের সময়ে রামচন্দ্র অন্তরাল হইতে বালীকে আঘাত করিবেন বলিয়া প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু প্রথম যুদ্ধে সুগ্রীব পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। বালী ও সুগ্রীব উভয়ের বেশভূষা এক হওয়ায় রামচন্দ্র বালীকে চিনিয়া আঘাত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়বার যুদ্ধের সময়ে লক্ষ্মণ সুগ্রীবে গলায় চিহ্নস্বরূপ একটি গজপুষ্পীলতা বাঁধিয়া দেন। যুদ্ধে সুগ্রীব ক্লান্ত হইয়া পড়িলে রামচন্দ্র অন্তরাল হইতে বালীকে শরাঘাতে নিহত করেন। এইভাবে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য ফিরিয়া পান এবং রাবণের বিরুদ্ধে অভিযানে সমস্ত শক্তি দিয়া রামচন্দ্রকে সাহায্য করেন। **মা আমার**—ধরণী। **কিষ্কিন্ধ্যা**—মহীশূরের উত্তরে পম্পার নিকট বানররাজ বালীর রাজ্য। রাজধানীর নামও কিষ্কিন্ধ্যা।

[৪৯১—৫১৯] **বারীশ**—বারির ঈশ্বর বা প্রভু অর্থাৎ বরুণ। **পাশী**—পাশ অস্ত্রধারী, বরুণ। **প্রভুর আদেশে পরিলা শৃঙ্খল পায়ে**—বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক সমুদ্র শাসনের বিবরণ আছে। সমুদ্রতীরে তিনরাত্রি আরাধনা করার পরেও সমুদ্র আবির্ভূত না হওয়ায় রামচন্দ্র

টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,—
'জয়, রঘুপতি, জয়!' ধ্বনিল
সকলে! ৫০০
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি।
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক; কহিল সে, 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী।

ক্রুদ্ধ হন এবং সমুদ্র শুষ্ক করিতে উদ্যত হন। তখন সাগর স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রামচন্দ্রকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন, বানরসেনারা যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবে তখন সমুদ্র আলোড়িত হইবেন না, স্থির হইয়া থাকিবে। ইহার পর স্থির সমুদ্রে সেতুনির্মাণ করা হয়। মধুসূদন সমুদ্রের পরিবর্তে জলের দেবতা বরুণ-কর্তৃক রামচন্দ্রের আনুগত্য স্বীকারের কথা বলিয়াছেন। **কটক**—সৈন্যবাহিনী। **টলিল এ স্বর্ণপুরী বৈরী-পদ-চাপে**—সেনাবাহিনী সেতুর উপর দিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল, স্বর্ণলঙ্কা সৈন্যদের পদভারে টলমল করিয়া উঠিল। বৈরী=শত্রু, এখানে বৈরী শব্দের দ্বারা রামচন্দ্রের সেনাবাহিনীকে বোঝানো হইয়াছে। তাহারা লঙ্কার শত্রু। **রক্ষঃকুল পতি**—রাবণ। **সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম বীর এক**—রাবণের সভায় সাক্ষাৎ ধর্মের মতো দেখিতে একজন বীর উপস্থিত ছিলেন। ইনি বিভীষণ। **রাঘবারি**—রাঘব, অর্থাৎ রামচন্দ্রের শত্রু, রাবণ। **পদাঘাত করি তারে**—বিভীষণ রাবণকে রামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করিতে বলায় দর্পিত রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, মূল বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ কর্তৃক বিভীষণকে পদাঘাতের কথা নাই। রাবণ রাজসভার উপস্থিত সকলের পরামর্শ চাহিলে সকলেই রাবণকে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলে। কুম্ভকর্ণ রাবণের কার্য অনুমোদন করে নাই, কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার জন্য আর না ভাবিয়া যুদ্ধে রামচন্দ্রকে হত্যা করিবার প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে। একমাত্র বিভীষণই বার বার রাবণকে সতর্ক করিয়া দিয়া সীতাকে ফিরাইয়া দিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিবার পর হইতেই লঙ্কায় নানারূপ অশুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তিনি বলেন, আমি অনুরোধ করিতেছি, রামের পত্নীকে ফিরাইয়া দাও। নতুবা সমস্ত রাক্ষসসমেত লঙ্কাপুরী ধ্বংস হইবে। এই পরামর্শে ক্রুদ্ধ রাবণ বিভীষণকে বলে, শত্রু আর ক্রুদ্ধ সর্পের সহিত বাস করাও ভালো, কিন্তু শত্রুর পক্ষপাতী মিত্র-

অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিল সরমা,
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে
দুঃখিত ৫১০
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে
কহিতে?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী
রূপসী,—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী
সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে!
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব স্বপন;—
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার
আশে; ৫২০
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে?
বহিল শোণিত-নদী! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম; পালে পালে শৃগাল; আইল
অসংখ্য কুকুর। লঙ্কা পূরিল
ভৈরবে। ৫৩০
"দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।

নামধারীর সহিত বাস করা উচিত নয়। কুলাঙ্গার, তোমাকে ধিক, তুমি যাহা বলিয়াছ আর কেহ তাহা বলিলে এই মুহূর্তেই তাই প্রাণ হারাইতে হইত। এইভাবে ধিক্কৃত হইয়া বিভীষণ রাবণের পক্ষ ত্যাগ করিয়া রামের পক্ষে যোগ দেন। **কুঞ্জর**—হস্তী, বিভীষণের বিশেষণরূপে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। **রক্ষোরাজানুজ**—রক্ষোরাজ অর্থাৎ রাক্ষসরাজ রাবণের অনুজ, ছোটভাই বিভীষণ।

[৫২০—৫৪০] **হুতাশন**—অগ্নি। **কেশরী**—সিংহ। **কবন্ধ**—মস্তক-বিহীন ভূতবিশেষ। **গৃধিনী**—স্ত্রী শকুনি। **কর্বুরনাথে**—রাক্ষসদের নাথ, অর্থাৎ, রাবণ। **রাঘব-বিক্রমে লাঘব-গরব**—রামচন্দ্রের পরাক্রমে গর্ব লাঘব হইয়াছে যাহার। **শূলি-শম্ভু-সম**—শূলধারী শিবের মতো শক্তিমান। **কুম্ভকর্ণ**—রাবণের মধ্যম ভ্রাতা। উগ্র তপস্যায় কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার নিকট হইতে

কে রক্ষিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে ?
ধাইল রাক্ষস-দল ; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে; নারী-দল দিল হুলাহুলি। ৫৪০
বিরাট মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ?)
কাটিলা তাহার শির! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর! জয় রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই! কাঁদিল রাবণ!
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে!
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
'রক্ষঃ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার! ৫৫০
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী ; ক্ষম, মা মোরে।' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি!
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া।'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে

অমরত্বের বর আদায় করিতে চেষ্টা করে। ব্রহ্মা তাঁহার স্ত্রী সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের কণ্ঠে আশ্রয় করিতে বলেন। ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণের সম্মুখে আসিলে কুম্ভকর্ণের কণ্ঠে আশ্রিত সরস্বতী অনন্ত জীবনের পরিবর্তে অনন্ত নিদ্রার বর প্রার্থনা উচ্চারণ করেন এবং ব্রহ্মা সঙ্গে সঙ্গে সেই বর দিয়া অদৃশ্য হইয়া যান। কুম্ভকর্ণ প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অনেক অনুনয় করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে ছয় মাস পর পর একবার নিদ্রাভঙ্গের বর পায়, কিন্তু অকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহার মৃত্যু হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা হয়। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে লঙ্কা বীরশূন্য হইলে উপায়ান্তর না দেখিয়া রাবণ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে আদেশ দেয়। অকালে জাগ্রত কুম্ভকর্ণ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও রামচন্দ্রের শরাঘাতে নিহত হয়।

[৫৪১ - ৫৬৯] **পশিল কটকে**—কুম্ভকর্ণ বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়া সৈন্যদলের (=কটক) মধ্যে প্রবেশ করিল। **রক্ষ-কুল দুঃখে……মোর** —মধুসূদন সীতা চরিত্রকে অতিশয় কোমল করিয়া গড়িয়াছেন। রাবণ তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে, নির্যাতন করিয়াছে। তবুও তিনি রাবণের এবং রাক্ষসদের শোকে কাতর হইয়া পড়েন। **মন্দারের**—স্বর্গীয় বৃক্ষ বা সেই বৃক্ষের ফুল।

দুরন্ত রাবণ রণে !' কেহ কহে,
'উঠ, ৫৬০
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে।'
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি ;
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীরে ? যাইব আমি যথা কান্ত মম
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা ; কাঙ্গালিনী
সীতা,
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি !'
"উত্তরিলা সুরবালা ; 'শোন লো
মৈথিলি ! ৫৭০
সমল খনির গর্ভে মণি ; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা।'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু
সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী !
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে !—জাগিনু অমনি !—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
ঘোর অন্ধকার ঘর ; ঘটিল সে দশা
আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু
চৌদিকে ! ৫৮০
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু
তখনি ?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ
দেহে ?"

বেড়িল—ঘিরিয়া ধরিল। **দেবেন্দ্রাণী শচী**—দেবতাদের প্রভু ইন্দ্রের পত্নী শচী। **নৃমণি**—নরশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ, রামচন্দ্র।

[৫৭০—৬০৪] **সমল খনির গর্ভে...দাতা**—সীতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন রামচন্দ্র যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, রাবণের মৃত্যু হইয়াছে। সুরবালারা বা দেবকন্যারা তাঁহাকে উত্তম ভূষণে সজ্জিত করিতে আসিয়াছেন। রামচন্দ্রের সহিত মিলনের জন্য সাজ সজ্জা করিতে অনুরোধ করিতেছে। সীতা কাঙালিনী বেশে রামচন্দ্রের নিকট যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সুরবালারা বলিয়াছেন, খনির গর্ভে যখন মণি থাকে তখন মণি ময়লাযুক্ত থাকে ঠিকই। কিন্তু রাজাকে যখন কেহ সেই মণি উপহার দেয় তখন ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেয়। সীতা যতদিন বন্দিনী ছিলেন ততদিন খনিগর্ভের মণির মতো মলিন ছিলেন। এখন রামচন্দ্রের কাছে যাইবেন, তাই তাহাকে পরিচ্ছন্ন হইয়া সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া যাইতে হইবে। **অংশুমালী**—সূর্য।

নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিড়ে তার যদি! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা; "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি!
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে!
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে
সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে ৫৯০
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে

অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে;—
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!
"কহিল রাঘব-রিপু; 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-
নিভাননে, ৬০০
রাবণের পরাক্রম! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে।
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন!
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে?'

নীরবিলা—নীরব হইল। **বিধুমুখী**—চন্দ্রবদনী। চাঁদের মত মুখ যাহার। **নীরবে যেমতি......তার যদি**—বীণা বাজাইতে বাজাইতে হঠাৎ তার ছিঁড়িয়া গেলে যেমন নীরবতা নামিয়া আসে, সেইরূপ সীতার সুমধুর বীণাধ্বনির মতো কথা থামিয়া গেল। **জিষ্ণু**—জয়শীল, বিজয়ী। **পৌলস্ত্য**—পুলস্ত্য মুনির পুত্র। ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য, পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা, বিশ্রবার পুত্র রাবণ। এখানে পৌলস্ত্য শব্দে রাবণকে বোঝানো হইয়াছে। **তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে**—বজ্রের আঘাতে যেমন সমুচ্চ পর্বতশিখর চূর্ণ হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়, সেইরূপ পক্ষীরাজ জটায়ু আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। **ইন্দীবর**—পদ্ম। **উন্মীলি**—উন্মীলন করিয়া, মেলিয়া। **ইন্দু-নিভাননে**—চাঁদের মতো মুখ (আনন) যাহার। **জগৎবিখ্যাত জটায়ু......যুঝিতে বর্বরে**—রাবণের এই উক্তি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন, "জটায়ু যে কারণে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিল, রাবণের নিকট তাহা অর্থহীন...... রাবণের পরাক্রমকে তুচ্ছ করিয়াছে, ইহাই জটায়ুর একমাত্র অপরাধ; সেই স্পর্ধার শাস্তি দিতে পারিয়াছে বলিয়া রাবণ উল্লসিত; সুন্দরী রমণীর নিকটে সে আপন পৌরুষের প্রমাণ দিয়াই যেন সকল পাপ প্রক্ষালিত করিয়াছে। কিন্তু মুমূর্ষু প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিও তাহার অনুকম্পা হয়—সেইটুকুই তাহার প্রকৃতিগত মনুষ্যত্ব, তাহাই তাহার মহত্ত্ব। সে 'জগৎবিখ্যাত গরুড়নন্দন'কে

"'ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ' ;—কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে—
'সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ্ রে ভাবিয়া ?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি
সিংহীরে !
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষ: ? পড়িলি
সঙ্কটে, ৬১০
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে !'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা !
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে ; 'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব ! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী ; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে।'
গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে !
শুনিনু ভৈরব রব ; দেখিনু সম্মুখে ৬২০
সাগর নীলোর্ম্মিময় ! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে ;
নিবারিল দুষ্ট মোরে ! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে ! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল
সম্মুখে !
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা ! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার
আভা ?

জানে, তাহার বীরত্বের প্রশংসা করে ; কিন্তু সে তাহার ধর্মজ্ঞানের প্রশংসা করে না, কারণ তাহার মর্ম সে বোঝে না।" মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ চরিত্রের একটা প্রধান দিক, "রাবণ কেবল নিজেকেই জানে, আর কাহাকেও জানে না ; সে নিজেই নিজের ধর্ম, আর কোনো ধর্ম মানে না। সে যেন বলে— আমি আমিই ; আমার শক্তিতে আমি যাহা করি, তাহার বিরুদ্ধেও শক্তিকেই জানি আর কিছুকে নয়।"

[৬০৫—৬২৭] **শূর**—বীর। **শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে**—মুমূর্ষু জটায়ু রাবণের উদ্দেশ্যে এই উক্তি করিয়াছেন। শৃগাল যদি সিংহীকে পাইতে চেষ্টা করে তবে যে যেমন বিপন্ন হয়, রাবণও সীতাকে আয়ত্ত করিবার এই চেষ্টায় সেইরূপ বিপন্ন হইবে। **নির্ঘোষে**—প্রচণ্ড শব্দে। **নীলোর্ম্মিময়**—জলের তরঙ্গময় (সমুদ্র)। **বারীশ**—জলের দেবতা বরুণ। **অনম্বর পথে**—আকাশপথে।

[৬২৮—৬৬০] **রঞ্জনের রেখা**—সমুদ্রের মধ্যে স্বর্ণলঙ্কাকে দেখা গেল,

স্বর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী!
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি!
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে!"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি; কাঁদিলা সরমা। ৬৪০

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা; "দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে ৬৫০
কাঁদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,

মনে হইল যেন একটি রঙিন রেখা। **স্বর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখি**—লঙ্কা স্বর্ণে গঠিত, ঐশ্বর্যময় ভূমি। কিন্তু বন্দিনী সীতার পক্ষে এ ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের কোনো মূল্য নাই। মুক্ত পাখিকে কেহ যদি সোনার খাঁচায়ও রাখে তবুও সেই পাখি সুখী হয় না। **বিধির নির্বন্ধ**—নিয়তি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। সরমা বলিয়াছেন, সীতা যে এমন দুঃখময় বন্দী জীবনযাপন করিতেছেন, ইহাও বিধি বা নিয়তির বিধান। মেঘনাদবধ কাব্যে এই নিয়তির কথা বারবার বলা হইয়াছে, যতো ঘটনা ঘটিতেছে, সবই এক পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে। এমন কি দ্বিতীয় সর্গে স্বয়ং শিব বিধির নির্বন্ধের কথা বলিয়াছেন। **বীরযোনি**—বীরপ্রসূ, লঙ্কার বিশেষণরূপে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। **বিদ্যাধরী** স্বর্গের গায়িকা। **মন্দারের দামে**—স্বর্গীয় মন্দার ফুলের মালায়। **ভেটিবে**—দর্শনলাভ করিবে। **বসুধা কামিনী····মধুরে**—বসন্তকালে পৃথিবী (বসুধা) যেমন ঋতুরাজ বসন্তের দর্শন পায়, সীতাও সেইরূপ রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিবেন।

সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী!" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি
তপন-তাপিত আমি, জুরালে আমারে!
মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী
সীতা,
তুমি লো মহার্ঘ রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"
নমিয়া সীতার পদে কহিলা সরমা;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে।"
কহিলা মৈথিলী; "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

ইতি মেঘনাদবধো কাব্যে অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ

[৬৬১—৬৮৬] **সুকেশিনি**—সুন্দর কেশ যাহার। সীতা। সম্বোধনে 'নি'। **মরুভূমে প্রবাহিণী**—মরুভূমিতে নদী। সীতা বলিতেছেন, এই শত্রুপুরীতে সহানুভূতিশীলা সরমা তাঁহার নিকট মরুভূমির নদীর মতো তৃপ্তিকর। **ভুজঙ্গিনী-রূপী এ কাল কনক-লঙ্কা শিরে শিরোমণি**—সরমার প্রশংসায় সীতা বলিতেছেন, এ লঙ্কাপুরী কালসাপের মতো আর সরমা সেই ভয়ংকর সাপের মাথার মণি। **মহার্ঘ**—বহু মূল্যবান। **দরিদ্র পাইলে......ধনি**—দরিদ্র যদি কোনো মূল্যবান রত্ন পায় সে কি কখনো সেই রত্নের অযত্ন করে? দুঃখিনী সীতার নিকট সরমা এক মহামূল্য রত্ন। কারণ এই শত্রুপুরীতে একমাত্র সরমাই তাহার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। **ধনি**—সুন্দরী রমণী। সাধারণতঃ কোনো রমণীকে সম্বোধনে কবিতায় এই শব্দ ব্যবহার হয়। **রঘুকুল-কমলিনী**—রঘুবংশের অর্থাৎ রামচন্দ্রের বংশের পদ্মস্বরূপা, সীতা। **চেড়ী**—নারী প্রহরী। **কুরঙ্গী**—হরিণী। **একটি কুসুম মাত্র**—সরমা চলিয়া গেলেন। অরণ্যের একমাত্র ফুলের মতো সীতা অশোকবনে বসিয়া রহিলেন।

ব্যাখ্যা

[প্রথম সর্গ]

অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিলা সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে? [৮১-৮৪]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এ কাব্যের সূচনা হইয়াছে এক নিদারুণ শোকসংবাদে। রাবণপুত্র বীরবাহু যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছে। মকরাক্ষ এই দুঃসহ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। পাত্র মিত্র-পরিবেষ্টিত রাজা রাবণ এতক্ষণ দূতমুখে যুদ্ধে বীরবাহুর পতনের বার্তা শুনিতেছিলেন। নীরবে তিনি অশ্রুপাত করিতে-ছিলেন। শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, অবরুদ্ধ শোক ভাষা পাইল রাবণের আক্ষেপোক্তিতে।

রাবণের পক্ষে এ শোকবার্তা রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো। লঙ্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর বীরবাহু। দেবতারাও তাহার সম্মুখীন হইতে ভীত। সেই বীর-বাহুর উপরে রাবণ শত্রুদমনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্র বীরবাহুর পক্ষে নিতান্ত অসম প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সেই রামচন্দ্রই বীরবাহুকে নিহত করিয়াছে, এ সংবাদ একান্ত অবিশ্বাস্য। দৃঢ় সমুন্নত শিমূলগাছকে কি ফুলের পাপড়ি দ্বারা ছেদন করা যায়? এ যেমন অসম্ভব, তেমনই অসম্ভব রামচন্দ্রের পক্ষে বীরবাহুকে হনন। ফুলদলের উপমায় রামচন্দ্রের শক্তিহীনতা ব্যঞ্জিত হইতেছে। অন্যপক্ষে শিমূলগাছের সহিত উপমায়, তুলনামূলকভাবে, বীরবাহুর শক্তিমত্তার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

রাবণের এই আক্ষেপোক্তির সুরে, প্রযুক্ত উপমায়—রাম-রাবণ যুদ্ধের উভয় পক্ষের শক্তির অসমতার কথাটাই বড়ো হইয়া ওঠে। কিন্তু এমনই বিড়ম্বনা যে ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্রের হাতে লঙ্কা ক্রমে বীরশূন্য হইতেছে। এই অভিজ্ঞতায় রাবণ নিয়তির গূঢ় ইঙ্গিত দেখিতে পান। তাঁহার বিস্ময়ের অন্ত নাই, বিস্মিত প্রশ্নে প্রশ্নে বারবার তিনি পরাক্রান্ত নিয়তির উদ্যত আঘাতের প্রতিই ইঙ্গিত

করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ-চরিত্র পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উক্তিতে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। মধুসূদনের রাবণ পাপবোধের দ্বারা পীড়িত নয়। নিজের পাপের কথা সে কখনো স্বীকার করে নাই। তাহার সকল সর্বনাশের জন্য সে দায়ী করিয়াছে এক অপ্রতিরোধ্য অজ্ঞেয় নিয়তি বা বিধিকে।

[২] বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে

একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে

....

নিরন্তর। হব আমি নির্ম্মূল সমূলে

এর শরে! [৯১—৯৬]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে উদ্ধৃত। বীরবাহু যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। এই সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে মকরাক্ষ। সভাসদসহ রাজসভায় আসীন রাবণ এই নিদারুণ দুঃখসংবাদ শুনিয়া শোকে অধীর হইলেন। শোকের আঘাত অবশ্য রাবণের পক্ষে নূতন নহে। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ শুরুর পর হইতে লঙ্কাপুরীর পরাক্রমশালী বীরবৃন্দ একে একে নিহত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র মানব রামচন্দ্র আর তাহার সঙ্গী বনচর যত বানরের সহিত এই যুদ্ধ যে এমন নিদারুণ হইবে রাবণ পূর্বে তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। লঙ্কার যুদ্ধে নিহত বীরবৃন্দ সকলেই রাবণের আত্মীয়-স্বজন। তাহাদের মৃত্যু একদিকে বাহিরের দিক হইতে যেমন রাবণের শক্তি খর্ব করিয়া আনিতেছে তেমনি অন্যদিকে রাবণের অন্তরকে শোকে জর্জরিত করিতেছে। শেষতম এই আঘাত ; পুত্রের মৃত্যুজনিত নিদারুণ শোক তাহাকে বিকল করিল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে দূতকে উদ্দেশ্য করিয়া যে সুদীর্ঘ খেদোক্তি করিয়াছে আলোচ্য অংশটি তাহারই অন্তর্গত।

রাবণের বর্তমান দুর্দশা এবং ভবিষ্যতের সর্বনাশ সম্পর্কে আশঙ্কা যুগপৎ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে আলোচ্য অংশের উপমাটিতে। এ কাব্যে কবি রাবণ সম্পর্কে বারবার তরুর উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। এই উপমাতেও তরুর প্রসঙ্গ আছে। কাঠুরিয়া বনে প্রবেশ করিয়া কোনো বড় বৃক্ষকে ভূপাতিত করিবার জন্য প্রথমে তাহার শাখা-প্রশাখাগুলি কাটিয়া ফেলে। তারপর

মূল বৃক্ষটিতে কুঠারঘাত করে। যে প্রতিকূল বিধি বা দৈব রাবণের সর্বনাশ-সাধনে উদ্যত তাহার ব্যবহারও সেই কাঠুরিয়ার মতো। রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, পুত্র বীরবাহু, যাহারা রাবণরূপ মহাবৃক্ষের শাখাপ্রশাখা স্বরূপ—এই প্রতিকূল দৈব একে একে তাহাদের শেষ করিয়া রাবণকে ক্রমে শক্তিহীন করিয়া ফেলিতেছে; রাবণ স্পষ্টই বুঝিতেছেন ইহার পরে আসিবে চরম আঘাত এবং সে আঘাত পড়িবে প্রত্যক্ষভাবে রাবণের উপরে। তাহাকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে।

এখানে রাবণ চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এই দুর্দশার জন্য বিধি বা দৈব নামক কোনো অপরিজ্ঞাত সে শক্তিকেই দায়ী করিয়াছে। নিজের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করে নাই।

[৩] কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
....
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?

[১০৭—১১২]

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে উদ্ধৃত এই অংশটি রাবণের সংলাপাংশ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্যে সজ্জিত, দেবতাদেরও ঈর্ষা উৎপাদন করে যে স্বর্ণলঙ্কা, সেই ঐশ্বর্যপুরীর মহাশক্তিধর অধিপতি বর্তমানে এক সর্বনাশের সম্মুখীন। রাবণ যে শুধু বাহিরের ঐশ্বর্যে ধনী এমন নয়। স্নেহের প্রেমের বন্ধনে বাঁধা তাহার সুবৃহৎ সংসারটি ছিল পরিপূর্ণ আনন্দ নিকেতন। কিন্তু সেই আনন্দ-নিকেতনে কাল প্রবেশ করিয়াছে। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে লঙ্কার মহাবীরেরা, রাবণের আত্মীয়-পরিজনেরা একে একে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। শেষতম শোকসংবাদ, রাবণপুত্র বীরবাহু যুদ্ধে পতিত হইয়াছে। এই আঘাতেই বিপর্যস্ত রাবণের খেদোক্তির একটি অংশ আলোচ্য পঙ্‌ক্তি কয়েকটি।

সমগ্র কাব্যে কবি নানাভাবে লঙ্কাপুরীর অপরিমিত সমৃদ্ধি এবং রাবণের

পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন। সেই বর্ণনায় লঙ্কাপুরী সম্পর্কে পাঠকের মনে যে ভাবাবহ তৈরি হয় তাহাতে এই পুরী সম্পর্কে 'উজ্জলিত নাট্যশালাসম' উপমাটি তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া ওঠে। সমগ্র কাব্যে পরিকীর্ণ বর্ণনায় যাহা নানাভাবে বলা হইয়াছে এখানে তাহাই প্রমূর্ত হইয়াছে একটি মাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় উপমায়। বিচিত্র দীপের আলোয় আলোকিত উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত এই লঙ্কাপুরী। নাট্যগৃহে মানুষ চিত্তবিনোদনের জন্য, আনন্দের সন্ধানের জন্য যায়। এখানে সেই আনন্দেরই অনিঃশেষ আয়োজন ছিল। কিন্তু সে দিন আর নাই! উৎসবশেষে নাট্যগৃহে যেমন শুষ্ক ফুল, নির্বাপিত দীপ, নীরব বাদ্যযন্ত্র বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকে, আজ লঙ্কাপুরীর দশাও সেইরূপ। সে উৎসবসজ্জা ম্লান হইয়াছে। ঘরে ঘরে আজ শোকের ছায়া। আনন্দের আলো নিবিয়াছে। নাট্যগৃহ যেমন রবাব (বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র), বীণা, মুরজ (মৃদঙ্গ), মুরলী (বাঁশি) প্রভৃতি নানা বাদ্যযন্ত্র হইতে সৃষ্ট মধুর সুরে পরিপুরিত হইয়া থাকে, একদিন রাবণের এই পুরী সেইরূপ আনন্দধ্বনিতে পূর্ণ ছিল। উৎসবশেষের নাট্যগৃহের মতোই আজ সে আনন্দধ্বনি নীরব হইয়া গিয়াছে। শোকে আচ্ছন্ন রাবণ তাই বিবিক্ত চিত্তে বলিতেছে, এই অন্ধকার নিরানন্দপুরী এবারে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভালো।

[৪] অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত ;
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন। [১২৫—১২৯]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে কাতর রাবণ বহুক্ষণ বিলাপ করিল। তাহার এ দুর্দশার জন্য প্রতিকূল দৈবের প্রতি দোষারোপ করিল। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন মহানায়ক নিহত হইয়াছেন, শোক যতোই প্রবল হোক এই বিপর্যয়ের সময়ে নতুন করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করার দায়িত্ব রাজাকেই পালন করিতে হইবে। আকস্মিক আঘাতে কর্তব্যের কথা যেন রাবণ বিস্মৃত হইয়াছে।

তাই প্রধানমন্ত্রী সারণ কৌশলে রাবণের মনে কর্তব্যবোধ জাগ্রত করিবার জন্যই এইরূপ উক্তি করিয়াছে। এই অংশটি সারণের উক্তির অন্তর্গত।

ভূধর অর্থাৎ পর্বত যেমন শৃঙ্গশোভিত, সেইরূপ রাবণের শক্তির চূড়াগুলি ছিল কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু প্রভৃতি বীরবৃন্দ। বজ্রাঘাতে পর্বতের চূড়া বিনষ্ট হইলে পর্বতের আকৃতি খর্ব হইয়া যায়, তাহার শোভা নষ্ট হয়। কিন্তু মূল পর্বত তবুও অটলভাবেই বিরাজ করে। সারণের উক্তিতে রাবণের উপমা ওই আহত, কিন্তু অটল পর্বত। শৃঙ্গ বিচূর্ণ হইলেও পর্বত যেমন অটল থাকে, এই মুহূর্তে রাবণকেও সেইরূপ অবিচলিতভাবে কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সে যদি বিচলিত হয়, কর্তব্য বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে দেশের মানুষের ভরসা কোথায়। এই উপমায় যেমন কর্তব্য বিষয়ে রাবণকে সচেতন করা হইয়াছে, সেই সঙ্গে রাবণের মহিমাও দ্যোতিত হইয়াছে। পরবর্তী অংশে সারণ একটি দার্শনিক উক্তি করিয়াছে। এই উক্তিটির ভিত্তি শঙ্করাচার্যের মায়াবাদে। ওই দর্শন মতে জগৎ মিথ্যা। এখানকার সুখ এবং দুঃখ দুইই অসত্য, মায়া মাত্র। তাই সুখে আনন্দিত, দুঃখে পীড়িত অনুভব করিবার কোনো কারণ নাই। যথার্থ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সুখ দুঃখ উভয়কেই মায়া বলিয়া জানে। দুঃখাভিভূত রাবণের দুঃখভার লাঘবের জন্যই সারণ এই দার্শনিক উক্তি করিয়াছে।

[৫] কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি। [১৫৪—১৫৮]

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে সন্তপ্ত রাবণ এবং প্রধানমন্ত্রী সারণের সংলাপের একটি অংশ আলোচ্য এই চরণ কয়েকটি। শোকে অধীর রাবণকে মন্ত্রী কঠিন কর্তব্যের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই কিছু সময়োচিত উপদেশ দিয়াছে। বুঝাইয়াছে, এ সংসার মায়াময়। সুখ ও দুঃখ সবই মায়ার ছলনা। প্রকৃত জ্ঞানী তাই সুখ-দুঃখের অভিঘাত অগ্রাহ্য করিয়া কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত হয়।

এ তত্ত্ব, রাবণের অজানা নহে। কিন্তু, মানুষের জীবনে এমন সময় আসে যখন তত্ত্ববিদ্যা, দর্শন কিছুই তাহার চিত্তবৈকল্য দূর করিতে পারে না। সেই কথাই রাবণ এখানে বলিয়াছে।

সব জানিয়াও যে হৃদয় মানিতে চাহে না। চিত্ত যে অতল বেদনায় নিমজ্জিত হইতেছে। মৃণাল হইতে প্রস্ফুটিত পদ্মটি ছিন্ন করিয়া লইলে মৃণাল জলে ডুবিয়া যায়। ভ্রাতা পুত্র ইহারা তো হৃদয়বৃন্তে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো। মহাকাল ইহাদের ছিন্ন করিয়াছে, অকালে বিনষ্ট হইয়াছে, তাই ছিন্ন-পদ্ম মৃণালের মতো হৃদয় শোকসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। এই একটি উপমায় কবি রাবণের শোকের গভীরতা এবং তাহার চিত্তবিকলতা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

[৬] শত প্রসবণে,

বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী

....

নয়ন-রমণীরূপে, পরাক্রমে ভীমা

ভীমাসমা! [২৩৮—২৪৩]

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে যেখানে রাবণ প্রাসাদচূড়ায় উঠিয়া লঙ্কাপুরীর চারপাশে শত্রুসৈন্যের সমাবেশ পর্যবেক্ষণ করিতেছে, সেই অংশ হইতে আলোচ্য চরণ কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

লঙ্কা আজ শত্রু পরিবেষ্টিত। অগণিত শত্রুসেনা স্বর্ণলঙ্কাকে শত বেষ্টনে (প্রসরণে) পরিবেষ্টিত করিয়াছে। কবি শত্রু-পরিবেষ্টিত লঙ্কার এই অবস্থা এখানে একটি উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন। গভীর অরণ্যে যেমন ব্যাধেরা মিলিত হইয়া সাবধানে সিংহীকে ঘিরিয়া ফেলে—রাঘবীয় বাহিনী তেমনি লঙ্কাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সিংহী দেখিতে সুন্দর, কিন্তু বীর্যে ভয়ংকরী, ঠিক যেন চামুণ্ডাদেবী। লঙ্কাও সুন্দরী, তাহার সৌন্দর্য নয়নমনোহর, সেই সঙ্গে লঙ্কার পরাক্রমের কথাও সুবিদিত। সেও বলবীর্যে ভয়ংকরী। কেশরী-কামিনী বা সিংহী এবং লঙ্কা উভয়েই যেমন যুগপৎ সুন্দরী ও ভয়ংকরী, দেবী ভীমাও সেইরূপ সুন্দরী ও ভয়ংকরী। সৌন্দর্য তাহাদের দেহে, বিভীষিকা তাহাদের পরাক্রমে।

এই বর্ণনায় লঙ্কার অনিবার্য পরিণামের ইঙ্গিতও আছে। ব্যাধবেষ্টিত সিংহীর ন্যায় শত্রুসৈন্যবেষ্টিত লঙ্কা শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট হইবে।

[৭] হায় রে, যেমতি

স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,

পড়ে ক্ষেত্রে, পরিয়াছে রাক্ষসনিকর,

রবিকুল রবি শূর রাঘবের শরে। [২৬০—২৬৩]

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে। দূতমুখে যুদ্ধে পতিত রাজপুত্র বীরবাহুর বীরপনার সংবাদ শুনিয়া শোকাহত অথচ গর্বিত পিতা রাবণ স্বচক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে আসিয়াছেন। প্রাসাদশিখরে উঠিয়া রাবণ যে দৃশ্য দেখিলেন আলোচ্য অংশটি তাহারই আংশিক বর্ণনা।

যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। রণক্ষেত্রে সেই যুদ্ধের ভয়ংকর পরিণাম প্রকট হইয়া আছে। যে বিশাল রাক্ষসবাহিনী বীরবাহুর নায়কত্বে রণক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল সেই বাহিনীর সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে। হস্তী ও অশ্বের মৃতদেহ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানাপ্রকার অস্ত্র, আর তাহার মধ্যে রাশি রাশি শবদেহ। উচ্চ প্রাসাদশিখর হইতে বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত মৃত সৈনিকদের দেখিয়া মনে হইল শস্যক্ষেত্রে কাটা ফসলের মতো তাহারা পড়িয়া আছে। দ্যুতিময় অস্ত্রশস্ত্র ও বর্মাদি শোভিত সৈনিকদের স্বর্ণচূড় শস্যের মতো দেখাইল। 'কৃষিদল' বা কৃষকদলের অস্ত্রের আঘাতে যেন মাঠে কাটা ফসলের স্তূপ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে তেমনিভাবে রাক্ষসেরা পড়িয়া আছে। সূর্যবংশের সূর্য-স্বরূপ বীর রামচন্দ্রের শরাঘাতে রাক্ষসদের এই দশা হইয়াছে।

[৮] অধম ভালুকে

শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;

কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে

বীতংসে।

[৩০৫-৩০৮ ; ক. বি. '৬১, '৬৪]

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে। রাবণ প্রাসাদচূড়া হইতে যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য দেখিলেন। আরো দূরে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সমুদ্রের বুকে শিলাময় সেতুবন্ধ চোখে পড়িল। রণক্ষেত্রের দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে প্রবল ক্ষোভ সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা অকস্মাৎ উদ্বেল হইয়া উঠিল। এই সমুদ্র এতকাল লঙ্কাপুরীর অলঙ্ঘ্য পরিখার কাজ করিয়াছে। রাবণ শুধু তাহার আত্মীয়-পরিজন নহে, প্রকৃতির সহিতও প্রীতির বন্ধন অনুভব করেন—লঙ্কার মৃত্তিকা এবং আকাশ, লঙ্কার চারপাশের সমুদ্র সবই তাঁহার আপন। তাহারা রাবণকে রক্ষা করিবে, আপদ হইতে বাঁচাইবে—ইহাই তাহার প্রত্যাশা। কিন্তু সমুদ্রের এই আচরণ আজ রাবণকে বিক্ষুব্ধ করিল। মহাপ্রতাপশালী জলধি কেন এই সেতুবন্ধস্বরূপ কলঙ্ক স্বীকার করিতেছে। পরাক্রান্ত সমুদ্র কেন এ জাঙাল বিচূর্ণ করিতেছে না। প্রথমে ক্ষোভ, তাহার পরে রাবণের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে ধিক্কার।

সমুদ্র বিক্রমে সিংহের মতো। সিংহকে কেহ কখনো কৌশলে ফাঁদে ফেলিতে পারে না। তাহার পায়ে ফাঁস পরাইতে পারে না। অধম শক্তিহীন ভালুককেই যাদুকরেরা বাঁধিয়া খেলা দেখায়, সিংহকে দিয়া ওরূপ আচরণ কখনো কখনো সম্ভব নয়। তবে কেন সেই সিংহতুল্য বিক্রমশালী সমুদ্র সেতুবন্ধরূপ ফাঁসের বন্ধনদশা সহ্য করিতেছে।

সমুদ্রকে ধিক্কার দিয়া তাহার শক্তি প্রবুদ্ধ করিবার এই প্রয়াসে আসলে রাবণের নিজের মনের ভাবান্তর প্রকাশ পাইয়াছে। এতক্ষণ শোকাভিভূত রাবণের মনে যে বিকলতা দিয়াছিল তাহা কাটিয়া গিয়া এবারে আবার শৌর্যবোধ ফিরিয়া আসিতেছে।

[৯] কাকোদর সদা

নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে। [৪০০—৪০২]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাসাদশিখর হইতে রণক্ষেত্রের দৃশ্য দেখিয়া রাবণ পুনরায়

রাজসভায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এমন সময়ে সদ্যোমৃত রাজকুমার বীরবাহুর জননী চিত্রাঙ্গদা সখীদলসহ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। এ এক দুঃসহ দৃশ্য। একমাত্র সন্তানের জননী চিত্রাঙ্গদা, বীরবাহুর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে ভাবে চিত্রাঙ্গদা পুত্রের মৃত্যুর জন্য রাবণকে দায়ী করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় বহুমহিষীর মধ্যে অন্যতমা চিত্রাঙ্গদার সহিত রাবণের সম্পর্ক অতিশয় শিথিল। স্বামী নহে, পুত্রই তাঁহার অবলম্বন ছিল। বীরবাহু-জননী রূপেই এই বৃহৎ রাজপরিবারে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল। আজ সেই প্রতিষ্ঠার ভিত্তিটি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য যে প্রাণ দেয় তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়। 'দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব গেছে চলি স্বর্গপুরে।' কিন্তু চিত্রাঙ্গদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি অতিশয় স্পষ্টভাবে সর্বসমক্ষে লঙ্কার বর্তমান দুর্দশার জন্য একমাত্র রাবণকেই দায়ী করিয়াছেন। যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার মূলে আছে রাবণের কৃতকর্ম। সীতা অপহরণ করিয়া রাবণ অন্যায় করিয়াছেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে সমগ্র লঙ্কাবাসী। রামচন্দ্র সুদূর অরণ্য বাস হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছেন, লঙ্কার সিংহাসন অধিকারের উদ্দেশ্য নয়। ক্ষুদ্র নর মহাপ্রতাপান্বিত রাবণের সিংহাসন লাভের আশা করিতে পারে না। বামন কি আর চাঁদ হাতে পাইবার আশা করে। সুতরাং তাহাকে দেশরিপু বা দেশের শত্রু বলা যায় না। তাঁহার পত্নীকে অপহরণ করিয়া যে আঘাত করা হইয়াছে, রামচন্দ্র সেই অপমানের প্রতিবিধান করিতে আসিয়াছেন। ইহা একান্তই স্বাভাবিক। সাপ (কাকোদর) সর্বদা মাথা নিচু করিয়াই চলে। কাহারো চোখেও পড়ে না। কিন্তু কেহ যদি সাপকে আঘাত করে তবে সে ফণা তুলিয়া আঘাতকারীকে দংশন করে। দংশনের হেতু প্রহারক স্বয়ং। এ ক্ষেত্রে রামচন্দ্র লঙ্কার যে ক্ষতি করিতেছেন তাহার জন্য রাবণই মুখ্যত দায়ী। কারণ রাবণই প্রথম আঘাত করিয়াছেন।

এ কাব্যে এমন স্পষ্টভাবে রাবণের অপরাধের কথা আর কোথাও আর কেহ বলে নাই।

[১০] যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
....
সেখানে ফোটে এ ফুল. যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।" [৪৭৬—৪৮২]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই চরণ কয়েকটি বারুণী দেবীর সংলাপের অংশ। রাবণ যুদ্ধায়োজন করিতে সৈনিকদের পদভরে লঙ্কা টলমল করিয়া উঠিল। সমুদ্র-তলেও দেখা দিল আন্দোলন। বরুণ দেবতার স্ত্রী বারুণী সখী মুরলার নিকট হইতে আন্দোলনের কারণ জানিলেন। তাহার কৌতূহল হইয়াছে, রাবণের সমরসজ্জার প্রত্যক্ষ বিবরণ শুনিবেন। তাই মুরলাকে প্রেরণ করিতেছেন লক্ষ্মীর নিকট। লক্ষ্মী বর্তমানে লঙ্কায় অধিষ্ঠিতা। লক্ষ্মীকে নিবেদন করিবার জন্য একটি স্বর্ণকমল বারুণী মুরলার হাতে দিলেন। একদা লক্ষ্মী যখন সমুদ্র-গর্ভে বাস করিতেন, তখন তিনি যেখানে পা দুখানি রাখিতেন সেইখানে এখনও এই পদ্মফুল ফোটে। সেই পদ্মই বারুণী লক্ষ্মীকে উপহার পাঠাইতেছেন। ফুলটি দেখিলে পূর্বস্মৃতি মনে পড়িবে, বারুণী সখীর কথা স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিবে।

এখানে মধুসূদন একটি পৌরাণিক প্রসঙ্গের ভিত্তিতে বরুণ-পত্নী এবং লক্ষ্মীর মধ্যে সখ্যতার সম্পর্কের উল্লেখ করিতেছেন। পুরাণমতে দুর্বাসার শাপে একদা স্বর্গ লক্ষ্মীকে হারায়। লক্ষ্মী তখন সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নেন। পুরাণোক্ত লক্ষ্মীর এই সমুদ্রবাসের সময়ের কথাই এখানে বারুণী বলিয়াছেন। তাহার পর সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী সমুদ্রতল হইতে উত্থিতা হন। বারুণী বলিতেছে, "যে অবধি তিনি আঁধারি জলধিগৃহ গিয়াছেন গৃহে," এ সেই সমুদ্রমন্থনের সময়ের কথা। পৌরাণিক প্রসঙ্গের ভিত্তিতে এইভাবে কবি দুটি চরিত্রের মধ্যে একটি স্মৃতিবিধুর স্নিগ্ধ সম্পর্ক রচনা করিয়াছেন।

[১১] কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।

....

পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা। কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি?

৬০২—৬০৮

আলোচ্য অংশটি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের অন্তর্গত লক্ষ্মী ও মুরলার কথোপকথন হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা মুরলার উদ্দেশে লক্ষ্মীর উক্তি। মারুত লঙ্কার যুদ্ধের সংবাদ জানিবার জন্য মুরলাকে লক্ষ্মীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। লক্ষ্মী এখানে বারুণীর উদ্দেশে যে বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনীর দিক হইতে তাহার তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক।

লক্ষ্মী অচিরেই লঙ্কাপুরী ত্যাগ করিয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। ইহার অর্থ রাবণের পতন আসন্ন। লক্ষ্মী বলিতেছেন বর্ষার সময়ে জল যেমন কর্দমাক্ত হইয়া ওঠে, এখন লঙ্কার অবস্থাও সেইরূপ। একদা ইহা পুণ্যনিকেতন ছিল, এখন পাপে পূর্ণ হইয়াছে। এমন পাপে পূর্ণ পুরীতে লক্ষ্মীর পক্ষে বাস করা আর সম্ভব নয়।

মেঘনাদের বিপদ ঘটানোয় লক্ষ্মীর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রভাষার ছদ্মবেশে প্রমোদ-উদ্যান হইতে মেঘনাদকে লঙ্কায় ফিরাইয়া আনিয়াছেন, ফলে মেঘনাদ হইয়াছেন আগামী যুদ্ধের সেনাপতি। আবার লক্ষ্মীই দ্বিতীয় সর্গে ইন্দ্রের নিকট গিয়া মেঘনাদের মৃত্যুর উপায় উদ্ভাবনের জন্য তাহাকে প্ররোচিত করিয়াছেন। মেঘনাদের বিরুদ্ধে দেবসমাজের যে উদ্যোগ তাহার মূল হইতেছেন লক্ষ্মী। আর লঙ্কাপুরীতে বাস করা যায় না, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন তাই পরবর্তী ঘটনাধারার পটভূমিতে তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া ওঠে। শুধু লঙ্কায় বাস করিবার অনিচ্ছাই তিনি প্রকাশ করেন নাই। এই পুরীর সর্বনাশ যাহাতে ত্বরান্বিত হয় সেইজন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

[১২] সাজিল রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর ; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্রসহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে। [৬৮৯—৬৯৩]

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে। মেঘনাদ লঙ্কার বাহিরে প্রমোদকাননে ছিলেন, সুতরাং বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জানিতেন না। রাজলক্ষ্মী ছদ্মবেশে আসিয়া মেঘনাদকে এই সংবাদ দেওয়ায় মেঘনাদ পরম বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ভ্রাতা নিহত হইয়াছে আর তিনি প্রমোদকাননে বিলাসে মগ্ন—এই কথা ভাবিয়া বীর মেঘনাদ ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। পুষ্পমাল্য ছিন্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ লঙ্কায় প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিলেন। অঙ্গে তুলিয়া লইলেন বীরের যোগ্য আভরণ। মুহূর্তের মধ্যে মেঘনাদের এই যোদ্ধবেশ ধারণের বর্ণনায় কবি এখানে দুটি পৌরাণিক উপমা প্রয়োগ করিয়াছে।

হৈমবতী অর্থাৎ পার্বতীর পুত্র কার্তিকেয় তারকাসুর বধের সময়ে যেমন রণসজ্জা করিয়াছিলেন মেঘনাদও সেইরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। কার্তিকেয়র সুন্দর দেহকান্তি এবং যুদ্ধসজ্জায় তাহার শৌর্যময়তার সহিত মেঘনাদের যোদ্ধৃরূপের তুলনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপমাটি অর্জুনের সহিত। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময়ে অর্জুন ক্লীব বৃহন্নলার রূপ ধারণ করেন। তিনিই যে মহাবীর অর্জুন তাহা কেহ জানিত না। বিরাটরাজের গোগৃহ কৌরবকর্তৃক আক্রান্ত হইলে বিরাটপুত্র উত্তর গোগৃহ রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়। তাহার সারথি হন বৃহন্নলারূপী অর্জুন। কৌরবসেনা দর্শনেই উত্তর মূর্ছিত হইয়া পড়িল। তখন বৃহন্নলা, সেই ক্লীববেশী অর্জুন, মুহূর্ত মধ্যে শমীবৃক্ষে রক্ষিত তাঁহার অস্ত্রাদিতে ভূষিত হইলেন। অকস্মাৎ অর্জুনের দেহে এইভাবে বীরত্ব বৈভব প্রকাশ পাইল। ইন্দ্রজিৎ সম্পর্কে উপমাটির তাৎপর্য এই যে, প্রমোদ-উদ্যানে সে যেন নিজের শৌর্য বিস্মৃত হইয়া ক্লীবের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। ছদ্মবেশী রাজলক্ষ্মীর মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাহার সেই সুপ্ত শৌর্য স্বমহিমায় জাগ্রত

হইল। শমীবৃক্ষমূলে অর্জুন যেমন বেশ পরিবর্তন করিয়া মুহূর্তমধ্যে বীরবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, মেঘনাদও সেইরূপ দ্রুত বেশপরিবর্তন করিয়া বীরের যোগ্য সজ্জায় সজ্জিত হইল।

উপমাগুলি ব্যবহারনৈপুণ্যে বর্ণনীয় চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ইহাকে তাই সার্থক উপমা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বলা যায়।

[১৩]   হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ যদি
....
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?   [৭০৩—৭০৮]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মধুসূদন প্রমোদ-উদ্যান হইতে লঙ্কায় যাত্রা করিতেছেন। এই বিদায়কালে প্রমীলা অনুনয় করিয়াছে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে। এই অংশটি প্রমীলার ওই অনুনয়সূচক উক্তি।

ধাবমান মাতঙ্গ (হস্তী) যখন বনভূমি দলিত করিয়া চলে তখন কোমল লতা তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া যেন কিছুক্ষণ রঙ্গরসে অতিবাহিত করিয়া যাইবার জন্য মিনতি করে। মাতঙ্গ সে মিনতিতে কর্ণপাত করে না সত্য কিন্তু লতাকে পায়ে স্থান দেয়। লতা তাহার পদ-সংলগ্ন হইয়া থাকে। বনপথে ধাবমান হস্তীর পায়ে জড়ানো লতা—এই প্রসঙ্গটির সহায়তায় প্রমীলার মনোভাব এখানে সুন্দর কাব্যময়ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কর্তব্যের আহ্বানে মেঘনাদ যাত্রা করিতেছে, তাহাকে আর রঙ্গরসের প্রলোভনে প্রমোদ-উদ্যানে ধরিয়া রাখা যাইবে না। প্রমীলা তাহা আশাও করে না। কিন্তু প্রমীলাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বাধা কোথায় তাহা সে বোঝে না। পায়ে জড়ানো লতা যেমন হস্তীর গতি রোধ করে না, বাধা সৃষ্টি করে না, প্রমীলাও সেইরূপ মেঘনাদের কর্তব্যে বাধা সৃষ্টি করিবে না। শুধু কাছে থাকিবার তৃপ্তিটুকু তাহার কাম্য। এই আকুতিতে মেঘনাদের প্রতি প্রমীলার গভীর ভালোবাসাই প্রকাশ পাইয়াছে।

[১৪]　উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টংকারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
....
গুণিগণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে। [৭৭২—৭৭৭]

আলোচ্য অংশটি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাবণ মেঘনাদকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়াছেন। আগামীকাল সকালে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া মেঘনাদ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন। যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া অস্ত্র ধারণ করিলে পৃথিবীর কোনো শক্তি তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে না। সুতরাং এবারে লঙ্কার বিপদের অবসান আসন্ন। লঙ্কাবাসীর এই আশা এবং আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে বন্দীদের গানে। আলোচ্য চরণ কয়টি বন্দীদের গানেরই একটি অংশ। এখানে মেঘনাদের গৌরব গীত হইতেছে।

বহু দুর্যোগে, একের পর এক আঘাতে লঙ্কা পর্যুদস্তপ্রায়। লঙ্কাকে শোকগ্রস্তা ভূলুণ্ঠিতা নারীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বন্দীরা মিনতি করিয়া বলিতেছে, এবারে শোক পরিহার করো। উঠিয়া দেখ সেই মহাবীর ধনু ধারণ করিয়াছেন যাঁহার ধনুর টংকারে যিনি বজ্র দ্বারা পর্বত খণ্ড খণ্ড করেন (আখণ্ডল) স্বর্গের দেবশ্রেষ্ঠ সেই ইন্দ্র পর্যন্ত ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যান। মেঘনাদ অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং লঙ্কা এবার শত্রুমুক্ত হইবেই। তাঁহার তূণ ভয়ংকর অস্ত্রসমূহে পূর্ণ। এইসব অস্ত্র স্বয়ং পশুপতির (মহাদেব) পক্ষেও ত্রাসের কারণ। মহাদেবের অস্ত্রের নাম পাশুপত। মেঘনাদের অস্ত্র সেই পাশুপত অস্ত্রের মতোই অমোঘ। অর্থাৎ এই মহাবীরের অস্ত্র কথনো ব্যর্থ হইতে পারে না। মেঘনাদের পরাক্রমে শত্রু বিনষ্ট হইবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। লঙ্কার এই বীর সর্বগুণান্বিত, রূপে ইনি রমণীদের চিত্ত জয় করেন। এই বীর আগামী কালের যুদ্ধে শত্রুকে পরাভূত করিয়া দেশকে,পুনরায় পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

কবি এইভাবে বন্দীদের গানের মাধ্যমে তাঁহার নায়কের উজ্জ্বল মূর্তি পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

তৃতীয় সর্গ

[১৫] যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !
আর কি পাইব আমি (ঊষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে !

[৫৭-৬০ ; ক. বি. ১৯৬৯]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। মধুসূদন বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া প্রমোদ-উদ্যান হইতে লঙ্কাপুরীতে গিয়াছেন। যাইবার সময়ে প্রমীলাকে বলিয়া গিয়াছিলেন অচিরেই শত্রু নিধন করিয়া ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু রাত্রি হইয়া গেল। এখনো মেঘনাদের দেখা নাই। প্রমীলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সখী তাহাকে পুষ্পোদ্যানে লইয়া গেল ফুল তুলিবার জন্য। এখানে ম্রিয়মান সূর্যমুখী ফুল দেখিয়া তাহার উদ্দেশ্যে প্রমীলা সমবেদনা জানাইয়াছে, নিজের অবস্থার সহিত সূর্যমুখীর অবস্থার মিল দেখিতে পাইয়াছে।

সূর্যমুখী সকালে ফোটে এবং সারাদিন সূর্যের দিকে চাহিয়া থাকে। রাত্রে সূর্য থাকে না, তাই সূর্যমুখী বিশুষ্ক নিস্তেজ হইয়া যায়। সূর্যের বিরহেই যেন সূর্যমুখী এমন মলিন। প্রমীলা বলিতেছে প্রত্যূষে সূর্যমুখী আবার সূর্যকে ফিরিয়া পাইবে, তাহার বিরহ-যন্ত্রণা ঘুচিবে। কিন্তু প্রমীলার যিনি জীবনসূর্য যে সূর্যের দিকে চাহিয়া সে প্রাণ ধারণ করে, সেই মেঘনাদ কি আর ফিরিবে ! অর্থাৎ সূর্যমুখীর চেয়েও তাহার অবস্থা মন্দ।

[১৬] পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
....
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ? [৭৪—৮০]

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে আলোচ্য অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। বিরহী প্রমীলা মেঘনাদের সন্ধানে লঙ্কাপুরীতে যাইবে স্থির করিল। তাহার অভিপ্রায় জানিয়া সখী বাসন্তী পথের বাধার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। লঙ্কাপুরীর চারদিক ঘেরিয়া ব্যূহ রচনা করিয়া আছে শত্রুসৈন্য, রামচন্দ্রের বাহিনী। সেই বাহিনী অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ অসম্ভব। সখীর কথায় তেজস্বিনী প্রমীলা সক্রোধে ঐ উত্তর দিল।

পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুলের জন্য গর্ব, স্বামীকে লইয়া গৌরববোধ এবং নিজের শক্তির উপরে দৃঢ়প্রত্যয় যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে প্রমীলার এই উক্তিতে। তাহার এই উদ্দীপ্ত ভাষণে তেজস্বিতা এবং ব্যক্তিত্বের শক্তি-মণ্ডিত নারীচরিত্রের যে রূপ প্রকাশ পায় তাহা বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। একটি উপমায় প্রমীলা তাহার অভিপ্রায়সিদ্ধির দুর্জয় শক্তি পরিপূর্ণভাবেই প্রকাশ করিয়াছে। পর্বতনিঃসৃত নদী সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, যাত্রাপথের কোনো বাধাই সে গ্রাহ্য করে না। নিশ্চিত গতিতে সেই নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মেশে, প্রমীলাও সেইরূপ সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া মেঘনাদের সহিত মিলিত হইবে। 'ভিখারী রাঘব' কথাটিতে রামচন্দ্রের প্রতি যে উপেক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, মেঘনাদের যোগ্য পত্নীর পক্ষে তাহা একান্তই সঙ্গত।

[১৭] সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মাদ বীর-মদে ;
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। [১২৯—১৩৩

আলোচ্য অংশটি মধুসূদন রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রমোদ-উদ্যান হইতে প্রমীলা রাজপুরীতে যাইবে। পথে শত্রুসৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করিতে হইবে। তাই রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। রণসজ্জায় সজ্জিত প্রমীলার রূপবর্ণনায় কবি দুটি পৌরাণিক প্রসঙ্গ ব্যবহার করিয়াছেন।

দেবী দুর্গা মহিষাসুর মর্দন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর ছিল পুরুষের অবধ্য। তাই বিভিন্ন দেবতার শক্তি এবং অস্ত্রে শক্তিমতী দুর্গা ভীষণ যুদ্ধে তাহাকে নিহত করেন। রণসজ্জায় সজ্জিত প্রমীলাকে সেই মহিষমর্দিনী হৈমবতী বা দুর্গার মতো দেখাইল।

কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে শুম্ভ, নিশুম্ভ ও নমুচি এই তিন দানব জন্মগ্রহণ করে। ইন্দ্রের হাতে নমুচি নিহত হয়। কনিষ্ঠের মৃত্যুতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ ক্রোধে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করে। বীর-মদে উন্মত্তপ্রায় এই দুই দানব কোনো ন্যায়নীতি মানিত না। দেবী দুর্গাকে ইহারা বিবাহ করিতে চায়। শেষ পর্যন্ত দুর্গার সহিত যুদ্ধে একে একে দুই দানবভ্রাতা নিহত হয়। এই শুম্ভ নিশুম্ভ নিধনের সময়ে দেবীর যোদ্ধবেশের সহিত প্রমীলার রণরঙ্গিনী রূপের তুলনা করা হইয়াছে।

প্রমীলা দেবী দুর্গার অংশে জাত, তাঁহার শক্তিতে শক্তিমতী। তাই বার বার মধুসূদন প্রমীলার সহিত দুর্গার নানা রূপের উপমা দিয়াছেন। চামুণ্ডা বা কালী রূপে দেবীর সঙ্গিনী ডাকিনী-যোগিনী। প্রমীলার সহচরী চেড়ীদের তুলনা করা হইয়াছে ডাকিনী-যোগিনীর সহিত।

[১৮] ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।

[১৬৩—১৬৬ ; ক. বি. '৬৭]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রমোদ উদ্যান হইতে যাত্রা করিয়া শতচেড়ী-পরিবৃতা প্রমীলা লঙ্কার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে। এই অংশটি সেই যাত্রাপথের বর্ণনার অন্তর্গত। বায়ুর তাড়নায় যেমন অগ্নি দ্রুত অগ্রসর হইয়া যায় তেমনিভাবে প্রমীলা চলিয়াছে। তাহাদের গতিবেগে পথের ধূলি আকাশ আচ্ছন্ন করিতেছে। কিন্তু মেঘাকার সেই ধূলা অগ্নিশিখাতুল্য প্রমীলার রূপ আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। রাত্রি অন্ধকারে প্রজ্বলিত অগ্নির দীপ্তি যেমন ধূমপুঞ্জে আচ্ছন্ন

হয় না, প্রমীলার রূপও সেইরূপ ধূলিজালে আচ্ছন্ন হয় নাই। প্রমীলা তেজস্বিনী সখীদের সহিত প্রবল গতিতে লঙ্কার উদ্দেশে অগ্রসর হইয়া চলিল, যেন চলমান অগ্নিশিখা।

এই অংশে প্রমীলা এবং তাহার সখীদের আচরণ বর্ণনায় কবি অকৃপণভাবে শৌর্য ও সৌন্দর্য-সূচক বিশেষণ এবং এবং উপমা উৎপেক্ষা প্রয়োগ করিয়াছেন। মেঘনাদের নায়কের স্ত্রীকেও তিনি উপযুক্ত মর্যাদাসম্পন্ন করিয়া গড়িতে আগ্রহী। সমগ্র তৃতীয় সর্গ এই প্রয়োজনেই ব্যয়িত হইয়াছে।

[১৯] কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎছটা
রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্‌ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা।

[২৪৩—২৪৭ ; ক. বি ১৯৭০]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হনুমানের উদ্দেশ্য প্রমীলার সংলাপের অংশ। প্রমীলা তাহার নারীসৈন্যবাহিনী লইয়া রামচন্দ্র রচিত ব্যূহের নিকটবর্তী হইলে বীর হনুমান অগ্রসর হইল। দেখিল 'বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী'। অপরূপ সুন্দরী প্রমীলার যোদ্ধবেশ দেখিয়া বিস্মিত হনুমান তাহাদের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে প্রমীলা এই উত্তর দিয়াছে। প্রমীলা বলিয়াছে, রামচন্দ্র তাহার স্বামীর শত্রু, কিন্তু সেজন্য রামচন্দ্রের সঙ্গে বিবাদ করিতে আসে নাই। মেঘনাদ নিজভুজবলে ভুবনবিজয়ী, সুতরাং রামচন্দ্রের সহিত সংগ্রামে অপর কাহারো সহায়তায় তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। তাহাদের লঙ্কা অভিযানের উদ্দেশ্য ভিন্ন। স্বামীর বিরহে কাতর প্রমীলা স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্যই লঙ্কায় প্রবেশ করিতে চায়। তাহার অভিপ্রায়ে যদি রামচন্দ্র বাধা দেন তবে সে যুদ্ধ করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিবে। রাক্ষসপুরসুন্দরী প্রমীলা আপনাকে বিদ্যুতের সহিত উপমিত করিয়া বলিয়াছে, যে বিদ্যুতের আলোক মানুষের নয়নানন্দ তাহারই স্পর্শে মানুষ জীবন হারায়। এই

সুন্দরী শুধু দৃষ্টির পক্ষেই রমণীয় নয়, ইহার তেজ বিদ্যুতের মতোই ভয়ংকর। প্রমীলা এখানে তাহার লঙ্কা অভিযানের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করে নাই। দূতী নৃ-মুণ্ড-মালিনীকে রামের নিকট লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। যাহা বলিবার দূতী রামচন্দ্রকে জানাইবে।

প্রমীলার উক্তিতে বিদ্যুতের উপমাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই উপমায় তাহার দৈহিক সৌন্দর্য ও চারিত্রিক শৌর্যের ব্যঞ্জনা আছে। প্রমীলা নিজেই নিজের সম্পর্কে উপমাটি ব্যবহার করিয়াছে, ইহাতে তাহার প্রত্যয়বোধ এবং মর্যাদাবোধ প্রকাশ পাইয়াছে। আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে প্রমীলা সংশয়হীন, এই অসংশয়িত মনোভাব প্রমীলা চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

[২০] পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরি,
....
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে! [২৪৯-২৫৬]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রমীলা সখীদলসহ লঙ্কাপুরীর পশ্চিমদ্বারে উপস্থিত হইতেই বাধা পাইল। হনুমান অগ্রসর হইয়া তাহাদের পথরোধ করিল। তখন প্রমীলা আপন সেনাবাহিনীর প্রধানা নৃ-মুণ্ড-মালিনীকে দূতরূপে রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিল। নৃ-মুণ্ড-মালিনী হনুমানের সহিত রামচন্দ্রের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, উদ্ধৃত অংশটি শুধু তাহারই বর্ণনা।

যে অঞ্চলে নৃ-মুণ্ড-মালিনী প্রবেশ করিয়াছে সেখানে সর্বত্র রামচন্দ্রের সৈন্য সমবেত হইয়া আছে এই শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও সেই বীরাঙ্গনার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল না। বরং পালতোলা (গরুৎমতী) নৌকা যেমন তরঙ্গের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া অনায়াসে অগ্রসর হয়, তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মতো রামচন্দ্রের বিপুল বাহিনীর মধ্য দিয়া দূতী সেইরূপ অনায়াসে অগ্রসর হইয়া চলিল। রাত্রিকালে এমন অগ্নিশিখাসদৃশ রূপবতীর দিকে চাহিয়া গৃহস্থ যেমন চমকিত হয়—রামচন্দ্রের বাহিনীভুক্ত বীরদের মানসিক

অবস্থাও সেইরূপ। নতুন কোনো বিপদ ঘটিতে চলিয়াছে এইরূপ তাহাদের আশঙ্কা।

[২১] আপনি সুমতি

ধরি ধনুঃবরে করে কহিলা রাঘব ;

"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে

বাহু-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!

কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে ?" [২৮৩-২৮৭]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে, ইন্দ্রের দূত চিত্ররথ রামচন্দ্রের শিবিরে দেব-অস্ত্রসমূহ পৌঁছাইয়া দিল। তৃতীয় সর্গের বর্তমান ঘটনা তাহার কিছু পরে সংঘটিত। বাহিরে প্রমীলার বাহিনী লঙ্কায় প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, প্রমীলার দূতী আসিতেছে রামচন্দ্রের নিকট বার্তা নিবেদন করিতে। এদিকে শিবিরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং অন্যান্য বীরদের সহিত দেব-অস্ত্রগুলি পর্যবেক্ষণ এবং ইহা লইয়া পর্যালোচনা করিতেছেন।

ইন্দ্রপ্রেরিত ধনুখানি রামচন্দ্র তুলিয়া লইলেন। তারকাসুর বধের সময়ে দেব-সেনাপতি কার্তিকের এই রুদ্রতেজে পূর্ণ ধনু ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই অস্ত্র ভিন্ন মেঘনাদকে হত্যা করা সম্ভব নয়। ধনুকে জ্যা রোপণ করিতে রামচন্দ্র সমর্থ হইলেন না। মনে পড়িল জনকের নিকট গচ্ছিত হরধনু পিনাক তিনি চূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই পিনাক মহাদেব ব্যবহার করিয়াছিলেন দক্ষযজ্ঞের সময়ে দেবতাদের নিকট হইতে যজ্ঞভাগ আদায়ের জন্য। বাল্মীকির বর্ণনায় পাওয়া যায়, আট চাকার শকটে করিয়া পাঁচ হাজার দীর্ঘাকৃতি লোক এই ধনু রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র জ্যা রোপণ করিতে চেষ্টা করিলে সেই ধনু ভাঙিয়া যায়। জনক প্রতিজ্ঞা অনুসারে সীতার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ দেন। কিন্তু বর্তমান ধনুখানি তাহার চেয়েও শক্তিশালী। রামচন্দ্র ভাবিতেছেন, মহাধনু লক্ষ্মণ ব্যবহার করিবেন কিরূপে।

মেঘনাদবধের জন্য সংগৃহীত অস্ত্র সম্পর্কে এই সকল উক্তিতে প্রকারান্তরে মেঘনাদের পরাক্রম এবং শৌর্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ অস্ত্রে সেই অসাধারণ বীরকে হত্যা করা সম্ভব নহে।

[২২] "দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি!
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে!" [৩৫৯-'৬১]

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে। বিভীষণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের এই উক্তিতে রামচন্দ্র চরিত্রের যে পরিচয় পরিস্ফুট তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। প্রমীলার দূতী নৃ-মুণ্ড-মালিনী বলিয়াছিল, প্রমীলা লঙ্কার প্রবেশ করিতে চায়। রামচন্দ্র ইচ্ছা করিলে পথ ছাড়িয়া দিতে পারেন, নয়তো আসিয়া যুদ্ধ করুন। রামচন্দ্র তখন অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত সেই দূতীকে বলিয়াছিলেন, রাক্ষস-নারীদের সহিত বিবাদ করিবার জন্য তিনি এখানে আসেন নাই। নির্বিবাদে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিতে হনুমানকে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বিভীষণের নিকট স্বীকার করিতেছেন, বিনাযুদ্ধে পথ ছাড়িবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। দূতীর আকৃতি দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, তাই যুদ্ধ এড়াইতে চাহিয়াছেন। বাঘিনী-সদৃশ বিক্রমশালিনী এই চেড়ীদের উত্তেজিত করিলে যে ভয়াবহ পরিণাম হইতে পারে তাহার আশঙ্কাই রামচন্দ্রের অমন সৌজন্য-প্রদর্শনের মূল।

এক সময়ে রামায়ণের শ্রদ্ধেয় চরিত্রগুলি কলঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া মধুসূদনকে প্রচুর সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে। ইচ্ছাপূর্বকই তিনি ইহা করিয়াছেন। রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে শৌর্যে-বীর্যে অতুলনীয় করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাহা করিতে গিয়া প্রতিপক্ষকে দুর্বল এবং কাপুরুষরূপে চিত্রিত করিতে হইয়াছে। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্রের মুখে এরূপ উক্তি কল্পনাও করা যায় না।

[২৩] যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
...[illegible]...
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।
[৪২৫-৪৩১ ; ক. বি '৬৫]

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রমীলা রামচন্দ্রের বাহিনী অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল। সেই শৌর্যময়ীকে দেখিয়া রামচন্দ্র বিস্ময়ে অভিভূত। তাঁহার ধারণা প্রমীলা নহে, মায়াদেবী এই বেশে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। বিভীষণ পুনরায় রামচন্দ্রকে বুঝাইতেছেন মায়াদেবী নহে, প্রমীলাই তাহাদের সম্মুখ দিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল। দুর্গার অংশে জাত অপরূপ সুন্দরী এবং তেজস্বিনী এই নারী। এমন রূপ তেজস্বিতার জন্যই মেঘনাদের মতো মহাপরাক্রমশালী বীরকে বশে রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। মেঘনাদ তাহার প্রেমে বিমোহিত হইয়া থাকে, তাই জগৎবাসীরাও সুখে শান্তিতে আছে।

জলধারা যেমন কাননের শত্রু দাবানলকে নির্বাপিত করে, কালাগ্নি-সদৃশ মেঘনাদকে সেইরূপ প্রমীলা প্রেম আলাপনে নিস্তেজ করিয়া রাখে। কালীয় নাগ যমুনার সুশীতল জলে আত্মগোপন করিয়া থাকে, তাই বিশ্ব তাহার বিষের জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। সেই কালীয় নাগের তুল্য এই মেঘনাদও সতত প্রমীলার প্রেমরূপ যমুনা-জলে শান্ত হইয়া থাকে। না হইলে ইহার উপদ্রবে মর্তের মানুষ, পাতালে নাগেরা ও স্বর্গবাসী দেবতারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। বিশ্বকে রক্ষা করিবার জন্যই বিধাতা এমন নারী সৃষ্টি করিয়াছেন।

[২৪] বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গাড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। [৫৬৫-৫৬৯]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদন রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিভীষণ রামচন্দ্রকে সতর্ক করিয়া দিলেন মেঘনাদের সহিত প্রমীলা আসিয়া মিলিত হইয়াছে, রাত্রিটুকু সাবধানে থাকা উচিত। রাত্রে কোনো নতুন বিপত্তি না ঘটিলে সকালবেলায় মেঘনাদকে হত্যার একটা সুযোগ মিলিবে। রামচন্দ্র তাই বিভীষণ ও লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলেন সর্বত্র প্রহরার ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া আসিতে। তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রহরীদের সকলকে সতক প্রহরায় নিযুক্ত দেখিলেন।

চার দ্বারে চার বূ্যহ অতন্দ্রভাবে দ্বার রক্ষা করিতেছে। এই প্রহরার দৃশ্য কবি একটি উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন আলোচ্য অংশে। বারিদপ্রসাদে, অর্থাৎ মেঘ হইতে বর্ষিত জলে পুষ্ট হইয়া যখন ফসল বাড়িতে থাকে তখন ক্ষেতের পাশে উঁচু মাচা বাঁধিয়া কৃষকেরা সারারাত ফসল পাহারা দেয়। হরিণ, মহিষ বা অন্য কোনো প্রাণী যাহাতে শস্যের কোনো ক্ষতি করিতে না পারে সেইজন্যই এত সতর্কতা। রামচন্দ্রের বাহিনীর নায়কেরাও সেই কৃষকদের মতো সারারাত্রি সতর্কভাবে জাগিয়া আছে। কৃষকেরা শস্যনষ্টকারী পশুদের বিতাড়ন করে, আর এই বীর প্রহরীরা রাক্ষসদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছে।

২৫ তুরঙ্গম-আস্কান্দিতে উঠিছে পড়িছে

গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে

কনক-কমল যেন মানস-সরসে!

[৫৮৬-৫৮৮ ; ক. বি: ৬৬]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদন রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশের দৃশ্য কৈলাস হইতে পার্বতী দেখিতেছেন। প্রমীলার বাহন বড়বা বিচিত্র ভঙ্গিতে চলিয়াছে, আর তাহার চলার ছন্দে প্রমীলার গৌর অঙ্গ উন্নত-আনমিত হইতেছে। দৃশ্যটি দেখিয়া মনে হয় যেন মানসসরোবরে প্রস্ফুটিত স্বর্ণ-কমল তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে। প্রমীলার দেহকান্তির সৌন্দর্য এবং অশ্বের চলার

ছন্দে তাহার আন্দোলিত রূপ এই অংশে কবি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বর্ণনার গুণে চরণ তিনটিতে একটি সুন্দর ছবি ধরিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

পার্বতী প্রমীলার রূপের প্রশংসা করিতেছেন। পার্বতীর অংশেই প্রমীলার জন্ম। সেইজন্যই তাহার রূপ এমন অসামান্য।

২৬ মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে ; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি,
আভাহীন হয় সে লো দিবা অবসানে,
তেমনি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে। [৬০৭-৬০৪]

মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গে শেষ অংশে বিজয়ার প্রশ্নের উত্তরে পার্বতী প্রমীলা সম্পর্কে এই উক্তি করিয়াছেন। প্রমীলা বীর-বেশে লঙ্কায় প্রবেশ করিল। রাবণের বিপক্ষীয়দের পক্ষে প্রমীলার লঙ্কায় সমাগম মহা আশঙ্কার কারণ। মেঘনাদের সহিত প্রমীলা একত্রিত হওয়ায় সকলেই চিন্তিত, কারণ, "একাকী জগৎজয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে, তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা, মিলিল বায়ু-সখী অগ্নিশিখা সে বায়ুর-সহ!" পরাক্রান্ত ইন্দ্রজিৎকে প্রতিরোধ করা এবার দুঃসাধ্য হইবে। বিজয়া সখী এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করিয়াছে পার্বতীর নিকট। ইতিপূর্বে এই সর্গেই বিভীষণের উক্তি হইতে জানা যায় প্রমীলা মহাশক্তি অর্থাৎ পার্বতীর অংশে জাত। মহাশক্তির মতোই তেজস্বিনী। এ দানবীকে বিক্রমে আঁটিয়া ওঠা তাই কাহারো সাধ্য নয়। পার্বতী, আলোচ্য সংলাপে সেই তথ্যেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বিজয়াকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন, আগামীকাল প্রমীলার তেজ তিনি হরণ করিবেন। আগামীকাল প্রভাতে লক্ষ্মণ দেব অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিতে যাইবে। পার্বতী তখন প্রমীলার তেজ হরণ করিয়া লক্ষ্মণের বিপদাশঙ্কা দূর করিবেন।

যে সকল মণি সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল দেখায়, দিবা অবসানে সূর্যালোক অপগত হইলে সেই মণি আভাহীন হয়। পার্বতীর তেজে তেজস্বিনী প্রমীলা পার্বতীর কৌশলেই সেইরূপ তেজহীন হইবে। তাহার দিক হইতে

তাই আশঙ্কার আর কোনো কারণ থাকিবে না। পার্বতীর এই প্রতিশ্রুতি রামচন্দ্র এবং তাহার রক্ষক দেবতাদের পক্ষে পরম আশ্বাসের কারণ। রামচন্দ্র পার্বতীর ভক্ত। ভক্তকে আনুকূল্য করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এইভাবে পার্বতী প্রমীলার তেজহরণ করিয়া রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করিবেন। এ কাব্যে পরবর্তী ঘটনাধারায় যে শোকাবহ ট্র্যাজিডি সংঘটিত হইতে যাইতেছে এখানে তাহার ভূমিকা প্রস্তুত হইল। এইদিক হইতে পার্বতীর উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ সর্গ

[২৭] হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?
....
(দীন আমি !) রত্ন-রাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? [১৩—২০]

আলোচ্য অংশটি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম তিনটি সর্গে কবি কোথাও রামায়ণ কাহিনীর জনক বাল্মীকি বা অপর কোনো ভারতীয় কবির নিকট ঋণ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু 'অশোকবন' নামক এই চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে তিনি স্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ করিয়া বাল্মীকিকে প্রণাম জানাইয়াছেন এবং কাব্যে সিদ্ধিলাভের জন্য আদি কবির আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, রাবণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি চরিত্র চিত্রণে কবি বাল্মীকিকে অনুসরণ না করিলেও দুঃখিনী সীতার চরিত্র তিনি বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াই আঁকিয়াছেন। তাই এই সর্গের সূচনায় বিশেষভাবে ঋণ স্বীকারের প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন।

আদিকবি বাল্মীকি যে রামায়ণ কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে বিভিন্ন কবিদ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ রামায়ণ ভারতীয় সাহিত্যে এক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভর্তৃহরি, ভবভূতি, কালিদাস, কৃত্তিবাস—প্রসিদ্ধ এই কবিবৃন্দ সকলেই নিজেদের কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বাল্মীকির মহাকাব্য হইতে। মধুসূদন বলিতেছেন, এইসব প্রখ্যাত কবির কাব্য প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে বাল্মীকির প্রসাদে। মধুসূদন এই কবিসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে চান। তাই পিতৃস্থানীয় কবি বাল্মীকির প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছেন। ভর্তৃহরি, কালিদাস প্রভৃতি কবি কাব্যরসের সরোবরে রাজহংসের মতো। বাল্মীকির দয়া ভিন্ন সেই রসসরোবরে মহাকবিদের সহিত একত্র বিহার সম্ভব নয়। মধুসূদনের একান্ত সাধ, আপন মাতৃভাষাকে সৌন্দর্যময় উপকরণে সজ্জিত করিয়া তুলিবেন। সে উপকরণ বাল্মীকির কাব্য হইতেই সংগ্রহ করিতে চান। এই নূতন কবি যে কাব্যমালিকা রচনা করিতে চান, তাহার জন্য বাল্মীকির কাব্যরূপ পুষ্পচয়ন করিতে হইবে। অন্ততঃ এই চতুর্থ সর্গের উপকরণ তিনি নিষ্ঠার সহিত বাল্মীকির কাব্য হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। রত্নাকর বা সমুদ্রই রত্নের আকর। রত্ন যে আহরণ করিতে চায় তাহাকে রত্নাকরের নিকট যাইতেই হইবে। বাল্মীকিকে রত্নাকর বলার অপর তাৎপর্য, কিংবদন্তি অনুসারে কবিত্বলাভের পূর্বে বাল্মীকি দস্যু ছিলেন এবং তখন তাঁহার নাম ছিল রত্নাকর। এখানে স্মরণীয়, প্রথম সর্গের সূচনায় সরস্বতী বন্দনায় কবি লিখিয়াছেন :

> "হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
> কাব্যরত্নাকর কবি।"

[২৮] কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারা রত্ন যথা।
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা। [৮৩—৮৬

আলোচ্য অংশটি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রাবণ আগামী দিনের যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছেন। বীরবাহুর মৃত্যুতে লঙ্কায় যে শোকের ছায়া নামিয়াছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে। সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ইন্দ্রজিৎ আগামী দিনের যুদ্ধে রামচন্দ্রকে নিশ্চিত-ভাবে পরাস্ত এবং বিতাড়িত করিবে। তাই সমগ্র লঙ্কা উৎসব মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি সীতার প্রহরায় নিযুক্ত চেড়ীর দলও উৎসবে অংশ গ্রহণ করিতে গিয়াছে। অশোক-কাননে সীতা একাকী রহিয়াছেন। এই সুযোগে বিভীষণ-পত্নী সরমা সীতার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। লঙ্কায় বন্দিনী সীতার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেন এই একটিমাত্র মানুষ, সরমা। যখনই সুযোগ পান, সীতার কাছে আসিয়া বসেন। সিঁদুর পরাইয়া দেন। তাঁহার মুখে পূর্বজীবনের কথা শোনেন। আজও সরমা আসিয়াছেন সীতার কাছে।

সরমা সঙ্গে আনিয়াছেন সিঁদুরের কৌটা। এয়ো স্ত্রীলোক সিঁদুর না পরিলে অকল্যাণ হয়। সরমা তাই যত্নে সীতার ললাটে সিঁদুর পরাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বন্দিনী সীতা সর্বদাই বিষাদে মলিন হইয়া থাকেন। দেখায় ম্লান আলোর গোধূলির মতো। সীতার মলিন মুখ, গোধূলির মতো ম্লান ললাটে সিঁদুরের বিন্দুটি সন্ধ্যাতারার মতো উজ্জ্বল দেখাইল। দেখিয়া সরমা পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। এ তাঁহার এক পুণ্যকর্ম। পুণ্যার্থী যেমন দেবীকে প্রণাম করে, সরমাও সেইরূপ সীতাকে প্রণাম করিলেন।

বর্ণনাটি তেমন কিছু চমকপ্রদ নয়। কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে কবির যে মনোভাবের আভাস ফুটিয়া ওঠে তাহা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। মধুসূদন য়ুরোপীয় জীবনাদর্শকেই বারংবার তাঁহার একান্ত কাম্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এমনকি কাব্য-রচনাতেও তিনি ভারতীয় প্রথার শাসন ছিন্ন করিয়া বিপ্লব সাধনে প্রয়সী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রক্তের সংস্কার, তাঁহার দুর্মর ভারতীয়ত্ব বা বাঙালিত্বই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছে। সীতা-সরমা সংবাদে এই চতুর্থ সর্গে বিশেষভাবে বাঙালি নারীর, বাঙালি বধূর কমনীয়তা, বাঙালি জীবনের সংস্কারসমূহ অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। মধুসূদনের কবিমানসের এই অন্তরঙ্গ পরিচয়ের দিক হইতে আলোচ্য অংশের বর্ণনা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। সরমা একটু আগেই সীতাকে বলিয়াছেন, "এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ।" এই উক্তি বিশেষভাবে বাঙালি

কুলবধূরই উক্তি। শব্দ ব্যবহারের দিক হইতেও মধুসূদন এখানে লৌকিক বাঙলা ভাষার উপরেই নির্ভর করিয়াছেন।

[২৯] "কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।" [১৬৮-১৭২]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতার প্রহরায় নিযুক্ত চেড়ীবৃন্দ উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছে। এই সুযোগে সরমা আসিয়াছেন সীতাকে প্রণাম করিতে। কবি এইভাবে সীতা ও সরমার কথোপকথনের সূত্রে মেঘনাদবধ কাব্যের পরিকল্পনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যায় না এমন সব কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। এইভাবে চতুর্থ সর্গে রাম ও রাবণের বৈরিতার পটভূমি স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে। সীতার মুখে একটানা বিবৃতি ক্লান্তিকর হইতে পারে বিবেচনা করিয়া কবি সরমার প্রশ্ন ও সীতার উত্তরের আকারে সমগ্র বিবরণটি উপস্থাপন করিয়াছেন। মাঝে মাঝে পূর্বস্মৃতি বর্ণনায় সীতা ব্যথিত এবং কাতর হইয়া পড়েন। সরমা লজ্জিত বোধ করেন। সীতাকে নিরস্ত করিতে চান। কিন্তু যতোই বেদনা বাজুক, একজন সহমর্মী মানুষের কাছে নিজের দুঃখময় জীবনের কথা বলিয়া হৃদয়ভার লাঘবের সুযোগ সীতা হারাইতে চান না। কেন সীতা সরমাকে সব কথা বলিতে আগ্রহী—তাহা বুঝাইতে একটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই উপমাটিই এখানে ব্যাখ্যা করিবার জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

সীতা সরমাকে বলিয়াছেন, বর্ষার নদী প্লাবনপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া দুই কূল ছাপাইয়া জলরাশি আশেপাশে ছড়াইয়া দেয়। ইহাতে জলধারার চাপে নদীর বেদনা কিছুটা লাঘব হইয়া যায়। দুঃখী সীতা সেই বর্ষার নদীর মতো। প্রতিকূল ঘটনার চাপে তাঁহার অন্তঃকরণ সর্বদা পীড়িত,

ব্যথিত। এ বেদনা একাকী বহন করা দুঃসাধ্য। সহমর্মী সরমাকে কাছে পাওয়ায় তাঁহার মনের বাঁধ অতিক্রম করিয়া সেই অন্তর-গত বেদনাপ্রবাহ সরমার মনে সঞ্চারিত হইতে চাহিতেছে। সরম যদি এই বেদনার অংশ নেন, এ প্রলাপ যদি শোনেন, তবে সীতার দুঃখভার কিছুটা লাঘব হইবে। সীতাকে সর্বদাই চুপ করিয়া একাকী বেদনা বহন করিতে হয়। সর্বদা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে যে চেড়ীর দল, তাহাদের নিকট মনের কথা বলিবার কোনো অর্থ নাই, তাহারা শুনিবেও না। সমগ্র লঙ্কাপুরীতে একমাত্র সরমাই সীতার বেদনায় ব্যথিত, সীতার প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই যতটুকু সময় সরমাকে সীতা কাছে পান, নিজের কথা তাঁহাকে বলিয়া মনোকষ্ট লাঘব করেন।

[৩০] "শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন যবে তার সমাগমে।" [২১৩-২২০]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতা ও সরমার কথোপকথনের সূত্রে রাম-রাবণের বিরোধিতার পটভূমি স্পষ্ট করিয়া তোলাই চতুর্থ সর্গে মধুসূদনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু যেভাবে এই দুটি চরিত্রের সংলাপ কবি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কাহিনী উপস্থাপনের সেই প্রাথমিক অভিপ্রায় ছাড়াইয়া সীতা ও সরমার চরিত্রচিত্র অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির আলোকে চরিত্র দুটি উদ্ভাসিত। সীতার প্রতি সরমার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধের অভিব্যক্তি হিসাবে আলোচ্য অংশটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সরমার প্রশ্নের উত্তরে সীতা পঞ্চবটী বনে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অতিবাহিত দিনগুলির সুখস্মৃতি বিবৃত করিয়াছেন। রাজকন্যা, রাজার ঘরের বধূ সীতা অমিত সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বামী এবং দেবরের সহিত অরণ্যপথে আসিয়াছেলন। আজন্ম রাজপ্রাসাদে লালিত সীতার পক্ষে বনবাস অপরিসীম ক্লেশজনক হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু, সীতা বলিতেছেন, অরণ্যে কখনো তিনি কোনোপ্রকার মানসিক কষ্ট অনুভব করেন নাই। পঞ্চবটী বনে রাজপ্রসাদের বিলাস ব্যসন ছিল না। কিন্তু সুরম্য প্রতিনিয়ত নয়ন-মন ভুলাইয়া এক অপূর্ব সুখের স্বাদ সঞ্চার করিয়া দিল। বন্য প্রাণীরা, বিচিত্র বর্ণের সব পাখি সীতার কুটিরে আসিত তাঁহার আদরের লোভে। রাজভাণ্ডার না থাকিলেও দণ্ডকারণ্যরূপ ভাণ্ডারে আহার্যের কোনো অভাব ছিল না। মাঝে মাঝে ঋষিপত্নীরা সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সর্বোপরি ছিল রামচন্দ্রের নিয়ত সাহচর্য এবং লক্ষ্মণের অতন্দ্র সেবা। সীতার অরণ্যবাসের এই অপরূপ কাহিনী শুনিতে শুনিতে সরমা মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়াছেন। বলিয়াছেন, এই কাহিনী শুনিলে রাজপ্রাসাদের বিলাস-ব্যসনে, সুখের আয়োজন ঘৃণা জন্মে। রাজপ্রাসাদের সুখ ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে ইচ্ছা করে। সঙ্গে সঙ্গে সরমার মনে হইয়াছে, সীতার পক্ষে অরণ্য সুখভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু সকলের পক্ষে তেমন না হইতেও পারে। সীতা পুণ্যবতী নারী। তাঁহার চরিত্র সূর্যরশ্মির মতো আলোকময়। সূর্যরশ্মি যেমন অন্ধকার বনকেও আলোকিত করিয়া তোলে, সীতার চরিত্রগুণে সেইরূপ অরণ্য সুখভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। তুলনায় সরমা নিজেকে তমিস্রাময়ী রাত্রি বলিয়াছেন। রাত্রি যেখানে যায় সেখানেই মালিন্য নামিয়া আসে, আলো দূরে যায়। সীতাকে সূর্যরশ্মির সহিত তুলনা করিয়া নিজেকে এইভাবে হীন করিয়া দেখানোর মধ্যে সীতার প্রতি সরমার শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার সহিত মিশিয়া আছে নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বেদনাবোধ। বিভীষণ রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দেওয়ায় সরমা লঙ্কায় সকলের উপেক্ষায় পাত্রী হইয়াছেন। এই অসম্মানকর পরিস্থিতিতে তাঁহাকে সর্বদা যে বিষাদ বহন করিয়া দিনযাপন করিতে হয়, নিজের সম্পর্কে ব্যবহৃত মলিন রাত্রির উপমায় সরমার মনের ক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩১] "আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!"

[২৪৩—২৪৮]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনা, আর মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনায় এ কাব্য শেষ হইয়াছে। এই পরিকল্পনার পরিসীমার মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়ের পূর্বসূত্র, অর্থাৎ রাবণকর্তৃক সীতাহরণ ইত্যাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপন করিবার উপায় নাই। কবি তাই সীতার স্মৃতিকথার মাধ্যমে সেই পূর্বকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে ইহাই কবির মূল অভিপ্রায়। আলোচ্য অংশে সীতা বর্তমান বিরোধের পূর্বকারণ বর্ণনা করিতেছেন। সূর্পণখা রামচন্দ্রের রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসিলে লক্ষ্মণের হাতে সে লাঞ্ছিত হয়। সূর্পণখার লাঞ্ছনায় ক্রুদ্ধ রাক্ষসেরা রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণ করে। এখানে সেই যুদ্ধের কথাই সীতা বলিতেছেন।

রামায়ণের বিবরণ অনুসারে, সূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বকে রাবণ ক্রমে ক্রমে হত্যা করায় অনুতপ্ত হইয়া বিধবা ভগিনীকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিহারের স্বাধীনতা দেন এবং খর দূষণ নামে দুই সেনাপতিকে তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাক এবং কান কাটিয়া লাঞ্ছিত করিলে সে খর ও দূষণের নিকটে এই লাঞ্ছনার কথা জানায় এবং রাম-লক্ষ্মণ সহ সীতার রক্তপানের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। খরের আদেশে প্রথমে চোদ্দজন রাক্ষস রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিতে আসিয়া নিহত হয়। সূর্পণখার নিকট সংবাদ পাইয়া খর স্বয়ং চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য লইয়া রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখীন হয়। এক ভয়ংকর যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত খর ও দূষণ সহ সমস্ত রাক্ষসসৈন্য

রামচন্দ্রের শরাঘাতে নিহত হয়। সীতা সরমার নিকট এই ভীষণ যুদ্ধের কথাই বিবৃত করিতেছেন।

বিশাল রাক্ষস বাহিনী পঞ্চবটী বনের দিকে ধাবিত হইল। রামচন্দ্র তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। এক তুমুল যুদ্ধ শুরু হইল। ভয়ে সীতা কুটিরের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। ধনুর (=কোদণ্ড) টংকারে আতঙ্কিত সীতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিলেন দেবতারা যেন রামচন্দ্রকে রক্ষা করেন।

সীতা এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা করেন নাই। কাহিনীর দিক হইতে ঘটনাটির গুরুত্ব আছে। এই যুদ্ধে খর ও দূষণের পরাজয়ের সংবাদ সূর্পণখা রাবণকে জানায়। রাবণ বিক্ষুব্ধ হইয়া ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সীতা-অপহরণ আয়োজন করেন। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকার্ত রাবণ একবার বলিয়াছেন :

"হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ?"

সুতরাং শুধু রামায়ণ কাহিনী নয়, মেঘনাদবধের ঘটনাধারা এবং চরিত্র-চিত্রণের দিক হইতেও সীতার মুখে বর্ণিত যুদ্ধের ঘটনাটির কিছু তাৎপর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা আছে।

[৩২] "মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম। তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা !
যাই আমি। গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি ? নহে দোষ মম ;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।"

[৩১১-৩১৫]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা সীতার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণের উক্তি। সীতা সরমার নিকট রাবণকর্তৃক তাঁহাকে অপহরণের বিবরণ দিতে গিয়া কীভাবে লক্ষ্মণ তাঁহাকে একাকী রাখিয়া রামের অন্বেষণে যাইতে বাধ্য হন, তাহাই বিবৃত করিতেছেন।

মারীচ মায়ামৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করিলে সীতার অনুরোধে রামচন্দ্র সেই পলায়মান মৃগের পশ্চাতে ছুটিয়া যান। কিছুক্ষণ পরে দূর হইতে রামচন্দ্রের আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সীতা রামচন্দ্র বিপন্ন হইয়াছেন ভাবিয়া ব্যাকুলভাবে লক্ষ্মণকে অনুসন্ধান করিতে বলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে একাকী রাখিয়া যাওয়া উচিত হইবে না বলায় বিপদাশঙ্কায় বুদ্ধি-ভ্রষ্ট সীতা লক্ষ্মণকে কুবাক্যে তিরস্কার করেন। মূল রামায়ণে আছে, সীতা এমনকি লক্ষ্মণের চরিত্রের প্রতিও কটাক্ষ করেন। বলেন কৌশলে সীতাকে অধিকার করার জন্য অথবা ভরতের প্ররোচনায় রামচন্দ্রের ক্ষতিসাধনের জন্যই লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সহিত বনে আসিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে অবশ্য মধুসূদন এইসব অশিষ্ট উক্তি বর্জন করিয়াছেন। রামায়ণে সীতার কটূক্তির উত্তরে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণও সীতাকে কিছু কঠোর কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, স্ত্রীজাতি ধর্মজ্ঞানশূন্য, চপল, নির্দয়, তাহারা আত্মীয়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে। মধুসূদন লক্ষ্মণের এইসব কটূক্তিও বর্জন করিয়াছেন। এখানে লক্ষ্মণ বলিয়াছেন, সীতাকে তিনি মায়ের মতো মনে করেন। মাতৃসম সীতার কটূক্তি তিনি নীরবে সহ্য করিবেন। সীতার আদেশ মানিয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তিনি সীতাকে একাকী রাখিয়া যাইতেছেন। যাইবার সময়ে সাবধানে গৃহের মধ্যে থাকতে বলিয়া গেলেন। মধুসূদন লক্ষ্মণ চরিত্রকে রামায়ণের লক্ষ্মণের তুলনায় অনেক বেশি ধীর এবং স্থিতধী এবং সংযত করিয়া আঁকিয়াছেন। শুধু আলোচ্য উক্তিতে নয়, মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বত্রই লক্ষ্মণ চরিত্র সংযত এবং আত্মপ্রত্যয়শীল। মধুসূদনের প্রিয় নায়ক মেঘনাদ এই লক্ষ্মণের হাতেই নিহত হইবে। হয়তো মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে মধুসূদন চারিত্রিক মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া আঁকাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। মেঘনাদ মরিবেই, কিন্তু যেন কোনো নীচে কাপুরুষের হাতে তাহাকে প্রাণ দিতে না হয়—এইরূপ একটা প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষার জন্যই এ কাব্যে রামের তুলনায় লক্ষ্মণকে মধুসূদন উজ্জ্বলতর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

[৩৩] 'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।" [৩৫৪—৩৬০]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অংশ সীতার একটি সংলাপের অন্তর্গত। সীতা সরমার নিকট রাবণ কর্তৃক তাঁহাকে অপহরণের দৃশ্যটি বর্ণনা করিতেছেন। রামচন্দ্র মায়ামৃগের পশ্চদ্ধাবন করিয়া ছুটিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই দূর হইতে, রামের আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সীতা লক্ষ্মণকে রামের সন্ধানে যাইতে বাধ্য করেন। তার পরেই আবির্ভূত হয় ছদ্মবেশী রাবণ। সীতা প্রথমে ঘরের বাহিরে গিয়া রাবণকে ভিক্ষা দিতে সম্মত হন নাই। অভিশাপের ভয়ে বাহিরে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাবণ তাঁহাকে ধরে। এই দৃশ্যের বর্ণনায় সীতা একটি পূর্বতন ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চবটী বনে বাসকালে একদিন সীতা রামচন্দ্রের সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। সেই সময়ে দূরে একটি হরিণীকে বিচরণ করিতে দেখিতে পান। অকস্মাৎ ভীষণ গর্জন শুনিলেন। চাহিয়া দেখেন হরিণীটিকে একটি বাঘ আক্রমণ করিয়াছে। সীতা কাতর হইয়া হরিণীটিকে বাঘের আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে রামচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র মুহূর্তের মধ্যে শরানলে বাঘটিকে ভস্মীভূত করিয়া হরিণীর প্রাণরক্ষা করেন। সীতা বহুযত্নে সেই সুন্দরী হরিণীকে সুস্থ করিয়া তোলেন।

রাবণ-কর্তৃক ধৃত সীতার অবস্থা হইয়াছিল সেই আক্রান্ত হরিণীর মতো। রামচন্দ্র হরিণীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, শার্দূলটিকে হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সেই ক্ষণে উপস্থিত ছিলেন না। শার্দূল-আক্রান্ত হরিণীর উপমায় সীতা সরমার নিকট নিজের অসহায় দুর্দশার কথা মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন।

[৩৪]

" 'চিনি তোরে', কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণশরে ! আয় মূঢ়মতি !"

[৪১৯—৪২৪]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সরমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সীতা একে একে পূর্ব ঘটনাসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। কারণ যখন সীতাকে অপহরণ করিয়া পুষ্পক রথে দ্রুত লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন দশরথের বন্ধু বৃদ্ধ পক্ষীরাজ জটায়ু রাবণকে বাধা দেয়। সীতার বিবরণ অনুসারে, ধাবমান পুষ্পকে সীতা অকস্মাৎ প্রচণ্ড গর্জন শুনিতে পান। সেই গর্জনে রথবাহী অশ্বগুলি কাঁপিয়া ওঠে, রথের গতি অস্থির হয়। সীতা দেখিলেন, প্রলয়ের মেঘাকৃতি এক বীর পর্বতের উপরে দণ্ডায়মান। সে রাবণকে সম্বোধন করিয়া ধিক্কার দিতেছে। আলোচ্য অংশ সীতা কর্তৃক বর্ণিত জটায়ুর সেই ধিক্কারসূচক উক্তির অংশ। জটায়ু রাবণকে পরস্বাপহারী চোর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জটায়ু বলিয়াছে, চিরদিন এই তোর কাজ। আজ আবার কাহার ঘর অন্ধকার করিলি, কাহার কুলবধূ অপহরণ করিয়াছিস ? রাবণকে কেহ পরাস্ত করিতে পারেনা, অস্ত্রীদল বা অস্ত্রধারী বীরদের এই অপবাদ আজ ঘুচিবে, আজ রাবণকে জটায়ুর তীক্ষ্ণ শরাঘাতে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় মধুসূদন জটায়ুকে মনুষ্যদেহধারী বীররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাই জটায়ুর মুখে শরাঘাতে রাবণকে হত্যা করিবার কথা দিয়াছেন। মূল রামায়ণের বর্ণনা ভিন্নরূপ।

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণই নায়ক। কবি পরম সহানুভূতিভরে রাবণের মহিমান্বিত চরিত্র এবং তাহার জীবনের বিপন্নতার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এ কাব্যে রাবণের দুষ্কর্মকে কোথাও বড়ো করিয়া দেখানো হয় নাই। শুধু

প্রথম সর্গ চিত্রাঙ্গদা এবং চতুর্থ সর্গের আলোচ্য অংশে জটায়ু রাবণের কাজের সমালোচনা করিয়াছে। অবশ্য জটায়ুর সমালোচনায় রাবণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তাহার জীবননীতি অনুসারে শক্তিমান মানুষ আপন অভিপ্রায় চরিতার্থ করিবে, ইহাতে কোনো পাপ থাকিতে প.রেনা। রাবণ নিজেকে ক্ষুদ্র ন্যায়-অন্যায় বিচারের উর্ধ্বে মনে করে।

[৩৫] " 'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে !
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি ; আশীষিনু তোরে !" [৪৫৫-৪৬১]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতার প্রতি এই উক্তি সমগ্র কাব্যের ঘটনা পরিণতির দিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রাবণ ও জটায়ু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সীতা পলায়ন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মাটিতে পড়িয়া যান। সীতা তখন উদ্ধারলাভের আর উপায় নাই দেখিয়া মাতা বসুন্ধরাকে ডাকিয়া তাহার কোলে স্থান দিতে অনুরোধ করেন এবং অচৈতন্য হইয়া পড়েন। অচৈতন্য অবস্থায় সীতা স্বপ্ন দেখেন, মাতা বসুধা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সুমধুর স্বরে বলিতেছেন, রাবণ-কর্তৃক সীতাকে অপহরণের মধ্য দিয়া বিধির ইচ্ছাই কার্যকর হইতেছে। রাবণের অনাচার এবং পাপ বসুন্ধরার পক্ষে দুর্বহ হওয়ায় তাহার বিনাশের জন্যই বসুন্ধরা সীতাকে জন্ম দিয়াছিলেন। এখানে স্মরণীয়, হল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণের সময়ে জনক রাজা সীতায় অর্থাৎ লাঙলের রেখায় এই কন্যাকে পাইয়াছিলেন। সীতাকে এইজন্য পৃথিবী বা বসুধার কন্যা বলা হইয়াছে। বসুধা বলিতেছেন, পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারেই রাবণ সীতার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, তাহাকে অপহরণ করিতেছে। বিধি এতদিনে সুপ্রসন্ন হইলেন। অর্থাৎ রাবণের বিনাশ নিশ্চিত হইল।

মেঘনাদবধ কাব্যে বার বার বিধির ইচ্ছা বা নিয়তির নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হইয়াছে। যাহা কিছু এ কাব্যে ঘটিয়াছে সবই সেই নিয়তি দ্বারা নির্দিষ্ট, সকল ঘটনাই অনিবার্য। কবি এক নিয়তি পরিকল্পনার ঐক্যবন্ধনে সমস্ত ঘটনার মধ্যে অন্তর্গত গ্রন্থনসূত্র রচনা করিয়া তুলিয়াছেন। এমনকি দ্বিতীয় সর্গে স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন, "দেবে বা মানবে, কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি"। এই প্রাক্তন বা নিয়তি বা বিধি সমস্ত ঘটনা অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, এ শক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার বা ইহার নির্ধারিত গতিমুখ ফিরাইয়া দিবার সাধ্য কাহারও নাই। রাবণ নিজেও বহুবার এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শক্তির কথা বলিয়াছে। এই নিয়তির নির্ধারিত পরিণাম রোধ করিবার উপায় নাই জানিয়াও রাবণ ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। এই সংগ্রামে রাবণের আত্মপ্রত্যয়শীল পুরুষেরও অনিবার্য বিধ্বংসী পরিণাম নিদারুণ হইয়াছে।

আলোচ্য অংশে বসুধার মুখে বিধির ইচ্ছার কথা উচ্চারণ করাইয়া কবি এ কাব্যের অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রটি সম্পর্কে আমাদের আর একবার সচেতন করিয়া দিয়াছেন।

[৩৬] "কহিলা হাসিয়া

মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি ?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে!
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে'।" [৪৮০-৪৮৫]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জটায়ু এবং রাবণের যুদ্ধের সময়ে সীতা অচৈতন্য হইয়া পড়েন এবং অচেতন অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন মাতা বসুধা তাঁহাকে আশ্বাস দিতে আসিয়াছেন। স্বপ্নে আবির্ভূতা বসুধা সীতাকে ভবিষ্যতের ঘটনাবলী দেখান। কবি এই কৌশলে সীতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বহির্ভূত ঘটনাগুলি তাঁহার মুখ দিয়া বর্ণনা করার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। বসুধা ভবিতব্য বার

খুলিয়া দিলেন। সীতা দেখিলেন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া সীতার অন্বেষণে এক নতুন দেশে আসিয়াছেন। রাম সেখানকার রাজাকে হত্যা করিয়া অপর একজন বীরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই নূতন রাজার আদেশে লক্ষ লক্ষ বীর একত্রিত হইল, তাহাদের পদভরে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। এ আবার এক নূতন বিপদ মনে করিয়া সীতা সভয়ে চোখ মুদ্রিত করিলেন। তখন বসুধা সীতাকে আশ্বস্ত করিবার জন্ম বলিলেন, ভয়ের কোনো কারণ নাই। আর রাম যাহাকে হত্যা করিয়াছেন তাহার নাম বালি। এই সমস্ত ঘটনা অনুষ্ঠিত হইতেছে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে। মহাবলশালী বীরবৃন্দ যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইতেছে।

বাল্মীকি-রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মৈত্রীর কাহিনী বর্ণিত আছে। কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালি বলিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত এবং তাহার স্ত্রী রুমাকে অধিকার করে। সুগ্রীব রামচন্দ্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পর সুগ্রীব রামের সাহায্য লাভের ভরসায় বালিকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে। প্রথম যুদ্ধে সুগ্রীব পরাস্ত হয়। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধেও সুগ্রীব পরাভূত হইতেছে দেখিয়া অন্তরাল হইতে শরাঘাতে রামচন্দ্র বালিকে হত্যা করেন। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হয়। সুগ্রীব সীতা উদ্ধারে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিল। তাহার সৈন্তবাহিনী লইয়াই রামচন্দ্র লঙ্কা অবরোধ করেন এবং একে একে রাক্ষস বীরদের বিনষ্ট করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনেন।

আলোচ্য অংশে রামায়ণ বর্ণিত সেই বিস্তৃত আখ্যানের আভাষ দেওয়া হইয়াছে।

[৩৭] "চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
'রক্ষঃ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা আমার!
পরের কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী ; ক্ষম, মা, মোরে।' " [৫৪৮–৫৫২]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ-কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জটায়ু এবং রাবণের যুদ্ধের সময়ে সীতা অচৈতন্ত হইয়া

পড়েন এবং অচেতন অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন মাতা বসুধা তাঁহাকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিতে আসিয়াছেন। বসুধা ভবিতব্যতার খুলিয়া দিয়া সীতাকে ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটিবে সব একে একে দেখান। এইভাবে স্বপ্ন বৃত্তান্তের মাধ্যমে মধুসূদন সীতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বহির্ভূত ঘটনাগুলি সীতার বিবরণের অন্তর্গত করিয়াছেন। সীতা রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ একে একে লঙ্কার বীরদের বিনষ্ট হইতে দেখেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাবণ কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের শরাঘাতে সেই মহাবীরকেও প্রাণ হারাইতে হইল। সীতা স্বপ্নের মধ্যে দেখিলেন, রাক্ষসদের হাহাকারে লঙ্কার আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন হইল। শত শত বীর যোদ্ধা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে। তাহাদের আত্মীয় পরিজনদের আর্তক্রন্দন শুনিয়া সীতা দুঃসহ বেদনা বোধ করিলেন। বসুধাকে নিরস্ত হইতে অনুনয় করিলেন। এমন নিদারুণ দুঃখ সীতা সহ্য করিতে পারেন না। এমন কি শত্রুর ও শোক তাঁহার কোমল, পর দুঃখ কাতর অন্তঃকরণ ব্যথিত করে।

মধুসূদন সীতাকে নারীর শ্রী, কমনীয়তা ও কোমলতায় এক অনবদ্য চরিত্র রূপে গড়িয়াছেন। অকারণে সীতা চরম নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু নির্যাতনকারীর দুর্দশাও তাঁহাকে ব্যথিত করে। এত মৃত্যু, এত শোক, এত হানাহানি—সবকিছুরই জন্য সীতা নিজেই দায়ী মনে করিয়া কুণ্ঠিত। শত্রুর প্রতিও তাঁহার করুণার অন্ত নাই। পূর্ব কাহিনী বর্ণনায় মাঝে মাঝে সীতা যে সব মন্তব্য করিয়াছেন সেই মন্তব্যগুলিতেই তাঁহার এই করুণাময়ী চরিত্ররূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য অংশটি সেইরূপ একটি অংশ।

প্রসঙ্গতঃ মধুসূদনের চরিত্র নির্মাণ দক্ষতার কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনায় কবি নিজে কোনো মন্তব্য যোজনা না করিয়া সীতা চরিত্রের নিজস্ব উক্তির মাধ্যমেই চরিত্রটির স্বরূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন। কবির বিবৃতিতে নয়, নিজেরই আচরণ ও ব্যবহারে, নিজেরই উক্তির ভিতর দিয়া সীতা আমাদের সম্মুখে বিষন্ন মাধুর্যে, করুণায়, দুঃখবহনের ক্ষমতায় এক আশ্চর্য চরিত্র রূপে ফুটিয়া ওঠে।

[৩৮] " 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম ! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজবলে !
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন !
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্বরে ?' " [৫৯৯-৬০৪]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ-কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা সীতার উদ্দেশ্যে জটায়ু বিজয়ী রাবণের উক্তি। সীতাকে অপহরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া যাইবার সময়ে গরুড় রাবণকে বাঁধা দেন। সীতাকে ছাড়িয়া রাবণ গরুড়ের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। এক ভয়ংকর যুদ্ধে রাবণ গরুড়কে আহত করিয়া মাটিতে ফেলেন এবং বিজয়ীর গর্বে সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, পদ্ম আঁখি মেলিয়া রাবণের পরাক্রম দেখ। শৌর্যের জন্ত জগতে যে জটায়ু, তাহার দুর্গতি দেখ। কেন এই মূর্খ আমার ন্যায় শক্তিধরের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল। নিজের দোষেই আজ জটায়ুকে প্রাণ দিতে হইল।

রাবণের এই দম্ভোক্তির মধ্যে তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতার পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ন্যায় নীতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা মেঘনাদ বধের নায়ক রাবণ কখনো স্বীকার করেন নাই। তাঁহার জীবন-নীতি তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সীতা অপহরণ ব্যাপারটিতে রাবণ কখনো অন্যায় দেখে নাই। রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ সূর্পণখা অপমান করিয়া রাবণের প্রতিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছে, অতএব সীতাকে অপহরণ করিয়া রামলক্ষ্মণকে শিক্ষা দিতে হইবে। জটায়ু রাবণের অসীম শৌর্যকে উপেক্ষা করিয়াছেন অতএব তাঁহাকে মরিতে হইবে। ইহার কোনো ঘটনার জন্তই রাবণ নিজেকে দায়ী মনে করেন না। তিনি স্পষ্টই বলেন, "নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়নন্দন"। জটায়ুর ধর্মজ্ঞান রাবণের সহানুভূতি বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নাই, বরং পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বীর বীরত্বের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ জীবন নীতি দুর্বলের নহে, শক্তিমানের জীবন নীতি। শক্তি যাহার আছে, সে আপন শক্তিবলে পৃথিবীতে আধিপত্য করিবে। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ যে করে, সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তিকে

তিনি শ্রদ্ধা করেন কিন্তু তাহার ধর্মজ্ঞান বা নীতিপরায়ণতাকে কোন মূল্য দেন না। সীতাকে সামনে বিজয়ী রাবণ যে ভঙ্গিতে নিজের বীরত্বের কথা উচ্চারণ করিয়াছে, তাহার মধ্যেও শক্তির প্রতি সশ্রদ্ধ হইবার আহ্বান প্রচ্ছন্ন আছে। সীতার দাম্পত্য নীতির মর্ম রাবণ বোঝে না। শৌর্যের দৃষ্টান্তে এই নারীকে অভিভূত করিয়া তাহাকে জয় করিতে চান।

[৩২] সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
যে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ বিহারিণী! [৬২৯-৬৩৫]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়েছে। জটায়ুর সহিত যুদ্ধের পর রাবণ সীতাকে লইয়া পুষ্পকে লঙ্কার দিকে ধাবিত হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিপুল সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে একটি রঙিন রেখার মতো স্বর্ণলঙ্কা সীতার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। অপূর্ব সে দৃশ্য। লঙ্কার সৌন্দর্যের তুলনা নাই। কিন্তু যতোই সুন্দর হোক, সীতার পক্ষে লঙ্কাপুরী বন্দীশালা ভিন্ন আর কিছু নয়। সরমার নিকট সীতা এইভাবে প্রথম লঙ্কা দর্শনে তাঁহার মনে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সীতার এই উক্তি যথার্থ মনস্তত্ত্ব সম্মত। স্বর্ণলঙ্কার বৈভব এবং ঐশ্বর্য তিনি অস্বীকার করেন নাই। সমুদ্রের মাঝখানে এই দ্বীপটির প্রকৃতিক সৌন্দর্যও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু ওই অতুলনীয় ঐশ্বর্যপুরীতে সীতাকে আনা হইতেছে বন্দীরূপে। বনে যে পাখি নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় উড়িয়া বেড়ায়—সেই স্বাধীনতা তাহার নিকট সবচেয়ে মূল্যবান। তাহাকে যদি মহামূল্য সোনার খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, খাঁচাটা সোনার—অতএব তাহার কোনো দুঃখ থাকিবে না,—এমন হইতেই পারে না। বন্দী পাখির চোখে সোনার খাঁচাও সুন্দর দেখায় না। যে খাঁচাতেই রাখা যাক, বন্দী পাখি স্বাধীনতা হারানোর বেদনা কিছুতেই ভুলিতে

পারে না। সীতার মানসিকতাই এই অবরুদ্ধ পাখির মতো। লঙ্কার ভোগসুখের কিছু অভাব থাকিবে না হয়তো, কিন্তু বন্দীজীবনের সেই সুখ কখনোই তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। কখনো তিনি ভুলিতে পারিবেন না যে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে এখানে আনা হইয়াছে।

কবি এখানে সীতার দৃষ্টি দিয়া লঙ্কার শ্রী এবং ঐশ্বর্য আমাদের দেখাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সীতার মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশদ করিয়া চরিত্রটির সঙ্গতিও অব্যাহত রাখিয়াছেন।

[৪০] "মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে !
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম ! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা শিরে শিরোমণি !
আর কি কহিব, সখি ? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন ! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি ?" [৬৬৮-৬৭৩]

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতার সহিত দীর্ঘ আলাপনের পর সরমা বিদায় গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস অচিরেই সীতা বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইবেন, রামচন্দ্রের নিকট ফিরিয়া যাইবেন। সরমার প্রশস্তিবাচনের উত্তরে সীতা বলিয়াছেন, এই শত্রুপুরীতে সরমাই তাঁহার একমাত্র শুভানুধ্যায়ী। সীতার দুরবস্থায় দয়াপরবশ হইয়া সরমা প্রতিনিয়ত তাঁহার খোঁজ খবর লইয়াছেন, নিয়ত কুশল কামনা করিয়াছেন, সুযোগ পাইলেই সঙ্গ দান করিয়া তাঁহার একাকীত্বের দুঃসহ বোঝা লাঘব করিয়াছেন। সরমার প্রতি তাই সীতার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। তিনি মূর্তিমতী দয়া। লঙ্কারূপ কর্দমাক্ত জলে সরমা পদ্মফুলের মতো। এ পাপ পুরীর কলুষ তাঁহাকে কলুষিত করে নাই। তাঁহার অন্তঃকরণ পদ্মের মতো পবিত্র এবং স্নিগ্ধ। সীতার পক্ষে লঙ্কাপুরী এক কালসর্পের মতো। ভয়ংকর কালসর্প ভীতিপ্রদ হইলেও তাহার মাথার মণি যেমন মানুষের আদরের ধন, লঙ্কাপুরী সীতার সর্ববিধ দুর্দশার কারণ হইলেও এই লঙ্কারই কুলবধূ সরমা সেই মণির মতোই সীতার কাম্য এবং আদরণীয়। সীতা নিজেকে সর্বদাই ছোট করিয়া দেখেন। তাঁহার

স্বাভাবিক বিনয়বশে তিনি নিজের তুলনায় পৃথিবীর সকলকেই মনে করেন শ্রেষ্ঠতর। সরমাকেও তিনি নিজের তুলনায় মহার্ঘ বলিয়াছেন। সরমার মতো এমন সর্বগুণান্বিতা রত্নতুল্য নারীর সাহচর্য পাইয়াছেন বহুভাগ্যে। দরিদ্র রত্নলাভ করিলে যেমন ব্যাকুলভাবে সেই রত্নকে যত্ন করে, রক্ষা করে, সীতাও সেইরূপ সরমার সহিত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমা—এই দুই নারীর হৃদ্যতার এক অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সীতা অপহরণের পাপে রাবণ সর্বনাশের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহার পাপকার্য সমর্থক করিতে না পারিয়া বিভীষণ রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়াছেন। ফলে লঙ্কার রাজপ্রাসাদে স্বজনবিদ্বেষী বিভীষণের পত্নী সরমার কোনো মান মর্যাদা নাই। সীতা ভিন্ন তাঁহার এই অবমাননাকর অবস্থার কথা বুঝিবে না। সীতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি পোষণ করেন, সীতাও তাঁহার প্রতি মমতা পোষণ করেন। এক বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে উভয়ের এক নিবিড় হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য অংশটিতে এই হৃদ্যতার ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে সীতার উক্তিতে।

———

প্রশ্নোত্তর

[এক] "মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনায় কবি বলিয়াছেন, "গাইব, মা বীররসে ভাসি মহাগীত"। বীররসের কাব্যরচনার এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত কতোটা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বিশদভাবে আলোচনা কর।

উত্তর। কবি মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বীররসপ্রধান মহাকাব্যরচনার প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়াছেন। কবির এই উক্তির জন্যই সমগ্র কাব্য শেষ পর্যন্ত কতোটা বীররসাশ্রিত হইয়াছে সে বিষয়ে আলোচনা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বিচার্য, কবির প্রকট অভিপ্রায় কতোটা সফল হইয়াছে এবং না হইয়া থাকিলে সেই কারণে কাব্যটির রসাবেদন ব্যর্থ হইয়াছে কিনা। এই প্রসঙ্গে আলোচনার সূচনাতেই মনে পড়ে কবির একখানি পত্রের কথা, যেখানে তিনি বন্ধুকে লিখিয়াছেন, "You must not judge of the work as a regular Heroic poem. I never meant it such. It is a story, a tale, rather heroically told." কাব্যের সূচনায় যাহাই বলুন না কেন দেখা যাইতেছে, কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়া কবি এ কাব্যকে রীতিমত বীররসাত্মক করিয়া তোলার ব্যাপারে আর উৎসাহ পোষণ করেন নাই। এখানে এই যে দ্বিধার ভাবটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমাদের আলোচনার পক্ষে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

মেঘনাদবধ কাব্যের দোষ-গুণ বিচারের যেসব প্রচেষ্টা হইয়াছে—সেই সমালোচনার ধারায় বারবার রসবিচারের প্রশ্নটিও উঠিয়াছে। কোনো কোনো সমালোচক অনুযোগ করিয়াছেন, মধুসূদন বীররসাত্মক কাব্যরচনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই, এ কাব্য করুণরসের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। কেহ বা মধুসূদনের কাব্যলক্ষ্মীকে বলিয়াছেন, মহাতেজস্বিনী—, সর্বদাই বীরভাবান্বিতা, বীর-রসাশ্রিত বাক্যপ্রিয়া। আবার অনেকের মতে এ কাব্যে বীররস ও করুণরস যুক্তধারায় বহিয়া গিয়াছে। কাব্যের বর্ণনা-ভঙ্গি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, শেষ অভিমতটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মহাতেজস্বী পরাক্রান্ত রাবণ; কিন্তু কাব্যের আরম্ভে কবি তাহাকে উপস্থাপন করিয়াছেন শোকাহত মূর্তিতে। পুত্রের মৃত্যুসংবাদে বিকলহৃদয় রাবণের আক্ষেপোক্তিগুলির কোথাও বীরত্বের আভাস

নাই। একে একে আত্মীয়-পরিজনের মৃত্যুতে এই আত্মীয়বৎসল পুরুষের হৃদয়ে যে শোক পুঞ্জিত হইতেছিল, বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে তাহা সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া উদ্বেলিত হইয়াছে। শোকাভিভূত রাবণের অন্তরের কথা—

"হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোকসাগরে......"

কিন্তু শোকের এ অভিঘাত রাবণের ব্যক্তিত্ব-শক্তি বিনষ্ট করে নাই। বীর পুত্রের আত্মোৎসর্গে গর্বিত তাহার পিতৃহৃদয় শেষ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বীরশূন্য লঙ্কার অধিপতি রাবণ নিজেই যুদ্ধযাত্রায় উদ্যোগী হইয়াছে। রাবণের শোকের পরিণতি উৎসাহে, কারুণ্য মিশিয়া যায় উদ্দীপনায়। এই যে রূপান্তর, ইহা এক প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রের রসবিচারের নিরিখে বিচার করিয়া বোঝা যায় না। মানব-চরিত্রে আবেগের নানা স্তর, কখনো কোনো একটি ভাবানুভূতি প্রবল হইয়া ওঠে, কখনো বা সেই অনুভূতি অপর ভাবের তরঙ্গে নিজেকে বিলীন করিয়া দেয়। চরিত্রে মানবিক হৃদয়াবেগের গভীরতা আনিবার জন্য, চরিত্রকে বাস্তবতাসম্মত করিয়া তুলিবার জন্য কাহিনীর পটের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তাহার হৃদয়াবেগের তরঙ্গ, ভাবের ভিন্নতা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিতে হয়। না হইলে চরিত্র হইয়া ওঠে যান্ত্রিক। মধুসূদন অলংকারশাস্ত্রের বিধির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া দৃষ্টিপাত করিয়াছেন মানব-জীবনের বাস্তবতার প্রতি। ফলে তাঁহার কাব্যরসের অবিমিশ্রতার গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলেও জীবনের বাস্তবতা-সম্মত হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্য রীতিমতো বীররসাত্মক কাব্যও হয় নাই, আবার অবিমিশ্র করুণরসের কাব্যও হয় নাই। সপ্তম সর্গে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পরে রাবণকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করানো হইয়াছে। সেখানেও মহাতেজস্বী এই যোদ্ধার শোকখিন্ন হৃদয়াবেগ কবি প্রচ্ছন্ন করেন নাই। বরং ওই শোকের প্রসঙ্গের জন্যই রাবণের যুদ্ধবর্ণনা মামুলি বীররসের বিবরণ মাত্র না হইয়া গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়। রাবণ-চরিত্র মর্মস্পর্শী হইয়া ওঠে।

এ কাব্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার বিবরণ কিছু কম নাই। মেঘনাদ প্রমীলা প্রভৃতি চরিত্রের সবল সমুন্নত শৌর্য আমাদের মুগ্ধ করে। লঙ্কাবাসীর জীবনে উপস্থিত দুর্যোগ যতোই পরাক্রান্ত হোক, ইহারা সেই দুর্যোগে বিন্দুমাত্র বিচলিত

হয় নাই। অপরিমিত সাহস এবং শৌর্যে সে সেই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইয়াছে। কিন্তু এই বীরত্বপূর্ণ উদ্যোগ আয়োজন শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর করাল গ্রাসে বিনষ্ট হয়। সমগ্র কাব্যখানিকে ঘিরিয়া আছে অপ্রতিরোধ্য নিয়তির কালো ছায়া। পরিণাম পূর্ব হইতেই নির্ধারিত হইয়া আছে। নির্ধারিত সেই পরিণাম অস্বীকার করিবার সাহসেই চরিত্রগুলির শৌর্য পরিস্ফুট। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর অনিবার্যতায় যখন সেই বীরচরিত্র বিধ্বস্ত হয় তখন সেই শোকাবহ পরিণতির সম্মুখে মানব-ভাগ্যের করুণ পরিণতির সম্মুখে আমাদের স্তম্ভিত হইতে হয়। এক মৃত্যুর আঘাতে এ কাব্যের সূচনা, আর সকল লঙ্কাবাসীর আশাভরসা ইন্দ্রজিতের চিতাগ্নির আলোকে দণ্ডায়মান রাবণের শোকমূর্তিতে এ কাব্যের সমাপ্তি। সন্দেহ নাই, বীররস নহে করুণরসই এ কাব্যের মূল রস। কিন্তু সেই করুণরসকে মহিমা দান করিয়াছে বীরচরিত্রের আধার।

কাব্যের সূচনায় 'বীররসে ভাসি মহাগীত' রচনার যে উদ্দেশ্য কবি অভিব্যক্ত করিয়াছেন, আক্ষরিকভাবে তাহা মানিয়া লইলে বলিতে হয় কবির সে অভিপ্রায় এ কাব্যে চরিতার্থ হয় নাই। কিন্তু ওই উক্তিটিকে এ কাব্যে কবি কল্পনার নিয়ামকরূপে গ্রহণ করিবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। সেভাবে এ কাব্য পাঠ করিবার চেষ্টা পরিণত রসবোধের পরিচায়ক নহে। বরং আখ্যান-ধারায় চরিত্রগুলি যে বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সর্ববিধ পূর্ব-সংস্কার বর্জন করিয়া তাহার আস্বাদনই কাম্য। তাহাতেই এ কাব্যের প্রকৃত রসের স্বাদ পাওয়া সম্ভব। সে রস শুদ্ধ বীররস বা করুণরস নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহার মধ্যে সুস্থ জীবন-রসের আস্বাদ মেলে। তাহাতেই এ কাব্যের গৌরব।

[দুই] মেঘনাদবধ এ পুরাতন পৌরাণিক কাহিনী মধুসূদনের প্রতিভাস্পর্শে কিরূপে সমকালীন যুগপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ সর্গ হইতে দেখাও। [ক. বি. ১৯৬৬]

উত্তর। পৌরাণিক রামায়ণ-কাহিনীর নায়ক রামচন্দ্র। ইনি বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত। সচ্চরিত্র, সর্বভূতের হিতকারী বিদ্বান, আত্মসংযমী, জিতক্রোধ, অসূয়াশূন্য ও অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন এই রামচন্দ্রের চরিত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক গুণের চরম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাল্মীকি এই

চরিত্রে মানুষকেই দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন। রামায়ণ-কাহিনীতে নানাবিধ অবস্থাসঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়া এই চরিত্রের মহত্ব অসংশয়িতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। শ্রেয়, রামচরিত্রে, তাহারই উজ্জলতম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাই ভারতীয় জনসমাজে এই কাহিনী যুগে যুগে এক আদর্শ-প্রতিভূরূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বাঙলাদেশে মধ্যযুগে রামায়ণের যে অনুবাদ হইয়াছিল, বিশেষত কৃত্তিবাস কবি এই কাহিনীর যে নূতন রূপ দিয়াছিলেন তাহাতে তৎসাময়িক ভক্তিবাদের স্পর্শে রামচরিত্র ভক্তবৎসল দেবতার অবতারে পরিণত হয়। শত্রু রাবণের প্রতিও এই ভক্তের ভগবানের ক্ষমা ও করুণার অন্ত নাই। বাঙলাদেশের রামায়ণে ভক্তিরই লীলা। বাল্মীকি এবং কৃত্তিবাসের রচনায় ভিন্নতা আছে, রসাবেদনের পার্থক্য আছে—কিন্তু উভয় কাহিনীর কাঠামোতেই শুভ ও শ্রেয়বোধের প্রতীক রামচন্দ্র। এইদিক হইতে উভয় কবির রচনার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে কোনো মৌলিক বিরোধ নাই। কিন্তু এই কাহিনীরই একটি অত্যন্ত আধুনিক শাখা মেঘনাদবধ কাব্যে কাহিনীটি যেভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাতে এই আধুনিক কবির সহিত প্রাচীন কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক প্রভেদই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিবর্তনের হেতু কী, আধুনিক জীবনভাবনার প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য কীভাবে রামায়ণ-কাহিনীর এই আধুনিক শাখাটিতে প্রতিফলিত তাহা বিচার করিয়া দেখিবার যোগ্য।

সাহিত্য কিছু বৃন্তহীন পুষ্পের মত নিরালম্ব বস্তু নয়। জীবনের ভূমি হইতে রসাকর্ষণ করিয়াই সাহিত্য পুষ্ট হয়। সুতরাং জীবনের বনিয়াদে যদি কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে—তবে সাহিত্যে তাহা প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। আমাদের দেশে ইংরেজ রাজত্বের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের ধারায় একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। বাহিরের পৃথিবীর সহিত নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় জীবন-সম্পর্কিত ধ্যানধারণায় আমূল পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা, যাহা রেনেসাঁস আন্দোলনেরই ফল,—সেই সভ্যতার মূল মর্ম মানবতাবাদ এবং ব্যক্তির মুক্তি—আমাদের চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাদের জীবনদৃষ্টিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই যে নবীন জীবনচেতনা আমাদের জাতীয় জীবনে আলোড়ন আনিয়াছিল সাহিত্যে ইহার প্রতিফলন ঘটিতে বিলম্ব হয় নাই। আধুনিক শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজের উজ্জলতম

ছাত্র মধুসূদন আকৈশোর আপনার সমগ্র সত্তা দিয়া য়ুরোপীয় সাহিত্যের রস আস্বাদ করিয়াছিলেন। য়ুরোপের নানা ভাষা আয়ত্ত করিয়া রেনেসাঁস জীবনবাদের মূল উৎস হইতে তিনি রসধারা আহরণ করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেশের নবশিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত অগ্রসরশ্রেণী ততদিনে মাতৃভাষার সংস্কারসাধন, সমাজসংস্কার আন্দোলন, প্রাচীন শাস্ত্রের পুনর্বিচার প্রভৃতি নানামুখী কর্মোদ্যোগে জাতীয় জীবনে নতুন মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। এই পরিবেশে জাতীয় জীবনের এই পরিবর্তনমুখী উদ্যোগের মধ্যে ইতিহাসের নতুন পর্বের উন্মেষের কাব্য রচনা করিতে বসিয়া আধুনিক কবির পক্ষে আর পুরাতনের পুনরাবৃত্তি সম্ভবপর ছিল না।৮ মধুসূদন যাহা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নহে, দেশের মধ্যে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল তাহার মূলগত ভাবনা-মন্ত্র মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদনের প্রতিভা আশ্রয় করিয়া প্রমূর্ত হইয়া উঠল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণ কথার একটি নূতন-বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, এ কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি— তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।"

মধুসূদন যে নতুন কাব্য রচনা করিলেন বাহিরের দিক হইতে অর্থাৎ ঘটনাগত বিবরণের দিক হইতে তাহা রামায়ণেরই সুপরিচিত কাহিনী। সীতাহরণ, রামচন্দ্র কর্তৃক লঙ্কা অবরোধ, দিনের পর দিন রাবণের শক্তিক্ষয়ের কাহিনী। কিন্তু এ কাব্যে চরিত্ররূপায়ণের ভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন রাজসভার পরিবেশে তিনি লঙ্কার সর্বময় অধীশ্বর যে রাবণকে উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহার দেহে মনে রামায়ণের রাবণ-চরিত্রের ছায়ামাত্র নাই। আত্মপ্রত্যয়শীল, মহাপরাক্রান্ত, এক স্বাধীন দেশের নায়ক এই রাবণ সর্ববিধ মানবিক গুণে ভূষিত পুরুষ। তাহার রাজসভার বর্ণনায় যেমন বাহিরের ঐশ্বর্যের পরিচয় আছে তেমনি এই শোকাভিভূত পিতার অন্তরের

মানবিক রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার খেদোক্তিতে। পাপপুণ্যের প্রথাসিদ্ধ বিচারে এ চরিত্রের পরিমাপ করা যায় না। তাহার শক্তি এবং দুর্বলতায় কোথাও অলৌকিকের ছায়া বা দৈবশক্তির নির্দেশ মানিয়া লইবার মনোভাব প্রকাশ পায় নাই। রাবণ যে অবস্থা-সংকটের মধ্যে পড়িয়াছে তাহার জন্য সম্পূর্ণত সে নিজেই দায়ী, এবং তাহার চরিত্রে এ দায়িত্ব বহন করিবার শক্তির অভাব নাই। বীরবাহুর মৃত্যু, রাবণের সমরসজ্জা, মেঘনাদকে সৈন্যাপত্যে বরণ ইত্যাদি ঘটনায় মোটামুটিভাবে মধুসূদন রামায়ণ-কাহিনীর ছক অনুসরণ করিলেও মর্মগত বক্তব্যের দিক হইতে এই বর্ণনার সহিত রামায়ণের কোনো সাদৃশ্যই নাই। বিশেষভাবে দুটি চরিত্র, রাবণ ও মেঘনাদ, প্রথম সর্গে সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। অন্যপক্ষে প্রথম সর্গে অংশত এবং সমগ্র দ্বিতীয় সর্গে কবি দেবসমাজের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে পৌরাণিক দেবদেবী চরিত্র তাহাদের মহিমা হারাইয়া-ভীত, ত্রস্ত, গৌরবহীন একদল ষড়যন্ত্রকারীতে পরিণত হইয়াছে।

রাবণ-মেঘনাদের চরিত্র-মহিমা উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্যই কবি এমন করিয়া দেব-চরিত্রগুলি আঁকিয়াছেন। এই প্রয়োজনে দেবলোক সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন বিশ্বাসে আঘাত দিতেও কবি সংকোচবোধ করেন নাই। তৃতীয় সর্গের পরিকল্পনাটিও একান্তভাবে মৌলিক, এই সর্গে প্রমীলা-চরিত্রে আধুনিক নারী-ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল রূপ, দাম্পত্য সম্পর্কের নতুন ধারণা যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে রামচরিত্রে দৈবকরুণাপ্রত্যাশী মানুষের ভীরুতা এবং কাপুরুষতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম সর্গের রাবণ এবং তৃতীয় সর্গের রামচরিত্রের মধ্যে তুলনা করিলেই বোঝা যায় মধুসূদনের হাতে রামায়ণ কেমন আমূল রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

চতুর্থ সর্গের সীতা চরিত্র-কল্পনা এই কাব্যের মূল ভাবপ্রেরণার দিক হইতে অসঙ্গত, এমনকি বিরোধী মনে হইতে পারে। কিন্তু এই সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবিক ভাবাবেগের সংমিশ্রণে যে অপূর্ব কাব্যরূপ নির্মীত হইয়াছে তাহার গীতিময় সুষমায় প্রকৃতপক্ষে আধুনিক গীতি কবিতার সূচনা বলা যায়। বিশেষ-ভাবে এই সর্গের সীতা চরিত্র এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলিতে কবি যথাযথভাবে বাল্মীকিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনোভাবেই ইহাকে বাল্মীকির রচনার ভাবান্তর বলা চলিবে না। বিন্যাস কৌশলে, বর্ণনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে, চরিত্রের ভাবমূর্তি রচনা করিয়া তুলিবার দক্ষতায় ইহা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি।

[৬] প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুর সংবাদের আঘাতে ও চিত্রাঙ্গদার অনুযোগের উত্তরে রাবণ চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশদভাবে নির্দেশ কর। এই সর্গে রাবণের আচরণ কতটা মহাকাব্যের নায়কোচিত হইয়াছে সে বিষয়ে তোমরা অভিমত ব্যক্ত কর।

অথবা,

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের ভাষণ ও স্বগত ভাষণের মধ্য দিয়া রাবণ চরিত্রের বিভিন্ন দিক কেমন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ সাহায্যে দেখাও।

অথবা,

"বীরবাহুর মৃত্যুতে ও চিত্রাঙ্গদার অনুযোগের পীড়নে রাবণ-চরিত্রে যে ভাববিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহা কেবল পুত্রবিয়োগকাতর পিতার শোকাবেগ নহে, রাজকর্তব্যপালনে ব্যর্থতার জন্য ক্ষোভ।" মেঘনাদবধের প্রথম সর্গে বর্ণিত পুত্রশোকাতুর রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার সংলাপ বিশ্লেষণ করিয়া ইহা বুঝাইয়া দাও।

অথবা,

"The idea of Ravana elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow."

কবির এই মনোভাব তাঁহার রচিত কাব্যের কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা মেঘনাদবধ কাব্যে প্রথম সর্গ অবলম্বন করিয়া প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসহ প্রদর্শন কর। [ক. বি. ১৯৭০]

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে রাবণের সংলাপ এবং রাবণ সম্পর্কে কবির বর্ণনা। যদিও মেঘনাদ এ কাব্যের নায়ক, তথাপি কবি রাবণকেই কাব্যসূচনার মুখ্য চরিত্ররূপে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। রাবণের রাজসভায় বর্ণনায় ঐশ্বর্য এবং সমৃদ্ধির চূড়ান্ত সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে। এ বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে রাবণ বিশ্বের সুখ ও সমৃদ্ধির সকল উপকরণ আপন শক্তিতে লঙ্কায় সঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছেন। দেবতা ও মানবের ঈর্ষা উদ্রেককারী এই ঐশ্বর্য আহরণের মূলে যে প্রচণ্ড শক্তি ও পরাক্রম প্রয়োজন, রাবণ সেই অসামান্য শক্তিরই অধিকারী।

একদিকে বাহিরের সুখৈশ্বর্যের উপরে অবাধ অধিকার, অন্যদিকে আত্মীয়-পরিজন ও দেশবাসীর অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আনুগত্যে রাবণ মানবজীবনের চরম সফলতা ও পরিপূর্ণতা আয়ত্ত করিয়াছে। এমন পূর্ণ মহিমায় মানুষের পতন—ইহাই মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়। ঐশ্বর্যপুরী লঙ্কার রাজসিংহাসনে বসিয়া এই মানুষটি এক নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিতেছে, বনচারী ভিক্ষুক-প্রায় রামচন্দ্রের হাতে তাহার মহাপরাক্রমশালী পুত্র বীরবাহু নিহত হইয়াছে। শোকের আঘাত এই প্রথম নয়। রাবণের মুখেই শোনা যায় ইতিপূর্বে কুম্ভকর্ণ এবং অন্যান্য বীরেরা নিহত হইয়াছে। প্রচণ্ড শক্তিমান রাবণের শক্তি এইসব বীরের শৌর্যের উপরেই নির্ভরশীল। তাই বাহিরের দিক হইতে তাহার শক্তি খর্ব হইয়া আসিতেছে। আর ইহারা সকলেই তাহার আপন জন, ইহাদের মৃত্যু অন্তরে যে রক্তক্ষরণ ঘটাইতেছে তাহার বেদনাও ক্রমে সহ্যশক্তির সীমা অতিক্রম করিতেছে। বাহিরের দিক হইতে শক্তি খর্ব হওয়ার অর্থ দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়া। রাজা হিসাবে তাহার উপরে অর্পিত বিরাট কর্তব্য সে ব্যক্তিগত শোকে বিস্মৃত হয় নাই। বরং বলা যায় রাজকর্তব্য পালন ক্রমাগত অসমর্থ হওয়ার জন্য গ্লানিবোধ এবং আত্মীয়-পরিজনের মৃত্যুজনিত শোক—উভয় অনুভূতিই তাহার সংলাপে মিশ্রিতভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথম সংলাপটি সদ্য পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরেই উচ্চারিত। ইহাতে পুত্রের জন্য শোক-কাতরতা এবং ক্রমাগত এইরূপ ঘটনায় চূড়ান্ত পরিণাম সম্পর্কে আশঙ্কা অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুসজ্জিত নাট্যশালার মতো এই লঙ্কাপুরী, ইহার সুখের দিন যে শেষ হইয়া আসিতেছে রাবণ তাহা স্পষ্টভাবেই অনুভব করে। মৃত্যুশোকের আঘাত যে কত কঠিন তাহা প্রকাশ পাইয়াছে সারণের প্রতি উচ্চারিত সংলাপটিতে। হৃদয়বৃন্তের কুসুমগুলি মহাকাল ছিন্ন করিয়া লইতেছে, হৃদয় শোকসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। মহাপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও রাবণ কোনো তত্ত্বচিন্তাতেই এই শোক ভুলিতে পারে না।

শোকের প্রথম অভিঘাত কাটিয়া গেলে বীরবাহুর জন্য গৌরববোধে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। তখন ব্যক্তিগত শোকের চেয়ে প্রবলতর হইয়াছে রাজা হিসাবে দেশরক্ষার দায়িত্ববোধ এবং এই দায়িত্বপালনে যে বীর প্রাণ দিয়াছে

তাহাকে সম্মানিত করিবার আগ্রহ। যুদ্ধে পতিত বীরকে দেখিবার জন্ত রাবণ প্রাসাদচূড়ায় উঠিয়াছে। বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে যুদ্ধের দৃশ্য দেখিয়া তাহার হৃদয় কী প্রচণ্ড ক্ষোভে ভরিয়া উঠিয়াছে তাহা বোঝা যায় সমুদ্রের প্রতি উচ্চারিত ধিক্কার-বাণীতে। অভিপ্রায়সিদ্ধির পথের যে কোনো বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলাই রাবণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আজ সেই পরাক্রান্ত বীর কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির জালে ক্রমেই জড়াইয়া পড়িতেছে। সমুদ্রকে ধিক্কার আসলে নিজের এই অসহায় দশাকেই ধিক্কার দেওয়া।

ইহার পর শুরু হইয়াছে আর এক পরীক্ষা। বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদা, রাবণের বহুমহিষীর অন্ততমা, রাবণকে নির্মমভাবে অভিযুক্ত করিয়াছে: লঙ্কার দুর্দশার জন্ত দায়ী একমাত্র রাবণ। সীতাহরণের পাপে লঙ্কার এই দশা আজ। স্বতরাং এই যুদ্ধে যাহারা প্রাণ দিয়াছে তাহাদের মৃত্যুর জন্ত একমাত্র রাবণই দায়ী। চিত্রাঙ্গদার এই নির্মম অনুযোগের সবটুকুই সত্য, কিন্তু রাবণ কখনো এ সত্য স্বীকার করে নাই। তাহার নিজের চিন্তার দিক হইতে সীতাহরণ ও তজ্জনিত পাপ ইত্যাদি আদৌ প্রাসঙ্গিক নয়। তাই পত্নী চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া রাবণ বলিয়াছে, "দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব গেছে চলি স্বর্গপুরে।" এই উক্তিতে রাবণের পিতৃসত্তা নহে রাজসত্তার পরিচয়ই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।

বিলাপে রাবণ কর্তব্য শেষ করে নাই। প্রথম সর্গে ধাপে ধাপে রাবণের মানসিক পরিবর্তন কবি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। দুঃসংবাদের প্রথম আঘাতে বিস্ময়বিমূঢ় দশা, তাহার পর প্রবল খেদ ও শোকাবেগ ক্রমে শোকের আবেগ সংযত হইয়া আসিয়াছে। রাবণ ঘটনাটিকে লঙ্কার সামগ্রিক অবস্থার পটে স্থাপন করিয়া ইহার তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহার পর চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ ও তিরস্কারে অভিভূত দশা একেবারেই শেষ হইয়াছে, কর্তব্যপালনের জন্ত সে প্রস্তুত হইয়াছে। বীরশূন্ত লঙ্কার ভাগ্য আজ রাবণের উপরেই নির্ভর করিতেছে, শোক করিবার তাহার সময় নাই। সৈন্তবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বভার সে নিজের উপরে তুলিয়া লইয়াছে।

এই সংলাপগুলিতে রাবণের যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহাকে একজন স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতি এবং প্রখর দায়িত্বসচেতন মানুষ বলিয়া মনে হয়। সে যে একটি দেশের অধিপতি, তাহার উপরে

এদেশের সকল মানুষের ভাগ্য নির্ভর করিয়া আছে—একথা কখনো বিস্মৃত হয় নাই। তাই রাবণের শোক বিলাপে শেষ হয় না, ব্যক্তিগত শোক শেষ পর্যন্ত তাহার পৌরুষকেই উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। পুত্রের গৌরবময় মৃত্যু বীর পিতাকেও পথ দেখাইয়া দিয়াছে। শোকাহত অন্তরের শূন্যতা ক্রমে শৌর্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দেশরক্ষার দায়িত্ব সে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে। পুত্রশোকের জন্য তাহার অন্তরের ক্ষোভ ছাপাইয়া উঠিয়াছে রাজকর্তব্য পালনে ব্যর্থতার জন্য ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ মিটাইবার জন্যই রাবণ সমরসজ্জার আদেশ দিল।

"শোকে, অভিমানে,
ত্যাজি স্বকনকাসন, উঠিলা গর্জিয়া
রাঘবারি। "..................
............যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি"।

প্রথম সর্গে রাবণের শোকোচ্ছ্বাসগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করিলে মনে হইতে পারে মধুসূদন করুণরসের উচ্ছ্বাসে কাব্যটিকে ভাবালুতায় আকীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু এ ধারণা যুক্তিসহ নহে। প্রথম সর্গে রাবণের চরিত্রে কবি সাফল্যের সহিত করুণ ও বীররসের যুগ্মধারা সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবী মায়াময় জানিয়াও রাবণের হৃদয় শোকে অভিভূত হয়, তাহাকে বলিতে শুনি,—

"হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোকসাগরে।"

কিন্তু এই সুগভীর শোক তাহাকে বিবশ করে নাই। সমুদ্রের প্রতি উচ্চারিত ধিক্কারবচনে তাহার অন্তরের ক্ষোভ এবং জ্বালা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ধীরে ধীরে পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং তাহার উপরে এখন যে দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে তাহা পালনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। শোকে রাবণের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি দুঃখের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, শোক হইতে জাত ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত তাহার অপ্রতিহত শক্তিকে

উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কোমলতা এবং কঠোরতায় সে পরিপূর্ণ মানুষ। কবি বলিয়াছিলেন, রাবণ চরিত্রের ধারণা তাহার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। রাবণের মধ্যে তিনি পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা প্রত্যয় করিয়াছেন। হৃদয়গত মনুষ্যত্বের আদর্শই তিনি এ কাব্যের রাবণ চরিত্রে প্রমূর্ত করিয়াছেন। পদে পদে দেবতাদের অনুগ্রহপ্রার্থী রামচন্দ্র নহে, আত্মশক্তিনির্ভর রাবণ কবির শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে এবং রাবণকে তিনি 'grand fellow' রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। মহাকাব্যের নায়কোচিত মহিমা এই চরিত্রে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এমন কথা আমাদের মনে হয় না। বরং মনে হয় সবলতা দুর্বলতায় সুসম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়াছেন বলিয়াই রাবণ-চরিত্র পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে। শোকে এবং সংগ্রামে তাহার চরিত্রের সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বেরই প্রকাশ দেখিতে পাই।

[চার] মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের যে পরিচয় আছে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া এই চরিত্রের অবতারণার সার্থকতা কী, বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনা হইয়াছে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে। যুদ্ধে নিহত বীরবাহুর জননী চিত্রাঙ্গদা। রাবণের বহুমহিষীর মধ্যে ইনি অন্যতমা। দূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হইবার সময় হইতে রাজসভায় যে শোক পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহার অভিঘাত দুঃসহতম সীমায় উপনীত হয় চিত্রাঙ্গদার আবির্ভাবে। শোকাতুরা রানী চিত্রাঙ্গদা তাহার জীবনের চরম দুর্দিনে আর লজ্জা-সংকোচের বাধা মানে নাই। রাজসভায় সকলের সম্মুখে তাহার স্বামী, রাজা রাবণের নিকট অনুযোগ জানাইতে উপস্থিত হইয়া তাহার পরে মহাকাব্যের বিপুল ঘটনার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সামান্য পরিসরে তাহার যে মূর্তি চিত্রিত হয় তাহা শেষ পর্যন্ত আমাদের চিত্তপটে মুদ্রিত থাকে।

রাবণ প্রাসাদশিখরে হইতে রণক্ষেত্রের দৃশ্য দেখিয়া রাজসভায় ফিরিয়াছে। এমন সময়ে দূর হইতে রোদনধ্বনি ভাসিয়া আসিল। হেমাঙ্গী চিত্রাঙ্গদা সখীদের সহিত রাজসভায় প্রবেশ করিল। এখানে চিত্রাঙ্গদার রূপবর্ণনাটুকু লক্ষ্য করিবার মতো। তাহার কবরীবন্ধন এলায়িত, দেহ আভরণহীন। পুষ্পাভরণহীন শীতঋতুর লতার মতো খিন্ন তাহার রূপ। বীরবাহুর শোকে

বিবশা। এই চিত্রাঙ্গদার চিত্রখানি সামান্ত কথায় কবি সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। এতক্ষণ যে শোক স্তম্ভিত হইয়া ছিল, চিত্রাঙ্গদার আবির্ভাবে তাহা ঝড়ের মতো রাজসভার আবহাওয়া বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। সিংহাসনে রাজা রাবণ এই দৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইল। পরিচারকেরা তাহাদের কর্তব্য বিস্মৃত হইল। 'দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি ভীমরূপী'। এই চরণটিতে চিত্রাঙ্গদার শোকমূর্তি উপস্থাপনের কারণের প্রতি ইঙ্গিত আছে। এই শোকমূর্তি বীরবাহুর মৃত্যুর প্রতিবিধানে উত্তেজিত করিবে, শুধু দৌবারিককে নহে, স্বয়ং রাবণকেও প্রেরণা দিবে।

রাবণের সহিত চিত্রাঙ্গদার সংলাপাংশ সামান্তই। কিন্তু এই সংলাপে রাবণের সহিত চিত্রাঙ্গদার দাম্পত্য সম্পর্কের একটা স্বতন্ত্র রূপ যেমন উদ্ঘাটিত হইয়াছে তেমনি রাবণ সম্পর্কে একটি অতি নির্মম সত্য প্রকাশ পাইয়াছে। সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই একবার মাত্র কবি আমাদের মনে করাইয়া দিয়াছেন লঙ্কার ভাগ্যাকাশে আজ যে দুর্যোগ দেখা দিয়াছে, যে সঙ্কট সমগ্র লঙ্কাবাসীকে গ্রাস করিতে উদ্যত তাহার মূলে আছে রাবণের পাপ। চিত্রাঙ্গদা এই পাপের কথা সর্বসমক্ষে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় উচ্চারণ করিয়াছে। রামচন্দ্র রাবণের সিংহাসনের লোভে লঙ্কা অবরোধ করে নাই। তাহার পত্নীকে অপহরণ করিয়া রাবণ যে ঘোর অন্যায় করিয়াছে—রামচন্দ্র লঙ্কায় আসিয়াছে সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে। লঙ্কার বর্তমান দুর্ভাগ্যের মূলে আছে রাবণের কৃতকর্ম। তাই এই যুদ্ধে যাহারা প্রাণ দিয়াছে তাহাদের মৃত্যুর দায়িত্বও এক রাবণের। রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে বলিয়াছে, 'দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব গেছে চলি স্বর্গপুরে।' চিত্রাঙ্গদার মনে এজন্য কোনো গৌরববোধ নাই। চিত্রাঙ্গদা এইসব ঘটনা যে দৃষ্টিতে দেখে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার শেষ উক্তিতে। 'হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।'

চিত্রাঙ্গদার এই নির্মম ভাষণে তাহার সহিত রাবণের সম্পর্ক যে প্রেমের নহে তাহা আর গোপন থাকে না। রাবণের বহু মহিষীর মধ্যে অন্যতমা এই পুরীতে বীরবাহুর জননী রূপেই মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুত্রের মৃত্যুতে তাহার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। পুত্রের মৃত্যুতে সন্তপ্ত চিত্রাঙ্গদা অন্তঃপুরের বাহিরের রাজসভায় আসিয়াছে রাজার কাছে অভিযোগ জানাইতে। যে রাবণ তাহার সন্তানের জনক—সেই রাজা

রাবণেরই কাছে চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ। এই শ্লেষটুকু চিত্রাঙ্গদার অভিযোগকে মর্মান্তিক করিয়া তোলে। রাবণ তাহাকে নানাভাবে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে, নিজের প্রতি সহানুভূতি জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা রাবণের সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলিয়া মানিতে পারে নাই। মোহিতলাল মন্দোদরীর সহিত তুলনায় চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন, "এই চরিত্রের পাশে মন্দোদরীকে দাঁড় করাইলে, উভয় চরিত্র, মর্মর শিল্পীর মূর্তি-রচনার মত, আকারে, আয়তনে ও ডৌলে বিলক্ষণ ও সুপরিচ্ছন্ন হইয়া ওঠে। মন্দোদরী রাবণের জেষ্ঠা মহিষী, পাটরানী; সে তাহার সহধর্মিণী—ধর্মসাধন ভার্যা। মন্দোদরী শুধুই পুত্রের জননী নয়, রাবণের গৃহিণী, সমস্ত রাক্ষসপুরীব ও রাক্ষস পরিবারের কল্যাণচিন্তা, রাজ্যের শুভাশুভ, স্বামীর সম্পদ—বিপদের ভাবনা তাহাকে ভত্রিণীযোগ্য গুরুভার মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছে। ······চিত্রাঙ্গদা শোকার্ত জননী হইলেও তাহার রূপে নায়িকার লক্ষণ আছে। ······একজন সংসারকে বুকে জড়াইয়া এবং আপনাকেও সেই সংসারে বিলাইয়া দিয়া, স্নেহ ও প্রেমের দাবি ছাড়া আর কিছু জানে না। আর একজনের আত্মসচেনতা এখনও অটুট, বিবেক ও বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যে, সে চরিত্র আপনাকে হারায় না—প্রেম বা স্নেহের আত্মবিগলিত অবস্থার গদগদ-ভাষা বা প্রলাপ-বাণী তাহার পক্ষে অসম্ভব।" স্বামীর সহিত চিত্রাঙ্গদার ভালোবাসার বন্ধন শিথিল বলিয়াই তাহার সমগ্র সত্তা একমাত্র পুত্রকেই অবলম্বন করিয়া আছে। স্বামীর অবস্থাসংকট বা তাহার হৃদয়বেদনা সম্পর্কে চিত্রাঙ্গদা উদাসীন। "এই একটিমাত্র দৃশ্যের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে, একটি নারীর জীবন ও চরিত্র অতি গভীর রেখায় পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। রাজগৃহবন্দিনী রূপসী চিত্রাঙ্গদার দুঃখ ও অভিমান, স্বামী-স্নেহ-বঞ্চিতা-পুত্রহারা রমণীর নৈরাশ্য-পীড়িত তেজস্বিনী-মূর্তি—তাহার সেই অশ্রুপ্লাবিত করুণ সুন্দর চক্ষে আহত নারী-হৃদয়ের বহির্বিভাস—আমাদের মানস-পটে প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে।"

প্রথম সর্গে যেখানে কবি রাবণ-চরিত্রকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজনে ব্যাপৃত সেখানে অকস্মাৎ চিত্রাঙ্গদার আবির্ভাব এবং রাবণ চরিত্রের দুর্বলতম দিকের প্রতি এমন স্পষ্টভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ আপাত-দৃষ্টিতে অবান্তর মনে হইতে পারে। রাবণের মহত্ত্ব প্রতিপাদনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সীতাহরণ-প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাই তো সুবিবেচনার কাজ।

কিন্তু একটি মালিন্যমুক্ত শুদ্ধ চরিত্ররূপে রাবণকে গড়িয়া তোলা কবির উদ্দেশ্য ছিল না। সেরূপ চরিত্র কখনো পরিপূর্ণ মানব-চরিত্র হইতে পারে না। আত্মপ্রত্যয়শীল, মহাশক্তির আধার রাবণ নিজের বিবেক-বুদ্ধিমতো একটা জীবন-নীতির উপরে দাঁড়াইয়া চরিতার্থতার অভ্রংলিহ সৌধ গড়িয়াছে। কিন্তু মানুষ বলিয়াই তাহার দেহমন মানবিক দুর্বলতা হইতে মুক্ত নয়। সেই দুর্বলতার বশে সীতাকে অপহরণ করিয়াছে। তাহার বিচারে সীতা অপহরণ পাপ নহে। সে নিজে কখনো এ পাপের কথা স্বীকারও করে নাই। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত এই কার্যের জন্যই যে তাহার কীর্তিসৌধ ধসিয়া পড়িতেছে ইহাও সত্য। মেঘনাদবধ কাব্যে এই সত্য কথাটি একটি মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে চিত্রাঙ্গদার মুখেই উচ্চারিত হইয়াছে। রাবণ-চরিত্র লইয়া কবি যে ট্রাজিডি রচনা করিতে বসিয়াছেন সেই ট্র্যাজিক আখ্যানের সম্পূর্ণতা-সাধনের জন্যই তাই চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। সীতাহরণ এই মহাশক্তিমান মানুষটির জীবনে যে দুর্যোগ ডাকিয়া আনিয়াছে, রাবণ তাহাকে নিয়তির আঘাত মনে করে। রাবণ যাহাকে নিয়তি বলে, তাহা বিশ্বনীতিরই রাবণকৃত ভাষ্য। অলঙ্ঘনীয় বিশ্বনীতির অমোঘ বিধানের কথাই কবি চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে উচ্চারণ করাইয়াছেন।

[পাঁচ] **মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে বারুণী-মুরলা-রমার আখ্যান কি উদ্দেশ্যে মহাকাব্যের মুখ্য কাহিনীর সহিত গ্রথিত হইয়াছে ও এই উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।**

[ক. বি. ১৯৬৬]

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাজসভা হইতে চিত্রাঙ্গদা বিদায় লইবার পর রাবণ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়াছে এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়াছে। সমগ্র লঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধায়োজনের শুরু হইল। সৈন্যদলের পদভরে লঙ্কা টলমল করিয়া উঠিল, সমুদ্র তলদেশ অবধি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল। এইসূত্রেই জলদেবতা বারুণী এবং তাঁহার সখী মুরলার কথোপকথন রচনায় সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। বারুণী ভাবিয়াছিলেন আবার বুঝি বায়ুদের সহিত সমুদ্রের সংঘাত শুরু হইল। কিন্তু সখী মুরলা কী ঘটিতেছে তাহা জানাইল। রাবণের যুদ্ধযাত্রার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেই বারুণীর মনে পড়িয়াছে লঙ্কায় অধিষ্ঠিতা লক্ষ্মীদেবীর কথা। বারুণী চরিত্রটি

মধুসূদন মিলটনের *Comus* কাব্যের সেব্রিনা চরিত্রের আদর্শে গড়িয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মীর সহিত তাহার এই প্রীতির সম্পর্কটি ইঙ্গিত করিতেছে হিন্দু পুরাণের একটি ঘটনার প্রতি। দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মীদেবী কিছুকাল সমুদ্রতলে বাস করিয়াছিলেন। পরে সমুদ্র মন্থনের সময়ে সমুদ্রতল ত্যাগ করিয়া যান। মুরলা বারুণীর নির্দেশে লক্ষ্মীর মন্দিরে গেলেন। লক্ষ্মী মুরলাকে রাবণের সমরসজ্জা দেখাইতেছেন, এই সুযোগ সৃষ্টি করিয়া কবি ওই সমরায়োজনের দৃশ্য বর্ণনা করিলেন। মুরলাই এই কাব্যে প্রথম মেঘনাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে, 'কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ কুল-হর্যক্ষ বিগ্রহে?' লক্ষ্মীদেবীর কথায় জানা গেল, লঙ্কার সকল বীর এখনও বিনষ্ট হয় নাই মেঘনাদ এখনও জীবিত আছে। রাবণ যে লঙ্কা সম্পর্কে বীরশূন্য বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছিল তাহা সর্বাংশে সত্য নয়। মেঘনাদ ইতিপূর্বে দুইবার রাম-লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, এইজন্যই রাবণ তাহাকে পুনরায় যুদ্ধে পাঠাইতে চাহে নাই। কিন্তু লক্ষ্মী মেঘনাদ-ধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশে মেঘনাদের প্রমোদ কাননে গিয়া তাহাকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ দিলেন এবং লঙ্কায় ফিরাইয়া আনিলেন। অর্থাৎ এ কাব্যের মুখ্য ঘটনা যাহাকে লইয়া, সেই মেঘনাদকে ঘটনাকেন্দ্রে স্থাপনের কাজটি লক্ষ্মী চরিত্রের সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়াছে। কাহিনী বয়নের দিক হইতে লক্ষ্মীচরিত্রের ইহাই প্রাথমিক প্রয়োজন।

মেঘনাদকে প্রমোদ উদ্যান হইতে রাজপ্রাসাদে ফিরাইয়া আনা এবং দেবসমাজকে রাবণ মেঘনাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় করিয়া তোলা—এই উভয়বিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজ লক্ষ্মী বা রমা চরিত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি মেঘনাদকে সংবাদ দিয়াছিলেন বলিয়াই মেঘনাদ যথাসময়ে আসিয়া পিতার নিকট সৈন্য পরিচালনার ভার ভিক্ষা করিয়াছে এবং সেনাপতি পদে বৃত হইয়াছে। 'মেঘনাদবধ' বর্ণনাই এ কাব্যে কবির মুখ্য উদ্দেশ্য, এইদিক হইতে দেখিলে লক্ষ্মীদেবী চরিত্রটিকে কবি ঘটনাবয়নের কাজে সুন্দরভাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিতে হয়।

বারুণী ও মুরলার কথোপকথনের সূত্রেই দেবসমাজের ঘটনাবলী এ কাব্যে সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। ওই সূত্র ধরিয়া আসিয়াছে রমা এবং তাঁহার উদ্যোগের বিবরণ। সুতরাং এ কাব্যের ঘটনা পরিণতির দিক হইতে আলোচ্য প্রসঙ্গটি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

[ছয়] মেঘনাদবধ কাব্যে তৃতীয় সর্গের সার্থকতা বিচার কর।

[ক. বি. ১৯৬৪]

উত্তর। বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে সুপরিকল্পিতভাবে কাহিনী বিন্যস্ত করিয়া সুবৃহৎ কাব্য রচনার প্রথম দৃষ্টান্ত মেঘনাদবধ কাব্য। স্বেচ্ছাচারী কল্পনার অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস নহে, সামগ্রিক পরিকল্পনার সংহতির মধ্যে কবিত্বের সামর্থ্য অনুসারে বিষয় সমাবেশ এবং বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সুঠাম কাব্যদেহ নির্মাণ করিয়া তুলিবার উদ্যোগ ইতিপূর্বে আর কোনো কবির রচনায় দেখা যায় নাই। "কাব্যের কেন্দ্র ও পরিধি গোড়া হইতে স্থির করিয়া নয়টি সর্গে তিনি পর পর যে বস্তু যোজনা করিয়াছেন; সামান্য আখ্যানটুকুকে যেরূপ সাবধানতার সহিত বিস্তারিত করিয়াছেন; সর্গগুলির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য ও যথাস্থান যে ভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন; এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মূল কাহিনীর গতিধারা যেরূপ অব্যাহত রাখিয়াছেন—তাহাতে কাব্যখানি, গঠনে ও গাঢ়বন্ধতায়, প্রায় অনবদ্য হইয়াছে।" এ কাব্যে কবির প্রধান লক্ষ্য নায়ক মেঘনাদকে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যের দিক হইতে তৃতীয় সর্গ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় সর্গের প্রায় সম্পূর্ণ ব্যয়িত হইয়াছে প্রমীলা চরিত্র রূপায়ণের উদ্দেশ্যে। মেঘনাদ এ কাব্যের নায়ক, নায়িকা প্রমীলা। নায়িকা চরিত্র চিত্রণের একটা দায় আছে, সেটা কোনো প্রকারে সারিয়া দিলেই হইল—এরূপ মানসিকতা দ্বারা কবি চালিত হন নাই। হইলে এতটা পরিসর লইয়া এত যত্নে তৃতীয় সর্গটি সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় করিবার কোনো প্রয়োজন হইত না। এইরূপ মামুলি দায় হইতে নহে, গভীরতর প্রেরণার বশেই কবি মেঘনাদের মতো চরিত্রের উপযোগী নায়িকা সৃষ্টি করিতে বসিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি রামায়ণ হইতে বিশেষ কিছু সাহায্যই পান নাই। তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে পাশ্চাত্ত্য কাব্য সাহিত্যে তাঁহার অধীত বিদ্যা এবং আপন কল্পনাশক্তির উপরে।

যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণে পূর্ণ প্রথাসিদ্ধ বীররসাত্মক কাব্য রচনা কবির উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি এই কাব্যে যে নতুন রসবস্তু সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহাকে বলা যায় মানবরস। মেঘনাদ-প্রমীলা তাঁহার এই নূতন রসবস্তু পরিবেশনের আধার। এই দুই চরিত্রে শুধু এক বীর-দম্পতিকে পাই না, পাই

মানবজীবন সম্পর্কে নতুন ধারণা। ইন্দ্রজিৎ চরিত্রে সর্ববিধ মানবিক গুণ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিকশিত। আত্মপ্রত্যয়শীলতা, কর্তব্যবুদ্ধি, দেশানুরাগ, বীরোচিত ধর্মবোধ এবং ভয়শূন্যতা তাহার চরিত্রকে অপূর্ব মর্যাদাসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতায় উজ্জ্বল এই চরিত্রের আর একটি দিক প্রকাশ পাইয়াছে প্রমীলার সহিত তাহার দাম্পত্য সম্পর্কে। এ সম্পর্ক প্রাচীন দাম্পত্য নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রমীলা চরিত্রেই আমাদের সাহিত্যে আমরা সর্বপ্রথম আধুনিক নারীব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হইতে দেখি। মেঘনাদের সহিত, তাহার সম্পর্কের ভিত্তি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক বিবাহিত সম্পর্ক নয়। পরস্পরের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাই সেই সম্পর্কের ভিত্তি। প্রমীলা নারী, কিন্তু ব্যক্তিত্ববিনাশী প্রথার শাসন মানিয়া চলা নারী নয়। মেঘনাদের মতো স্বামীর নিকট হইতে মর্যাদা লাভের উপযুক্ত চরিত্রবল এমন কি বাহুবলেরও তাহার অভাব নাই। মানবিকতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই আধুনিক জীবনের ভাবনা-মন্ত্র, এই ভাবনামন্ত্র যেমন মেঘনাদ তেমনি প্রমীলা চরিত্রে পরিপূর্ণ মহিমায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার মূলে যে উদ্দেশ্য ছিল, আধুনিক জীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার সেই প্রয়াসের দিক হইতে মেঘনাদ ও প্রমীলা কবির যুগ্ম সৃষ্টি, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ চরিত্র। পুরুষ ও নারীর মিলিত চিত্র ভিন্ন কোনো জীবন ভাবনার প্রকাশ পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। কবি আপন জীবনবোধ পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশের জন্যই মেঘনাদের সহিত প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি প্রেরণার দিক হইতে পর্যালোচনা করিলে তাই মনে হয় প্রমীলা চরিত্র ভিন্ন কবির বক্তব্য পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না।

কবিপ্রেরণার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ভিন্ন কাহিনীর অগ্রগতির দিক হইতে অবশ্য প্রমীলা যে এই কাব্যের আখ্যানধারাকে খুব বেশি অগ্রসর করিয়া দিয়াছে—তাহা বলা যায় না। প্রমোদ উদ্যান হইতে প্রমীলার লঙ্কায় প্রবেশের সময়ে রামচন্দ্র বিভীষণের সংলাপে তাহাদের যে ভয় এবং এই সর্গের শেষদিকে বিজয়ার উক্তিতে যে আশঙ্কা প্রকাশ পাইয়া পরবর্তী কালে সেরূপ কোন ঘটনা সংযোজিত হয় নাই। অবশ্য মেঘনাদের জীবনের ট্র্যাজিডি গভীরতর হইয়াছে এই চরিত্রের জন্য। অন্যদিকে প্রমীলার সহমরণ দৃশ্য রাবণের শোকে একটা নতুন অভিঘাত সৃষ্টি করিয়াছে। এ কাব্যের বিষাদান্ত পরিণাম প্রমীলার জন্যই যে গভীরতর হইয়াছে—তাহাতে সন্দেহ

নাই। তাই বাহিরের ঘটনার দিক হইতে প্রমীলা চরিত্র তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও এ কাব্যের রসপরিণামের দিক হইতে চরিত্রটি অপরিহার্য মনে হয়। এবং এই কারণেই তৃতীয় সর্গটিকে কাব্যপরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে বাধা হয় না।

৩। [সাত] আপন মানসদুহিতা প্রমীলাকে শক্তি ও প্রেমের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ নারীত্বের মহিমায় উজ্জ্বলরূপে দেখাইবার জন্যই তৃতীয় সর্গ পরিকল্পিত। কবির পরিকল্পনা কীভাবে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা প্রমীলা-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দাও। [ক. বি. ১৯৫৮]

অথবা,

মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গে প্রমীলা-চরিত্রে রমণীসুলভ কোমলতা ও দৃপ্ত ক্ষাত্রতেজের যে সুষ্ঠু সমন্বয় হইয়াছে তাহা আলোচনা সাহায্যে প্রতিপন্ন কর। [ক বি. ১৯৬১, '৬৬]

উত্তর। প্রকৃতি, প্রেম বা যুদ্ধ বর্ণনা—কাব্যের বিষয় যাহাই হোক কবির জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা অনুসারে সেই বিষয় কাব্যে বিশেষ রসমূর্তি লাভ করে। কোনো কাব্যের আলোচনায় তাই সেই কবির জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতার জন্য কাব্যবিষয় কীরূপ অভিনব রসমূর্তি লাভ করিয়াছে তাহাই বিবেচ্য। আধুনিক কালের কবি মধুসূদনের মানসিক পরিমণ্ডল য়ুরোপীয় মানবতাবাদ এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের ভিত্তিতে গঠিত। এই বিশ্বাসের দিক হইতেই তিনি জীবনে সত্যাসত্য বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জীবনদৃষ্টির এই বিশিষ্টতার জন্যই মধুসূদনের কল্পনায় প্রেম নূতন রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে এবং তাঁহার প্রেম-চেতনার সহিত নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে মধ্যযুগীয় ধারণার কোনো মিল নাই।

মেঘনাদবধ কাব্যের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র প্রমীলাতেই কবির স্বাধীন কল্পনা-বৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এই চরিত্রের মূল উপাদান সেই প্রেম, যাহা জীবনে ও সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণধর্মরূপে স্বীকৃত। নায়ক মেঘনাদ চরিত্রের অন্তরের দিক, মনুষ্যত্বের পুষ্পিত রূপ যেখানে প্রেম নামক হৃদয়বৃত্তির আকারে প্রকাশ পায়—সেই জগৎটিকে পরিপূর্ণ করিয়া চিত্রিত করিবার প্রয়োজনে প্রমীলা চরিত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। এই চরিত্র কল্পনায় কবি নারী চরিত্র সম্পর্কে ভারতীয় কাব্য সাহিত্যের যে প্রথাসিদ্ধ ধারণা—তাহার প্রভাব আদৌ স্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ প্রমীলা সম্পূর্ণই তাঁহার

মৌলিক সৃষ্টি এবং এই চরিত্র সৃষ্টিতে সাফল্য মধুসূদনের প্রতিভার শক্তির একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

যে পরিস্থিতির মধ্যে কবি এই চরিত্র স্থাপন করিয়াছেন, কাব্য কাহিনীর সেই পরিমণ্ডলে প্রমীলার ব্যক্তিত্বের শক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ চরিত্রের মূল ধর্ম প্রেম, প্রেমেরই শক্তি তাহার অভিনব আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম সর্গের শেষে মেঘনাদ যখন প্রমোদ উদ্যান হইতে বিদায় লইতেছে তখন প্রমীলার উক্তিতে আসন্ন বিচ্ছেদের জন্য যে কাতরতা প্রকাশ পায় তাহাতে স্বামীগতপ্রাণা নারীর কোমল চিত্তবৃত্তির কমনীয়তাই আমরা অনুভব করি। প্রমীলা নিজেকে মেঘনাদের পদাশ্রিতা লতা বলিয়াছে। এ উক্তিতে স্বামীর সহিত তাহার প্রেম সম্পর্কের নিবিড়তাই প্রতিপন্ন হয়। নারীর কমনীয় স্বভাব কবি অপরূপ স্নিগ্ধতায় মণ্ডিত করিয়া আঁকিয়াছেন। সেই আশঙ্কা-ব্যাকুল রমণীর প্রেমার্তি একটা সুন্দর করুণ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতো আমাদের মনে অনুরণিত হয়। প্রমীলা চরিত্রের এইটিই মূল সুর। তাঁহার ব্যাকুলিত অন্তরে যে আশঙ্কার ছায়া কাঁপিতেছে তাহা মিথ্যা নয়। এ কাব্যে প্রমীলার শেষ পরিণাম মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণে। সুতরাং অনিবার্য দুঃখান্তিক পরিণতিতে যে চরিত্র উপনীত হইবেই, তাহার চরিত্র অঙ্কণে সুসঙ্গতভাবেই প্রথম হইতে বিষাদের ছায়া সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সর্গে মেঘনাদ নিধনের যে নেপথ্য আয়োজন বর্ণিত হইয়াছে তাহার ছায়ায় প্রমীলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পাঠকের মনেও একটা আশঙ্কা মিশ্রিত সহানুভূতির ভাব জাগিয়া থাকে।

এই পটভূমিতে কাব্যের তৃতীয় সর্গটি যোজিত হইয়াছে। এ সর্গের প্রথমদিকে প্রমীলার যে চিত্র আছে তাহাও বেদনায় অধীর অশ্রুমুখী নারীর চিত্র। কিন্তু কবি সুকৌশলে তাহার মানসিক ভাব-মণ্ডলে পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। প্রমীলা লঙ্কাযাত্রার প্রস্তাব করিলে সখী বাসন্তী তাহাকে পথের বাধার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই বাধা, শত্রুসেনার ব্যূহ অতিক্রমের দুঃসাধ্যতার কথাতেই তাহার মনে একটা প্রবল বিক্ষোভ জাগিয়া ওঠে। এখানে প্রমীলার ভাষণটি তাহার চরিত্র বুঝিবার পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সে বলিয়াছে :

"পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃকুলবধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?"

উক্তিটির প্রথম অংশে আছে নিজের শক্তি সম্পর্কে প্রবল প্রত্যয়বোধ। নদীর অনিবার্য গতিই সে শক্তির উপমা। দ্বিতীয়াংশে প্রকাশ পাইয়াছে পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুলের জন্ম গৌরববোধ। অর্থাৎ সে যে শক্তির ঘোষণা করিতেছে তাহা ভিত্তিহীন বা অমূলক নহে। দানবনন্দিনী প্রমীলা অপরিমিত শক্তির অধিকারী রাবণের পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদের পত্নী। তাহার এই অকুতোভয়, প্রত্যয়দৃপ্ত ভাষণ যে মিথ্যা নহে তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ম কবিকে এই সর্গে অনেকটা পরিসর ব্যয় করিতে হইয়াছে, কিন্তু এই বর্ণনাতেই প্রেমিকা প্রমীলা শৌর্যশালিনী রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় এবং সম্পূর্ণ নূতন এক নারী চরিত্র সৃষ্টি হইয়া ওঠে।

একই নারীতে কুলবধূ এবং বীরাঙ্গনার আচরণ অনেকের প্রথাবদ্ধ ধারনায় বিসদৃশ বোধ হইয়াছে, কিন্তু এ কাব্যে প্রমীলা চরিত্র সকল আচরণে এমনই স্বাভাবিক এবং জীবন্ত যে আমাদের অভ্যস্ত ধারণা তাহার সম্মুখে ব্যর্থ হয়। নতুন দৃষ্টিতে বিচারের প্রয়োজন দেখা দেয়। কবি এ চরিত্রের কোনো আচরণকেই নারীর স্বাভাবিক বৃত্তি হইতে বিশ্লিষ্ট হইতে দেন নাই। সমগ্র নারীসত্তার একমাত্র শক্তি প্রেমই এই চরিত্রে কেন্দ্রগত হইয়া সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। "একই প্রেমের দায়ে সে কখনো বীরাঙ্গনা, কখনো কুলবধূ; নতুবা, তাহার আসল রূপ একই। যে রূপের আভাস কবি চকিতে একবার দিয়াছেন রজনী-প্রভাতে ইন্দ্রজিৎ যখন বড় আদরে মধুর মৃদুভাবে, তাহাকে ডাকিয়া জাগাইল, তখন—

চমকি রামা উঠিলা সত্বরে—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে।
আবরিলা অবয়ব সুচারুহাসিনী
সরমে।

এ আচরণ কুলবধূর পক্ষেও যেমন, বীরাঙ্গনার পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। এমনই করিয়া সর্বত্র প্রমীলার ভিতরকার এই নারীরূপকে এক মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন হইতে না দিয়া, কবি এই চরিত্রে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা একান্ত বিরোধী, সেই আদিরস ও বীররসকে একাধারে মিলাইয়াও রসাভাস বা অসঙ্গতি দোষ নিবারণ করিয়াছেন।"

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মেঘনাদ ও প্রমীলার এই দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে এমন বিশিষ্টতা পরিস্ফুট হইয়াছে যাহা আদৌ প্রথাসিদ্ধ দাম্পত্য নীতি-সম্মত নয়। আধুনিক জীবনে নারী এবং পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহার মূলে আছে নারী ব্যক্তিত্বের মর্যাদার স্বীকৃতি। প্রমীলা শুধু ইন্দ্রজিতের পত্নী নয়, চিন্তায় ও কর্মে, সুখে এবং দুঃখে সে সর্বতোভাবে ইন্দ্রজিতের সহচারিণী। সে আপন শক্তিতেই পরাক্রান্ত পুরুষ ইন্দ্রজিতের পাশে মর্যাদার আসনটি রচনা করিয়াছে। নারী-ব্যক্তিত্বের এবং দাম্পত্য সম্পর্কের এই রূপ আমাদের দেশের ভাবনায় সম্পূর্ণই নূতন।

[আট] চিত্রাঙ্গদা ও প্রমীলা মেঘনাদবধ কাব্যের এই দুই নারী চরিত্র সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রাঙ্গদা এবং প্রমীলা চরিত্রে নারীর দুই স্বতন্ত্র রূপ চিত্রিত হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদা রাবণের মহিষী, লঙ্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর বীরবাহুর মাতা। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে সে রাবণের একমাত্র পত্নী নহে, বহু মহিষীর মধ্যে অন্যতমা। তাহাকে আমরা এ কাব্যে একটা চরম অবস্থা সংকটের মধ্যে একবারের জন্যই দেখিতে পাই। এই রমণী রাবণের বৃহৎ সংসারে সে মর্যাদার স্থানটুকু অধিকার করিয়া ছিল তাহা নিজের কোনো শক্তি বলে নয়, প্রেমের দাবিতেও নয়। সে বীরপুত্রের জননী—এইটুকুই ছিল তাহার সকল অধিকারের ভিত্তি। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা চরিত্র এক অর্থে অতিশয় দীন। তাহার নিজের চারিত্রিক মাহাত্ম্য তেমন কিছুই নাই।

অন্যপক্ষে প্রমীলা এই রাজপুরীতে যে সকলের নিকট সম্মান ও স্নেহ পাইয়াছে তাহা শুধু সে মেঘনাদ-পত্নী এই পরিচয়ের জন্য নহে। যুবরাজ মেঘনাদের পত্নী হিসাবে প্রমীলা আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহার সম্পর্কে লঙ্কার-অধিবাসীদের মনোভাব শুধু আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শনেই

সীমাবদ্ধ নয়। ইহার প্রমাণ মেলে—বীরাঙ্গনা বেশে প্রমীলা যখন লঙ্কায় প্রবেশ করিল তখন লঙ্কায় তাহার অভ্যর্থনার বর্ণনায়। আগ্নেয় তরঙ্গের মতো অসামান্যা রূপবতী প্রমীলা লঙ্কার পথ অতিক্রম করিতেছে, অগ্নিশিখা দেখিয়া পতঙ্গেরা যেভাবে ছুটিয়া আসে লঙ্কায় নরনারী সেইভাবে প্রমীলার অভ্যর্থনার জন্য ছুটিয়া আসিল। মেয়েরা হুলুধ্বনি দিয়া পুষ্পবর্ষণ করিল। বন্দীদের গানে, যন্ত্রীদের যন্ত্রবাদনে লঙ্কাপুরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

"খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা।"

ওই বীরপণার উল্লেখটুকু ইঙ্গিতপূর্ণ। এই সম্মান প্রমীলা নিজের শক্তিতেই অর্জন করিয়াছে। ইহা শুষ্ক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র নহে জনসাধারণের এ অভ্যর্থনায় লঙ্কাপুরীতে প্রমীলার মর্যাদা এবং সমাদর কতো ব্যাপক ও গভীর তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা এবং প্রমীলা এ কাব্যে সমান স্তরের চরিত্র নয়।

তবুও এই দুটি চরিত্রে কোথাও যে একটা মূলগত মিল আছে তাহাও অনুভব করা যায়। ইহাদের জীবন-সমস্যায় কোনো ঐক্য নাই ঠিকই, কিন্তু দুই চরিত্রে জীবন সম্পর্কে কবি মধুসূদনের একই ভাবনাভঙ্গি প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক জীবনের কবি মধুসূদন সর্বোপরি ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তাকে মর্যাদা দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব ভাবনা বেদনার জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক চরিত্রের সহিত অপর চরিত্রের তাই মিল না থাকাই স্বাভাবিক। কবির আধুনিক জীবন ভাবনার এই বৈশিষ্ট্য চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল ছিল। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের বিশাল পটভূমিতে বহুসংখ্যক নারী পুরুষ ভীড় করিয়া আসে বটে কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য। যতো সামান্য পরিসরেই অঙ্কিত হোক, প্রতিটি চরিত্র নিজ নিজ স্বাতন্ত্র লইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়ায়। চিত্রাঙ্গদা তেজস্বিনী, প্রমীলাও তেজস্বিনী, কিন্তু উভয় চরিত্রকে কোনোমতেই একটা ছকে বাঁধা তেজস্বিনী চরিত্রের টাইপ রূপে ভাবা যায় না। পৃথক পরিবেশে তাহাদের ব্যক্তিত্ব দুই ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছে। চিত্রাঙ্গদা যে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাস করিত সেখানে বীর জননীরূপে তাহার মর্যাদাটুকুই ছিল জীবনধারণের পক্ষে গৌরবময়

অবলম্বন। বীরবাহুর মৃত্যুতে সে অবলম্বন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বামীর সহিত তাহার সম্পর্ক—প্রেমের নহে। সেইজন্যই পুত্রের মৃত্যুতে সন্তপ্ত এবং বিপর্যস্ত এই নারী প্রকাশ্যে স্বামীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতম অভিযোগ ঘোষণা করিতেও দ্বিধা করে নাই। তাহার উক্তিতে নিশ্চয়ই সত্যভাষণের সাহস এবং তেজস্বিতা আছে, কিন্তু সে তেজস্বিতা শোকখিন্ন। পুত্রশোকে বিপর্যস্ত চিত্রাঙ্গদার উক্তিগুলির মধ্যে নারী-চরিত্রের আভাস আছে, তাহা অতিশয় স্বতন্ত্র।

আর প্রমীলা, অন্তত তৃতীয় সর্গ পর্যন্ত, দৃপ্ত মহিমা ও অপরাহত শৌর্যে পূর্ণ চরিত্র। তাহার এই তেজস্বিতার সহিত মিশিয়াছে প্রেমের করুণ কোমলতা। প্রেমের সকরুণতা ও প্রেমেরই তেজদৃপ্ত শক্তিরূপ—এই সেই চরিত্রের অপূর্ব সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়াছে। এ চরিত্রেও মেঘনাদবধ কাব্যে অনন্যসদৃশ।

প্রমীলা, চিত্রাঙ্গদা বা অন্য চরিত্রে মধুসূদন ছকে বাঁধা মানুষ তৈরি করেন নাই। সেইজন্য চরিত্রগুলির মধ্যে তুলনা করিতে গেলে তাহাদের পারস্পরিক বৈসাদৃশ্যের কথাই প্রধান হইয়া ওঠে।

[নয়] **"প্রমীলা ও ইন্দ্রজিতের প্রেম বর্ণনায় গীতিকবিতার উচ্ছলতার সহিত মহাকাব্যোচিত সংযমের একটি সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে।" এই মন্তব্যের যথার্থ্য বিচার কর।** [ক. বি. ১৯৬৩]

উত্তর। মহাকাব্য এবং গীতিকাব্যের আঙ্গিক, প্রকাশরীতি, কাব্যের মর্মগত রসাবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহাকাব্য আখ্যান-আশ্রিত। বিশাল পট-ভূমিতে বহু চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ঘটনার বয়নে মহাকাব্যে সংঘাতসঙ্কুল জীবনের বিরাট চিত্র ফুটিয়া ওঠে। কবি নিজের ব্যক্তিত্বকে চরিত্র ও ঘটনার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাহিনীর যুক্তিসঙ্গত পরিণতি অনিবার্য ধারায় অগ্রসর করেন। বিশালতা এবং বিস্তৃতি মহাকাব্যের রসাবেদনের মূল বৈশিষ্ট্য। অন্যপক্ষে গীতিকাব্য বিশেষভাবে কবিব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-আশ্রিত আবেগ অনুভূতির স্বগত প্রকাশ। স্বল্প পরিসরে কবির কল্পনা সূক্ষ্ম ও গভীর ব্যঞ্জনায় এক একটি অনুভূতির নিটোল রূপ পরিস্ফুট করিয়া তোলে। "গীতিকবিতায় একটিমাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মতো টল্ টল্ করিয়া ওঠে, আর বড়ো বড়ো কাব্যে ভাবের সম্মিলিত সজ্য বর্ণায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে।" গীতিকবিতায় আবেগের একমুখি পরিণাম, মহাকাব্যে বিচিত্র আবেগের

সম্মিলিত ধারাপ্রবাহ। গীতিকবিতায় আবেগের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, মহাকাব্যে আবেগের বিস্তৃততর বিশালতর ব্যাপ্ত প্রকাশ। গীতিকবিতায় শব্দগুলি সুরের মূর্ছনায় ভাবাবেগের উচ্ছলতা সৃষ্টি করে, মহাকাব্যে আবেগ এক একটি মহাকায় তরঙ্গের মতো উত্তাল হইয়া ওঠে।

গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের এই প্রকৃতিগত ভিন্নতা মানিয়া লইলে বলিতে হয় মহাকাব্যে যদি গীতিকবিতাসুলভ প্রকাশভঙ্গির আতিশয্য ঘটে তবে সে রচনা মহাকাব্য হিসাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু 'গীতিকাব্য' শব্দটিকে সাহিত্যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা বুঝাইতেও ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য প্রশ্নে এই অর্থেই 'গীতিকবিতা' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে মনে হয়।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের আয়োজন, ইহার বর্ণনাভঙ্গি এবং বিন্যাস কৌশল মহাকাব্যের সকল শর্ত পূরণ করিয়াছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এ কাব্যে এমন পরিবেশ, এমন চরিত্র আসিয়াছে, যেখানে কবি ভাষা এবং ছন্দকে ভিন্ন ভঙ্গিতে লীলায়িত করিয়া এক একটি নিটোল আবেগের তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইসব অংশে গীতিধর্মিতা বা lyricism এর প্রশ্রয় আছে। ইহাতে এ কাব্যের মহাকাব্যিক বদাবেদন ব্যাহত হইয়াছে এমন কথা বলা চলে না। বরং কবির রচনা নৈপুণ্যে ওই গীতিধর্মিতা মহাকাব্যের বিশালতার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে। ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রমীলা ও ইন্দ্রজিতের প্রেম বর্ণনার অংশটি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

কবি প্রথম প্রমীলাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছেন প্রথম সর্গের শেষ অংশে। লঙ্কাপুরী হইতে দূরে সংগীত ও সৌন্দর্যে আবিষ্ট পরিবেশে এতক্ষণ এই প্রেমিকযুগল পরস্পরে সান্নিধ্যে অতিবাহিত করিয়াছে। এ সুখ যে অকস্মাৎ খণ্ডিত হইবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু প্রভাষার ছদ্মবেশে রাজলক্ষ্মী যে দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছেন, সেই সংবাদ শুনিয়া মেঘনাদের পক্ষে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন ভিন্ন উপায় থাকে না। এই বিচ্ছেদ প্রমীলাকে অতৃপ্ত বাসনায় পীড়ায় পীড়িত করিয়াছে। তৎসহ সে দুর্যোগের মধ্যে মেঘনাদকে একা পাঠাইয়াও স্বস্তিবোধ করে না। তাহার এই মানসিকতা, এই সকরুণ কাতরতা প্রকাশে কবি যে ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা গীতিধর্মী হওয়াই স্বাভাবিক।

"হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ।"

অত্যন্ত কাতর এই অনুনয়। প্রমীলা সঙ্গী হইতে চায়, কর্তব্যের আহ্বানে মেঘনাদকে যাইতে হইতেছে—যাত্রাপথে সে বাধা হইতে চায় না। তৃতীয় সর্গের সূচনা অংশেও আশঙ্কিত নারী হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশে কবি গীতি-ধর্মিতারই আশ্রয় লইয়াছেন এখানে ভাষা আরো মসৃণ, উপমাগুলি বর্ণনীয় বিষয়ের সকরুণতা প্রকাশের পক্ষে আরো বেশি উপযোগী হইয়াছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ সূর্যমুখীর উদ্দেশ্যে প্রমীলার উক্তিটির উল্লেখ করা যায়:

"তোর লো যে-দশা এই ঘোর নিশা-কালে
ভানুপ্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা!
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে।
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ অনলে।"

বিচ্ছেদ-কাতর প্রমীলার বর্ণনাতেই কবি এইরূপ গীতিকবিতাসুলভ উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রমীলার অন্তরের চিত্র এইসব অংশে সকরুণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এমন সকরুণতা মেঘনাদের চরিত্রের পক্ষে সঙ্গত নয়। তেমন বর্ণনা এ কাব্যে নাই।

কিন্তু এই প্রেমের চিত্র চিত্রণেই কবি মুহূর্তের মধ্যে তুলিকা পরিবর্তন করিয়াছেন। এমন সূক্ষ্ম করুণ বর্ণ অকস্মাৎ জমকালো ঔজ্জ্বল্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। মেঘনাদ কুসুমসজ্জা ছিন্ন করিয়া যখন বীরসজ্জায় সজ্জিত হয় তখন হইতেই এই প্রেমের উপাখ্যানে একটি উত্তাল ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিতে থাকে। ইহাই, এই মহাকাব্যিক বর্ণনাভঙ্গিই প্রমীলার সমরসজ্জা ও লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রার বর্ণনায় তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উদ্বেল হইয়া ওঠে। এই অংশে এক একটি ভার্স-প্যারাগ্রাফ-এ সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান বা সমরায়োজনের সুসংহত বর্ণনা সকরুণ-সুরমূর্ছনাকে অকস্মাৎ সমুদ্র কল্লোলে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। এই অংশের ভাবাভঙ্গি শৌর্য-বীর্যময় মহাকাব্যিক আবেগ প্রকাশের উপযোগী করিয়াই রচিত।

"পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম ;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে।
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে
দ্বিষৎ-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে !"

এই উক্তিও সেই প্রমীলার, যাহার কণ্ঠে কিছু পূর্বেই কাতর রোদন শোনা গিয়াছিল। চরিত্রের মানসিকতা অনুসারে কবি বর্ণনাভঙ্গিতে দ্রুত পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। কখনো গীতিকাব্যের সুরমূর্ছনা, কখনো মহাকাব্যোচিত সমুদ্র গর্জনের ভাষা। এই দুই বর্ণনাভঙ্গি ভাবাবেগের স্তর অনুসারে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই কাব্যসুষমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

[দশ] মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ অবলম্বনে রামচন্দ্র চরিত্রটির পরিচয় দাও।

অথবা,

প্রমীলার লঙ্কা-অভিযানে রামচন্দ্রের আচরণ অবলম্বনে তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার ধারণা পরিস্ফুট কর। এই ব্যাপারে তাহার চরিত্র-মহিমা সত্যই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ? [ক. বি. ১৯৬৮]

উত্তর। রাবণ ও মেঘনাদ চরিত্র পরিস্ফুট করিবার জন্ম মধুসূদনকে যে সকল উপকরণ সংগ্রহ ও বিন্যাস করিতে হইয়াছে রামচরিত্র তাহারই অন্যতম অর্থাৎ এ কাব্যে রামচরিত্রের ভূমিকা গৌণ, রাবণের পক্ষীয়দের প্রধান শত্রু, ইহার বেশি মর্যাদা তাহার নাই। যে রামায়ণ কাহিনী হইতে কবি এই কাব্যের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন সেই রামায়ণে সকল ঐশ্বর্যে, সকল চারিত্রিক মহিমায় রামচরিত্র সমৃদ্ধ। আর এখানে সেই মুখ্য আকর্ষণের কেন্দ্র রাম হইতে সরিয়া রাবণ চরিত্রের উপরে সংস্থিত। সুতরাং রামচন্দ্র যে রাবণের ছায়ায় ম্লান হইবে ইহা একান্তই স্বাভাবিক।

তৃতীয় সর্গে রামচন্দ্রকে দেখা যায় একটা সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে রাক্ষসদের আচার আচরণ, তাহাদের গতিবিধি সম্পর্কে সর্বদাই তাহার একটি আশঙ্কার ভাব। বিভীষণ সর্বক্ষণ পরামর্শদানের জন্ত কাছে আছেন, তবুও আশঙ্কা দূর হয় না। প্রতিপদে অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় সে আশঙ্কিত। কম্প-মুক্ত-

মালিনী সৈন্যবাহিনী সরাইয়া প্রমীলাকে লঙ্কায় প্রবেশের পথ দিতে অথবা যুদ্ধ করিতে আহ্বান জানানোয় রামচন্দ্রের মনে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহাতেই এই চরিত্রের স্বরূপ বোঝা যায়। নৃ-মুণ্ড-মালিনীকে সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া, আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দেওয়া হইল। প্রমীলাকে পথ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু পরক্ষণে রামচন্দ্র বিভীষণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছে,

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি!
মূঢ় যে ঘাটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে।"

এই উক্তিতে চরম কাপুরুষতা প্রকাশ পাইয়াছে। দেবতাদের আনুকূল্যধন্য, একের পর এক যুদ্ধে বিজয়ী রামচন্দ্রের পক্ষে নারীসেনাদের দেখিয়া এই ভীতি বস্তুত চরিত্রটির পক্ষে চরম কলঙ্কের কথা। রাবণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মতো চরিত্রবল তাহার নাই। রাবণকে অসমান প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে পরাস্ত হইতে হইতেছে, রামচন্দ্রের এই সকল উক্তি পাঠকের মনে এইরূপ ধারণাই সৃষ্টি করে। কবিরও ইহাই উদ্দেশ্য। তৃতীয় সর্গে এই জাতীয় কাপুরুষোচিত উক্তি আরও আছে। একা মেঘনাদের ভয়েই রামচন্দ্র অস্থির তাহার উপরে প্রমীলা আসিয়া জুটিল। আশঙ্কিত রামচন্দ্র বিভীষণকে বলিতেছে,

"সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে,
কে রাখে এ মৃগপালে?"

সিংহ এবং মৃগপাল শব্দ দুটির ব্যবহার লক্ষণীয়। স্পষ্টই বোঝা যায় রামচন্দ্রের প্রতি কবির কোনোপ্রকার সহানুভূতি নাই। তাহার প্রিয় রাবণ-মেঘনাদের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তিনি নিজেও যেন মনের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব পোষণ করিয়াছেন। রামচরিত্র কবির সহানুভূতি বঞ্চিত।

লক্ষ্মণের অকুতোভয়, শৌর্যমণ্ডিত সরল চরিত্রের পাশে রামচন্দ্রের ভীরুতা এবং আশঙ্কা ব্যাকুলতা আরো প্রকট হইয়া উঠে। রামচন্দ্র দুর্বল, তাহার দুর্বলতার একটি কারণ লক্ষ্মণের জন্য দুঃশ্চিন্তা। তাহার ভ্রাতৃস্নেহের অকৃত্রিমতা আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে, কিন্তু ভ্রাতার প্রতি স্নেহজনিত দুর্বলতায় রামচন্দ্রের সকল মহিমা আচ্ছন্ন। হৃদয় দৌর্বল্যের দিক হইতে রাবণ-চরিত্রের সহিত রামচরিত্রের পরিকল্পনাগত সাদৃশ্য আছে। "একদিকে রাবণ যেমন পুত্র

সতেজ বৃন্ত কুসুম হইয়াও এই হৃদয়-দৌর্বল্যের তাপে শুকাইয়া যাইতেছে, তেমনই, অপরদিকে, ইহাই নিছক দুর্বলতার রূপে রামের চরিত্রকে কীটদষ্ট প্রসূনের মত শীর্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়াছে। এ দুর্বলতার চিত্র রাবণেরই বিপরীত দিক; মেঘনাদবধ কাব্য পাঠকালে পাঠক যাহাতে ইহা সহজেই অনুভব করে, কবি যে বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই, শুধু কাহিনীর প্রয়োজনেই নয়, রাবণের চরিত্রকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই অন্যান্য সকল উপকরণের মত, রামের চরিত্রও কল্পিত হইয়াছে।" কোথাও কোথাও রামচন্দ্রের হৃদয়দৌর্বল্যের বর্ণনায় অবশ্য কবি উৎকৃষ্ট কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু অংশত কাব্যরস সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হইলেও রাবণের প্রতি অতিমাত্রায় পক্ষপাতের জন্যই রামচন্দ্রের প্রতি কবির প্রথম হইতেই বিতৃষ্ণা। রামচন্দ্রের সকল আচরণে এবং কথায় পদে পদে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। কবির সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত এই চরিত্র খুব স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইয়া ওঠে নাই। রামচন্দ্রকে এ কাব্যে 'উপেক্ষিত চরিত্র' বলা হয়।

চতুর্থ সর্গে প্রত্যক্ষতঃ রাম কোথাও উপস্থিত নাই। সীতার স্মৃতিচারণ সূত্রে রামচরিত্রের যে আভাস পাওয়া যায় তাহাতে রাম এক স্নিগ্ধ আত্মশক্তির নির্ভরতায় দৃঢ় নির্ভয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্ররূপেই প্রতিভাত হয়। সীতার দৃষ্টিতে রামের চরিত্র-স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত এ কাব্যের অন্যত্র বর্ণিত রাম চরিত্রের সাদৃশ্য নাই। বস্তুতঃ চতুর্থ সর্গে রাম সম্পর্কে সীতার উক্তিগুলি রাম চরিত্রের প্রতি কবির নিজস্ব মনোভাব বুঝিতে বিশেষ সহায়তা করে না।

[এগার] মেঘনাদবধ কাব্যের তোমার পঠিত অংশ অবলম্বনে মেঘনাদ চরিত্রের পরিচয় দাও।

উত্তর। মনুষ্যত্বের পূর্ণমহিমায় উজ্জ্বল মেঘনাদের মৃত্যু মেঘনাদবধ কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা। মানুষের সুখবাসনা মানবিক হৃদয়বৃত্তির পুষ্পিত রূপ এবং আত্মশক্তির উপরে অবিচলিত নির্ভরতা মেঘনাদ চরিত্রে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই নিষ্কলুষ পবিত্র এবং সৌন্দর্যময় চরিত্রটির শোকাবহ পরিণতি চিত্রিত করাই এ কাব্যে কবির উদ্দেশ্য। মেঘনাদ চরিত্রে কবি জীবন নিয়তির যেরূপ, দৈবাহত মানুষের যে বিষাদময় পরিণাম চিত্রিত করিতে বসিয়াছেন তাহার প্রেরণা তিনি পাইয়াছিলেন পাশ্চাত্ত্য ট্রাজিডি হইতে।

এই কাব্যের শাখা-প্রশাখায় জটিল কাহিনীর মধ্যে কবিকে অত্যন্ত সতর্কভাবে চরিত্রটি গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। প্রথম সর্গের এবং তৃতীয় সর্গের শেষদিকে আমরা মেঘনাদ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে রাবণ এবং লঙ্কার সকল অধিবাসী যখন শোকাভিভূত, রাবণ শেষবারের মত রামচন্দ্রের সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন মেঘনাদ লঙ্কাপুরীর বাহিরে প্রমোদ উদ্যানে প্রমীলার সহিত প্রেমলীলায় মগ্ন। রামচন্দ্রকে মেঘনাদ ইতিপূর্বে দুইবার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার ধারণা রামচন্দ্র নিহত হইয়াছে। তাই নিরুদ্বেগচিত্তে যুবরাজ প্রমোদ উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছে। এই সময়ে লঙ্কার রাজলক্ষ্মী প্রভাষা রাক্ষসীর ছদ্মবেশে তাহাকে সংবাদ দিল। মেঘনাদকে কাহিনীর বৃত্তের মধ্যে আনিবার জন্য কবিকে এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ইতিপূর্বে লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন :

"যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ আনি তারে স্বর্ণলঙ্কা ধামে।
প্রাক্তনের ফল তুরা ফলিবে এ পুরে।"

এই উক্তিতে ইন্দ্রজিৎ আমাদের সম্মুখে আসিবার পূর্বেই অশুভ ইঙ্গিত করা হয়। প্রাক্তনের ফল অবশ্যম্ভাবী। সে প্রাক্তনের গতিরোধ করিবার ক্ষমতা স্বয়ং মহাদেবেরও নাই। এইরূপ একটা পটভূমি রচনা করিয়া তাহার মধ্যে কবি নায়ক চরিত্রকে প্রথম পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখ উপস্থাপন করিয়াছেন।

মেঘনাদ লঙ্কার সংবাদ শুনিল। ভ্রাতার মৃত্যু এবং দেশের বিপদের সংবাদে তাহার অন্তর ক্ষুব্ধ। এমন বিপদের সময়ে সে প্রমোদ উদ্যানে ফুলখেলায় মত্ত —ইহা ভাবিয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়াছে। পুষ্পসজ্জা দূরে ফেলিয়া মেঘনাদ বলিয়াছে,

"হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা,— হেথা আমি বামদেল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ?"

প্রমীলা স্বভাবতই বেদনাবোধ করিয়াছে। কাতর অনুনয় করিয়াছে। কিন্তু মেঘনাদ তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহে নাই। বলিয়াছে,

"ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে,
রাঘবে।"

এই উক্তিতে প্রমীলার সহিত ইন্দ্রজিতের সম্পর্কের স্নিগ্ধতা এবং আপন শক্তি সম্পর্কে তাহার প্রবল প্রত্যয়বোধ যুগপৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ইহার পর দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়। লঙ্কায় উপনীত হইয়া মেঘনাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া সংযতভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত পুনরায় সৈনাপত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে। এই প্রার্থনাটিও আত্মশক্তির উপরে মেঘনাদ অসীম আস্থার এবং দেশের প্রতি, পিতার প্রতি তাহার সদাজাগ্রত কর্তব্য-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। রাবণের শঙ্কা ও সংশয় মিশ্রিত উক্তির উত্তরে বীরদর্পে মেঘনাদ বলে,

"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি।"

এ কর্তব্যভার গ্রহণ না করিলে মেঘবাহন অর্থাৎ ইন্দ্র হাসিবে, তাহার ইষ্টদেবতা রুষ্ট হইবেন। এ সকল কথায় ইন্দ্রজিৎ চরিত্রে একটু করিয়া উন্মোচিত হইয়াছে, তাহার মনের নানাদিক উদঘাটিত হইয়াছে। ইন্দ্রকে পরাস্ত করা তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। অগ্নিদেবতার আশীর্বাদেই ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে অপরাজেয়। কবি এইভাবে ইন্দ্রজিৎ চরিত্রটিকে পাঠকের সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সর্গে প্রত্যক্ষভাবে মেঘনাদকে উপস্থাপন করা হয় নাই। তবে দেবসমাজের যে কর্মচাঞ্চল্য দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ মেঘনাদবধের উপায় উদ্ভাবন।

তৃতীয় সর্গেও মেঘনাদের ভূমিকা গৌণ। প্রমীলা বীরত্বপূর্ণ অভিযানের শেষ 'উত্তরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে।' এইখানে আমরা মেঘনাদের সাক্ষাৎলাভ করি। যোদ্ধৃবেশে প্রমীলা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রমীলাকে অভ্যর্থনা করিয়া সে কৌতুকভরে বলিয়াছে—

"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস ধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদতলে তবে, চিরদাস আমি
তোমার।"

এই উক্তিতে প্রমীলার বীরত্বপূর্ণ অভিযাত্রার জন্য গৌরববোধ এবং তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রেম সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

নিদারুণ মৃত্যুতে যে মেঘনাদের জীবন সমাপ্ত হইবে, তাহাকে কবি এই-ভাবে সকল ঐশ্বর্য পূর্ণ করিয়া গড়িয়াছেন। "এ চরিত্র নিদাঘ-দিবার মত দীপ্ত ও নির্মল, কোনোখানে মেঘ বা কুয়াশার লেশমাত্র নাই। ইহার অন্তঃকরণে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রশ্ন সংশয় নাই, নৈরাশ্য নাই; প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রস্ফুট কুসুমে কোথাও চিন্তাকীট প্রবেশ করে নাই। আর্য-রামায়ণের মেঘনাদের সেই দৃপ্ত পশুবল, মধুসূদনের মেঘনাদে অপর সকল মহৎ গুণের সমবায়ে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে—মায়ের দুলাল, পিতার নয়ন-মণি, পত্নীর কণ্ঠহার, শত্রুর দুঃস্বপ্ন এই মেঘনাদ, সলিল-অগ্নি-মরুতের সন্নিপাতে মেদুর মেঘকান্তির মত নয়ন মনোহর হইয়াছে। মেঘনাদের বীরত্বের মূল উপাদান হইয়াছে—তাহার নিরতিশয় ভয়শূন্যতা। শক্তিমদমত্ততা নয়—অসীম বাহুবল ও হৃদয়বলের অমোঘতায় বিশ্বাসই ইহার কারণ।"

[বারো] মেঘনাদবধ কাব্যের তোমার পঠিত অংশ অবলম্বনে মধুসূদনের কল্পনায় এবং কাব্যের পরিকল্পনায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর। [ক. বি. ১৯৬৮]

উত্তর। উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা এবং য়ুরোপীয় প্রভাব আমাদের চিন্তা ভাবনায় যে পরিবর্তনের সূচনা করিতেছিল বাঙলা কবিতায় তাহার প্রথম সার্থক প্রতিফলন দেখা যায় মেঘনাদবধ কাব্যে। য়ুরোপ হইতে যে ভাবের প্রবাহ আমাদের মনকে আঘাত করিল তাহার মূল মর্ম মানবতাবাদ। শিল্পকলায়, জ্ঞান বিজ্ঞানে মানুষের সর্বময় আধিপত্য বিস্তারে এবং অলৌকিকত্বে বিশ্বাসের উচ্ছেদ সাধনে য়ুরোপ যে আধুনিকতার সূচনা হইয়াছিল, আমাদের দেশে প্রধানত সাহিত্যের মাধ্যমে তাহার সহিত পরিচয় এবং ওই আধুনিক জীবনবাদ নিজেদের সাহিত্যে আত্মীকরণের উদ্যোগ দেখা দেয়। বাঙলা সাহিত্যে এই কালান্তরের চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া ওঠে মেঘনাদ-

বধ কাব্যে। এ কাব্যের ভাষা, ছন্দ, কাব্যবিষয়, কবিকল্পনার বিশিষ্টতা, চরিত্র পরিকল্পনার বিশিষ্টতা এবং ইহার কেন্দ্রগত আধুনিক জীবনবাদ—সম্পূর্ণরূপে আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র। মধুসূদন এই কাব্যে পৌরাণিক কাহিনী হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার আধুনিক জীবন চেতনার স্পর্শে সেই পুরাতন প্রসঙ্গগুলি সম্পূর্ণ নূতন রসমূর্তি লাভ করিয়াছে। কেবল ছন্দোবন্ধে এবং রচনাপ্রণালীতে নহে, ইহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন আসিয়াছে জীবন ভাবনার পরিবর্তনের সূত্রে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণ সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এ কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতিসূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে তাহার ত্যাগ ও দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।" এই স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলা—ইহা আত্মপ্রত্যয়শীল, আত্মশক্তির উপরে বিশ্বাসসম্পন্ন মানুষেরই লীলা। রাবণ-ইন্দ্রজিৎ চরিত্রে এই নতুন ভাবনা জয়যুক্ত হইয়াছে। মৃত্যুর মূল্যে এই মানুষ মর্যাদা অর্জন করে। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রেরণামূলে, এই কাব্যের মর্মে যে জীবনবাদ প্রচ্ছন্ন আছে, সেই মানবতাবাদ পাশ্চাত্ত্যেরই ভাবনা-মন্ত্র।

কাব্যপ্রেরণার দিক হইতে যেমন তাহার চিত্তের স্ফূর্তির মূলে ছিল পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শ—তেমনই কাব্যের কায়া-গঠনে, কাহিনী-বিন্যাসে তাঁহার বহু অধ্যয়ন-জাত বিদেশী সাহিত্যের অভিজ্ঞতাই কাজে লাগাইয়াছেন। "এখানেও মধুসূদনের শুধু প্রতিভাই নয়, সেকালের পক্ষে যাহা অনন্যসুলভ ছিল, সেই খাঁটি সাহিত্যিক শিক্ষা বা উৎকৃষ্ট কালচারের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় ক্লাসিক্যাল মহাকাব্যগুলি গভীর রসগ্রাহিতার সহিত পাঠ করার ফলে মধুসূদনের সেই শিক্ষা হইয়াছিল, যাহা এদেশের মহাকাব্য বা কাহিনী-কাব্যের আদর্শ বা রীতি হইতে লাভ করা সম্ভব ছিল না। একটা বিষয়বস্তু বা চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া আদি মধ্য ও অন্তযুক্ত কাহিনী-

রচনা—আমাদের দেশে এরূপ কাব্যের রীতি নয়।...মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদনই সর্বপ্রথম এই য়ুরোপীয় কাব্যকলাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন।" প্রথম সর্গে বীরবাহুর পতন, রাবণের যুদ্ধোদ্যোগ এবং পরিশেষে মেঘনাদকে সৈন্যাপত্যে বরণ, এইভাবে কাব্যের মুখপাত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গে দেবদেবীদের ব্যাপক কর্মোদ্যোগে 'মেঘনাদবধ' বা কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা সংঘটনের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলা চরিত্রের কল্পনায় হেকতোরের স্ত্রী আন্দ্রোমাখের এবং তাস্সোর কাব্যের রণরঙ্গিনী ক্লোরিন্দার আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। ব্যক্তিত্বের শক্তিতে সমৃদ্ধ প্রেম ও শৌর্যে পূর্ণ এই নারী চরিত্র মেঘনাদবধ কাব্যের বিশেষ গৌরব। এ চরিত্রের দ্বারা মেঘনাদের জীবনের রূপ সুসম্পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছে, এবং দাম্পত্য সম্পর্কের একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তৃতীয় সর্গটিও ভাব ও আখ্যানবস্তুর বিকাশের দিক হইতে এ কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ।

চতুর্থ সর্গে আখ্যান এবং চরিত্র রূপায়ণে বাল্মীকির প্রভাব স্বীকার করিলেও সর্গটির বিন্যাস কৌশল এবং কাব্য কল্পনায় আধুনিক পরিশীলিত কবি মনেরই ছাপ সর্বত্র লক্ষ করা যায়। গোটা গল্পাংশ যে ভাবে সংলাপের পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে, বর্ণনায় প্রকৃতি ও মানবিক অনুভূতির সংমিশ্রণ যে ভাবে ঘটানো হইয়াছে, কাব্যভাষার যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য বিকশিত করিয়া তোলা হইয়াছে, সবই আমাদের কাব্যে নূতন। এবং এ অভিনবত্ব পরিশীলিত রুচি ও কাব্যকলা বিষয়ে বহুদর্শী কবি ভিন্ন সম্ভব ছিল না।

বাঙলা কাব্যের চিরাগত ছন্দ-প্রকরণের ক্ষেত্রে মধুসূদন যে বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল মিলটনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স-এর ধ্বনিগাম্ভীর্য মাতৃভাষায় পরিস্ফুট করার প্রেরণা। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙলা পয়ারের ভিত্তিতেই গঠিত, কিন্তু মিলটনের কাব্যের উদাত্ত ধ্বনির সুমহান গাম্ভীর্য মাতৃভাষায় পরিস্ফুট করিবার জন্ত পয়ারের ছেদ-যতি বিন্যাসের চিরাগত রীতি লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, চরণান্তিক মিল বর্জন করিতে হইয়াছে। এই প্রবহমান ছন্দে এক একটি অখণ্ড ভাবচিত্র সুসম্পূর্ণভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্ত ভার্স-প্যায়াগ্রাফ বা পঙ্‌ক্তিব্যূহ রচনার কৌশল প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কাব্য-

প্রকরণের ক্ষেত্রে এই সংস্কারসাধন এবং নবপ্রবর্তনার মূলে পাশ্চাত্ত্য কাব্যের প্রভাব যে আছে তাহা বলাই বাহুল্য।

মেঘনাদবধ কাব্যের সকল ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এক নিয়তিশক্তি দ্বারা। এই নিয়তি বা প্রাক্তনের কল্পনায় ও গ্রীক নিমেসিসের ধারণার প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। 'মরে পুত্র জনকের পাপে'—ইত্যাদি উক্তিতে পুরুষানুক্রমিক পাপচক্র সম্পর্কে গ্রীক ধারণার আভাস পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে বাঙলা কাব্যে রীতি ছিল—কাব্যারম্ভে কাব্যরচনার জন্ত দেবদেবীদের প্রত্যাদেশের কথা বিবৃত করা। মধুসূদন প্রথম সর্গে বীণাপানি এবং কল্পনাদেবীর বন্দনা করিয়া কাব্যের মুখপাত করিয়াছেন। বীণাপানি ও কল্পনাদেবীর এই বন্দনা আদৌ আমাদের প্রাচীন কাব্যরীতির অনুসরণ নয়, পাশ্চাত্ত্য কবিদের Muse বর্ণনারই অনুরূপ।

এইভাবে মেঘনাদবধ কাব্যের ভাব ও রূপে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব প্রমাণ করা যায়। কিন্তু মনে রাখা উচিত, প্রভাবিত হওয়া ও অনুকরণ করা এক কথা নয়। বিশ্বের নানা কবির চিত্ত-ফুলবন হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুসূদন অপরূপ মধুচক্র রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। মাতৃভাষার দীনতা মোচনের জন্ত, বাঙলা কাব্যের প্রথাবদ্ধ রীতি এবং একই কাব্য-বিষয়ের বহু-ব্যবহারজনিত ক্লান্তি দূর করিয়া আধুনিক জীবন-চেতনা প্রকাশের উপযুক্ত আধার নির্মাণের জন্ত তাঁহার অক্লান্ত প্রয়াস সফল হইয়াছে। উপকরণ তিনি নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিভার শক্তিতে সেই সব উপকরণে অনিন্দ্যসুন্দর কাব্যমূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন।

[তেরো] মেঘনাদবধ-কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। মধুসূদন হইতে বাঙলা কাব্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। কবিতার ভাব ও রস প্রকাশ-ভঙ্গি উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রেই মধুসূদন বিপ্লব সাধন করিয়াছেন। নবযুগের বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এই কবি যে নবীন চেতনা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহার উপযুক্ত আধারও তাঁহাকে নির্মাণ করিতে হইয়াছে। মধুসূদনের বিদ্রোহ শুধু মধ্যযুগীয় জীবনবোধের বিরুদ্ধে নহে, মধ্যযুগের কাব্যকলাকেও তিনি বর্জন করিয়াছেন। নবজাগরণের যুগে জাতীয় জীবনে যে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইল তাহারই প্রত্যক্ষ ফল মাতৃভাষার সংস্কার

সাধন এবং আধুনিক মানুষের জীবন-ভাবনা প্রকাশের উপযোগী ভাষা নির্মাণ। মধ্যযুগীয় জীবনের বৃত্তবদ্ধতা ভাঙিয়া আত্মমর্যাদায় উদ্দীপ্ত মানুষ যখন আপন মহিমা প্রকাশ করিতে চায় তখন ভাষা এবং সাহিত্য-রীতির ক্ষেত্রের পুরাতন প্রথার বন্ধন-মুক্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া ওঠে। আমাদের সাহিত্যে এই মুক্তি সম্ভব হইয়াছিল মধুসূদনের সাধনায়।

আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যেমন বৈচিত্র্যের নিতান্ত অভাব, কাব্যদেহ-নির্মাণেও তেমনই একটা প্রথাসিদ্ধ রীতি প্রায় সকল কবিই মানিয়া চলিয়াছেন। পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দের বাঁধা রীতিতে কাব্য-প্রসঙ্গের উপস্থাপনা ভিন্ন অন্য কোনো রীতি-উদ্ভাবনের সাক্ষ্য মেলে না। কখনো কখনো বৈচিত্র্য সাধনের জন্য সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণ করা হইয়াছে। উদ্দীপ্ত কল্পনার পরিবর্তে ভাবপ্রবণতাই যেন মধ্যযুগের সাহিত্যিক মানসিকতার প্রধান লক্ষণ। বাঙলা ভাষার স্বাভাবিক নমনীয় ভঙ্গি এই ভাবপ্রবণতার স্পর্শে নিতান্তই মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িয়াছে। মধুসূদন কবিতার ভাষায় নতুন করিয়া দৃঢ় মেরুদণ্ডের সবলতা আনিয়াছেন। ছন্দপ্রকরণের ক্ষেত্রে তিনি মূলতঃ প্রাচীন পয়ারের উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু পয়ারে চরণান্তিক মিল এবং যতি ও ছেদের সহঅবস্থান কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহে যে অনিবার্য বাধা আরোপ করে, তাহা মানিয়া চলার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 'ছন্দ' বাহির হইতে আরোপিত একটা বন্ধন নহে, কবি-কল্পনাকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করিতে সহায়তা করাই ছন্দের উদ্দেশ্য। আপন কবিস্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই তিনি ছন্দ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছেন। (প্রাণের যে প্রচণ্ড লীলা মেঘনাদবধ কাব্যের পরিমণ্ডলে বাধা-বন্ধহীন আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভিন্ন তাহা সম্ভব হইত না।) চরণের শেষে মিল না থাকা এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য নহে। পয়ারে প্রতিটি চরণ ৮ এবং ৬ মাত্রায় দুটি পর্বে বিভক্ত। কবিতা পাঠের সময়ে শ্বাসগ্রহণের জন্য ৮ মাত্রার শেষে স্বল্প বিরতি এবং চরণের শেষে আসে দীর্ঘ বিরতি। প্রতিটি চরণের ১৪ মাত্রা এইভাবে ৮ এবং ৬ মাত্রার দুটি পর্বে বিভক্ত হইয়া যায়। পয়ারে এই ১৪ মাত্রার মধ্যেই একটি অর্থবহ চরণ রচনা করিতে হয়। ১৪ মাত্রার এইরূপ দুইটি চরণের মধ্যে একটি ভাব সম্পূর্ণ করিতে হয়। যেমন, "মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥" মধুসূদন এই

বাধ্যবাধকতা অগ্রাহ্য করিয়া ছন্দের শ্বাসবিভাগ এবং অর্থ-বিভাগ দুটিকে পরস্পরের নির্ভরতা হইতে মুক্তি দিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ১৪ মাত্রায় চরণ রচিত হয়, কিন্তু এইরূপ দুটি চরণের মধ্যে একটি অর্থকে সম্পূর্ণ করা আবশ্যিক নয়। চরণ হইতে চরণান্তরে ভাবনার ধারা প্রবাহিত হইয়া যায়। ছন্দের প্রচলিত প্রথায় মধুসূদন এইভাবে বিপ্লব সাধন করিলেন। চরণান্তিক মিল পয়ারে সহজে একটি ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করে, অমিত্রাক্ষর মিল বর্জন করা হইয়াছে, কিন্তু কাব্যের ধ্বনি-প্রবাহে বিচিত্রতা সৃষ্টি দ্বারা এই ক্ষতি অন্যভাবে পূরণ করিতে হইয়াছে। ধ্বনিতরঙ্গের বিচিত্রতা তৎসম শব্দের ব্যবহার ভিন্ন সম্ভব ছিল না। তাঁহার রচনায় তৎসম শব্দের বাহুল্য অভিধান-নির্ভরতার প্রমাণ নয়, এই শিল্পীর শ্রুতি সর্বদা ছন্দের অন্তর্লীন সঙ্গীতপ্রবাহের প্রতি সচেতন ছিল। তাই নিতান্ত লৌকিক বুলি, বাক্‌বন্ধ এবং লোকপ্রচলিক মৌলিক ভাষারীতির ব্যবহার যেমন তাহার কাব্যে সর্বত্র দেখা যায়, তেমন যেখানেই ভারি ওজনের তৎসম শব্দ ছন্দ-স্পন্দের সহায়ক হইবে বিবেচনা করিয়াছেন—অসংকোচে তাহার ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙলা ক্রিয়াপদের অসতর্ক ব্যবহার ভাষাকে শ্লথ-বন্ধ করিয়া দেয়। তাই ভাষা দৃঢ়নিবন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রচুর নামধাতু ব্যবহার করিতে হইয়াছে। 'সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ'—এখানে 'দ্বন্দ্বি'র পরিবর্তে 'দ্বন্দ্ব করিয়া' লিখিলে ভাষার সংহতি নিঃসন্দেহে ভাঙিয়া পড়ে। স্বরধ্বনির বাহুল্য ভাষাকে নমনীয় করিয়া আনে, স্বরধ্বনির বাহুল্য বর্জন করিবার জন্যই তিনি ব্রজ, বৃন্দ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক তৎসম শব্দের সাহায্যে বহুবচনের পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙলার লৌকিক ভাষার সহিত প্রয়োজন-বোধ তৎসম শব্দ মিশ্রিত করিয়া, কখনো বা নতুন শব্দ নির্মাণ করিয়া আবহমান কাল প্রচলিত বাঙলা ভাষার ধাতুতেই নতুন যুগের কবিতার ভাষা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। "মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাই আধুনিক বাঙলা কাব্যের প্রথম কবিভাষা, অর্থাৎ, ভাষা এখানে সর্বপ্রকারে কবির নিজস্ব প্রয়োজনের অধীন হইয়াছে, ছন্দে ও বাগ্‌বন্ধে, ধ্বনি ও রূপব্যঞ্জনায় তাহাকে কবির কল্পনা-অনুযায়ী বেশবিন্যাস করিতে হইয়াছে।"

ছন্দের মতোই মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাসজ্জায় মধুসূদন অলংকার প্রয়োগেও অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষাকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্যই অলংকারের প্রয়োজন। কিন্তু কাব্যে যে ভাষা-দেহ রচিত

হয় তাহা যেহেতু ভাবেরই দেহ, অতএব সেই ভাষা-দেহকে সজ্জিত করিবার জন্য প্রযুক্ত অলংকারেও কাব্যের আত্মাস্বরূপ যে ভাব—তাহার সহিত সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। অলংকার যদি কাব্যের সহজ রসস্ফূর্তির পথে বাধা হইয়া কেবল বহিরঙ্গ সাজসজ্জায় পরিণত হয় তাহা হইলে কাব্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। মেঘনাদবধ কাব্যে ছত্রে ছত্রে বিভিন্ন অলংকার প্রযুক্ত হইয়াছে। বিমূর্ত ভাবকে মূর্তিবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে উপমা-উৎপ্রেক্ষার সহায়তা যে কোনো কবির পক্ষেই অপরিহার্য। এইসব অর্থালঙ্কার ভিন্ন নিছক শব্দধ্বনির সংঘাত সৃষ্টি করিয়া ভাষাপ্রবাহকে তরঙ্গিত করিবার জন্য মধুসূদন প্রচুর শব্দালঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের অলংকার বাহুল্যের জন্য অনেক সমালোচক কবিকে সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সতর্কভাবে এই কাব্য পাঠ করিলে দেখা যাইবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অলংকারগুলি কবির ভাব প্রকাশের অপরিহার্য বাহন হইয়া ওঠায় এই অলংকারের জন্যই মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষায় উৎকৃষ্ট অনন্তসদৃশ স্টাইলের আভাস ফুটিয়াছে। সুকৌশলে অনুপ্রাস ব্যবহারের দ্বারা কবি বহুস্থানে বর্ণনীয় বিষয়ের যথার্থ স্বরূপটি অনায়াসে প্রকাশ করিয়াছেন। 'ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা'; 'ভীমমূর্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষদল পতি, প্রেক্ষড়নধারী বীর, দুর্বার সমরে', 'পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপ দানে', 'বোলিছে ঘুজ্ঘু রাবলা ঘুনু ঘুনু বোলে'— এইরূপ অজস্র সার্থক অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যায়, যেখানে ব্যঞ্জনধ্বনির সংঘাতের দ্বারা ভাষায় কখনো বা ধ্বনি-তরঙ্গের সংক্ষুব্ধতা সৃষ্টি করা হইয়াছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে শব্দধ্বনিকে তরঙ্গিত করিয়া চাতুর্য প্রকাশ কবির লক্ষ্য নয়, অর্থের এবং ভাবের অনুগামিতাই এখানে অলংকারকে তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়াছে। অর্থালংকারের ক্ষেত্রেও এইরূপ এক একটি ভাবাবস্থার প্রত্যক্ষ মূর্তি রচিত হইয়াছে। রাবণ যখন বলে 'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে,' তখন ঐ উপমাটির গুণে মুহূর্তেই অমিতবীর্যশালী রাবণের বিড়ম্বিত ভাগ্যের কথা পাঠকের প্রত্যয়সিদ্ধ হইয়া ওঠে। প্রয়োজনবোধে মধুসূদন সংস্কৃত বাক্যাংশ সংযোগে উপমা প্রস্তুত করিয়াছেন। এইরূপ উপমার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত 'যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে'। এই উপমাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "এখানে, ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বারবার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে।" মেঘনাদবধের ভাষাগত সৌন্দর্য

বিধানের জন্য কবি কোথাও বিদেশী কাব্য হইতে উপমা উৎপ্রেক্ষা চয়ন করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন প্রথম সর্গে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সৈনিকদের বর্ণনায়—

"হায়রে যেমতি
স্বর্ণচূড়শস্যক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষস নিকর।"

—এই উৎপ্রেক্ষটি হোমরের ইলিয়দ কাব্য হইতে সংগৃহীত। সংস্কৃত-কাব্য, লোক প্রচলিত ভাষা, বিদেশী কাব্য—প্রভৃতি নানা সূত্র হইতে কবি অলংকার সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু সর্বত্র নিজের কল্পনাশক্তি প্রয়োগ কাব্যের ভাববস্তুর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সংগৃহীত অলংকারকেও বিশেষভাবে এই কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত করিয়াছেন।

[চোদ্দ] "মানবজীবনের অপরিহার্য নিয়তির ফলশ্রুতিই মেঘনাদবধ কাব্যতরু সকল গৌণ-মুখ্য রসধারা, ঘটনা-পল্লব এবং শাখা প্রশাখার মূলকাণ্ড—কাব্যটির করুণ-রসাত্মক স্থায়ীভাবের মেরুদণ্ড।"—মেঘনাদবধ কাব্যে নিয়তি-কল্পনা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচকের এই মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। 'মেঘনাদবধকাব্য পাঠের ভূমিকা'র আলোচনা অংশে 'মেঘনাদবধ কাব্যে নিয়তি' দ্রষ্টব্য।

[পনেরো] মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ-ইন্দ্রজিতের জীবনের মহিমান্বিত রূপ চিত্রণই কবির উদ্দেশ্য। তাই এই কাহিনীর মধ্যে চতুর্থ সর্গে বর্ণিত রাবণকর্তৃক সীতাহরণের প্রসঙ্গ কবির মূল অভিপ্রায় রূপায়ণের পক্ষে বাধাস্বরূপ—অনেকে এই মত পোষণ করেন। এই অভিমতের যৌক্তিকতা বিচার প্রসঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যে চতুর্থ সর্গের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যে রামায়ণের কাহিনী ব্যবহার করা হইলেও কবির জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতার জন্য এ কাব্য সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে, যে গার্হস্থ্য-নীতি এবং ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে যে বিচারবোধ বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য, মধুসূদন এইসব নীতিবোধ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মানবতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আধুনিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী কবি মধুসূদন তাই তাঁহার কাব্যের নায়করূপে নির্বাচন করিয়াছেন দেবদ্রোহী রাবণকে। এ

কাব্যের সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে অবস্থিত এই রাবণ চরিত্র, যে স্বরূপে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রাবণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ সর্ববিধ মানবিক গুণে ভূষিত। একদিকে আপন শক্তিতে যে যেমন বাহির বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্যের অধিকারী, অন্যদিকে সন্তানসন্ততি, আত্মীয় পরিজন এবং প্রজাপুঞ্জের সহিত আন্তরিক সম্পর্কে সংযুক্ত হইয়া মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মহিমায় সমুজ্জল। প্রতিকূল শক্তির সহিত সংগ্রামে এবং পরাভবে তাহার মানব মহিমা ম্লান হয় নাই। বরং দুঃখ বহনের শক্তিতে, সর্বনাশের মধ্যেও অমিত আত্ম-প্রত্যয়ে সে আমাদের দৃষ্টিতে এক বিস্ময়াবহ মানুষরূপে প্রতিভাত হয়। সেই সঙ্গে মেঘনাদ-প্রমীলা-মন্দোদরী প্রভৃতি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল চরিত্র এ কাব্যে মানবজীবনের এক একটি গৌরবময় প্রতিচ্ছবিরূপে আবির্ভূত হয়। সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের পরিকল্পনা এবং রূপায়ণের মধ্যে এক আধুনিক জীবনরসিক কবির কল্পনা ক্রিয়াশীল। প্রথার বিরুদ্ধে, বাহির হইতে আরোপিত বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশই এই কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এবং এ বিদ্রোহ মূর্ত হইয়াছে মুখ্যতঃ রাবণ চরিত্রে। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ পাপের মূর্ত প্রতীক, কিন্তু মধুসূদন ওই রাবণ চরিত্রকেই শোধন করিয়াছেন, ওই কাহিনীর আদলের মধ্যেই তিনি রাবণকে মানবিক মহিমার প্রতীক করিয়া তুলিয়াছেন। তাই মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া অজ্ঞাত বিধির বিধান সম্পর্কে বার বার ক্ষোভ প্রকাশ করিলেও সীতাহরণজনিত অন্যায় কখনো স্বীকার করে নাই। চিত্রাঙ্গদা স্পষ্ট ভাষায় লঙ্কার বিপর্যয়ের জন্য সীতার প্রতি রাবণের অন্যায় আচরণকেই দায়ী করিলেও রাবণ উত্তরে বলিয়াছে :

> "এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে।
> গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?"
> হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
> আমি!"

মেঘনাদবধে রাবণের উক্তি এবং আনুষঙ্গিক বর্ণনা হইতে তাহার দুশ্চরিত্রতা প্রমাণ করা যায় না। রাবণ বরং সূর্পণখাকে উদ্দেশ করিয়া একবার সকল দুর্দৈবের জন্য ধিক্কার দিয়াছে। এ কাব্যে রাবণকে যেরূপ মর্যাদাবান চারিত্রিক

মানুষরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহার সহিত বাল্মীকির রাবণ-চরিত্রের নীচতা এবং প্রবৃত্তি তাড়না কিছুতেই মেলানো যায় না।

অথচ চতুর্থ সর্গে আমরা রাবণের যে চরিত্র দেখি তাহা মূলতঃ বাল্মীকি রামায়ণের অনুরূপ। চতুর্থ সর্গে সীতা যখন বলে,

"কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা।"

কিংবা জটায়ুর মুখে যখন উচ্চারিত হয়,

"কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া, এবে
প্রেমদীপ ? এই তোর নিত্যকর্ম, জানি।"

তখন স্পষ্টতঃই উক্তিগুলি মনে হয় মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ চরিত্রের পূর্বাপর বিবরণের মধ্যে অসঙ্গত। সীতাকে রাবণ এমন কথা বলিয়াছে যাহা স্মরণ করিয়াও সীতা লজ্জায় মরিয়া যায়, নারীহরণ রাবণের নিত্যকর্ম—এসব কথা যখন বলা হয় তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারি, মধুসূদন নিজস্ব কাব্য পরিকল্পনার পরিধির বাহিরে পদক্ষেপ করিয়া চরিত্রের সঙ্গতি ব্যাহত করিতেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে চতুর্থ সর্গের অবস্থিতি সম্পর্কে আপত্তি ওঠে এই কারণে। কবি রাবণ সম্পর্কে যে ভাবাবহ প্রস্তুত করিয়া তোলেন, চতুর্থ সর্গের রাবণ তাহার সম্পূর্ণই বিপরীত। মধুসূদন এখানে স্বকীয় কল্পনায় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিয়া বাল্মীকির দ্বারা চালিত হইয়াছেন, কাব্যে বাল্মীকির প্রভাব মানিয়া লইয়াছেন। মোহিতলাল মজুমদার বা অন্যান্য সমালোচকেরা ব্যাপারটিকে সমর্থন করিবার জন্য কিছু কিছু যুক্তি দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু রাবণকেই যদি এ কাব্যের মূল মেরুদণ্ডরূপে গ্রহণ করি, এবং তাহাই অনিবার্য, তবে কবির ত্রুটি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বলিতেই হইবে, আপন কাব্য পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কবি সাময়িকভাবে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহার কবি কল্পনার একাগ্রতা বিচলিত হইয়াছে। চতুর্থ সর্গ সম্পর্কে মোহিতলালের উক্তি, "তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ সাগরের মধ্যস্থলে একটি শুভ্র শ্যামল প্রবাল দ্বীপ",—তাই মানিয়া লওয়া যায় না।

কবি নিজে এই ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "কাহিনীর অগ্রগতির সহিত প্রায় সম্পর্কহীন সীতাহরণের উপকাহিনী (চতুর্থ সর্গ) সংযুক্ত করা হয়তো উচিত হয় নাই। কিন্তু তুমি কি স্বেচ্ছায় ইহা বর্জন করিবে?" মেঘনাদবধ কাব্যের পরিধি যেটুকু, তাহার পূর্ণতা সাধারণের জন্য সীতাহরণের কাহিনীর প্রয়োজন ছিল না। সীতাহরণের জন্যই রাবণকে বিপন্ন হইতে হইয়াছে, এই তথ্য যদি গল্পটির সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজনও মনে করা যায়, তবে সে প্রয়োজন প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার অনুযোগেই সিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহার জন্য গোটা একটা সর্গের পরিসর ব্যবহারের আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, চতুর্থ সর্গটির প্রতি কবির নিজেরও মোহ কম ছিল না। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা উদ্ধৃত চিঠির দ্বিতীয় বাক্যটি কবির মনোভাব স্পষ্ট করিয়া তোলে। কেন এই মোহ?

কাব্যকাহিনীর সহিত নিঃসম্পর্কিত হইলেও চতুর্থ সর্গটির কাব্যসৌন্দর্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ, ছন্দ এবং ভাষার কথা। নব আবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটা বড়ো শক্তি পরীক্ষা হইয়াছে চতুর্থ সর্গে। কবি মিলহীন এই ছন্দে ধ্বনিপ্রবাহের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পদান্তিক মিলের আশ্রয়চ্যুত এই ছন্দ এলায়িত হইয়া পড়িবে—এইরূপ আশঙ্কাই ধ্বনিগাম্ভীর্যময় তৎসম শব্দ বিন্যাসের দিকে অত্যধিক মনোযোগের কারণ। কিন্তু চতুর্থ সর্গে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দকে স্বাভাবিক-ভাবেই চরম রমনীয়তাগুণসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। ফলে এমনকি গ্রাম্য বাঙলা শব্দ ব্যবহারেও কবির আর দ্বিধা নাই। মানবিক অনুভূতির সূক্ষ্ম ও গভীর স্তর, মেয়েলি কথোপকথনের স্বচ্ছন্দ ঢঙ সবই এখানে সহজভাবে ফুটাইয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। এই সর্গে সীতার উক্তিতে পঞ্চবটী বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা, বা সীতার বিরহতাপিত মনোভাবের প্রকাশ—গীতিকাব্যের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে মণ্ডিত। ছন্দ ও ভাষার এই কবিত্ব মাধুর্যের জন্য চতুর্থ সর্গটি কবি বর্জন করিতে চান নাই। দ্বিতীয়তঃ, চরিত্রের কথা। সীতা এবং সরমার সংলাপধারার মাঝ দিয়া এই যে দুটি দুঃখিনী নারীর চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহার আকর্ষণও কম নয়। স্বকৃত কোনো অপরাধে নয়, বাহির হইতে ঘনাইয়া

আসা দুর্বিপাকে সীতা চরম লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। পূর্বস্মৃতি এবং বর্তমান দুর্দশার মিশ্র আবেগে সীতার প্রতিটি উক্তি মর্মস্পর্শী। এত দুঃখের মধ্যেও কাহারও প্রতি, এমন কি রাবণের প্রতিও তাহার কোনো অভিযোগ নাই। দুঃখ বহনের শক্তিতে, অপার ক্ষমতাশীলতায় এ চরিত্র অবিস্মরণীয় এবং এ চরিত্র মধুসূদনের নতুন সৃষ্টি। অন্যদিকে সরমার মধ্যে যে শ্রদ্ধাপরায়ণতা, সহানুভূতি, পরদুঃখকাতরতা প্রমূর্ত হইয়াছে—তাহাও ভুলিতে পারা যায় না। তাই বলিতে হয় মেঘনাদবধ কাব্যের সামগ্রিক পরিকল্পনার দিক হইলেও কাব্য-সৌন্দর্যে এবং চরিত্র চিত্রণের নৈপুণ্যের জন্য চতুর্থ সর্গটির একটি নিজস্ব মূল্য আছে। এই মূল্যের জন্যই কবি সর্গটি বর্জন করিতে পারেন নাই। আমরাও বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রবল যুক্তি থাকা সত্ত্বেও বর্জন করিতে পারি না।

[ষোল] মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ অবলম্বনে সীতা চরিত্রটির পরিচয় দাও।

অথবা,

মেঘনাদবধ কাব্যের অপর নারী চরিত্রগুলির সহিত তুলনায় সীতা চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ কর।

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান নারী চরিত্রগুলির অন্যতম সীতা। সীতা এ কাব্যের নায়িকা নয়, মূল কাহিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ কোনো সম্পর্কও নাই। মধুসূদন যে জীবনভাবনা এবং যে আধুনিক মূল্যবোধ পরিস্ফুট করিবার জন্য মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সীতা চরিত্র তাহার পক্ষে বিপরীতধর্মী—এমন কথাও বলা যাইতে পারে। তবুও কেন সীতা চরিত্র এ কাব্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, তাহা অপর নারী চরিত্রগুলির সহিত তুলনা করিলে পরিস্ফুট হইবে।

এ কাব্যের অপর নারী চরিত্রগুলির মধ্যে প্রথমেই মনে আসে প্রমীলার কথা। স্বর্গ এবং পৃথিবীর সকল শক্তির প্রতিস্পর্ধী বীর মেঘনাদের যোগ্য পত্নী প্রমীলা। মেঘনাদ ও প্রমীলার দাম্পত্য সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা স্বীকৃতির উপরেই নির্ভর করিয়াছে। আনুষ্ঠানিক বিবাহবন্ধন বা প্রথানুগত দাম্পত্যনীতির পরিবর্তে এই শৌর্য, বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বের সমভিত্তিতে রচিত, ইহাদের দাম্পত্য সম্পর্ক এক আধুনিক জীবন ভাবনার পরিচায়ক।

প্রমীলা আমাদের সমাজের আত্মমর্যাদাহীন নারীর সর্বতোভাবে পতি-নির্ভরতা নীতির এক মূর্ত প্রতিবাদ। এ চরিত্রে কবির নতুন জীবনদৃষ্টিই জয়যুক্ত হইয়াছে। ভিন্নভাবে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রেও প্রখর নারী ব্যক্তিত্বের আর একরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। যে কথা রাবণকে বলিতে আর কেহ সাহস পায় নাই, একমাত্র চিত্রাঙ্গদাই সেই অভিযোগ উচ্চারণ করিয়াছে। লঙ্কার দুর্বিপাকের জন্য সে স্পষ্টভাষায় সর্বসমক্ষে রাবণকে দায়ী করিয়াছে। এই দুটি চরিত্র মুখ্যতঃ মধুসূদনের আধুনিক মানসিকতার স্বরূপটি স্পষ্ট করিয়া তোলে। আমরা বুঝিতে পারি, প্রেমে বা অপ্রেমে ব্যক্তিত্বের বিনাশ মধুসূদনের অভিপ্রেত জীবনাদর্শ নয়। প্রমীলা নিজের ব্যক্তিত্বের শক্তিতে সমৃদ্ধ, প্রেম তাহার সেই ব্যক্তিত্বশক্তি আশ্রয়ে পূর্ণ শোভায় এবং সৌন্দর্য বিকশিত। অন্যপক্ষে চিত্রাঙ্গদা স্পষ্টতঃই স্বামী প্রেম হইতে বঞ্চিত। কিন্তু সেই উপেক্ষা বা অমর্যাদা সে গ্রাহ্য করে না। সর্বশক্তিময় যে স্বামী তাহাকে জীবনে উপযুক্ত মর্যাদা দেয় নাই, তাহার প্রতি চিত্রাঙ্গদা অক্ষমা গোপন করিতে পারে না। এই প্রখর অক্ষমাও একভাবে নারী ব্যক্তিত্বের দৃপ্ত শক্তিকেই প্রকাশ করে। অর্থাৎ মধুসূদনের দৃষ্টিতে প্রেম বড়ো কথা নয় বড়ো কথা নারীর ব্যক্তিত্ব শক্তি। এই ব্যক্তির স্বকীয় মর্যাদা স্বকৃতিই আধুনিক মানসিকতার একটা বড়ো লক্ষণ।

মধুসূদনের এই জীবনবাদ সম্পর্কে তৃতীয় সর্গ পর্যন্ত যে ধারণা গড়িয়া ওঠে তাহার ফলেই চতুর্থ সর্গে আমাদের বিচারবুদ্ধি অকস্মাৎ সংশয়ের সম্মুখীন হয়। এতক্ষণে আমরা যেন সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন ধরনের মানুষের সামনে আসিয়া দাঁড়াই। (অশোককাননের পরিবেশটাই স্বতন্ত্র। তৃতীয় সর্গ জুড়িয়া প্রমীলার যুদ্ধায়োজন এবং রামচন্দ্রকে অভিভূত করিয়া সগৌরবে লঙ্কায় প্রবেশের সেই কলকোলাহলের দূরতম রেশটুকুও অশোককাননের অব্যাহত বিষণ্ণ শান্তি ক্ষুণ্ণ করে নাই। (ভাবা ও ছন্দের গীতিময় গুঞ্জরণে এই সর্গের সূচনা হইতেই কারুণ্য সঞ্চারিত হইতে থাকে। কবি এই পরিবেশে উপস্থাপন করেন বিষাদমূর্তি সীতাকে। খনিগর্ভের অন্ধকারের রত্নের মতো সীতা এই অন্ধকার অরণ্যে একাকিনী। স্মৃতি-বেদনার ভারে অবনতমুখী।) প্রথম হইতেই প্রমীলা বা চিত্রাঙ্গদার সহিত তাহার ভিন্নতা ধরা যায়। চিত্রাঙ্গদাকেও আমরা নিদারুণ শোকাহত অবস্থাতেই দেখিয়াছি। কিন্তু শোক সেই রাজ্ঞীর

তেজস্বিতা আবৃত করে নাই। রাক্ষসপুরীতে সীতার একমাত্র সহধর্মী সরমা। পরম সহানুভূতি ভরে সে এই দুঃখিনীর একাকীত্বের শূন্যতা দূর করিতে চেষ্টা করে। উভয়ের কথোপকথনের সূত্রে সীতার স্মৃতিকথার পটে চরিত্রটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠে।

সীতার আভরণহীন অঙ্গের দিকে চাহিয়া সরমা রাবণকে ধিক্কার দিতেই সীতা বলিয়া ওঠে, রাবণের কোনো দোষ নাই। ঠিকই, রাবণ তাহার অলংকার হরণ করে নাই, অনুসন্ধানকারীদের সুবিধার জন্য সীতা নিজেই পথে পথে সব অলংকার ছড়াইয়া আসিয়াছে। কিন্তু রাবণ যাহা করিয়াছে, তাহার জন্যও সীতা কোনো অভিযোগ করে না। পৃথিবীর কাহারো বিরুদ্ধে তাহার কোনো ক্ষোভ নাই, প্রতিবাদ নাই, সব দুর্দশাকে সে নিজের ভাগ্য মনে করিয়া দুঃখ বহন করিতেছে। নীরবে দুঃখ বহনের অপরিসীম শক্তিতে বিস্ময় জাগানো এই চরিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সত্যই মনে হয়, "মধুসূদন, পুরুষের পৌরুষ ও মানুষের মনুষ্যত্ব গৌরব সম্বন্ধে যে ভাবের ভাবুক হউন—মাতৃতন্ত্ররসের মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই ; আমাদের ঘরের সেই নারীমূর্তি, সেই সর্বংসহা ধরিত্রী কন্যা—সেই আত্মমুগ্ধা, পরগতপ্রাণা, স্বার্থে দুর্বলা, ত্যাগে মহাবীর্যবতী মানবী-রূপিণী দেবীর মহিমা কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারেন নাই।" প্রমীলা বা চিত্রাঙ্গদার নারী চরিত্রের যে নূতন আদর্শ আছে সীতা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। আবাহমান বাঙলার সমাজ-সংসারে নীরবে সকল ভার বহন করিয়া চলা, অথচ চির অক্ষুব্ধ, চিরক্ষমাময়ী নারীর যে দৃষ্টান্ত আমাদের চিরদিনের চেনা, সীতা সেই ধাতুতেই গঠিত। বলা যাইতে পারে, আপন অন্তরের সকল বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া মধুসূদন এই একবার দেশজ ধ্যান-ধারণায় এক বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন ; সেই বিগ্রহ, সেই সীতাকে সমস্ত দিয়া অর্চনা করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রেত জীবনধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন জানিয়াও আপন হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেরণাকে উপেক্ষা করেন নাই। সীতা তাই মেঘনাদবধ কাব্যের অপর নারী চরিত্রগুলির পাশে স্বতন্ত্র মহিমায় বিরাজিত।

সীতা চরিত্র মধুসূদন প্রধানতঃ সীতার উক্তির মাধ্যমেই পরিস্ফুট করিয়াছেন। মাঝে মাঝে সরমার প্রশস্তিবাচন এবং কবির উপমাপ্রয়োগ

চরিত্রটির মানসিক পরিমণ্ডল পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বন্দিনী সীতা সরমার কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্ত পূর্বাস্মৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা এখন পুঙ্খানুপুঙ্খ যে দৃশ্যগুলি চলচ্ছবির মতো আমাদের দৃষ্টির সামনে ভাসিয়া ওঠে। রাজপ্রাসাদের বিলসবৈভব ত্যাগ করিয়া রাজার কন্তা, রাজকুলবধূ সীতাকে বনে আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই বনবাস এক দিনের জন্যও নিরানন্দ মনে হয় নাই। এই পঞ্চবটী বনের বর্ণনায় কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সহিত মানবিক অনুভূতির অপূর্ব-সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। প্রকৃতিকে এমনভাবে মানবিক অনুভূতির সহিত মিলিত করিয়া দেখা আমাদের কবিতায় সম্পূর্ণ নূতন। বন্ত প্রাণীদের সহিত, তরুলতার সহিত সীতার আত্মীয় সম্পর্কের বিবরণগুলি কাব্যগুণ সমৃদ্ধ সুন্দর রচনা। ইহার পরে একে একে আসিয়াছে শূর্পণখা, স্বর্ণমৃগ ইত্যাদি প্রসঙ্গ। রাবণ কর্তৃক সীতাকে অপহরণের ঘটনা এবং জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধের বিবরণে কবি বাল্মীকির বর্ণনা অনুসরণ করিলেও সীতার আত্মগ্লানি এবং রামচন্দ্রের জন্ত দুঃসহ বিরহবোধের মিশ্রণে এইসব পরিজ্ঞাত ঘটনার বর্ণনাও নূতন স্বাদসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কোনো বর্ণনাই এখানে নিছক ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা নয়। সব ঘটনা বিবৃত হইয়াছে সীতার স্মৃতিসূত্রে এবং সব বর্ণনার মধ্যেই মিশিয়া আছে সীতার বিরহ তাপিত হৃদয়ের আর্তি। তাই ক্ষুদ্র বৃহৎ সব ঘটনা সীতার মনকেই পরিস্ফুট করে। কখনো তাহার উচ্ছলতা, কখনো প্রীতিরস নিমগ্নতা, কখনো আশঙ্কাব্যাকুলতা এবং অসহায়তা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কিছুই বাস্তব ঘটনার তাৎক্ষণিক তীব্রতা লইয়া দেখা দেয় না। কারণ এসব ঘটনা ঘটিয়াছে বহুপূর্বে। তাই বহুবিচিত্র অনুভূতির সমাবেশ সত্বেও সবকিছু ছাপাইয়া প্রধান হইয়া ওঠে স্মৃতিবেদনার রস।

মধুসূদনের সীতা প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধা, স্বাভাবিক প্রীতিপরায়ণা, ক্ষমা এবং সহনশীলতায় অক্ষুব্ধ। বাহিরের শত দুঃখ তাহার অন্তরের ধৈর্য এবং স্নিগ্ধতা আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। এত নৈরাশ্যের মধ্যেও তাহার হৃদয়ের মধ্যে কোথাও একটা ভরসার অবলম্বন আছে। তাহার একাগ্র ভালোবাসা ব্যর্থ হইবে না, রামচন্দ্রের সহিত এ বিচ্ছেদ কখনো চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কবি স্বপ্নবৃত্তান্তের মাধ্যমে সীতার এই প্রত্যয়টুকু সুকৌশলে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের অপর কৃতিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু চতুর্থ সর্গের কাব্যসৌন্দর্য এবং চরিত্র সৃষ্টি নৈপুণ্যের জন্ম মধুসূদন চিরস্থায়ী কবিকীর্তি অর্জন করিয়াছেন বলা যায়।

৩। [সংক্ষেপ] মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ অবলম্বনে সরমা চরিত্রটির পরিচয় দাও।

উত্তর। বিভীষণ-পত্নী সরমা এ কাব্যের একটি গৌণ চরিত্র। সীতা চরিত্র পরিস্ফুট করিবার জন্যই কবি এই চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনের দিক হইতে যতোই গৌণ হোক, সেই সীমার মধ্যে কবি চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ করিয়াই গড়িয়াছেন। তাহার প্রতি কোনো অবিচার করেন নাই।

অশোককাননী বন্দিনী সীতাকে সর্বদা পাহাড়া দেয় দুরন্ত চেড়ীবৃন্দ। আগামীকাল ইন্দ্রজিৎ সেনাপতিরূপে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। লঙ্কাবাসীর নিশ্চিত ধারণা এবারে রামচন্দ্র পরাভূত ও নিহত হইবে। তাই শোকগ্রস্ত লঙ্কাপুরীতে আবার আনন্দ উৎসব শুরু হইয়াছে। কৌতূহলী চেড়ীর দল সীতাকে একাকী রাখিয়া সেই উৎসবে যোগ দিতে গিয়াছে। সরমা এই সুযোগে সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। কৌটায় ভরিয়া আনিয়াছে সিঁদুর। বিবাহিতা নারী সীতা সিঁদুর পরিতে পায় না। তাহাকে সিঁদুর পরাইয়া সরমা তৃপ্ত হয়, পুণ্য অর্জন করে। সিঁদুর পরানোর পরে সরমা প্রণাম করিয়া সীতার পায়ের কাছে বসিল। এখানে কবি লিখিয়াছেন,

'আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন, জ্বলিল, উজ্জলি
দশ দিশ।'

এই একটি উপমায় কবি সরমার শ্রী ও সৌন্দর্য যেমন পরিস্ফুট করিয়াছেন তেমনি এই দুই নারীর পবিত্র সম্পর্ক আভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন।

সীতা-সরমার কথোপকথনে যে অন্তরঙ্গতা এবং পারস্পরিক সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাহির হইতে আরোপিত নয়। কাব্য কাহিনার মধ্যেই এই স্নিগ্ধ সম্পর্কের মূল্য আছে। বিভীষণ রাবণের কার্যাবলী সমর্থন করিতে পারে নাই, সে রামচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। স্বভাবতঃই বিভীষণের এ আচরণ সমস্ত লঙ্কাবাসীর চোখে দেশদ্রোহিতা রূপে পরিগণিত।

রাজ পরিবারের মধ্যে সরমার অবস্থাটাও আমরা সহজেই কল্পনা করিতে পারি। তাহাকে উপেক্ষা এবং বিরূপতা সহ্য করিয়া বাস করিতে হয়। এখন লঙ্কায় একমাত্র সীতার কাছে আসিয়াই সরমা মনের শান্তি পায়। বিভীষণ যেমন রামচন্দ্রের অনুগত, সরমাও সেইরূপ সীতার অনুগত। চতুর্থ সর্গে কবি সীতা-সরমা সংবাদ রচনা করিয়াছেন এই ভিত্তির উপরে নির্ভর করিয়া।

সরমা কোথাও নিজের কথা বলিবার সুযোগ পায় নাই। কবি তাহার মুখে উচ্চারিত প্রশ্নে প্রশ্নে সীতার স্মৃতির জগৎ উন্মোচিত করিয়াছেন। সরমা এখানে মুখ্যতঃ জিজ্ঞাসু এবং শ্রদ্ধাপরায়ণা শ্রোতা মাত্র। *কিন্তু তাহার প্রশ্নের ভঙ্গিতে এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে চরিত্রটির একটি স্পষ্ট রূপ ফুটিয়া ওঠে। সীতার প্রতি আচরিত অন্যায়ে সে ক্ষুব্ধ, ক্ষোভ আরও বেশি এই কারণে সে নিজে ওই রাক্ষসকুলের বধূ। তাই তাহার প্রতিটি কথায় আছে কুণ্ঠা। সীতার জীবনের বিচিত্র দুঃখময় অভিজ্ঞতার কথা সে জানে। এই দুঃখিনীর জন্যই এতবড় একটা যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতেছে, অজস্র রক্তপাত ঘটিতেছে। সীতা তাই সরমার দৃষ্টিতে এক বিস্ময়কর নারী। সে সীতার সান্নিধ্যলাভের সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করে। পূর্বস্মৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া সীতা বারবার মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। এইসব সময়ে সরমার উৎকণ্ঠা এবং তাহারই কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে গিয়া সীতা কষ্ট পাইতেছে অনুভব করিয়া লজ্জা ও আত্মগ্লানির মনোভাব তাহার চরিত্রের কোমল ও বিনয়ী দিক প্রকাশ করে। সীতা বন্দিনী জীবনে একমাত্র সরমার ব্যবহারেই আন্তরিক সহানুভূতির স্পর্শ লাভ করিয়াছে। এই সহানুভূতির জন্য সীতা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে :

"সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম।"

সরমা এ উপমার যোগ্য চরিত্র। নিজেকে প্রকাশ করিবার যে সামান্য সুযোগ সে পাইয়াছে তাহার মধ্যেই আপন অন্তঃকরণের করুণা এবং সহানুভূতি নিঃশেষে প্রকাশ করিয়াছে।

আর একটি কথা এখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। মেঘনাদবধ কাব্যের

কাহিনী অযোধ্যা ও লঙ্কার পরিবেশের সহিত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সংলগ্ন হইলেও বিশেষভাবে সীতা ও সরমার আচরণে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে এবং এই সর্গের উপমাগুলিতে বিশেষভাবে বাঙালী ঘরোয়া জীবনের ছবিই ভাসিয়া ওঠে। সরমাকে কোনো সুদূর লঙ্কার রাক্ষস কুলবধূ মনে হয় না, মনে হয় বাঙালী সংসারের পরিবেশ হইতে আসা এক গৃহবধূ। বাঙালী সধবা নারীই সধবাকে সিঁদুর পরাইয়া পুণ্যলাভ হইল অনুভব করে। সরমার চরিত্রে স্নিগ্ধতা, তাহার ন্যায়নীতি ধর্মাধর্মবোধ সবই বাঙালী নারীর অনুরূপ। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে কবি দেশের মাটি স্পর্শ করিয়াছেন। সেই মৃত্তিকার কন্যারূপেই তিনি সরমা চরিত্র কল্পনা করিয়াছেন।

এই কাব্যের পক্ষে সরমা চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে কোনো পৃথক আলোচনার অবকাশ নাই। গোটা চতুর্থ সর্গটাই কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য নয়। বরং বলা যায়, চতুর্থ সর্গ এ কাব্যে কবির মূল অভিপ্রায়ের বিরোধী। তবে চতুর্থ সর্গের স্বতন্ত্র কাব্যমূল্য যদি স্বীকার করা যায়, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে সরমার উপস্থিতি ভিন্ন, তাহার কৌতূহলী প্রশ্নধারা ভিন্ন এমনভাবে সীতার স্মৃতিকথা বিবৃত করা সম্ভব হইত না। তাই গোটা মেঘনাদবধ কাব্যের পক্ষে সরমা চরিত্রের প্রয়োজনীয়তার আলোচনায় প্রবেশ না করিয়াও বলা যায়, চতুর্থ সর্গের সীমার মধ্যে আঙ্গিকগত এবং কাহিনীর প্রয়োজনগত দিক হইতে সরমা অপরিহার্য এবং অত্যাবশ্যক চরিত্র। সেই সীতার স্মৃতি কাহিনীর সূত্রধারিণী।

প্রয়োগ-রীতি উন্নত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা কেরীর অকৃত্রিম নিষ্ঠারই পরিচায়ক। কেরীই ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের প্রধান নায়ক, কিছুদিন পরে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়া ওঠে। অবশ্য শ্রীরামপুরের সহিত কেরীর সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় নাই এবং ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থাবলী শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্র হইতেই প্রকাশিত হইত। শুধু পাঠ্যপুস্তকই নয়, মিশনের মুদ্রাযন্ত্র হইতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতও মুদ্রিত হইয়াছিল। সুতরাং বাংলা গদ্যের সূচনা এবং মুদ্রণশিল্পের সহায়তা দ্বারা জনসমাজে নতুন সাহিত্য-প্রচারের দিক হইতে শ্রীরামপুর মিশনের দান অপরিসীম।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশ। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা এখান হইতে প্রকাশিত হয়। 'দিগ্‌দর্শন' বাংলা ভাষার প্রথম মাসিক পত্র। জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। সাময়িকপত্রগুলি অবলম্বন করিয়াই বাংলা গদ্যভাষা বিকশিত হইয়াছে এবং ব্যাপটিস্ট মিশন এইদিক হইতেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশের একমাসের মধ্যে মিশন 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সাপ্তাহিক পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। 'সমাচার দর্পণ' প্রতি শনিবারে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকায় সরকারী আইন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিষয়ে যাবতীয় সংবাদ এবং সমসাময়িক প্রধান ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হইত। মাঝে মাঝে প্রকাশ বন্ধ থাকিলেও প্রায় ৩৫ বৎসর পর্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশের সামাজিক ইতিহাসের বহু মূল্যবান তথ্য এই পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্য বহু বিচিত্র শাখায় প্রবাহিত হইয়াছে, সেই সমৃদ্ধি বাঙালী লেখকদের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের গদ্যশাখার সূচনা, সাময়িক পত্রের প্রবর্তন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সাহিত্যকে মুদ্রণশিল্পের সহায়তা দান—এই তিনটি দিক হইতে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের

প্রতিভাসম্পন্ন ইংরেজ কর্মীদের নাম বাংলা সহিত্যের আধুনিক পর্বের ইতিহাসের সহিত চিরদিনের মত যুক্ত হইয়া আছে।

[দুই] বাংলা গদ্য-সাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের রচনারীতি ও প্রধান গ্রন্থগুলির পরিচয় দাও।

উত্তর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন স্থায়িভাবে শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইল তখন স্বভাবতই কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তখন সরকারী কাজ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত ইংরাজ এদেশে আসিতেন, এখানকার ভাষা না জানায় সুষ্ঠুভাবে কার্যনির্বাহে তাঁহারা অসুবিধা বোধ করিতেন। স্থানীয় সমস্যা সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য এদেশের ভাষা-শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিল। লর্ড ওয়েলেসলীর উদ্যোগে সিভিলিয়নদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে এই প্রতিষ্ঠানে আরবী, ফারসী এবং হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যোগ্য অধ্যাপকের অভাবে বাংলা-বিভাগের কাজ আরম্ভ করিতে কিছু দেরি হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় উইলিয়ম কেরীর প্রতি লর্ড ওয়েলেসলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারই নির্দেশে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদের জন্য কেরীই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। শ্রীরামপুরে কেরী সম্পূর্ণভাবে ধর্মপ্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন, নতুন পদ গ্রহণ করিয়া তিনি আপন প্রতিভার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পাইলেন। তাঁহারই নায়কত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকবৃন্দ বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। কেরী বাংলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া গ্রন্থরচনা এবং অধ্যাপনার জন্য আটজন অধ্যাপক নিয়োগ করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রমানাথ বাচস্পতি পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন, আর সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হইলেন শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দ চন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু। শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কেরী পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করিবার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপকদের সাহায্যে গ্রন্থ-প্রণয়নে উদ্যোগী হইলেন

কলেজ কর্তৃপক্ষ পাঠ্যপুস্তক রচনায় উৎসাহদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন, এবং কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য মুদ্রিত পুস্তকের অনেকগুলি খণ্ড ক্রয় করিতেন। এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকরূপে যে গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩); গোলকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২), চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫); রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৪); হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫) এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পদার্থ কৌমুদী' (১৮২১)। কেরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮২২)। এই গ্রন্থগুলিতেই বাংলা গদ্যের বনিয়াদ প্রস্তুত হইয়াছিল বলা যায়। বিভিন্ন লেখক আপন আপন শিক্ষাদীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থরচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, বাংলা গদ্যের কোন আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত, সুতরাং ব্যবহার এবং বাক্যের প্রয়োগরীতির দিক হইতে অধিকাংশ রচনাই সংস্কৃত-নির্ভর। সেইযুগে গদ্যরচনায় যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের সম্মুখে কোন আদর্শ না থাকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে গদ্যের একটি নির্ভরযোগ্য কাঠামো প্রস্তুত করিয়া নেওয়া ভিন্ন কোন উপায় ছিল না। সংস্কৃত এবং ইংরেজি গদ্যের মধ্যে সংস্কৃতের অনুসরণই ইহাদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু সংস্কৃতনির্ভর বাংলা গদ্যের সহিত প্রচলিত কথ্য বাংলার সামঞ্জস্যবিধান একটি জটিল সমস্যা। ভাষায় গতিসঞ্চার এবং সহজবোধ্যতার জন্য লোকপ্রচলিত ভাষার উপকরণ ব্যবহার অত্যাবশ্যক। কথ্যভাষার প্রাঞ্জলতা ও সংস্কৃতের শব্দসম্পদের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগে পরিচ্ছন্ন গদ্যনির্মাণের মতো প্রতিভা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের ছিল না, কিন্তু তাঁহাদের রচনায় বাংলা গদ্যের মূল সমস্যাগুলি সঠিকভাবে ধরা পড়িয়াছিল এবং গদ্যের একটি নির্ভরযোগ্য কাঠামো এই লেখকবৃন্দ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার বিষয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌলিক নয়, সংস্কৃত বা আরবী-ফারসী হইতে সংগৃহীত। এই অনুবাদমূলক রচনায় স্বাভাবিকভাবেই মূল গ্রন্থের ভাষারীতির প্রভাব দেখা যায়। আরবী-ফারসী গ্রন্থের উপর নির্ভর

করিয়া যাঁহারা পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের রচনায় আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার সুপ্রচুর।

ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থাবলীর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া সুকুমার সেন লিখিয়াছেন : "এই সকল গ্রন্থে রচনারীতির প্রধান দোষ হইতেছে (১) দূরান্বয়, (২) Parenthesis-এর অত্যধিক ব্যবহার এবং (৩) ছেদচিহ্নের অল্পতা। মধ্যে মধ্যে আভিধানিক শব্দের প্রয়োগও রচনারীতির সামঞ্জস্যের হানি করিয়াছে। তখনকার দিনের সাধুভাষার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লক্ষণীয় হইতেছে এই আটটি —(১) একাধিক বহুবচন-বিভক্তির ব্যবহার, যেমন স্ত্রীগণেরা, ভৃত্যবর্গেরা, পঞ্চজন যক্ষেরা, ইত্যাদি ; (২) তৃতীয়া—সপ্তমীতে 'এতে' বিভক্তির ব্যবহার, যেমন—হাতাতে, ঘরেতে ইত্যাদি ; (৩) ক্রিয়াযোগে চতুর্থীর স্থানে -কে বা -রে বিভক্তির ব্যবহার, যেমন, বিপরীত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল, আমি প্রসন্ন আছি তোকে, রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া, আমারও উচিত নহে এখানে থাকিতে ইত্যাদি ; (৪) তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে 'করণক' শব্দের প্রয়োগ, যেমন, ঐরাবত করণক পর্বত বিদার করিয়া দিলে, হংস হত হইল, পথিক করণক ইত্যাদি ; (৫) ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত বহুবচনের -দিগ বিভক্তির যোগ যেমন—তাহার দিগের, রাজার দিগকে, ইত্যাদি ; (৬) শতৃপ্রত্যয়জাত শব্দের অসমাপিকা অর্থে প্রয়োগ, যেমন—চরত, আচরত, হওত, ইত্যাদি ; (৭) সামান্য অথবা নিত্যবৃত্ত অতীতের স্থানে অসম্পন্ন বর্তমান কালের ব্যবহার, যেমন—পথিক প্রকাশ করিয়া কহিতেছে ইত্যাদি ; (৮) -অন এবং -ইবা প্রত্যয়ান্ত শব্দে সপ্তমী বিভক্তি যোগ করিয়া তাহা -ইলে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার অর্থে ব্যবহার, যেমন—হইবতে, আইসেন, পাওনেতে ইত্যাদি।"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তিনিই প্রথম বাঙালী লেখক। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রামরাম বসুর মৌলিক রচনা, অনুবাদ নয়। রামরাম বসু সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন না, ফলে তাঁহার ভাষা সংস্কৃতপ্রভাবমুক্ত। আরবী-ফারসী শব্দের সুপ্রযুক্ত-ব্যবহারে তাঁহার ভাষা সমৃদ্ধ। সমসাময়িক অন্যান্য লেখকের তুলনায় রামরাম বসুর গদ্য অনেক বেশী প্রাঞ্জল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন

সবচেয়ে খ্যাতিমান এবং প্রভাবশালী। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁহাকে 'Colossus of Literature' বলিয়াছেন। পাণ্ডিত্যে এবং প্রতিভায় তাঁহার তুল্য লেখক এই সময়ে আর কেহ ছিলেন না। তিনি কেরীর অধীনে কাজ করিতেন; কিন্তু কেরী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নিকট নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করিতেন। হিন্দুশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সমাজে অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীতে গদ্য ভাষা লইয়া নিরন্তর পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। "বাংলা গদ্যের যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থা, তখনই তিনি বিভিন্ন গদ্যরীতি লইয়া পরীক্ষা চালাইয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তক বিভিন্ন রীতিতে রচনা করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। ঐ শিশুভাষার ভবিষ্যৎ বিচিত্র সম্ভাবনার কথা সর্বপ্রথম তাঁহারাই মানস-নেত্রে ধরা পড়িয়াছিল এবং কোন প্রাচীন আদর্শের অভাবে তিনি নানা আদর্শ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় জ্ঞানী মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত-রীতিকে যতদূর সম্ভব প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু খাঁটি বাংলা-রীতিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নাই।"

উইলিয়ম কেরী অপরিসীম নিষ্ঠার সহিত যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা যেসব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সাহিত্যিক মূল্য না থাকিলেও বাংলা গদ্যের কাঠামো এই লেখকদের হাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে প্রতিভাবান লেখকদের দ্বারা এইজন্যই সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

[তিন] "রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জমান দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন।" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনের গদ্য রচনাগুলির স্থান বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্রে ভারতীয় ইতিহাস এক নূতন যুগে পদার্পণ করিয়াছে এই সত্য আমাদের দেশে রামমোহনই সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। আধুনিক য়ুরোপের নূতন সভ্যতার আলোক বহন করিয়া ইংরেজ জাতি যখন বাংলাদেশের মাটিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিল, তখন তাহাদের বাহিরের শক্তির সমারোহ অনেককেই অভিভূত করিয়াছিল। রাজপ্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষায় ইংরেজ বণিক-সরকারের দ্বারে

ভিক্ষাপাত্র লইয়া যাহারা উপস্থিত হইয়াছিল—তাহাদের দৃষ্টিতে ইংরেজ জাতির ঐশ্বর্য এবং শক্তির দিকটাই ছিল বড়। একমাত্র রামমোহন বুঝিয়াছিলেন রাজবেশটাই ইংরেজ জাতির একমাত্র পরিচয় নয়, তাহারা এক নূতন জীবনবাদের প্রতিনিধিরূপে, য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে এদেশে আসিয়াছে। ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে কেহ রাজপ্রসাদের লোভে দাসখত লিখিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে, কেহবা প্রাচীন ভারতের প্রথাবদ্ধ সংস্কারগুলিকেই একমাত্র সত্য বিবেচনা করিয়া ইংরেজ জাতিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। রামমোহন ইতিহাসের গতিধারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের চিত্ত তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য লইয়া যে সীমাহীন জড়ত্বে অভিভূত, ইংরেজ জাতির চিত্তের স্পর্শ সেই ভারতবর্ষকে জাগ্রত করিয়া বিশ্বের সহিত সসম্মানে মিলিত হইবার উপায় করিয়া দিবে। তিনি স্বদেশকে বিশ্বের পটভূমিতে দেখিয়াছিলেন, যুগযুগান্তের বিচ্ছিন্নতার অবসানে ভারতবর্ষ বিশ্বের সহিত মিলিত হইয়া নূতন যুগের আলোকে জাগ্রত হইয়া উঠিবে এই প্রত্যয় ছিল রামমোহনের সমস্ত চিন্তা এবং কর্মের মূলে।

স্বভাবতই আধুনিকতার আলোকে দীপ্ত রামমোহনের মন কোন অন্ধ সংস্কারকেই প্রশ্রয় দেয় নাই। প্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্যের নিহিত সারবস্তু তিনি বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা উদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন, তাহার সহিত মিলিত করিতে চাহিয়াছেন আধুনিক য়ুরোপের নবজীবনবাদের সত্য। রামমোহন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের মিলনের যে ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসের ইঙ্গিত তিনি সঠিকভাবে অনুভব করিয়াছিলেন এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতি পূর্ণ আস্থা লইয়া তিনি পথনির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই নায়কের ভূমিকা কখনও বিঘ্ন-রহিত ছিল না। পদে পদে বিরুদ্ধ-শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়াই তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কোন সংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসের মোহে তাঁহার চিন্তা কখনও আচ্ছন্ন হয় নাই। প্রখর বুদ্ধিই ছিল তাঁহার একমাত্র অস্ত্র, অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিই ছিল তাঁহার একমাত্র অবলম্বন।

রামমোহনের সমগ্র রচনায় একটি প্রখর যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাবতঃই যুক্তির পথ যিনি অনুসরণ করেন যুক্তির ভাষা বা language

of reason হিসাবে গদ্যই তাঁহার আত্মপ্রকাশের বাহন। রামমোহন যখন গদ্যে নিজেই বক্তব্য প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হন, তখনও বাংলা গদ্যের কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের চেষ্টায় যে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাতে গদ্যের কোন পরিণত রূপ ফুটিয়া ওঠে নাই। পাঠকসাধারণও গদ্য পাঠ করিতে অভ্যস্ত ছিল না। রামমোহন রায় একদিকে যেমন গদ্যকে সুবিন্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনই পাঠকদের গদ্য-পাঠে অভ্যস্ত করিয়া তুলিবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বেদান্ত-গ্রন্থের ভূমিকায় পাঠকদের গদ্যপাঠের নিয়ম তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই আলোচনা হইতে বোঝা যায় যে, নির্মীয়মান বাংলা গদ্যের সমস্যাগুলি সম্পর্কে রামমোহন পূর্ণসচেতন ছিলেন। ভাষা-নির্মাণে তিনি আপন প্রতিভার শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অগঠিত ভাষায় তিনি যে বিষয়সমূহ উপস্থাপন করিয়াছেন তাহা আদৌ সহজ নহে। পাঠকদের গদ্য-বোধশক্তি নাই, সেইজন্য কোন সহজ বিষয় যেমন-তেমনভাবে পরিবেশন করিয়া পাঠকসাধারণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। তিনি বেদান্তসার ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া এই দুরূহ বিষয় পাঠক-সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছিলেন। "কেবল পণ্ডিতদের নিকট পাণ্ডিত্য করা, জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জন করা, রামমোহন রায়ের ন্যায় পরম বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জন অত্যুচ্চ-শিখর ত্যাগ করিয়া সর্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা সমস্ত মানবসভার মধ্যে পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে বাংলাদেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। নব্যবঙ্গের প্রথম বাঙালী, সর্বসাধারণকে রাজটিকা পরাইয়া দিলেন এবং রাজার বাসের জন্য সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্যে সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন" (রবীন্দ্রনাথ)। রামমোহন যে মহৎ ভাবনার উপরে বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালী জাতিকে দাঁড় করাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই বলেন 'গ্রানিটস্তর'। তিনিই যথার্থভাবে নব্য বাংলার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙালী প্রতিভা উত্তরকালে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে, বিশ্বের সম্মুখে যে সম্পদ লইয়া বাঙালী জাতি সম্মানের আসন দাবি করিবার অধিকার অর্জন করিয়াছে তাহা রামমোহনই সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহনের পূর্বে বাংলা গদ্যে যাহাকিছু রচিত হইয়াছিল তাহা বিদ্যালয়-পাঠ্যগ্রন্থেই নিবদ্ধ ছিল। তিনিই প্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে জীবনের সর্ববিধ প্রয়োজনের ভাষারূপে বাংলা গদ্য ব্যবহার করেন। রামমোহনকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে দুই প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির সহিত। তাঁহার জাগ্রত চিত্ত অনুভব করিয়াছিল স্বদেশের ঐতিহ্যে নিহিত সত্যবস্তু উদ্ধার করা প্রয়োজন। সেই কাজে তিনি যুক্তির দ্বারা প্রাচীন শাস্ত্রের সার উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টায় প্রবল বাধা আসে রক্ষণশীল হিন্দু-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে। অন্যদিকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দুসমাজ-বিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের পক্ষ হইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। স্বভাবতঃই তাঁহার রচনাবলীতে তাই বিচার-বিতর্ক প্রধান। রামমোহন রায়ের গদ্যে বাক্যগুলি পরস্পরের সহিত যুক্তির বন্ধনেই সংবদ্ধ। তাঁহার ভাষা সরস এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন ছিল না, কিন্তু বক্তব্য স্পষ্টভাবে প্রকাশের ক্ষমতায় তাঁহার ভাষা সমসাময়িক রচনার তুলনায় অনেক শক্তিশালী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রামমোহনের ভাষা সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ-ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পরিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" রামমোহনের অনুবাদমূলক দুটি গ্রন্থ 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার অন্যান্য প্রধান পুস্তক-পুস্তিকাগুলির নাম 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকদের সম্বাদ' (১৮১৮), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'ব্রাহ্মণসেবধি ও মিসিনরী সম্বাদ' (১৮২১) এবং 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩)।

প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করিয়া নিজের মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি কয়েকটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামমোহন-সম্পাদিত সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সম্বাদকৌমুদী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামমোহন বাংলা গদ্যে কঠ, তলবকার, মণ্ডুক প্রভৃতি উপনিষদ্‌ অনুবাদ করিয়াছিলেন। সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলির বক্তব্য উপস্থাপনের কাজ তিনিই শুরু করিয়া যান।

[চার] বিদ্যাসাগরের গদ্য-রীতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্বে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল বিভিন্ন লেখক সাময়িক পত্রে এবং বিভিন্ন গ্রন্থে বাংলা গদ্যের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে কোন বক্তব্য প্রকাশের উপযুক্ত শক্তি বাংলা গদ্যে যে বিদ্যাসাগরের পূর্বেই সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামমোহন রায়ের রচনাবলী। বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যথোপযুক্ত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারই একমাত্র উপায়,—একথাও বিদ্যাসাগরের পূর্বেই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্যভাষায় বক্তব্য প্রকাশের ক্ষমতা দেখা দিলেও সেই ভাষায় শিল্পশ্রী ফুটিয়া ওঠে নাই। নিয়মিত যতির দ্বারা বাক্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে ধ্বনিগত সুষমতা এবং ভারসাম্যরক্ষার দ্বারা গদ্যেও যে ছন্দস্পন্দন সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী লেখকেরা সচেতন ছিলেন না। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যভাষাকে শ্রী ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়া যথার্থ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্যনির্দেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রম বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। ……ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না।…বাংলা ভাষাকে পূর্ব-প্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ-যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দ-স্রোত

রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।" বক্তব্য বিষয় যথাযথভাবে প্রকাশের অতিরিক্ত যে সৌন্দর্য তাহাই যথার্থ পরিণত ভাষার লক্ষণ, বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য এই পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচিত হয়। 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রকাশকাল ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। হিন্দী 'বৈতাল-পচ্চিসী' গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে প্রধান—বাংলার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবন চরিত (১৮৪৯), বোধোদয় (১৮৫১), শকুন্তলা (১৮৫৪), কথামালা (১৮৫৬), সীতার বনবাস (১৮৬০), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ও স্বরচিত জীবনী 'বিদ্যাসাগর চরিত্র'। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। এ বিষয়ে তিনি একাধিক প্রবন্ধে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের মতামত খণ্ডন করিয়া নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ এবং নানাবিধ সমাজসংস্কারমূলক বিষয়ে তাঁহার মতামতের জন্য উল্লেখযোগ্য রচনা 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত উচিত কিনা তদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১-৭৩)। বিদ্যাসাগরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫১)। ইহা ভিন্ন তাঁহার সমালোচকদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি বেনামী রচনায় তিনি বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছিলেন, এই জাতীয় রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) এবং 'ব্রজবিলাস'।

বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনার বিষয় ইংরাজী বা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, এইজন্য তাঁহার প্রতিভার মৌলিকত্ব অনেকে স্বীকার করিতে চান না। তাঁহার 'শকুন্তলা'র কাহিনী কালিদাসের নাটক হইতে সংগৃহীত, সীতার বনবাস রচনায় তিনি ভবভূতি এবং বাল্মীকির উপরে নির্ভর করিয়াছেন, 'কথামালা' ঈশপস্ ফেবল অবলম্বনে রচিত—এইরূপে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থগুলির কাহিনীর উৎস কোন না কোন ইংরেজী বা সংস্কৃত গ্রন্থে নির্দেশ করা যায়। কিন্তু মনে রাখা উচিত বিদ্যাসাগর একমাত্র 'মহাভারতের উপক্রমণিকা' অংশের

অনুবাদ ভিন্ন কোন গ্রন্থই মূলের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। বিষয়-বিন্যাসে তিনি স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন এবং চিরায়ত সাহিত্যের কাহিনী তাঁহার রচনায় সম্পূর্ণ নূতন রসমূর্তি লাভ করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা তাই অনুবাদ নয় তাহা নূতন সৃষ্টি। তাঁহার শিল্পশ্রীমণ্ডিত ভাষা যে-কাহিনীকেই অবলম্বন করুক তাহাকে নূতন রূপে রসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের ভাষায় তৎসম শব্দের প্রাচুর্যের জন্য অনেকে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু পণ্ডিতি রীতির রচনার মত তাঁহার রচনায় তৎসম শব্দ কখনো উৎকটভাবে ভাষার গতিশীলতা অবরুদ্ধ করে নাই। তৎসম শব্দের সংযত ব্যবহারের দ্বারা তিনি বাংলা গদ্যের প্রকাশক্ষমতা এবং সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে বিদ্যাসাগর যে একেবারে কথ্যরীতির গদ্যও রচনা করিতে পারিতেন তাহার প্রমাণ তাঁহার ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি। আসলে ভাষার ষ্টাইল ভাববস্তুর নিহিত তাৎপর্যের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। বিদ্যাসাগর সচেতন শিল্পী ছিলেন বলিয়াই বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী ভাষা নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার স্নেহশীল অন্তরের আবেগ একটি ক্ষুদ্র বালিকার মৃত্যুতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' নামক রচনাই সেই উদ্বেল হৃদয়ের অনুভূতি যে ভাষায় কায়া লাভ করিয়াছে—তাহার দৃষ্টান্তে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তিনি বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি যথার্থ-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই যে-কোন প্রয়োজনে এই ভাষাকে ব্যবহার করিতে পারিতেন এবং বিষয় যাহাই হোক তাঁহার সৃজনক্ষম প্রতিভার স্পর্শে সেই ভাষা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইত।

[পাঁচ] বাংলা গদ্যভাষার গঠনে অক্ষয়কুমার দত্তের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আত্মস্থ করার চেষ্টায় এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের আলোচনায় অক্ষয়কুমার বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন, এবং এই পত্রিকাটিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ পর্যন্ত বার বৎসর তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেন। দেবেন্দ্রনাথের সযত্ন পরিচালনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইত,

এমন কি অক্ষয়কুমারের রচনাও প্রথম প্রথম দেবেন্দ্রনাথ সংশোধন করিয়া দিতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের মূলে দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার এবং দেশের বিভিন্ন অংশে যে সব ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তি বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধন। অক্ষকুমারের দ্বারা তাঁহার এই উদ্দেশ্য যে বিশেষ সাধিত হইয়াছিল তাহা বলা চলে না, কারণ অক্ষয়-কুমারের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল কোন ধর্মবিশ্বাসের বিপরীত। দেবেন্দ্রনাথ যেন কতকটা হতাশ হইয়াই তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন: "আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ।" দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক বা না হোক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রধান লেখকরূপে বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব এবং সমাজবিদ্যার চর্চায় অক্ষয়কুমার যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের অপরিসীম সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। মানসিক গঠনের দিক হইতে অক্ষয়কুমার ছিলেন বৈজ্ঞানিক। আবেগ বা অন্ধ বিশ্বাস নহে, কঠিন বুদ্ধির পথে তথ্যপ্রমাণের বিশ্লেষণের দ্বারাই তিনি জগৎ ও জীবনের সত্য উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন। স্বভাবতঃই ভাষাকে প্রসাদগুণমণ্ডিত করিবার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, জ্ঞানের বিষয় সর্বজনবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করার দিকেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। পুঞ্জীভূত তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করিয়া যুক্তির ভিত্তিতে আপন বক্তব্য তিনি উপস্থাপন করেন। বিষয়ের গৌরবেই তাঁহার রচনার গৌরব। অক্ষয়কুমারের যাবতীয় রচনা প্রথমত সাময়িক পত্রের পাঠকদের জন্যই লিখিত হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থগুলির এক একটি অধ্যায় এক একটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের আকারে গঠিত। তাঁহার এই প্রবন্ধাবলীতে তত্ত্বালোচনামূলক প্রবন্ধের চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। আজও বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের নিতান্ত অভাব, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার সাফল্য বিষয়ে তর্ক আজও শোনা যায়। কিন্তু অক্ষয়কুমার সেই যুগে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনায় আশ্চর্য সক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচনার নিদর্শন নিম্নরূপ:

"যদি জগতে কেবল কতকগুলি পরমাণু ও তাহার আকর্ষণ গুণ থাকিত আর তাহার প্রতিবিধানার্থ কোন শক্তি না থাকিত তবে সমুদয় জড় পদার্থ পরস্পর দৃঢ়তর আকৃষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড হইত।

কিন্তু তেজ নামে এক পদার্থ থাকাতে, ঐ প্রকার বিপত্তি ঘটনা নিবারণ হইয়াছে। পরমাণুসকল যেমন আকর্ষণ দ্বারা সংযুক্ত হয়, সেইরূপ তেজ দ্বারা বিযুক্ত অর্থাৎ পরস্পর দূরীভূত হয়। তেজের এই গুণকে বিয়োজন গুণ বলে।"

রামমোহনের রচনার সহিত এই রচনা তুলনা করিলে দেখা যাইবে ছেদচিহ্নহীন সুদীর্ঘ বাক্যের পরিবর্তে অর্থের সুষম প্রকাশের জন্য নিয়মিত ছেদচিহ্নের দ্বারা বাক্যগুলি এখানে সুনিয়ন্ত্রিত এবং অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও সংহত। ক্রিয়াপদের ব্যবহারে বিচিত্রতা দেখা দিয়াছে। "ক্রিয়াপদের যথোচিত প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র" ভাষার পরিণতিরই চিহ্ন। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধে পরিচ্ছন্ন, যুক্তিনিষ্ঠ, ঋজু মননভঙ্গি বিশিষ্ট একটি মনের স্পর্শ পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলাদেশের চিত্ত চিরাভ্যস্ত জড়তা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই নবজাগরণের দিনে আধুনিক প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ বাঙালি-মানস আপনাকে প্রকাশের জন্যই গদ্যভাষা সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। প্রথম যুগ হইতেই গদ্যের প্রধান কাজ ছিল 'শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন' তাহাই মাতৃভাষায় সর্বজনবোধ্য-রূপে দেশের সম্মুখে উপস্থাপন করা। প্রবন্ধ সাহিত্যের এই যুগটিকে বলা যায় 'indispensable age of prose and reason'। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের এই ধারায় অক্ষয়কুমার সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক।

অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটি দুই ভাগে ১৮৫২ এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি জর্জ কুম্ব রচিত 'Constitution of Man' নামক গ্রন্থের উপরে নির্ভর করিয়াছেন, কিন্তু ইহা অনুবাদ গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "ইহা ইংরেজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক, কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এদেশের পরম্পরাগত কুপ্রথাসমুদয় মধ্যে মধ্যে উদাহরণস্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে।"

তাঁহার রচিত 'চারুপাঠ' তিনখণ্ড যথাক্রমে ১৮৫৩, ১৮৫৪ এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ দীর্ঘদিন পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত

হইয়াছে। 'ধর্মনীতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা গ্রন্থ 'পদার্থবিদ্যা' ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অক্ষয়কুমারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা, আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার অদ্বিতীয় গ্রন্থ **ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়**। গ্রন্থটি দুটি ভাগে যথাক্রমে ১৮৭০ এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্মবালম্বী উপাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে উইলসনের লেখা দুটি প্রবন্ধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অক্ষয়কুমার ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের ধর্মমত এবং সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হন। রোগজীর্ণ দেহ লইয়া তিনি এই মহাগ্রন্থ রচনায় যে পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন বাংলাদেশে তাহা সুলভ নয়। "দুই ভাগেরই উপক্রমণিকার অংশ সুদীর্ঘ এবং মূল্যবান। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় মূল আর্য্য (ইউরোপীয়), আর্য্য (ইন্দো-ইরাণীয়) এবং ভারতীয় আর্য্য (বৈদিক এবং সংস্কৃত) ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। ভাষা বিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবাসী কর্তৃক এইই প্রথম। দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় প্রাচীন ভারতীয় অর্থাৎ বৈদিক এবং পৌরাণিক ধর্ম ও দর্শন সাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছে" (সুকুমার সেন)। অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থে ১৮২টি সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী গবেষকদের নিকট হইতে তিনি যে তথ্য পাইয়াছেন তাহা নিজে গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সংশোধন করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। অধিকাংশ সম্প্রদায়ের বিবরণ তাঁহার নিজস্ব গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। বস্তুনিষ্ঠ, বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা-পদ্ধতি অবলম্বনে অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থ রচনায় যে মনীষার পরিচয় দিয়াছেন তাহা আজও বিস্ময় উদ্রেক করে। বস্তুত এই বিষয়ে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থের সহিত তুলনা করা যায়, এমন আর কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই।

ছয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের দান সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। দেবেন্দ্রনাথ বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম যৌবনে তাঁহার অন্তরে তীব্র অধ্যাত্মপিপাসা জাগ্রত হইয়া ওঠায় জাগতিক ভোগবিলাসের আকর্ষণ তাহার নিকট অর্থহীন মনে হইয়াছিল। ঈশ্বরের করুণালাভের জন্য তাঁহার অন্তরের মধ্যে ধ্যানী মানুষটি চিরদিন একাগ্র সাধনায় নিমগ্ন ছিল। সাধকপ্রকৃতি লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,

কিন্তু সংসারের বন্ধন তিনি অস্বীকার করেন নাই। পারিবারিক জীবনে যেমন তিনি গুরুদায়িত্ব বহন করিয়াছেন সমসাময়িক সমাজের প্রতিটি সমস্যা বিষয়েও তাঁহার সমান আগ্রহ ছিল। বালক বয়সে তিনি রামমোহনের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, রামমোহনের জীবন ও সাধনা ছিল তাঁহার আদর্শ। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্যের উন্নয়ন, সর্ববিষয়ে তিনি রামমোহনের চিন্তাধারার অনুবর্তী ছিলেন।

তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্তি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ। এই প্রতিষ্ঠান এবং পত্রিকাটিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপন আদর্শ রূপায়িত করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তিনি পরিচালনা করিতেন এবং নিজে ছিলেন এই পত্রিকায় অন্যতম লেখক। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম, এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর হাতে বাংলা গদ্য এক ক্রান্তি পার হইয়া আসিয়াছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রধান পরিচালকরূপে তিনি বিভিন্ন লেখকের রচনা পরীক্ষা করিয়া, সংশোধন করিয়া রচনার একটি নির্দিষ্ট মান স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথই শৃঙ্খলা আনিয়াছিলেন। নিজের রচনার দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী'র যুগে বাংলা গদ্যের লেখকদের সংঘবদ্ধ করিয়া বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে যেভাবে নায়কত্ব করিয়াছেন তাহার মূল্যও কম নয়। এই কাজের জন্য বাংলা গদ্যের নির্মাতা রূপে তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইবে।

দেবেন্দ্রনাথের নিজের রচনা সংখ্যায় বিপুল নহে, কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই ধর্মবিষয়ক, এমন কি 'আত্মজীবনী'তেও তিনি আপন সাধক জীবনের অভিজ্ঞতাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৎকালীন গদ্য রচনার এক বিপুল অংশই ছিল ধর্মঘটিত বিতর্কমূলক রচনা। দেবেন্দ্রনাথের রচনায় কোন বিরোধী পক্ষের সহিত বিতর্কের উত্তাপ এবং উত্তেজনা কোথাও নাই। ঈশ্বরের অপরিসীম করুণায় বিশ্বাসী আস্তিক দেবেন্দ্রনাথ আপন অন্তরের দৃষ্টি দ্বারা জগতের তুচ্ছ

ও মহৎ সকল কিছুর মধ্যেই এক জগৎপিতার কল্যাণময় উপস্থিতি অনুভব করিয়াছেন। এই উপলব্ধির গভীরতা এবং অনুদ্বেজিত মনের স্নিগ্ধ প্রশান্তি তাঁহার ভাষায় সঞ্চারিত হইয়া আছে। তাঁহার রচনা পাঠককে বিতর্কের মধ্যে নিক্ষেপ করে না, তিনি যে প্রত্যয়ের শুদ্ধভূমি হইতে কথা বলেন সেই দ্বিধাহীন প্রত্যয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পাঠক এক নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে। দেবেন্দ্রনাথের রচনায় বিষয়বস্তুর গুরুত্বই প্রধান নহে, প্রধান হইয়া ওঠে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। বাক্যগুলি শুধু বক্তব্যকে প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, কোন এক গভীর অনুভূতিলোকের ব্যঞ্জনা বহন করিয়া আনে।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে উপনিষদের নির্বাচিত শ্লোকগুলি অবলম্বনে যে সব আলোচনা করিতেন তাহাই পরে 'ব্রাহ্মধর্ম' (১৮৫২), 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২), 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬৯-৭২) প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি অবলম্বন করিয়া যে বক্তৃতা তিনি দিতেন তাহাতে তাঁহার নিজের উপলব্ধির কথাই প্রকাশ পাইত। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন, "এই ব্যাখ্যানগুলিতে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ কথিত কতকগুলি শ্লোকের উন্নত পবিত্র ভাব ও তাৎপর্য স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।......ইহার এক একটি ব্যাখ্যান পাঠ করিলে এক একটি ধর্মতত্ত্ব জানা যায় এমন নহে ; কিন্তু ইহার প্রত্যেক পত্রের এক একটি বাক্য তড়িতের ন্যায় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে নবজীবন প্রদান করে, চমকিত করিয়া তোলে।"

বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত আত্মজীবনী। গ্রন্থটি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে **পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত আত্মজীবন চরিত** নামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে গ্রন্থস্বত্ব দান করিয়া দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত আমার জীবন কাহিনী উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করিয়া তোমাকে দিলাম ; ইহা তোমার সম্পত্তি হইল। ইহাতে কোন নূতন শব্দ যোগ করিবে না, ইহার বিন্দুবিসর্গও পরিত্যাগ করিবে না। আমি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না।" তাঁহার নির্দেশক্রমেই এই জীবনী তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের স্বল্প কয়েকটি আত্মজীবনীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থটি একটি স্মরণীয়

গ্রন্থ। জীবনের ঘটনাবলী তিনি এ গ্রন্থে পুঞ্জীভূত করিয়া তোলেন নাই, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কীভাবে তিনি ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারই বিবরণ এ গ্রন্থের প্রধান বিষয়। তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ এবং সাবলীল সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাষার গুণে বইখানি আজিও সুখপাঠ্য। জীবন চরিতে দেবেন্দ্রনাথের মনের সৌন্দর্য-চেতনার পরিচয় বড় সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। সংসার হইতে দূরে—নিভৃত পর্বত, অরণ্যের দুর্গম পথে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনাবিষ্কৃত জগৎ তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিদিন অনাবৃত হইয়াছে। দু একটি উপমায় আশ্চর্য কৌশলে তিনি এই সব খণ্ডদৃশ্য প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহার রচনায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দেবেন্দ্রনাথ ঋগ্বেদের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি কয়েকটি সূক্ত অনুবাদ করার পর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের উপরে ঋগ্বেদ অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।

[সাত] 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' গ্রন্থদুটির পরিচয় দাও এবং এই গ্রন্থদুটির গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা গদ্যের সূচনাকাল হইতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের রচনার দ্বারাই এই ভাষা পরিপুষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃত-আশ্রিত, ক্রিয়াপদের সাধুরূপ সমন্বিত গদ্যই আদর্শ ভাষারূপে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু গদ্য-লেখকদের মধ্যে অনেকে এই সাধুভাষার সহিত লোকমুখে প্রচলিত কথ্যরীতির ভাষার দূরত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অনেকেই অনুভব করিয়াছেন, জ্ঞান-চর্চায় এবং সাহিত্য-সৃষ্টিতে যে সাধুরীতির ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হইতে এতই দূরবর্তী যে এই ভাষা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কোন কোন রচনায় তিনি সাধু এবং কথ্যরীতির ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁহার লঘু রচনায় কথ্যরীতি অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু সাধুভাষা বর্জন করিয়া একমাত্র কথ্য ভাষারীতির আশ্রয় গ্রহণের দুঃসাহস **প্যারীচাঁদ মিত্রের** (১৮১৪-৮৩) পূর্বে কেহ করেন নাই। হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্যারীচাঁদ অনুভব করিয়াছিলেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষিত শ্রেণীর

মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া থাকিলে সমগ্র দেশের চিত্ত জাগ্রত হইবে না, তিনি আহৃত বিদ্যা সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, অশিক্ষিত বা স্বল্প-শিক্ষিত মানুষের মনের সহিত সংযোগ সাধনের জন্য লোক-প্রচলিত ভাষাকেই মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে ঘোষণা করা হইয়াছিল: "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" বাংলা গদ্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে 'মাসিক-পত্রিকা' প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ সাধু এবং চলতি—ভাষার এই দুই রীতি সম্পর্কে যে সংশয়িত প্রশ্ন বাংলা গদ্যের মনে প্রচ্ছন্ন ছিল—প্যারীচাঁদ তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া বলিলেন এবং এই সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইলেন। প্যারীচাঁদের প্রথম গ্রন্থ **আলালের ঘরের দুলাল** গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রধানত চলতি ভাষা ব্যবহার করিয়া কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ আলালের ঘরের দুলালের পূর্বে রচিত হয় নাই। টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে রচিত এই গ্রন্থ তাই বাংলা ভাষায় একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল।

শুধু ভাষার দিক হইতেই নহে, আলালের ঘরের দুলাল বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস রূপেও ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ। সাময়িক পত্রে বা কোন কোন গ্রন্থে সমসাময়িক সমাজের নানাশ্রেণীর মানুষের জীবন সম্পর্কে মাঝে মাঝে যে সব ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হইত—সেই নক্সাগুলিতে উপন্যাসের অস্পষ্ট পূর্বাভাস ফুটিতেছিল। সমাজের পটে ব্যক্তিচরিত্রকে স্থাপন করিয়া একটি নির্দিষ্ট কাহিনীর বন্ধনে বাস্তব জীবনচিত্র পরিস্ফুট করা উপন্যাস-শিল্পের প্রাথমিক দায়িত্ব, প্যারীচাঁদ মিত্র সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কে টানাপোড়েনে একটি নির্দিষ্ট কাহিনী আলালের ঘরের দুলালে উপস্থাপন করিলেন। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক। বড়লোকের আদুরে ছেলে মতিলালের পদস্খলন এবং শেষে সৎপথে ফিরিয়া আসা উপন্যাসটির মূল প্রসঙ্গ, ঘটনাগুলি

মতিলালকে ঘিরিয়াই আবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু ঠকচাচা নামক চরিত্রটিই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: "ঠকচাচা উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সৃষ্টি; উহার মধ্যে কূট কৌশল ও স্তোক বাক্যে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতার এমন চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে যে, পরবর্তী উন্নত শ্রেণীর উপন্যাসেও ঠিক এইরূপ সজীব চরিত্র মিলে না। বেচারাম, বেণী, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম প্রভৃতি চরিত্রও—কেহ বা অনুনাসিক উচ্চারণে, কেহ বা সংগীতপ্রিয়তায়, কেহ বা কোন বিশেষ বাক্য-ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তিতে—স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। এই বাহ্য বৈশিষ্ট্যের উপর ঝোঁক ও ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন প্রবণতায় প্যারীচাঁদ অনেকটা ডিকেন্সের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কেবল রামলাল ও বরদাবাবু চরিত্র স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া ম্লান ও বিশেষত্ববর্জিত কতকগুলি সদ্গুণের যান্ত্রিক সমষ্টি মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। কৃত্রিম সাহিত্য রীতি বর্জনে ও কথ্যভাষার সরস ও তীক্ষ্ণাগ্র প্রয়োগে 'আলাল'-এর বর্ণনা ও চরিত্রাঙ্কন আরও বাস্তব রসসমৃদ্ধ হইয়াছে।" সাহিত্যে কথ্যরীতির গদ্য প্রথম ব্যবহার এবং মৌলিক কাহিনী অবলম্বনে প্রথম উপন্যাস রচনা—এই দুই কারণে আলালের ঘরের দুলাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন গ্রন্থ। আলালের ঘরের দুলালের এই তাৎপর্য নির্দেশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন: "যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন এবং তিনিই প্রথম ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।"

প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনারীতি যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে **কালীপ্রসন্ন সিংহ** (১৮৪০-৭০) ছিলেন শ্রেষ্ঠ লেখক। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা কাল হইতে কলিকাতায় একশ্রেণীর বিত্তবান বিকৃত রুচির মানুষের আধিপত্য দেখা যায়। নীতিহীন বিলাসব্যসন এবং কুরুচিপূর্ণ আমোদ প্রমোদে ইহাদের দিন কাটিত। উনবিংশ শতাব্দীর বহু ব্যঙ্গরচনায় বাবু নামে অভিহিত এই হঠাৎ বড়লোকদের জীবনযাত্রা উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। **'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'** এই জাতীয় রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইংরেজ রাজত্বের রাজধানী আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান কলিকাতার সমাজের একাংশের বাস্তব চিত্র

হিসাবে এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল বলা যাইতে পারে। যদিও হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার অধিকাংশ রচনাই সংবাদিকতার পর্যায়ের, তথাপি মাঝে মাঝে দু'একটি আচড়ে আঁকা চরিত্র-চিত্রণে এবং বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার নক্‌শার কোন কোন রচনা সাংবাদিকতার উর্ধ্বে সাহিত্যের সীমায় উপনীত হইয়াছে। হুতোম প্যাচার নক্‌শা প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। কথ্যরীতির গদ্য ব্যবহারের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় কালীপ্রসন্ন সিংহ প্যারীচাঁদের চেয়ে অনেক বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্যারীচাঁদের ভাষায় মাঝে মাঝে সাধু ক্রিয়াপদ এবং সাধুভাষায় বাক্যগঠন রীতির মিশ্রণ আছে, কালীপ্রসন্ন অসংশয়ে কলিকাতার মানুষের কথ্যভাষা যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। এমন অপরিমার্জিতভাবে কথ্যভাষার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও দেখা যায় না। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই জাতীয় ভাষায় কখনো কোন মহৎ সৃষ্টি বা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নয়। কালীপ্রসন্ন যে বিকারগ্রস্ত জীবনের ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কন করিতে চাহিয়াছেন সেই বিষয়ের পক্ষে এই ভাষা যথার্থ উপযোগী।

প্যারীচাঁদ বা কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষা সাহিত্যে গৃহীত হয় নাই, এমন কি সাহিত্যিক প্রয়োজনে কথ্যরীতির গদ্যের প্রচলন ইহাদের দুঃসাহসী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বহুবিলম্বিত হইয়াছিল। বস্তুত প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্র' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহারই ফলে চলতি ভাষা সাহিত্যে যথাযোগ্য মর্যাদা পায়। সে অনেক পরের কথা। কিন্তু 'আলালের' বা 'হুতোমের' ভাষা অন্যভাবে বাংলা গদ্যের বিকাশধারাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে যে পণ্ডিতি রীতির গদ্য প্রচলিত হইয়াছিল কথ্য-রীতির গদ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া ইঁহারা তাহার কৃত্রিমতা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেন। অতঃপর সাধুভাষাও পণ্ডিতি রীতি পরিত্যাগ করিয়া অনেক পরিমাণে চলতি ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য আয়ত্ত করিয়াছে। বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধির পক্ষে চলতি ভাষার প্রভাব স্বীকার অপরিহার্য ছিল। বাংলা ভাষার বিবর্তনে প্যারীচাঁদ মিত্রের দানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন: "বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের

ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের পর হইতে বাঙালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারিচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।")

[আট] **'বঙ্গদর্শন' পর্যন্ত প্রধান বাংলা সাময়িক পত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।**

উত্তর। সাময়িক পত্র আধুনিক সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং সৃজনশীল সাহিত্য সাময়িক পত্রকে অবলম্বন করিয়াই পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সাধারণের মধ্যে জ্ঞানচর্চা প্রসারের যে সম্ভাবনা দেখা দেয় সাময়িক পত্রই তাহা সফল করিয়াছে। বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্রের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায়। বাংলা গদ্যেরও তখন সূচনাকাল। গদ্যভাষা ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় সর্বসাধারণের বোধগম্যভাবে প্রচার সম্ভব ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা লাভ যখন সম্ভব হইল—এবং বাংলা গদ্যের একটি মোটামুটি কাঠামো প্রস্তুত হইয়া উঠিল—তখন শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনের কর্মীরা সাময়িক পত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। এই বিদেশী মিশনারীরাই বাংলা সাময়িক পত্রের সূচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে বিভিন্ন বাঙালী মনীষী এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। এক-একটি সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন সময়ে এক একটি লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং সাময়িক পত্র অবলম্বনে এই লেখকগোষ্ঠীর সমবেত প্রচেষ্টায় সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ গদ্য-সাহিত্যে সাময়িক পত্রগুলির দান অপরিসীম। বস্তুত বাংলা গদ্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধি সাময়িক পত্রের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে।

বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন হইতে। জন ক্লার্ক মার্শম্যান এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই বৎসরের মে মাসে ইহারই সম্পাদনায় 'সমাচার দর্পণ' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি প্রভৃতি পণ্ডিতদের সহায়তায় সমাচার দর্পণ পরিচালনা করিতেন। পত্রিকাটি প্রায় ৩৪ বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশ করা হইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ এই পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলিতে অঙ্কিত হইয়া আছে। 'সমাচার দর্পণ' খৃষ্টধর্ম-প্রচারকদের দ্বারাই পরিচালিত হইত, কিন্তু কখনো প্রত্যক্ষভাবে এই পত্রিকায় ধর্মপ্রচার করা হয় নাই। এবিষয়ে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা উদারতার পরিচয় দিয়াছেন।

সমাচার দর্পণে মাঝে মাঝে পাঠকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্র প্রকাশ করা হইত, এইসব পত্রে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি কটাক্ষ করা হইত। হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে ইহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সম্বাদ কৌমুদী' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায় এই পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার বহু প্রগতিশীল মতবাদ এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের বক্তব্য প্রকাশের জন্য রামমোহন এই বৎসরেই 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে আর একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাটি ছিল দ্বিভাষিক এক পৃষ্ঠায় বাংলা আর পরবর্তী পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইত। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে রক্ষণশীল ছিলেন, স্বভাবতঃই রামমোহনের সহিত সর্ব বিষয়ে তাঁহার মতৈক্য হওয়া সম্ভব ছিল না। ধর্মবিষয়ে মতভেদের জন্য ভাবনীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে। রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তাধারা এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্ররূপে 'সমাচার চন্দ্রিকা' খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাময়িক পত্র নূতন যুগে প্রবেশ করিল। শুধু সংবাদ পরিবেশন এবং ধর্মঘটিত বিতর্কে যে সংবাদ পত্র-সাময়িক পত্র নিয়োজিত, ঈশ্বর গুপ্ত তাহাকে সাহিত্য-চর্চার বাহন করিয়া তুলিলেন। ইতিপূর্বে যে সব সাময়িক পত্র প্রকাশিত

হইয়াছিল সেই সব পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী ধর্মীয় বা সামাজিক মতাদর্শের ঐক্যবন্ধনেই আবদ্ধ ছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত এইরূপ কোন নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস বা মতাদর্শ প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে যে মন্তব্য সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হইত তাহাতে হয়ত ঈশ্বর গুপ্তের নিজস্ব মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি কখনো কোন নির্দিষ্ট মতবাদ সংঘবদ্ধভাবে প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। তাহার উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালী লেখকদের মধ্য হইতে যথার্থ সাহিত্যিক প্রতিভা আবিষ্কার এবং লালন। প্রাচীন কবিদের জীবনী সংগ্রহ, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপকরণ উদ্ধার—প্রভৃতি কাজে তিনি সাহিত্যিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পত্রিকায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধুর মতো প্রতিভাসম্পন্ন লেখকেরা আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করিয়াছেন। নূতন যুগের বাংলা সাহিত্য যাঁহাদের দানে সমৃদ্ধ—'সংবাদ প্রভাকর' ছিল তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশের অবলম্বন। এইদিক হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংবাদ প্রভাকরে'র ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

সংগঠিতভাবে জ্ঞানচর্চার দিক হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তকে এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং পত্রিকা পরিচালনার জন্য একটি 'পেপার কমিটি' বা প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভা গঠিত হয়। এই পেপার কমিটিতে সদস্য ছিলেন বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি তখনকার সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা। এই প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভার অনুমোদন ভিন্ন কোন রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারিত না। পত্রিকা প্রকাশের সময়ে দেবেন্দ্রনাথের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সংযোগ সাধন। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকা সম্পাদনার ভার লইয়া এই সংকীর্ণ উদ্দেশ্য অতিক্রম করিয়া পত্রিকাটিকে সমাজবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব এবং বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পরিণত করেন। অক্ষয়কুমার এই পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল

অসাধারণ। আধুনিক মানুষের অধিগম্য সকল জ্ঞানের বিষয় এই পত্রিকায় বাংলা গদ্যে তিনি আলোচনা করিলেন। জ্ঞানচর্চার ভাষারূপে বাংলা গদ্যের শক্তি এইভাবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা গদ্যের শক্তি এবং সৌন্দর্যের সমৃদ্ধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে আশ্রয় করিয়াই সাধিত হইয়াছে।

'বঙ্গদর্শনে'র পূর্ববর্তী কালের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক পত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'। "বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে বিলাতী পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শে" এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রথম বাংলা সচিত্র মাসিক পত্রিকা। পুরাতত্ত্বের আলোচনা, দেশ বিদেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী, প্রাচীন তীর্থের বিবরণ নানা বিষয় রচিত আকর্ষণীয় আখ্যান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ সাধারণ পাঠকদের উপযোগীভাবে এই পত্রিকায় পরিবেশিত হইত। এই পত্রিকাতেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মধুসূদনের প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইহা 'সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ…'।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। বঙ্গদর্শন প্রথমদিকে কলিকাতার ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হইত, পরে নৈহাটি কাঁটালপাড়ায় সঞ্জীবচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন প্রেস স্থাপন করেন তখন হইতে বঙ্গদর্শন পত্রিকা সেই প্রেসেই মুদ্রিত হইত। বঙ্গদর্শনের পূর্ব-পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে বিক্ষিপ্ত প্রস্তুতি চলিতেছিল—এই পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে পূর্ণ পরিণামে উপনীত করিলেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকা দ্বারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পূর্ণ যৌবন সূচিত হইল। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনী ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ রচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী লেখক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু, সঞ্জীবচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি। বাংলা ভাষার সামর্থ্য পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছে বঙ্গদর্শন পত্রিকা রচনাবলীতে। বঙ্কিমচন্দ্র চার বৎসর বঙ্গদর্শন পরিচালনা করিয়া সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে পত্রিকাটি তুলিয়া দেন। সঞ্জীবচন্দ্র যথোচিত যোগ্যতার সহিত এই পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে কিছুদিন সতীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় কিছুদিন এই পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।

[নয়] বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি সাধনে বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তির মূল্য বিচার কর এবং তাঁহার বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর। আধুনিক মানুষের ধ্যানধারণার বাহন গদ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে যখন বাঙালী চিত্ত নূতন চেতনায় জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল তখন হইতে আত্মপ্রকাশের অপরিহার্য মাধ্যমরূপে গদ্যভাষা নির্মাণের প্রচেষ্টাও শুরু হইয়াছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময়ব্যাপী বিভিন্ন লেখকদের চেষ্টায় বাংলা গদ্যের কাঠামো প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ অতিরিক্ত পরিমাণে সংস্কৃত-নির্ভর গদ্য লিখিয়াছেন, কাহারও রচনা বা কাব্যরীতির অনুসরণ করিয়াছে—কিন্তু এইসব রচনাতে বাংলা গদ্যের ভবিষ্যত রূপ কী হওয়া উচিত, ইহার মূল সমস্যাগুলি কী ভাবে সমাধান করা যায়—সে বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এই পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা গদ্যে যথার্থ সৃজনধর্মী কোন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে নাই। একটি জাতির নবজাগ্রত চেতনার আধার হইতে পারে যে ভাষা তাহা যথাযোগ্য-ভাবে নির্মাণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শক্তিমান প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। তিনি আপন শক্তিবলে নবজাগরণের যুগের ধ্যান-ধারণা আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার নবচেতনায় দীপ্ত ব্যক্তিত্বের বৈদ্যুতিক স্পর্শে ভাষায় সপ্রাণতা সঞ্চার করিলেন। তাঁহার পূর্বে গদ্যভাষার উপকরণ সমস্তই প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল। শব্দসম্পদ, শব্দের অন্বয়রীতি, বাক্য গঠনের রীতি, ছেদচিহ্নের যথোপযুক্ত ব্যবহারে বাক্যকে খণ্ডিত করিয়া বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশের পদ্ধতি—গদ্য-ভাষার এই মৌলিক গঠন তাঁহার পূর্বেই সম্পাদিত হইয়াছিল; সেই ভাষায় শুধু ছিল না সচলতা এবং গতি। ভাষা শুধু বক্তব্যেরই আধার নয়, ভাষাই একটা শিল্প—এবং ভাষার শিল্পত্ব নির্ভর করে ব্যকরণগত গঠনের অতিরিক্ত সপ্রাণতায়। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যে এই প্রাণবেগ, এই গতিশীলতা আনিয়া দিলেন। ভাষা শিল্পশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিল। মানুষের গভীরতম আবেগ, উচ্চতম কল্পনা অভিব্যঞ্জিত করিয়া তুলিবার শক্তি দেখা দিল বাংলা গদ্যে।

বঙ্কিম-প্রতিভার এই অসামান্য কীর্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: "নূতন যুগের জোয়ার আসে কোনো একজন মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য-বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে; দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলা দেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল; তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুত বেগে, আর তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালির মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে।"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করেন, বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভার শক্তি পূর্ণভাবে প্রয়োগ করেন। বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ রচনা তিনি নিজে লিখিতেন। এইসব রচনা পরে বিষয় অনুসারে বিন্যস্ত করিয়া গ্রন্থকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাস ভিন্ন অন্য গদ্য রচনাবলী তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখা যায়। (১) ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসমূলক, (২) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সমালোচনা, (৩) ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গ।

[এক] ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসমূলক রচনাবলী 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪)—এই তিনটি গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের কোন সম্মানের আসন ছিল না। হাস্য উৎপাদনের জন্য প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতাই একমাত্র উপায় বিবেচিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হাস্যরসকে অশ্লীলতার কলুষমুক্ত করিয়াছেন। মানবস্বভাবের অসঙ্গতির মধ্যেই যথার্থ হাস্যরসের উৎস, বঙ্কিমচন্দ্রের কালে সামাজিক জীবনে যে ভাঙাগড়া চলিতেছিল তাহার মধ্যে মানুষের স্বভাবগত অসঙ্গতিগুলি আরও প্রকট হইয়া উঠিত। বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসাত্মক রচনায় তাঁহার কালের প্রত্যক্ষ জীবনাশ্রিত অসঙ্গতি-গুলির উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। 'লোকরহস্যে'র খণ্ড খণ্ড রচনায় তাঁহার সম-সাময়িক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সাধ এবং সাধ্যের মিলনসাধনের করুণ

অক্ষমতা লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র স্থির সামঞ্জস্য-পূর্ণ কোন আদর্শের অনুসন্ধান করিতেন, যখনই দেখিয়াছেন কোন একটি প্রবণতার অতিরেকে কেহ প্রত্যাশিত সামঞ্জস্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছে—তখনই তাহার উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতেন। লোকরহস্য বা মুচিরাম-গুড়ের জীবনচরিত্রের ব্যঙ্গচিত্রগুলির অন্তরালে সুস্থ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের প্রতি আগ্রহশীল বঙ্কিমচন্দ্রকেই উপস্থিত দেখা যায়। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কমলাকান্তের দপ্তর। এই গ্রন্থের সহিত তুলনাযোগ্য দ্বিতীয় গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে নাই। কমলাকান্ত একটি কাল্পনিক চরিত্র। নেশাখোর অর্ধোন্মাদ এই চরিত্রটির বাচনভঙ্গি আমাদের কৌতুকবোধ জাগ্রত করে। তাহার অসঙ্গতিপূর্ণ আচার আচরণ প্রভৃতি হাস্যোৎপাদন করে, কিন্তু এই কমলাকান্ত কথা বলে এমন সব বিষয়ে যাহা মূলত গভীরতম দার্শনিক চিন্তার ফল। তাহাকে মনে হয় বিদূষকের ছদ্মবেশে একজন দার্শনিক। হাস্যরসের স্পর্শে যে গভীরতম বিষয়েরও গৌরবহানি হয় না বরং তাহা আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়—তাহার অদ্বিতীয় উদাহরণ 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

[দুই] 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮০৫), 'বিবিধ প্রবন্ধ' দুই খণ্ড (১৮৮৭ ও ১৮৯২) এবং 'সাম্য' (১৮৭৯) গ্রন্থ তিনটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমালোচনামূলক রচনাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। জ্ঞানচর্চার ভাষা হিসাবে বাংলা গদ্যের পূর্ণশক্তির পরিচয় এই প্রবন্ধাবলীতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অধীত বিদ্যার পরিধির বিস্তার বিস্ময়কর, আধুনিক কালের মননজাত জ্ঞানের সকল শাখাতেই তাঁহার অধিকার ছিল। তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল স্বদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে একাগ্র আদর্শ। আধুনিক পৃথিবীর মানুষের চিন্তাজাত ধনরত্ন ও গবেষণালব্ধ সত্যের সহিত স্বদেশের চিত্তের সংযোগ সাধন করিয়া তিনি অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন এদেশের চিত্ত আলোকিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই পাশ্চাত্ত্যমুখী মানসিকতা কিন্তু কখনো স্বদেশের ঐতিহ্যের সহিত সংযোগরহিত ছিল না। অন্ধ সংস্কারের পরিবর্তে যুক্তিবিচারের পথে তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের সত্যরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া বিবিধ প্রবন্ধের একাধিক রচনায় আধুনিক গবেষণার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সমসাময়িক সমাজ-বিন্যাস ও অর্থনৈতিক সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার সংখ্যাও বিবিধ প্রবন্ধে কম নয়। তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাহিত্য-সমালোচনা।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাকালে একদিকে যেমন সৃষ্টিশীল রচনার দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তেমনই এই রচনা উপভোগ করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্ম পাঠকগোষ্ঠীর রস-রুচি পরিমার্জিত করিবার দায়িত্বও তিনি পালন করিয়াছেন। সমালোচনামূলক রচনায় একদিকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের চিরায়ত গ্রন্থগুলি এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আলোচনায় যেমন একটি উন্নত সাহিত্যাদর্শ স্থাপন করিয়াছেন অন্তদিকে সমসাময়িক কালের বাঙালি সাহিত্যিকদের রচনার দোষ-গুণ বিশ্লেষণের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করিতেন সামাজিক শুভাশুভের দিক হইতে। যে রচনায় জাতীয় প্রকৃতির মূলগত বৈশিষ্ট্যগুলি সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করিতেন।

[তিন] বঙ্কিমচন্দ্রর ধর্ম ও দর্শন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৯২) এবং 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) গ্রন্থে। মানুষের সর্ববিধ গুণের সামঞ্জস্য-পূর্ণ বিকাশেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন সম্ভব এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার ধর্মবিষয়ক রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পৌরাণিক কৃষ্ণচরিত্রের অলৌকিক অংশ বর্জন করিয়া তিনি আপন আদর্শ অনুযায়ী কৃষ্ণচরিত্র নতুন-ভাবে গঠন করিয়াছেন তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে। অন্ধ বিশ্বাস নহে, প্রখর যুক্তির দ্বারাই তিনি প্রাচীন শাস্ত্র হইতে আপন আদর্শের প্রতিমূর্তিরূপে কৃষ্ণচরিত্রকে মহত্তম মানুষরূপে গড়িয়াছিলেন। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মানবিক গুণগুলির যথোপাযুক্ত অনুশীলনে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন কী ভাবে সম্ভব তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় : কাব্য ও কবিতা ॥

[দশ] বাংলা কাব্যের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর এবং সাধারণভাবে তাঁহার সাহিত্যকীর্তির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার কর।

উত্তর। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অদূরবর্তী কাঁচরাপাড়ায়

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার কবিতা রচনার শক্তি স্ফুরিত হয়। তখনকার দিনে জনসমাজে কবি-গানের প্রভূত সমাদর ছিল, ঈশ্বর গুপ্ত কবির দলের জন্য গান বাঁধিয়া দিতেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পান নাই, তাঁহার রুচি এবং রসবোধ প্রাচীন বাংলা কাব্যের আবহাওয়াতেই লালিত হইয়াছিল। আবাল্য তিনি যে প্রাচীন সমাজের জীবনধারা এবং কবিতার আবহাওয়াতে মানুষ হইয়াছেন, সেই অতীত ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার মমত্ববোধ ছিল সহজাত। এই প্রাচীন ঐতিহ্য-প্রীতি এবং রক্ষণশীল মনোভাব লইয়াই তিনি কলিকাতার উদীয়মান আধুনিক সমাজের জীবনস্রোতের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নগরাশ্রিত আধুনিক জীবনের প্রতি তাঁহার বিরাগ ছিল না। কিন্তু তাহার শিক্ষা দীক্ষা এবং জীবনাদর্শের পক্ষে নির্বিচারে আধুনিক জীবনের সমস্ত কিছু স্বীকার করিয়া নেওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ এই ঈশ্বর গুপ্তই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকরূপে আধুনিক জীবনের নিবিড় সান্নিধ্যে আসিয়াছেন। ফলে প্রাচীন ও আধুনিক জীবনাদর্শের প্রতি দোটানা এবং সংশয়িত মনোভাব তাঁহার চরিত্র-গত বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কবিতায় এই দ্বিধাগ্রস্ত মনেরই পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে।

কবিগান ও হাফ-আখড়াইএর কবিরা কলিকাতার অগঠিত, শৃঙ্খলাহীন সমাজের অপরিমার্জিত-রুচি শ্রোতাদের তৃপ্তির জন্য যে চটুল শালীনতাহীন কাব্য রচনা করিতেন তাহার পটভূমিতে দেখিলে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় বুদ্ধিদীপ্ত বহুনিষ্ঠ মনন-ভঙ্গীর প্রকাশকে নিঃসন্দেহে নতুন কাব্যরীতির ইঙ্গিত-বহ বলিয়া মনে হয়। খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতাই তিনি রচনা করিয়াছেন। এই সব কবিতায় বিষয় হিসাবে নীতি-বাদ, সামাজিক রীতি-নীতি, খাদ্যবস্তুর বর্ণনা এবং সমসাময়িক বহু ঘটনা ব্যবহার করা হইয়াছে। বিষয় যাহাই হোক সর্বত্র তাঁহার বুদ্ধির আলোকে উজ্জ্বল ব্যঙ্গপ্রবণ মনের প্রকাশে কবিতাগুলি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। যে ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি মমত্বরোধ জীবনের কখনো পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই কলিকাতার সমাজে আধুনিক জীবনের বিকাশ-মান প্রবণতাগুলির প্রতি তাঁহার সংশয় ও অবিশ্বাসের ভাব থাকাই স্বাভাবিক। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গপরায়ণতার মূল নিহিত আছে এইখানে। নূতন সমাজের আচার আচরণে তখন অতীতকে অস্বীকার করা হইতেছিল, কিন্তু নতুন কিছু

যথার্থই গড়িয়া উঠিবে কিনা, আধুনিক যুগের পরিণাম কোন পথে সম্ভব হইবে তাহা তখনো স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী ছিল না। অতীত জীবনের বনিয়াদ যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহাতেই তিনি দেখিয়াছেন, সমাজ-প্রগতির সফল পরিণামের ইঙ্গিত ধরিতে পারেন নাই। মনে হয় আধুনিকতার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁহার মনের এই সংশয় এবং দ্বিধাই প্রকাশিত। তবুও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি আধুনিক জীবনের প্রতি কখনো উদাসীন ছিলেন না। বরং সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকরূপে তাঁহাকে সমাজের প্রতিটি ঘটনাস্রোতের সহিত যুক্ত থাকিতে হইত। সংবাদিকরূপে ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিতে হইত, হয়ত সংবাদপত্র পরিচালনার সূত্রেই তাঁহাকে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার আয়ত্ত এবং স্বভাবগত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ। এই বহির্দৃষ্টিপ্রবণতার ফলে তাঁহার কবিতায় জীবন সম্পর্কে সুস্থ আগ্রহের সঞ্চার সম্ভব হইয়াছে। জীবনের প্রতি তিনি কখনো বিমুখ ছিলেন না। বরং জীবনের তুচ্ছ বস্তু ও ঘটনার উপরেও তাঁহার কৌতুকপ্রবণ মনের আলোকের দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আনারস, তপ্‌সে মাছ বা পাঁটা প্রশস্তি, পৌষ-পার্বণের বর্ণনা—প্রভৃতি কবিতায় তুচ্ছ বিষয়কেও তিনি কাব্য-প্রসঙ্গের মর্যাদা দিয়াছেন। তাঁহার চেতনার বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায় নীলকর বা মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি সম্পর্কে রচিত কবিতায়। বাঙালি জীবনের তুচ্ছ ও মহৎ সমস্ত কিছুর প্রতিই তাঁহার অকৃত্রিম আকর্ষণ। ঈশ্বর গুপ্তের রচনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন: "যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃত জনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজি নবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করে। এমন বাঙালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা দেশী ভাব প্রকাশ করেন।"

বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কালান্তর ক্ষণে তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যকে

বাঁচাইতেই চাহিয়াছিলেন, কবিজীবনী সংকলনে বা প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহে তাঁহার এই ঐতিহ্যপ্রীতি প্রমাণিত হয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার প্রসারে এবং প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনে তাঁহার উৎসাহের অভাব ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন। সংবাদ-প্রভাকরে তরুণ লেখকদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র রচনা করিয়া তিনি ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের কর্ণধারদের সাহিত্য-জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধুর মতো প্রতিভাসম্পন্ন লেখক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া শিক্ষানবিশি করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম সচেতন সাহিত্যিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন লেখক। আপন কালের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করিবার প্রয়াস এবং সাহিত্যিক দায়িত্ববোধে তাঁহার ব্যক্তিত্বের আধুনিকতারই লক্ষণ। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্য তিনি যেমন আধুনিক দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন তেমনি তাঁহার জীবনব্যাপী কর্মে ও দৃষ্টিতে নূতন যুগের অস্পষ্ট সূচনাও লক্ষ্য করা যায়।

[এগারো] বাংলা কবিতার রূপ ও রসের ক্ষেত্রে রূপান্তরসাধন করিয়া মধুসূদন কীভাবে আধুনিক বাংলা কাব্যের যথার্থ সূচনা করিয়া গিয়াছেন আলোচনা কর।

উত্তর। প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রাণশক্তি মধুসূদনের বহু পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত বা রঙ্গলাল আধুনিক যুগের প্রান্তে দাঁড়াইয়া বিলীয়মান অতীতের জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু সেই পুরাতন কাব্যের রস, রুচি ও প্রকাশরীতি যে আর পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলা যাইবে না নিজেদের কাব্য কীর্তিতেই ইঁহারা সেকথা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের আবির্ভাবের ঠিক আগের যুগের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় নূতন জীবন চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালী মানস যতটা নূতন সৃষ্ট গদ্যে স্পষ্ট মূর্তিলাভ করিয়াছে কবিতায় তাহার প্রকাশ তত স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন নয়। নূতন যুগের ধ্যান-ধারণা প্রকাশের জন্য নবনির্মিত গদ্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কাব্যের ভাষা তখনো প্রাচীন কবিতার জীবনহীন প্রথার মধ্যেই বদ্ধ। মধুসূদন এই পটভূমিতে বাংলা কবিতা লেখায় মন দেন, এবং সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে প্রথমেই তিনি ভাষা ও ছন্দের সংস্কারসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। আধুনিক বিশ্বের সাহিত্যিক প্রতিবেশের সহিত পরিচিত মধুসূদন যে জীবনাদর্শ

তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিতে চান—প্রাচীন রীতির কাব্য-আঙ্গিকে তাহার আধার প্রস্তুত অসম্ভব ছিল। সর্ববন্ধনমুক্ত মানুষের মহিমা মূর্ত করিবার জন্য তিনি আবহমানকালের পয়ার ছন্দের বেড়ি ভাঙার জন্যই প্রতিভার শক্তি প্রয়োগ করিলেন। পয়ারের চরণান্তিক মিল তুলিয়া দিয়া এবং যতি-স্থাপনের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি দ্বারা বাংলা কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করিলেন। কবিতার মুক্তি কবিতার আঙ্গিকের এই রূপান্তরকে অবলম্বন করিয়াই সম্ভব হইয়াছে। শুধু ছন্দের রূপান্তর নয়, কাব্য-ভাষার ক্ষেত্রেও তাঁহার কীর্তি বিস্ময়কর। সংস্কৃত ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ বাংলা-দেশের প্রাচীন কবিরাও করিয়াছেন, কিন্তু মধুসূদনের কবিতায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে যে শব্দের ধ্বনি ও সৌন্দর্য বিষয়ে সচেতনতা দেখা গেল তাহা পূর্ববর্তী কোন কবির রচনায় দেখা যায় না। তিনি প্রাকৃত-বাংলার শব্দসম্পদ এবং বাংলা ভাষার কথনরীতির সহিত সচেতনভাবে সংস্কৃত শব্দসম্পদ মিশ্রিত করিয়া নূতন যুগের মানুষের রস-রুচির যোগ্য ভাষা নির্মাণ করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে ভাষার অলংকরণে উপমা-উৎপ্রেক্ষা নির্মাণে তিনি অসংকোচে পাশ্চাত্ত্য বাক্যের উপমা-প্রয়োগ-পদ্ধতি নিপুণভাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়া দেখাইবেন বাংলা ভাষার শক্তি পৃথিবীর অন্য কোন ভাষার চেয়ে কম নয়। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়াই **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য** রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে 'তিলোত্তমা-সম্ভব' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুন্দ-উপসুন্দ নিধনের জন্য তিলোত্তমাসৃষ্টির পৌরাণিক কাহিনী মধুসূদন এই কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্যের বিষয় নয়, ছন্দের নবপ্রবর্তনার প্রতিই তাঁহার সমস্ত মনোযোগ এই কাব্যে নিবদ্ধ হইয়াছিল। ফলে পুরাতন কাহিনীটির কোন মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয় নাই। অবশ্য দেবচরিত্রগুলির পরিকল্পনায় এবং এক সর্বাতিশায়ী দৈবশক্তির কল্পনায় মধুসূদন গ্রীক কাব্য-ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

মধুসূদনের প্রতিভার শক্তি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে **মেঘনাদবধ** কাব্যে। শুধু ভাষা ও ছন্দে নহে, কাব্যের বিষয়গত বক্তব্যের দিক হইতেও এই কাব্য বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। রামায়ণ-কাহিনী

ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে আবহমানকাল ধরিয়া সমাদৃত। ভারতবর্ষের সমাজগঠন, ভারতীয় সমাজের নীতি ও ধর্মবোধ, গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধন—সমস্ত কিছুই রামায়ণে রাম-চরিত্রটিকে অবলম্বন করিয়া একটি অবশ্য অনুসরণীয় আদর্শের রূপে ভারতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। মধুসূদন এই রামায়ণের কাহিনীই অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার আধুনিক জীবনচেতনা প্রকাশের জন্য। ভারতবর্ষের প্রাচীন কবি ভারতীয় সমাজের পক্ষে যাহা কিছু গর্হিত তাহারই প্রতীক চরিত্র রূপে রাবণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মধুসূদন মধ্যযুগীয় জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের মহিমা বড়ো করিয়া দেখাইবার জন্য এই রাবণকেই তাঁহার কাব্যের নায়করূপে নির্বাচন করিলেন। রাবণ-চরিত্র অবলম্বনে কবির বিদ্রোহী চেতনা যেভাবে মেঘনাদবধ কাব্যে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ, তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে আনন্দ বোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু অগ্নি ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায়, তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে।...যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।" মেঘনাদবধ কাব্যের ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে এই যে অতি সচেতনভাবে পরিবর্তন ঘটানো হইল, প্রাচীন ধর্ম ও নীতিশাসিত জীবনের পরিবর্তে আত্ম-শক্তি-নির্ভর অটল-ব্যক্তিত্বে উন্নতশির মানুষের মহিমা মূর্ত করিয়া তোলা হইল—ইহাতেই যথার্থভাবে আধুনিক কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। শুধু বিষয় নহে, কাব্য-রচনার দিক হইতেও মেঘনাদবধ আধুনিক শিল্পবোধসম্পন্ন কবিমানসের পরিচয়বহ। নূতন ছন্দে ও রূপান্তরিত ভাষায়, কাহিনীবিন্যাসের পদ্ধতিতে, সুপরিকল্পিতভাবে প্লট গঠনের দ্বারা কাব্যের সংহত

অবয়বনির্মাণে মধুসূদন আধুনিক কবিদের সম্মুখে কবিতার শিল্পরূপ সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পর্কে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ, এবং এই কাব্যেই আধুনিক কবিতার যথার্থ সূচনা হইল।

পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার অনুবর্তনে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নূতন দিগন্ত মধুসূদন উন্মোচিত করিয়া গিয়াছেন। এইদিক হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বীরাঙ্গনা কাব্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বীরাঙ্গনা'য় মধুসূদন ওবিদের অনুসরণে পত্রকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যের এগারটি সর্গে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য হইতে নির্বাচিত প্রসিদ্ধ এগারজন নায়িকার চরিত্র কবি নতুন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্গগুলি পত্রাকারে রচিত আপন বক্তব্য যেন নায়িকার বিভিন্ন অবস্থা-সংকটে নিজেদের প্রেমাস্পদের নিকট পত্রে আপন বক্তব্য নিবেদন করিতেছে। চরিত্রগুলির উপাদান প্রাচীন সাহিত্য হইতে সংগৃহীত হইলেও প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল এবং প্রেম নামক হৃদয়বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন নারী-ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে বিচিত্র রসমূর্তি লাভ করিয়াছে। চরিত্র ও পরিবেশের বিচিত্রতার ফলে হৃদয়াবেগের সুরগুলি সর্বত্র এক নয়, কিন্তু ভাষা ও ছন্দ সর্বত্র বিষয়ের উপযুক্ততার দিক হইতে ত্রুটিহীন। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই কাব্যে অসাধারণ নমনীয়তা অর্জন করিয়াছে। ভাষা ও ছন্দের দিক হইতে বীরাঙ্গনাকে মধুসূদনের সার্থকতম রচনা বলা যায়।

প্রধানত আখ্যান-কাব্যে নিবদ্ধ মধুসূদনের প্রতিভার অন্য এক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার সনেটগুলিতে। সনেট গীতি-কবিতারই একটি বিশিষ্ট রূপ। মাত্র চতুর্দশটি চরণের সুনিয়ন্ত্রিত বন্ধনে সনেটে বক্তব্য সংহতভাবে প্রকাশ করিতে হয়। সনেট-রচনার দ্বারা মধুসূদন বাংলা গীতি-কবিতার নূতন ধারায় সূচনা করিয়াছেন। তাঁহার সনেটগুলি রচিত হইয়াছিল ফ্রান্সে প্রবাসকালে। স্বদেশ হইতে দূরে বসিয়া কবি যেন নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। এইসব কবিতায় তাঁহার অন্তরের পরিচয় অকৃত্রিমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বদেশ এবং মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ, বন্ধুপ্রীতি, স্বদেশ ও বিদেশের পূর্বগামী কবিদের প্রতি বিচিত্র অনুভূতি তিনি এই সনেটগুলিতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইতালীয় কবি পেত্রার্কই সনেটের প্রবর্তক, মধুসূদন যথাযথভাবে পেত্রার্কের সনেটের গঠনরীতি অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার অধিকাংশ সনেটে মিল্টনের সনেটের গঠনাদর্শ অনুসৃত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ রচনাকালে মধুসূদন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার রাধা-বিরহ প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত ব্রজাঙ্গনা কাব্য মেঘনাদবধের দুই খণ্ডের মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিষয় মধুসূদনের রুচির পক্ষে অনুকূল ছিল না, তাঁহার বন্ধুরাও এই কাব্য অনুমোদন করেন নাই। তবুও ব্রজাঙ্গনার কবিতাগুলি ভাষা ও ছন্দের পরীক্ষার জন্য আকর্ষণীয়। দেশজ ভাষার ছন্দস্পন্দ যে মধুসূদনের অপরিজ্ঞাত ছিল না—ব্রজাঙ্গনার কবিতাগুলি তাহার প্রমাণ। "সবচেয়ে লক্ষণীয় হইল ছন্দ। ব্রজাঙ্গনার ছন্দে মধুসূদন যে স্বাধীনতা দেখাইয়াছেন—যতি-সংখ্যায়, ছত্র-সংখ্যায়, মিলে এবং মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে—সে স্বাধীনতা অমিত্রাক্ষর-পয়ার প্রবর্তনের অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়" (সুকুমার সেন)।

[বারো] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর পরিচয় দাও এবং তাঁহার রচনায় কাব্যমূল্য বিচার কর।

উত্তর। রচনা-সংখ্যা এবং জনপ্রিয়তার দিক হইতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান কবি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫ বৎসরে হেমচন্দ্র ছিলেন বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি। এই সময়ে হেমচন্দ্র অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠার প্রমাণ হিসাবে রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছেন, "এখনকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণের দ্বারা সর্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত 'ভারতসঙ্গীত' অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে এবং তূরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে।" সমসাময়িক জনরুচির দ্বারা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হওয়া সত্ত্বেও হেমচন্দ্রের কোন রচনাই চিরন্তনত্বের গৌরব অর্জন করিতে পারে নাই। কালক্রমের দিক হইতে হেমচন্দ্রের স্থান মধুসূদনের ঠিক পরেই, কিন্তু উভয়ের রচনাবলীর মধ্যে তুলনা করিলে মনে হয় মধুসূদন বাংলা কবিতার ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব সাধন করিয়াছিলেন—তাহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি হেমচন্দ্রের ছিল না। পয়ার-ছন্দে যতি-স্থাপনের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মধুসূদন অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন ছন্দ-প্রবর্তন করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাঁহার রচনায় অমিত্রাক্ষরের নামে যে ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মিলহীন পয়ার মাত্র। হেমচন্দ্রের রচনার ভাষাতেও কোন অভিনবত্বের পরিচয় নাই। হেমচন্দ্রের কবিতার মূল্যবিচার প্রসঙ্গে মোহিতলাল

যথার্থই বলিয়াছেন, "বিলাতী আখ্যান-কাব্য, বিলাতী দেশপ্রীতিমূলক গাথা বা গীতিকবিতা, বিলাতী ভাবুকতাপূর্ণ (reflective) কবিতার নানা ভাব ও কল্পনাকে তিনি যেন বাংলায় তর্জমা করিয়াছেন। তিনি ইংরেজী কাব্যের উন্নত আদর্শ কোথাও রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার রচনাভঙ্গিতে কোনও বিশিষ্ট কাব্য-কৌশল নাই—সাধারণের উপযোগী বাক্যার্থ যোজনাই তাঁহার কাব্যের একমাত্র কৌশল। বক্তব্য বিষয়ের সারল্য ও ভাবস্বাচ্ছন্দ্য এবং সর্বোপরি—যে রস ও রুচি সমসাময়িক সমাজে উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহারই উদ্বোধন ও পরিপুষ্টি, ইহাই হেমচন্দ্রের কাব্যের মুখ্য গৌরব। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যরসে অভ্যস্ত পাঠকমণ্ডলীর রুচি ও রসবোধকে আঘাত না করিয়া বর্ণনা, বিষয়বস্তু ও ভাবনার দিকটা তিনি এমন করিয়া ঘুরাইয়া ধরিয়াছিলেন, যে কাব্য-কল্পনার আদর্শ বা উৎকর্ষের কথা কাহারও মনে আসে নাই। বক্তব্য বিষয়ের বৈচিত্র্যে এবং অতিশয় সুলভ ভাবুকতার অবারিত স্রোতে তিনি সমসাময়িক বাঙালীর চিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার ছন্দ, ভাষা ও ভাবুকতায় প্রাচীন বা আধুনিক কোনও আদর্শের চিহ্ন নাই; তিনি তাঁরই কালের কবি।"

হেমচন্দ্রের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির নাম 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১), 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪), 'কবিতাবলী' (১৮৭০), 'বৃত্রসংহার' (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) এবং 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮)। বৃত্রসংহার কাব্যই হেমচন্দ্রের কবিখ্যাতির প্রধান কারণ। ২৫ সর্গে সম্পূর্ণ বৃত্রসংহার কাব্যে বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের বিরোধের পৌরাণিক কাহিনীটি হেমচন্দ্র নূতনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বৃত্রাসুর ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য অধিকারের পর হইতে দধীচির অস্থি দ্বারা নির্মিত বজ্রের আঘাতে যুদ্ধে বৃত্রাসুরের পতন পর্যন্ত এই কাব্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত কাহিনীটির পরিকল্পনায় মেঘনাদবধ কাব্যের প্রভাব খুব স্পষ্ট। রাবণ ও ইন্দ্রজিতের মতো এই কাব্যে বৃত্রাসুর এবং রুদ্রপীড় দেবদ্রোহী। মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন সীতাকে অপমানিত করার ফলে রাবণ শিবের আশ্রয়চ্যুত হইয়াছে—এই কাব্যেও তেমনই বৃত্রাসুরের পতনের হেতু ইন্দ্র-পত্নী শচীর লাঞ্ছনা। দেবতাদের অনুরোধে দুর্গা রাবণবধের উপায় শিবের নিকট হইতে জানিয়া দিয়াছিল, বৃত্রসংহার কাব্যেও বৃত্রবধের উপায় দুর্গাই জানিয়া দেয়। মেঘনাদবধের চেয়ে অবশ্য বৃত্রসংহার কাব্যের

পটভূমি ব্যাপকতর, পটভূমির বিস্তারের দিক হইতে এই কাব্য মহাকাব্যোচিত রচনা। "নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া" এই কাব্যে হেমচন্দ্র বিভিন্নপ্রকার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কাব্যটির কোন কোন অংশে ইংরেজি কবিতার ভাবসংকলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, "বাল্যাবধি আমি ইংরাজিভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবেই তাহা বিচিত্র নহে।" বৃত্রসংহার কাব্য সমসাময়িক কালে মেঘনাদবধের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। কিশোর বয়সের একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথও মেঘনাদবধের তুলনায় বৃত্রসংহারকে শ্রেষ্ঠকাব্য বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "স্বর্গ উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের বিষয়।" কিন্তু কাহিনীর বিশালতা ভিন্ন বৃত্রসংহারে মহাকাব্যোচিত আর কোন গুণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এমনকি সমগ্র কাব্যটির গদ্যময় বিবৃতির মধ্যে সত্যকার কবিতা হইয়া উঠিয়াছে—এরূপ রচনাও খুব বেশি নাই। ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয় এইরূপ একটি সহজ নীতি দ্বারা হেমচন্দ্র সমগ্র কাহিনীটির পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। দধীচির অস্থিদান ব্যাপারটি একটি মহাকাব্যের বিষয় অবশ্যই হইতে পারিত, কিন্তু এ কাব্যে দধীচি কখনো প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা পান নাই। কাব্যের বিষয়বিন্যাসে সংহতিবোধের অভাব এবং চরিত্রগুলির মধ্যে সজীবতা-সঞ্চারের অক্ষমতা রসোত্তীর্ণতার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। মধুসূদন আধুনিক জীবন-চেতনা প্রকাশের জন্য রামায়ণ-কাহিনীর মৌলিক রূপান্তরসাধন করিয়া ধর্মদ্রোহী রাবণ এবং ইন্দ্রজিৎকেই তাঁহার কাব্যে নায়ক-উপনায়কের মর্যাদা দিয়াছিলেন, প্রবল শক্তিমান রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের পরাভবের মধ্যে একটি মহৎ ট্র্যাজিডি রূপবদ্ধ হইয়াছে। ধর্ম বা অধর্মের প্রশ্ন মেঘনাদবধ কাব্যের বিচারে অবান্তর। দুঃখ এবং মৃত্যুর মহিমায় মণ্ডিত মনুষ্যত্বের জয়বার্তা ঘোষণা ছিল মধুসূদনের প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যপক্ষে হেমচন্দ্র পৌরাণিক কাহিনীর বক্তব্য যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া বৃত্রের পরাজয়ে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছেন—তাঁহার কোন নূতন বক্তব্য এই কাব্যে আমরা পাই না।

হেমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে আখ্যানধর্মী কাব্য হিসাবে বৃত্রসংহার ভিন্ন বীরবাহু কাব্যটি উল্লেখযোগ্য। বীরবাহু কাব্যের কাহিনী সম্পূর্ণত কবির কল্পনা-প্রসূত। এই কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য বিষয়ে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল নির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।"

বীরবাহু কাব্যে যে দেশভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, হেমচন্দ্র তাঁহার বহু খণ্ড গীতিকবিতায় সেই দেশাত্মবোধকে উপজীব্য করিয়াছিলেন। দেশাত্মবোধ তাঁহার কবিতার প্রধান সুর। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের নবজাগ্রত দেশাত্মবোধকে হেমচন্দ্র ভাষা দিয়াছিলেন তাঁহার 'ভারতসঙ্গীত' এবং অন্যান্য গীতিকবিতায়। হেমচন্দ্রের গীতিকবিতা-সংকলন তিনখানি 'কবিতাবলী' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং 'চিত্তবিকাশ'-এ বিভিন্ন সময়ে রচিত গীতি-কবিতাগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আখ্যানকাব্যের চেয়ে গীতি-কবিতায় হেমচন্দ্র অধিক পরিমাণে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার খণ্ড-কবিতার মধ্যে ব্যঙ্গ-কবিতা-গুলির পরিহাস-রসিকতা আজও আকর্ষণীয় মনে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁহার অনুবাদ-কবিতার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লংফেলো, শেলী, কীট্‌স, পোপ এবং ড্রাইডেনের বহু কবিতা তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদগুলি অধিকাংশই অবশ্য আক্ষরিক এবং মূলের সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠে নাই। তবুও ইংরেজি কাব্যের সহিত বাঙালি পাঠকদের পরিচয়সাধনের এই শ্রমসাধ্য উদ্যম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।

[তের] **নবীনচন্দ্র সেনের প্রধান রচনাবলীর পরিচয় দাও এবং তাঁহার রচনার কাব্যমূল্য বিচার কর।**

উত্তর। নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "পাখীর যেমন গীত, সলিলে যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার রক্ত-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় নিশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।" নবীনচন্দ্রের প্রকৃতিগত এই কবিতানুরাগ তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল এবং তিনি নানা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের কবিতা রচনা করিয়া রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে বিপুল জনসমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার বিষয় ও রূপের বৈচিত্র্য

বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নবীনচন্দ্রের কবিতার প্রধান দুটি সুর দেশপ্রেম এবং আধ্যাত্মিকতা। বায়রনের দেশপ্রেমমূলক কবিতার সহিত তুলনা করিয়া নবীনচন্দ্রের দেশাত্মবোধের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "নবীনবাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্যস্রোত উচ্ছলিত হয়, তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়, তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীনবাবুর।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটির মধ্যেই নবীনচন্দ্রের শক্তি ও দুর্বলতা উভয়েরই ইঙ্গিত আছে। নবীনচন্দ্রের প্রবল হৃদয়াবেগ কোন সংযমের বাঁধন মানিত না, ভাবাবেগ সংযমিত করিয়া কবিতার শিল্পরূপ নির্মাণের কুশলতার অভাবে তাঁহার অধিকাংশ রচনা শিল্প-সৌন্দর্যহীন। তাঁহার আবেগপ্রবণ মনে কোন অনুভূতির তরঙ্গ জাগিলে তাঁহার সমগ্র সত্তাকে পরিপ্লাবিত করিত এবং আত্মহারা হইয়া অসংযত ভাষায় সেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেন। কৈশোর রচনাতেও যেমন, তেমনি পরিণত বয়সের রচনাতেও তরল ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য মন্দীভূত হয় নাই। নবীনচন্দ্র সময়ের দিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক, তাঁহার চিন্তা-ভাবনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। পাশ্চাত্ত্য ধ্যান ধারণা আত্মস্থ করিয়া স্বদেশের জন্য নূতন জীবনাদর্শ উদ্ভাবনের চেষ্টা এই সময়ের সকল লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রখর বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রাচীন শাস্ত্র পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীকরূপে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র নূতনভাবে গঠন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নবীনচন্দ্র তাঁহার 'রৈবতক', 'প্রভাস' এবং 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে মহাভারতের কাহিনীর পটভূমিতে ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতের কল্পনা রূপায়িত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে একজাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে সংগঠিত করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ। গীতার নিষ্কাম ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমবাদ-এর মিশ্রণে নবীনচন্দ্র আদর্শ মানুষরূপে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র নূতনভাবে কল্পনা করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্র কাব্যচর্চা শুরু করিয়াছিলেন খণ্ড গীতি-কবিতা রচনায়। বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁহার গীতিকবিতাগুলি 'অবকাশরঞ্জিনী' নামে দুই ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৭১ এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। আত্মজীবনীতে নবীনচন্দ্র

লিখিয়াছেন, "আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিতে আরম্ভ করার পূর্বে স্বতন্ত্র ...বিষয়ে খণ্ডকবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না...আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না।" নবীনচন্দ্রের এই দাবি ঐতিহাসিক বিচারে টেকে না, কারণ খণ্ড গীতিকবিতা তাঁহার পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং মধুসূদন লিখিয়াছিলেন। স্বদেশ-প্রেম তাঁহার পূর্বে প্রত্যক্ষভাবে কাব্যে স্থান পাইয়াছিল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। অবশ্য গীতি-কবিতা এবং কবিতার বিষয়রূপে স্বদেশপ্রেম নবীনচন্দ্রের রচনাতেই ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল। 'অবকাশরঞ্জিনী'র দ্বিতীয় খণ্ডের রচনাগুলিতে স্বদেশপ্রেমই প্রধান বিষয়। 'স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ' এবং ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীতের জন্য গর্ববোধ প্রকাশ এইসব কবিতার বৈশিষ্ট্য।

'অবকাশরঞ্জিনী' ভিন্ন নবীনচন্দ্রের অন্যান্য রচনার মধ্যে প্রধান 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৮৫), 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬), 'অমিতাভ' (১৮৯৫) এবং 'অমৃতাভ' (১৯০৯)।

'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিয়াই নবীনচন্দ্র বিখ্যাত হন। উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যায়িকা কাব্যগুলির বিষয় সাধারণভাবে সুদূরকালে ইতিহাস অথবা পুরাণ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। নবীনচন্দ্র অনতিদূরবর্তী কালের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় অবলম্বন করিয়া সাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। যে পরাধীনতার জন্য নবীনচন্দ্রের যুগের শিক্ষিত সমাজে গ্লানিবোধ দেখা দিয়াছিল, তাহার মূল কারণ পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয়। অনতিদূরবর্তী কালের ঘটনা হইলেও পলাশীর যুদ্ধের সত্য ইতিহাস তখনও পাওয়া সম্ভব ছিল না, ইংরেজ লেখকদের রচনায় সিরাজ-চরিত্রে যেভাবে কলঙ্ক লেপন করা হইয়াছিল, নবীনচন্দ্র মুখ্যত তাহারই অনুসরণ করিয়া তাঁহার কাব্যে সিরাজ-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সিরাজকে তিনি কাব্যে প্রধান চরিত্রের মর্যাদা দিতে সংকোচ বোধ করিয়াছেন, মোহনলাল হইয়া উঠিয়াছে এ কাব্যের নায়ক। সে যুগে জাতীয়তাবোধের অর্থ ছিল 'হিন্দু জাতীয়তাবোধ'। মোহনলাল আনুগত্যবোধে সিরাজের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, কিন্তু সিরাজের পরাজয়ে ভারতবর্ষ যে যবন-অধিকার হইতে মুক্ত হইল মোহনলালকে দিয়া এইরূপ উক্তিও করানো হইয়াছে। 'পলাশীর যুদ্ধে' আড়ম্বযুক্ত কোন পূর্ণায়ত কাহিনী নাই। পাঁচ সর্গে সম্পূর্ণ এই কাব্যের প্রতিটি সর্গে এক একটি প্রধান চরিত্র রূপায়িত

করা হইয়াছে। কবি দেশাত্মবোধ প্রকাশের জন্য প্রধানত নির্ভর করিয়াছেন রানী ভবানী এবং মোহনলাল চরিত্র দুটির উপরে। নবীনচন্দ্র এই কাব্যের অনেক স্থানে বায়রনের চাইল্ড হ্যারল্ড-এর যুদ্ধ বর্ণনা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। কাব্য হিসাবে পলাশীর যুদ্ধ অসফল রচনা, কিন্তু দেশাত্মবোধ উন্মীলনের যুগে এই কাব্য ব্যাপকভাবে সমাদৃত হইয়াছিল।

নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কাব্যত্রয়ীতে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, মধ্যলীলা এবং অন্তিমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কাব্য তিনখানি একটি অখণ্ড পরিকল্পনার অন্তর্গত। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে কৃষ্ণ-চরিত্রের অলৌকিক দিকের উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল, ঐতিহাসিক পটভূমির সহিত এই চরিত্রের সংযোগ স্পষ্ট করিয়া তোলা হয় নাই; নবীনচন্দ্র কৃষ্ণ-চরিত্রকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার কাব্যত্রয়ীতে। নবীনচন্দ্রের কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ আর্য-অনার্যের মিলনসাধনে এক ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ রচনার নায়করূপে নূতন তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণ-চরিত্র এইভাবে পুনর্গঠিত করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে নবীনচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীর বিস্তৃত পটভূমি এবং তথ্য ও ঘটনার সমারোহ সত্ত্বেও চরিত্র-চিত্রণের দুর্বলতার জন্য কোন বক্তব্যই পাঠকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে না। কৃষ্ণ-চরিত্রকে তিনি যে বিরাট আদর্শের প্রতিভূরূপে কল্পনা করিয়াছেন, তাহার যোগ্য ব্যক্তিত্ব চরিত্রটিতে কোথাও অনুভব করা যায় না। নবীনচন্দ্র তাঁহার সমস্ত জীবনে প্রবল উৎসাহে নানা শ্রেণীর কাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু যথার্থ কবিপ্রতিভার শক্তি তাঁহার ছিল না। তাঁহার কোন রচনাকেই রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি বলা যায় না।

[চৌদ্দ] **"আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের স্বর শুনিলাম।" বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর এবং তাঁহার রচনাবলীর পরিচয় দাও।**

উত্তর। উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় মহাকাব্যের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ কবিই আখ্যান-কাব্য এবং মহাকাব্য জাতীয় রচনায় উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। পুরাণ ইতিহাস হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া

ইংরেজী আখ্যান-কাব্যের আদর্শে যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণনা এবং স্বদেশানুরাগের উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতামূলক কাব্যরচনায় উনবিংশ শতাব্দীর কবিরা সাহিত্যক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫—১৮৯৪) এই সময়েরই কবি, কিন্তু সমসাময়িক রুচির দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নাই। বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগে নূতন গীতি-কবিতার সুর সর্বপ্রথম তাঁহারই কণ্ঠে জাগিয়াছিল। বিহারীলাল কাব্যের বিষয়ের জন্য পুরাণ বা ইতিহাসের কোন কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিভৃত মনের অনুভূতিপুঞ্জ তিনি স্বগত ভঙ্গিতে কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। কবির নিজেরই হৃদয়ের অনুভূতি, তাঁহার কল্পনার বিচিত্র জগৎ কাব্যের বিষয় হইতে পারে—এ কথা বাংলা দেশে তাঁহার পূর্বে অন্য কোন কবি তাঁহার মতো অনুভব করেন নাই। গীতি-কবিতা প্রাচীনকালেও লেখা হইয়াছে। প্রাচীনকালের যে গীতিকাব্যের পরিচয় আমরা পাই তাহার মধ্যে কবির নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কোথাও নাই, কেননা কোন ধর্মীয় রূপকের আবরণে কবিরা নিজেদের বক্তব্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ প্রাচীনকালের সমাজ পরিবেশে সম্ভবও ছিল না। আধুনিক কালের প্রধান লক্ষণ ব্যক্তিমানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সত্যমূল্য স্বীকৃতি। কাব্যে নিজস্ব ভাবনা-বেদনার জগৎটিকে একান্তভাবে মেলিয়া ধরিবার উদ্যোগ আধুনিক যুগের কবির পক্ষেই সম্ভব। প্রাচীন গীতি-কবিতায় যেমন ধর্মীয় রূপকের আবরণে ব্যক্তিগত অনুভূতির জগৎটি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় কবির নিজের সুর শোনা যায় নাই, বিহারীলালের পূর্ববর্তী আধুনিক কবিদের রচনায়ও আখ্যান-বর্ণনার মধ্যে কবি-হৃদয়ের অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটিয়া ওঠে নাই। বিহারীলালই বাংলা কবিতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম একান্তভাবে নিজের মনের জগৎটির কথা নিজের উপলব্ধিগত দুঃখ-বেদনার কথা অন্তরঙ্গ সুরে প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বস্তুত তাঁহারই রচনায় আধুনিক গীতি-কবিতার যথার্থ সূত্রপাত হইয়াছে। বাংলা গীতিকাব্যের চূড়ান্ত সিদ্ধি যাঁহার সৃষ্টিতে অর্জিত হইয়াছে সেই রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই অগ্রজ কবিদের মধ্যে একমাত্র বিহারীলালকেই নিজের কাব্যগুরুরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তখনকার দিনের বাংলা কবিতার পটভূমির মধ্যে বিহারীলালের রচনার বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত

কবিদিগের স্থায় যুদ্ধবর্ণনা-সংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের স্থায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা স ভামনোরঞ্জনের কোন উদ্দেশ্য দেখা গেল না। সেইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।" সমসাময়িক মহাকাব্য-রচনার সমারোহের পাশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত এই যে একটি স্বতন্ত্র সুর বিহারীলাল বাংলা কবিতায় যোজনা করিলেন, তাহারই আশ্চর্য বিস্তার এবং বৈচিত্র্য দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে।

বিহারীলালের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির নাম 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ-সন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেমপ্রবাহিনী' (১৮৭০), 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) এবং 'সাধের আসন' (১৮৮৯)। এই কাব্যগ্রন্থগুলিতেই বাংলা রোমান্টিক গীতি-কবিতার সূচনা হইয়াছিল। বিহারীলালের মনে বস্তুবিশ্ব যেন স্থূলতা-বিবর্জিত হইয়া সুরে পরিণত হয়। সেই সুর বিষাদময়।

প্রথমদিকের কাব্যগ্রন্থগুলিতে কবির কল্পনা অনেক পরিমাণে বাস্তবতা-নির্ভর। প্রকৃতির দৃশ্যপট, বা নারী-সৌন্দর্যের বর্ণনায় তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়াছেন। জাগতিক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায় কবিমানসের ভাবতরঙ্গগুলি কীভাবে উদ্বেল হইয়া ওঠে তাহার পরিচয় আছে 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন' বা 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যে। বাস্তব সংসারের আনন্দ-বেদনার স্মৃতি এইসব কাব্যের উপকরণ। সৌন্দর্য এবং প্রেম-প্রীতি বিহারীলালের কবি-হৃদয়ের জাগরণ-মন্ত্র। তাঁহার সৌন্দর্য-চেতনা ও প্রেমবোধ হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া এক সুতীব্র উৎকণ্ঠায় জাগতিক বন্ধনগুলি ছিন্ন করিয়া যেন কোন শুদ্ধতর, পরিপূর্ণতর উপলব্ধির জগতে উত্তীর্ণ হইতে চায়। জগতের কলকোলাহল স্তিমিত হইয়া আসে, সব বিচিত্রতা একটিমাত্র সুরের প্রবাহে মিশিয়া যায়। কবি বলেন,

> "মন যেন মজিতেছে অমৃত সাগরে
> দেহ যেন উড়িতেছে সমাবেগ ভরে।"

যে কোন অনুভূতিই তাহার অন্তরে সুতীব্র আবেগ জাগায়। বিহারীলাল তাঁহার হৃদয়াবেগ প্রকাশের ভাষাকে প্রথমদিকের কাব্যগ্রন্থগুলিতে শিল্প-

সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিতে প্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছেন। হৃদয়াবেগ সংযমিত করিবার অক্ষমতায় প্রথমদিকের কবিতাগুলি নির্দিষ্ট আকারবদ্ধ সৌন্দর্যমূর্তি লাভ করে নাই। তাঁহার কবিস্বভাবের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় 'সারদামঙ্গল' কাব্যে। 'সারদামঙ্গল'ই বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই কাব্যের প্রেরণা সম্পর্কে কবি লিখিয়াছিলেন, "মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ, সরস্বতী বিরহ, যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সংগীত রচনা করি।" সারদামঙ্গলে একটি অস্পষ্ট কাহিনীর সূত্র আছে, কিন্তু সেই কাহিনীর রূপরেখাটি কোন বস্তুজগতের ঘটনা অবলম্বনে গড়িয়া ওঠে নাই। সারদামঙ্গলের জগৎ একান্তভাবে কবির অন্তরগত কল্পনার জগৎ। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে কবি সারদার মূর্তি রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যলক্ষ্মীর রূপকল্পনায় কবির সৌন্দর্য-চেতনার সহিত 'বিরহিত মৈত্রী প্রীতির' করুণা মিশ্রিত হইয়াছে, সারদা এক বিষাদঘন সৌন্দর্যময়ী নারী রূপে কল্পিত হইয়াছে। কবিহৃদয়ের সৌন্দর্য-বোধ এবং প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার নির্যাস নিয়া সারদার তনু রচিত। সারদামঙ্গল কাব্যের সূচনায় বাল্মীকির কবিত্বলাভের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া এই করুণাময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব কবি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পর এই সারদার সহিত কবির বিচিত্র লীলার বিবরণ বিভিন্ন সর্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "কখনও অভিমান, কখনও বিরহ, কখনও আনন্দ, কখনও বেদনা, কখনও স্তব। দেবী কবির প্রণয়িনীরূপে উদিত হইয়া বিচিত্র সুখ ও দুঃখের শতধারে সংগীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছেন। কবি কখনও তাঁহাকে পাইতেছেন, কখনও তাঁহাকে হারাইতেছেন—কখনও তাঁহার সংহার-মূর্তি দেখিতেছেন। কখনও বা তিনি অভিমানিনী, কখনও বিষাদিনী, কখনও আনন্দময়ী" (রবীন্দ্রনাথ)। বিশ্বচরাচরের সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্যনৈমিত্তিক সম্পর্কের মধ্যে যেসব অনুভূতি উন্মীলিত হয়, কবি যেন সারদাকে অবলম্বন করিয়া একটি জগৎ রচনা করিয়াছেন, যেখানে তাঁহার ব্যক্তি-অনুভূতির হৃদয়ে সেই অনুভূতিপুঞ্জ স্বতন্ত্র-ভাবে সাবলীল ভঙ্গিতে স্বচ্ছন্দপ্রকাশের অবকাশ লাভ করিয়াছে। কবির কল্পনার জগৎ এই কাব্যে যেমনভাবে প্রকাশলাভ করিয়াছে, এক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোন বাঙালী কবির কাব্যে তাহার পরিচয় নাই।

[পনেরো] মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক রচনার প্রয়াস এবং রঙ্গমঞ্চ সংগঠন-প্রচেষ্টার পরিচয় দাও।

উত্তর। বাংলায় নাটক রচনা এবং রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটক অভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল ইংরেজ আমলে। কলিকাতায় প্রবাসী ইংরেজ-সমাজ নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়া অভিনয়ের আয়োজন করিতেন। ১৭৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত প্লে-হাউস সম্ভবতঃ কলিকাতার প্রাচীনতম রঙ্গমঞ্চ। ইহার পরে কলিকাতায় বিদেশীদের উদ্যোগে আরও বহু রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইসব দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বিত্তবান সম্ভ্রান্ত বাঙালীরা বাংলা নাটক অভিনয়ের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। প্রথম বাংলা-থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব অবশ্য একজন বিদেশীর প্রাপ্য। গেরাসিম লেবেডেফ নামে একজন রুশ পর্যটক ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভাষার জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন। লেবেডেফ *The Disguise* এবং *Love is the Best Doctor* নামক দুখানি ইংরেজী নাটক তাঁহার ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহায়তায় বাংলায় অনুবাদ করেন এবং কলিকাতায় ডোমতলাতে একটি নাট্যশালা নির্মাণ করিয়া এই নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর *The Disguise* নাটকটির প্রথম অভিনয়, ইহাই প্রথম বাংলা নাটক অভিনয়।

লেবেডেফের থিয়েটারের বহু পরে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর নারকেলডাঙার তাঁহার বাগানবাড়িতে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখানে সাধারণতঃ ইংরেজী এবং সংস্কৃত হইতে অনূদিত নাটক মাঝে মাঝে অভিনীত হইত। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের রঙ্গমঞ্চের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজারের থিয়েটার। নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারে বৎসরে চার-পাঁচটি বাংলা নাটক অভিনীত হইত। শহরের বিত্তবানদের চেষ্টায় অতঃপর বহু শৌখিন থিয়েটার কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইসব শৌখিন থিয়েটারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৭), রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' (১৮৫৮), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়'

(১৮৬৫) এবং 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা'। এই শৌখিন থিয়েটারের অভিনয়েই সাধারণের মধ্যে নাট্যরসপিপাসা জাগ্রত হইয়াছিল। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে জনসাধারণের জন্য নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৭২ সালে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলাদেশে যথার্থভাবে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা হয়।

থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের উপযোগী নাটকের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথমদিকে ইংরেজি এবং সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের দ্বারাই এই প্রয়োজন মিটাইতে হইত। প্রথম যুগের অনূদিত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' এবং 'চারুমুখ চিত্তহরা'। নাটক দুটি শেকস্পীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভিনিস' এবং 'রোমিও জুলিয়েটে'র ভাবানুবাদ। আর 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রথম সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, লেখকের নাম বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন।

এই যুগের দুটি নাটক মৌলিক 'কীর্তিবিলাস' এবং 'ভদ্রার্জুন'। দুটি নাটকই প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। কীর্তিবিলাসের লেখক জে. সি. গুপ্ত। এই নাটকটির গঠনে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অনুসৃত হইয়াছিল, ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুসরণে ট্র্যাজিডি রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে কীর্তিবিলাস নাটকটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ভদ্রার্জুনের লেখকের নাম তারাচরণ শিকদার। কীর্তিবিলাসের সূচনায় সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে নান্দী এবং প্রস্তাবনা যোগ করা হইয়াছিল, তারাচরণ সংস্কৃত নাট্যরীতি সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া অঙ্কবিভাগ এবং দৃশ্যবিন্যাসে ইংরেজি নাটকের গঠনরীতি সর্বতোভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই নাটক দুটি কোন রঙ্গমঞ্চে কখনো অভিনীত হয় নাই, তাই পরবর্তী নাট্যরচনার ধারায় ইহাদের কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২—১৮৮৬) বাংলা নাটকের ইতিহাসে প্রথম শক্তিমান লেখক। তাঁহার রচিত অনূদিত নাটকগুলি বহুবার সাফল্যের সহিত শৌখিন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছি এবং সে যুগে তিনিই ছিলেন রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মিটাইবার মতো একমাত্র লেখক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহুমুখী সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, সাহিত্যেও এই আন্দোলনের ছায়া পড়িয়াছে। সামাজিক কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু ব্যঙ্গরচনা এবং নাটক লেখা হইয়াছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'

(১৮৫৪) এবং 'নব নাটক' (১৮৬৬) এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৌলীন্যপ্রথা এবং বহু-বিবাহের কুফল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রামনারায়ণ এই নাটক তুইটি রচনা করিয়াছিলেন। 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' আদ্যন্তযুক্ত কাহিনী অবলম্বনে সংহত নাট্যকায়া লাভ করে নাই, বিভিন্ন দৃশ্যে এক একটি পরিস্থিতির পটভূমিকাতে কয়েকটি টাইপ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। ইহাকে ঠিক নাটক বলা যায় না। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চের জন্য রামনারায়ণ 'নব নাটক' রচনা করিয়াছিলেন। নাটকটির সম্পূর্ণ নাম—'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব নাটক'। কুলীনকুল-সর্বস্বের তুলনায় নব নাটকে অভিনয়-যোগ্যতা এবং নাট্যগুণ অনেক বেশি, এই নাটক বহুবার ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছিল। সমসাময়িক সমাজের পটভূমি অবলম্বনে রামনারায়ণ 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' 'উভয়সঙ্কট' 'চক্ষুদান' প্রভৃতি ছোট আকারের প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কালের পটভূমি ভিন্ন পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে রামনারায়ণ রুক্মিণীহরণ (১৮৭৪), কংসবধ (১৮৭৫) এবং ধর্মবিজয় নামে তিনটি নাটক রচনা করেন। মৌলিক নাটক ভিন্ন তিনি বেণীসংহার, রত্নাবলী, অভিজ্ঞানশকুন্তল এবং মালতীমাধব—এই চারটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। বাংলা নাটকের প্রথম যুগে রামনারায়ণের রচনাবলীই ছিল শৌখিন রঙ্গমঞ্চগুলির একমাত্র অবলম্বন এবং বাংলাদেশে অভিনয়শিল্পের সূচনাপর্বে অভিনয়যোগ্য নাটক সরবরাহ করিয়া তিনি শিল্পের এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

[যোল] মধুসূদন দত্তের নাটক ও প্রহসনগুলির পরিচয় দাও এবং বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁহার কীর্তির মূল্য বিচার কর।

উত্তর। মধুসূদনের পূর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল রামনারায়ণ তর্করত্নের। রামনারায়ণ উচ্চ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু জনসমাজের সদ্য-জাগ্রত নানা রসপিপাসা নিবৃত্তির জন্য নানা বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে নাটক রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের রিহার্সাল দেখিয়া মধুসূদন বাংলা নাটকের সম্পর্কে অবহিত হন এবং নাটক রচনার প্রতিজ্ঞা করেন। 'অলীককুনাট্যরঙ্গে'র পরিবর্তে যথার্থ শিল্প-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন নাটক রচনায় প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের চর্চায় পরিশীলিত শিল্পবোধ এবং মৌলিক প্রতিভা লইয়া মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় নাটকের শিল্পরূপ যথার্থভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সংস্কৃত ঐতিহ্যের অনুবর্তন না করিয়া তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকারদেরই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre."

মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। ইহার পরে তিনি 'পদ্মাবতী' নাটক (১৮৬১) এবং দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা সংখ্যায় বিপুল নয়, কিন্তু এই পাঁচটি মাত্র রচনায় তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকলা বাংলায় অনুবর্তনের এবং প্রহসন রচনায় অসফল প্রয়াসের অবসান ঘটাইয়া নাটক ও প্রহসনের যথার্থ আদর্শ বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বিষয়ের দিক হইতে মধুসূদনের নাটকগুলির মধ্যে শর্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতীকে পৌরাণিক এবং কৃষ্ণকুমারীকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কাহিনী মধুসূদন মহাভারতের যযাতি-দেবযানী উপাখ্যান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নাটকটিতে মুখ্য ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত করাইয়া দেখানো হয় নাই, বিবৃতির মাধ্যমে নাট্যকাহিনী উপস্থাপন করা হইয়াছে। ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। গঠনের দিক হইতে পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসৃত হইলেও শর্মিষ্ঠা নাটকের সংলাপ অনেক পরিমাণে সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে রচিত। শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর প্রতি যুগপৎ আকর্ষণে যযাতি চরিত্রে যে দোলাচলচিত্ততা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল মধুসূদন তাহার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, ফলে যযাতি এবং অন্যান্য চরিত্রেও গভীরতা সঞ্চারে ব্যর্থ হইয়াছেন। এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'শর্মিষ্ঠা' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল এবং বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছিল। পদ্মাবতী নাটকটিরও বিষয়বস্তু পৌরাণিক, কিন্তু কাহিনীর মূল রূপটি মধুসূদন সংগ্রহ করিয়াছিলেন গ্রীক পুরাণ হইতে। গ্রীক পুরাণের Apple of Discord নামক বিখ্যাত পৌরাণিক কাহিনীটি ভারতীয় পুরাণের ছকের মধ্যে নতুনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। গ্রীক পুরাণের দেবদেবীর

বিরোধের মূল কারণ ছিল স্বর্ণময় আসন, মধুসূদনের কাহিনীতে বিরোধের হেতু স্বর্ণপদ্ম। শর্মিষ্ঠার ত্রুটি-বিচ্যুতি মধুসূদন এই নাটকে অনেক পরিমাণে কাটাইয়া উঠিয়াছেন। শর্মিষ্ঠার মতো এই নাটকে কাহিনীটি পরোক্ষ বিবরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় নাই, নাটকের মধ্যে প্রত্যক্ষ ঘটনা ও চরিত্রের সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করিয়া কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। চরিত্রগুলিও ছকে ফেলা মানুষ নয়, স্বাতন্ত্র্যযুক্ত এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। পদ্মাবতী নাটকের কয়েকটি সংলাপে মধুসূদন মিলহীন পয়ার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্বরূপ হিসাবে এই সংলাপগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে মধুসূদন ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। কাহিনীটি টডের রাজস্থান হইতে গৃহীত। রাজা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণা। মানসিংহ এবং জয়সিংহ দুই রাজা কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থী। কৃষ্ণাকে না পাইলে তাহারা ভীমসিংহের রাজ্য ধ্বংস করিবে। ভীমসিংহের মনে কন্যাস্নেহ এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার কর্তব্যবোধের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দিল। শেষে কৃষ্ণার আত্মহত্যায় সমস্ত সমস্যার অবসান ঘটে, এবং নিদারুণ আঘাতে ভীমসিংহ উন্মাদ হইয়া যায়। কাহিনীটির পরিণামে যে ট্র্যাজিডি ঘটে তাহার হেতু চরিত্রের মধ্যে নিহিত ছিল না, বাহিরের অপ্রতিরোধ্য শক্তির চাপেই এই পরিণতি সম্ভব হয়। নাট্য-কাহিনী বিন্যাসের এই ভঙ্গির মধ্যে প্রকারান্তরে গ্রীক অদৃষ্টতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীর বহুশাখান্বিত বিস্তার ও জটিলতা এবং চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক-গ্রন্থনের নৈপুণ্যে 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাটকের মধ্যে অন্যতম।

প্রাচীন ও আধুনিক জীবনাদর্শের সংঘাতে আন্দোলিত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নানাবিধ অসঙ্গতি এবং চারিত্রিক ভারসাম্যের অভাব সহজেই চোখে পড়ে। এইসব অসঙ্গতিই সে যুগের ব্যঙ্গ রচনার উপকরণস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। নাট্যাকারে ব্যঙ্গচিত্র রচনার প্রয়াস হইতে বাংলা নাটকে প্রহসন নামক উপশাখাটির জন্ম। মধুসূদন এই ব্যঙ্গাত্মক রচনার একটি পরিচ্ছন্ন রূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুখানিতে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় আধুনিক শিক্ষাভিমানী যুবকদের সংস্কারমুক্তির নামে মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক অনাচারের ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হইয়াছিল। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে

রোঁ'-তে মধুসূদনের বিদ্রূপের লক্ষ্য প্রাচীনপন্থীদের ধর্মের নামে ভণ্ডামি এবং দুশ্চরিত্রতা। তুলনামূলকভাবে আলোচনা করিলে বলিতে হয় 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনখানি 'একেই কি বলে সভ্যতা'র চেয়ে উন্নততর সৃষ্টি। সাধারণ বাঙালি জীবনের সহিত এবং লৌকিক বাংলা ভাষার সহিত মধুসূদনের নিবিড় পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনটিতে। এই প্রহসনের ধর্মের ভেকধারী ভক্তপ্রসাদ এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি মধুসূদন জীবন্ত করিয়া তুলিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন।

মধুসূদনের নাটক রচনার ঝোঁক দুই বৎসরকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিনি যে কয়েকটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি নিজস্ব গতিপথের সন্ধান লাভ করিয়াছে। মধুসূদন তাঁহার প্রতিভার শক্তির তুল্য সৃষ্টি সাহিত্যের কোন শাখাতেই রাখিয়া যান নাই, নাটকেও কৃষ্ণকুমারী এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁতে যে শক্তির পরিচয় তিনি দিয়াছিলেন তাহা পূর্ণরূপে বিকশিত না হইতেই তাঁহার নাটক রচনার উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া যায়। নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি পথ প্রস্তুত করিতেই নিজের শক্তি যেন নিঃশেষিত করিয়াছিলেন, আপন শক্তির জন্য কীর্তি স্থাপন করিয়া যান নাই। তবুও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির তুলনায় দীনতম নাট্যশাখায় মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটক এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসন শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির মর্যাদায় ভূষিত রচনা।

[সতেরো] বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা নাটক ও প্রহসনের আঙ্গিক সমস্যা মধুসূদন সমাধান করিয়াছিলেন, সিরিয়স নাটক এবং প্রহসনের গঠন সম্পর্কিত আদর্শ তিনিই স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সব নাট্যকার মধুসূদন নির্দেশিত গঠনরীতি অনুসরণ করিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন। বাংলা নাটকের আঙ্গিকগত পরিণতির দিক হইতে দীনবন্ধু নতুন কিছু করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ছিল যথার্থ নাট্যকারের প্রতিভা। তিনিই বাংলা সাহিত্যের একমাত্র লেখক যাঁহার মধ্যে অবিমিশ্রভাবে প্রথম শ্রেণীর নাটকীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দীনবন্ধু তাঁহার কল্পনাকে প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের অধীন করিয়া যথাপ্রাপ্ত জগৎ এবং জীবনের রূপ তাঁহার নাটক-

ভঙ্গিতে মেলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার নাটকের পরিমণ্ডলে কোন কল্পিত জীবনাদর্শ আরোপ করিবার, কোনরূপ ভাব-ব্যাখ্যার সজ্ঞান প্রচেষ্টা কোথাও নাই। "জীবনের যাহা কিছু প্রত্যক্ষ অনুভূতিগোচর তাহাই যখন আপনারই ভঙ্গিতে আপনারই নিয়মে, একটি সুসমঞ্জস রসমূর্তি পরিগ্রহ করে—যাহা আছে তাহাকে তদ্বৎ উপভোগ করিবার শক্তিই যখন পরমানন্দের কারণ হয়—এই জীবন ও জগৎ যখন স্বাতন্ত্র্যাভিমান-বর্জিত মনকে হাত ধরিয়া নিজের পথে পথ দেখাইয়া বস্তু সকলের সুগভীর রহস্য নিকেতনে লইয়া যায়, তখন এই যথাপ্রাপ্ত জগৎই অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া যে রসের আস্বাদন করায় নাট্যকার সেই রসের রসিক।...কল্পনার এই objectivity উৎকৃষ্ট নাটকীয় প্রতিভার লক্ষণ, আমাদের সাহিত্যে অতি অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে—সেই অল্পের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ" (মোহিতলাল)।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক 'নীলদর্পন' (১৮৬০)। নীলদর্পন রচিত হইয়াছিল বাংলা দেশের এক সংকটমুহূর্তে। বাংলাদেশে ইংরেজ বনিকেরা নীল উৎপাদনের জন্য গ্রামাঞ্চলে কুঠিস্থাপন করিয়া বসবাস করিত। নীলের চাষ কৃষকের পক্ষে লাভজনক ছিল না, কিন্তু নীলকরদের অত্যাচারের ভয়ে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রায়তেরা নিজেদের জমিতে নীল উৎপাদন করিত। দেশের কৃষি-অর্থনীতিতে এই নীলচাষ ক্রমেই বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে থাকে। নীলচাষে বাধ্য করিবার জন্য নীলকরেরা চাষীদের উপরে নানাভাবে নির্যাতন চালাইত, এই অবিচারের প্রতিকার করিবার কোন উপায় ছিল না। আদালতের শ্বেতাঙ্গ বিচারকেরা নীলকরদেরই পক্ষ অবলম্বন করিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ১৮৫৯-৬০ সালে কৃষকদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ব্যাপক বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পাইতে থাকে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জীর চেষ্টায় দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও এই নীলবিদ্রোহের প্রতি ব্যাপক সহানুভূতি দেখা দেয়। নীলবিদ্রোহ যে আকারে ধারণ করিয়াছিল তাহাকে সর্বাত্মক গণঅভ্যুত্থান বলাই সঙ্গত। দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের মনে যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হইয়াছিল দীনবন্ধু তাহাকেই এই নাটকটিতে ভাষা দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তৎকালীন প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন

জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে হইল।" একটি গ্রামের পটভূমিতে জমিদার এবং হিন্দু মুসলমানের রায়তদের জীবনে নীলকরদের অত্যাচারজনিত সংকট দীনবন্ধু এই নাটকে রূপায়িত করিয়াছেন। নাটকের অধিকাংশ ঘটনা বাস্তব জীবন হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম বাংলাদেশের সর্বায়ত জীবনের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হইল। শুধু প্রকৃত ঘটনার প্রতিচিত্রণ নয়, দীনবন্ধু তাঁহার নাটকের পরিমণ্ডলে এক নিষ্ঠুর শক্তির সম্মুখীন মানুষগুলির আচরণে এবং বাচনে যেমন সেই সংকটের তীব্রতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তেমনই চরিত্রগুলিকে সপ্রাণ, জীবন্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিশেষভাবে ভদ্রেতর চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে তিনি চরিত্রসৃষ্টির অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। নীলদর্পণ নাটকের চরিত্রগুলি আদর্শায়িত মানুষ বা কোন আদর্শের প্রতিভূ চরিত্র নয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাহাদের শক্তি ও দুর্বলতা, তাহাদের বিশিষ্টস্বভাব লইয়া এই নাটকের বাস্তব পটপ্রেক্ষায় নিজেদের যথাযথ স্থান অধিকার করিয়াছে। নীলদর্পণে গঠনের দিক হইতে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিডির আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। কাহিনীর পরিণাম চিত্রণে দীনবন্ধু যুক্তিপারম্পর্য রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, ফলে নাটকটির শেষে মৃত্যুগুলি আকস্মিকভাবে আসে মনে হয়। ট্র্যাজিডি হিসাবে এই নাটক খুব সফল রচনা নয়, কিন্তু একটি জাতীয় সংকটের প্রতিরূপ যথাযথভাবে এই নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং নাটকটি আমাদের জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই নাটকের মধুসূদন দত্ত-কৃত ইংরেজি অনুবাদ *The Indigo Planters Mirror* প্রকাশ করিবার অপরাধে পাদ্রী লঙকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল।

নীলদর্পণ ভিন্ন দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকগুলির নাম 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'জামাইবারিক' (১৮৭২) এবং 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩)। এই সব রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'সধবার একাদশী'। মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় আধুনিক শিক্ষাভিমানী যুবকদের নীতিভ্রষ্ট আচরণ পদ্ধতির ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি এবং সর্বপ্রকার নীতিবোধের প্রতি উদ্ধত

ভাজিছলা উনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর একাংশের মধ্যে যে বিকার সৃষ্টি করিয়াছিল মধুসূদন তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেলেন। দীনবন্ধু সধবার একাদশীতে এই প্রসঙ্গটিকেই বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দীনবন্ধুর রচনা প্রহসনের পরিণাম রসিকতার লঘুতা অতিক্রম করিয়া সিরিয়স নাটকের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সধবার একাদশীতে নায়ক নিমে দত্তকে শ্রেণী-প্রতিনিধি টাইপ চরিত্র বলা যায় না। তাহার বিকৃত জীবনাচরণের মধ্যে নীতিভ্রষ্ট যুবক সম্প্রদায়ের প্রতিচ্ছবি আছে, কিন্তু নিমচাঁদের চরিত্রে প্রখর আত্মসচেতনা, দুর্মর প্রবৃত্তির মতো মদ্যাসক্তির জন্য জীবনের সকল সম্ভাবনা বিনষ্ট হওয়ার দুঃখবোধ এবং 'বিশুষ্ক জীবন-সুখ বিফলীকৃত শিক্ষার জন্য' আক্ষেপ —তাহাকে একটি ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত চরিত্রে পরিণত করিয়াছে। নিমচাঁদকে কখনোই প্রহসনের টাইপ চরিত্র মনে হয় না, বরং মনে হয় শিক্ষা-দীক্ষায় পরিমার্জিত, জীবনের শুভাশুভ বিষয়ের প্রখর চেতনাসম্পন্ন একটি মানুষ নিজেকেই প্রবৃত্তির দুশ্ছেদ্য বন্ধনের মধ্যে সজ্ঞানে নিজেকে ক্ষয় করিতেছে। নিমচাঁদ চরিত্র ট্র্যাজেডিরই নায়ক চরিত্র। এই চরিত্রটির জন্যই সধবার একাদশী প্রহসনের সীমা অতিক্রম করিয়া সিরিয়স নাটকের সীমায় উন্নীত হইয়াছে। শিল্পের বিচারে সধবার একাদশীই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ রচনা।

দীনবন্ধুর 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' এবং জামাইবারিক' প্রহসন সৃষ্টিও সেকালে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হইয়াছে। বিয়ে-পাগলা বুড়োয় বিবাহ-বাতিকগ্রস্ত এক বৃদ্ধের দুর্দশার কাহিনী কৌতুকরসের উৎস। জামাইবারিক প্রহসনটির বিদ্রূপের লক্ষ্য একটি বিত্তবান পরিবারের ঘরজামাই প্রথা।

দীনবন্ধুর সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার কল্পনাশক্তিতে বলিষ্ঠতার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একথা ঠিকই যে বিশেষ বিশেষ চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সেই চরিত্রগুলি সুসংবদ্ধ কাহিনীর মধ্যে স্থাপন করিয়া সংহত নাট্যকায়া নির্মাণে তিনি ততটা সফল হয় নাই। তাঁহার নাটকের মধ্যে একমাত্র সধবার একাদশী ভিন্ন অখণ্ড, যুক্তিপারম্পর্য-সমন্বিত কাহিনী ও চরিত্রের পারস্পরিক সহযোগে নির্দিষ্ট আকার-বদ্ধ প্লট কোথাও তিনি গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন একটি চরিত্রের প্রতি তাঁহার মনোযোগ সম্পূর্ণতঃ নিবদ্ধ হইয়া থাকায় নাটকের সামগ্রিক শিল্পরূপ বিষয়ে তিনি উদাসীন। চরিত্র-সৃষ্টিতেই শুধু তাহার

অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার কালের তো বটেই, পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক। তাঁহার নাটক প্রহসনগুলিতে জীবন-রসে সমৃদ্ধ বহু চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। উচ্চ ভাব-কল্পনার গৌরব হয়তো তাঁহার প্রাপ্য নয়, তবুও একথা স্বীকার করিতেই হইবে বাঙালি নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই সেই শক্তি ছিল—যে শক্তির বলে জগৎ এবং জীবনের বাস্তব রূপকে নাটকে জীবনেরই মতো বাস্তব করিয়া তোলা যায়। বাংলাদেশর লোকায়ত জীবনের ছবি তাঁহার দৃষ্টিতে যেমনভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—অতি আধুনিক গল্প উপন্যাস ভিন্ন বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও তাহার তুলনা নাই।*

বাংলা দেশের অভিনয় শিল্পের বিকাশে দীনবন্ধুর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার পূর্বে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু লইয়া যে সব নাটক রচিত হইয়াছিল—বিত্তবান উৎসাহী ব্যক্তি ভিন্ন কেহ সেই নাটক অভিনয়ের আয়োজন করিতে সাহসী হইতেন না। সেই সব নাটক-অভিনয়ের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা সাধারণ লোকের ছিন না। দীনবন্ধুর সামাজিক বিষয়াশ্রিত নাটকগুলি অভিনয়ে পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির জন্য অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইত না। এই কারণে তাঁহার নাটকগুলি অবলম্বন করিয়াই ব্যাপকভাবে অভিনয়ের চর্চা শুরু হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছিলেন যে, দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলি ছিল বলিয়াই কয়েকজন বিত্তহীন যুবক ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র এইজন্য দীনবন্ধু মিত্রকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

[আঠারো] গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলীর পরিচয় দাও এবং নাটক রচনায় ও রঙ্গমঞ্চ সংগঠনে তাঁহার কীর্তির মূল্য বিচার কর।

উত্তর। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) শুধু নাট্যকার ছিলেন না, তাঁহার জীবন সর্বতোভাবে রঙ্গমঞ্চের সহিত জড়িত ছিল। শক্তিমান অভিনেতা, প্রতিভাশালী পরিচালক ও অভিনয় শিক্ষক এবং রঙ্গমঞ্চ সংগঠকরূপে গিরিশচন্দ্র বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার পূর্বে অভিনয়-চর্চা চলিত প্রধানতঃ কলিকাতার বিত্তবান পরিবারগুলির পৃষ্ঠপোষকতায়, এইসব অভিনয়ের আসরে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য জাতীয় নাট্যশালা

প্রতিষ্ঠার কাজে গিরিশচন্দ্র আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড়ো কীর্তি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা। ন্যাশনাল থিয়েটারই বাংলাদেশের প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত সাধারণ নাট্যশালা। রঙ্গালয়ে নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করা এক দুরূহ সমস্যা। এজন্য প্রয়োজন একটি সুশিক্ষিত সংগঠিত অভিনেতৃ সম্প্রদায় এবং নতুন নতুন নাটক। গিরিশচন্দ্র সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য বেতনভুক্ অভিনেতৃ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র নিজে ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা। ব্যক্তিগত-ভাবে বিভিন্ন নাটকের চরিত্র রূপায়ণে তিনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন বাঙালি অভিনেতারা পরবর্তীকালে সেই আদর্শই অনুসরণ করিয়া শিল্পের এই শাখাটি সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মূল কারণ তাঁহার অভিনয়প্রতিভা। রঙ্গমঞ্চের পরিচালকরূপে দর্শকদের চাহিদা মিটাইবার জন্য তাঁহাকে নিত্য-নূতন নাটক অভিনয়ের আয়োজন করিতে হইত। অভিনয়যোগ্য নাটক তাঁহার পূর্বে খুব বেশি রচিত হয় নাই, অথচ নাট্যশালা চালু রাখিতে গেলে নতুন নাটক একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই তিনি নিজেই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত জীবনে গিরিশচন্দ্র প্রায় একশতটি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা সংখ্যার বিপুলতা সত্যই বিস্ময়কর। অবশ্য এইসব রচনার অধিকাংশই ইতিমধ্যে বিস্মৃতির মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। তিনি যতোবড়ো অভিনেতা ছিলেন তাহার তুলনায় তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা কতোটা ছিল এবিষয়েও সংশয় দেখা দিয়াছে। নাট্যকার হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব দুইদিক হইতে বিচার করা যাইতে পারে। প্রথমত, দেখা প্রয়োজন মধুসূদন-দীনবন্ধু বাংলা নাটকের আঙ্গিকগত উৎকর্ষের যে মান স্থাপন করিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র নিজের রচনায় সেই মান কতোটা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং শিল্পের এই নতুন শাখাটিতে পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য তিনি কতোটা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার নাটকগুলি সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে রসোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে কিনা। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শ বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষায় যে য়ুরোপীয় আঙ্গিকের নাটক রচনা সম্ভব—তাহা তিনি নিজের রচনায় প্রমাণ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু নাটক ও প্রহসনে নতুন কোন আঙ্গিকগত

পরীক্ষা করেন নাই, মধুসূদনের আদর্শই তিনি অনুবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু দীনবন্ধুর সৃষ্টিতে এই নতুন শিল্পমাধ্যমটি বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। প্রাচীন যাত্রা-গানের অভিনয় রীতির পরিবর্তে আধুনিক নাট্যকলার উন্নততর আদর্শ এইভাবে আমাদের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার রচনায় এই ঐতিহ্য অগ্রসর করিয়া লইবার দায়িত্ব পালন করেন নাই। তিনি রঙ্গমঞ্চ পরিচালকরূপে অনুভব করিয়াছিলেন পাশ্চাত্ত্য আদর্শের নাটকের পরিবর্তে যাত্রা-পালার মতো সঙ্গীতবহুল, ধর্মীয় বিষয়াশ্রিত নাটকই সাধারণ দর্শকের স্পৃহনীয়। জনরুচির কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সাধারণের রুচি উন্নত করিয়া তুলিবার আগ্রহ তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি যাত্রা এবং নাটকের এক মিশ্ররূপ সৃষ্টি করিয়া সহজ জনপ্রিয়তার পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। জনসাধারণের ভক্তিরসের তৃষ্ণা এবং অলৌকিক শক্তির প্রতি সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত নাটকগুলির মধ্যে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কোন স্বকীয় চিন্তা-ভাবনার পরিচয়ও নাই। ফলে বিষয় যাহাই হউক, একপ্রকার ভাবাবেগ জাগ্রত করা ভিন্ন তাঁহার নাটক আমাদের মনে কোন গভীর রসাস্বাদ জাগায় না। তাঁহার বিপুল রচনার মধ্যে মাত্র চার-পাঁচখানি নাটক কিছু পরিমাণে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন।

সমসাময়িক কালে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলিই বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত ছিলেন, ধর্ম বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ছিল প্রবল। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব ধারণার পরিচয় নাটক হইতে কিছু বোঝা যায় না। পৌরাণিক বিষয় এবং মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বনে তিনি যে সব নাটক লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে যুক্তিবিচারহীন ভক্তির উচ্ছ্বাস এবং অলৌকিক শক্তির প্রতি প্রগাঢ় আস্থা প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দু জীবনাদর্শের অনুমোদিত নীতি প্রচার এইসব রচনার একমাত্র লক্ষ্য। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে জনা, বুদ্ধদেব চরিত, শংকরাচার্য, বিল্বমঙ্গল, অভিমন্যুবধ, পাণ্ডবগৌরব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'জনা' শ্রেষ্ঠ রচনা।

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জাতীয় জীবনে দেশাত্মবোধ ও

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করার দিক হইতে তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকের বিশেষ মূল্য আছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে যে নতুন চেতনা দেশের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, জনসমাজ সেই উদ্দীপনা সঞ্চারিত করার কাজে গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সহায়ক হইয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম এবং ছত্রপতি শিবাজী বিখ্যাত।

গিরিশচন্দ্র কলিকাতার নাগরিক জীবনের নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। যৌথ পরিবারের ভাঙন, মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের বিবাহ সমস্যা, শহরের নিচুতলার জীবনের বিকার বিকৃতির প্রভাব মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার নানাবিধ দৃষ্টান্তে তিনি তাঁহার সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক বিষয়াশ্রিত রচনার মধ্যে 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' এবং 'শাস্তি কি শান্তি' সমাদৃত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল'র খ্যাতি একাল পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ আছে।

গিরিশচন্দ্রের এইসব নাটকের সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশি নয়, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিনয়ে এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের অভিনেতাদের পারদর্শিতায় নাটকগুলি মঞ্চসাফল্যের গৌরব অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সমসাময়িক রুচির পরিতৃপ্তিসাধন ভিন্ন তিনি সত্যকার সাহিত্যিক সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হন নাই। তবুও এইসব নাটক অবলম্বন করিয়াই গিরিশচন্দ্র বাংলাদেশে সাধারণ নাট্যশালা স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার অসাধারণ অভিনয় প্রতিভাও বিকশিত হইয়াছিল এইসব নাটকের অভিনয়েই। এই কারণে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

[উনিশ] বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান নির্দেশ কর এবং তাঁহার রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) যখন রচনা শুরু করিয়াছিলেন তখন রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের অপ্রতিহত একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিলেন। যাত্রার পদ্ধতিতে গীত ও নৃত্যবহুল

নাটক রচনার ধারায় গিরিশচন্দ্র মধুসূদন-দীনবন্ধুর ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে পরিশীলিত মন লইয়া নতুন উদ্যমে নাটকের আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত করিলেন এবং মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলা বাংলায় আরম্ভ করিবার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন সেই পথেই বাংলা নাটক রচনার ধারা অগ্রসর করিতে সচেষ্ট হইলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করিবার চেষ্টার মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাস এবং পুরাণ হইতে নাট্যবিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হাতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গগুলি সম্পূর্ণ নূতন তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের রূপায়ণ পদ্ধতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক ট্র্যাজেডিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে যেমন বিরোধী ঘটনার দ্বন্দ্বের সহিত চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব সংযুক্ত করিয়া দ্বিমুখী দ্বন্দ্বে নাট্যকাহিনীতে গভীরতা আনা হয়, দ্বিজেন্দ্রলালও সেইভাবে চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার নাটকে ঘটনাধারার উৎস নিহিত থাকে চরিত্রগুলির দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত অন্তরের মধ্যে। তিনি চরিত্রের মনের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট করিবার জন্য প্রায়ই দীর্ঘ স্বগত উক্তি ব্যবহার করেন। স্বগত ভাষণের বাহুল্য দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অন্যতম প্রধান ত্রুটি। সংলাপের ভাষা সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন, এবং নাটকের মধ্যে কাব্যময় ভাষা ব্যবহারের উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া লইতেন। সংলাপের ভাষা অলংকারপ্রবণতা অনেক সময়ে তাঁহার নাটকে কাহিনীর ধারাপ্রবাহ ব্যাহত করে।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমদিকে কয়েকটি ব্যঙ্গবিদ্রূপময় প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'কল্কি অবতার', 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ' প্রভৃতি লঘুরসের নাটকগুলি মঞ্চ-সফল রচনা হইলেও ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য ছিল না। গিরিশচন্দ্রের আদর্শে তিনি 'পরপারে' এবং 'বঙ্গনারী' নামে দুটি সামাজিক নাটক রচনা করেন—সামাজিক নাটকেও দ্বিজেন্দ্রলাল সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে। বিশেষভাবে ঐতিহাসিক নাটকেই তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পাষাণী সীতা এবং ভীষ্ম—এই তিনখানি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ভীষ্মই দ্বিজেন্দ্রলালের

শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির নাম—প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত এবং সিংহল বিজয়। চন্দ্রগুপ্ত এবং সিংহল বিজয় ভিন্ন সব কয়টি নাটকেই দ্বিজেন্দ্রলাল মোগল ও রাজপুত ইতিহাসের উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন। মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে রাজপুতদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের কাহিনীর আচ্ছাদনে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রক্ষিপ্ত করিয়া দেখাইবার সুযোগ ছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন নাটকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। মেবার পতনে জাতীয়তাবোধের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল উপনীত হইয়াছেন বিশ্বমানবতার আদর্শে। মোগল ইতিহাসের ক্ষমতা দ্বন্দ্ব, বিচিত্র চক্রান্ত এবং চমকপ্রদ ঘটনার নাটকীয়তার প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল আকর্ষণ বোধ করিয়াছেন। সাজাহান এবং নূরজাহান নাটক মোগল সম্রাটদের শক্তির উত্থান-পতনের তরঙ্গসঙ্কুল ঘটনাধারার সহিত চরিত্রগুলির বিচিত্র হৃদয়বৃত্তির মিশ্রণে জটিল নাট্য-কাহিনী নির্মিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত না করিয়া বর্ণবৈচিত্র্যময় ঘটনার সমারোহের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিতে বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-বিরোধের উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি নূতন তাৎপর্য লইয়া দেখা দেয়। এই চরিত্রগুলিই তাঁহার নাটকের প্রধান আকর্ষণ, ইতিহাসের সত্য কতোটা রক্ষিত হইয়াছে বা হয় নাই সে কথা আমাদের মনে কখনো প্রধান হইয়া ওঠে না।

চতুর্থ অধ্যায় : ছোটগল্প ও উপন্যাস

[কুড়ি] বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিরূপ আদর্শ স্বীকৃত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় কর।

উত্তর। বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত প্রধান উপন্যাসে কোন না কোনভাবে ঐতিহাসিক উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইতিহাস হইতে উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংগ্রহের মূলে জাতীয় জীবনের অতীতের গৌরবময় দিনগুলির পুনরুদ্ধারের প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল। জাতীয়তাবোধের উন্মীলনের দিনে স্বদেশের অতীত গৌরব এবং মহত্ত্বের বাণী জনমানসে সঞ্চারিত করার

প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করিয়াছিলেন, উপন্যাসে কিছু পরিমাণে এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার সুযোগ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যবহারের গূঢ়তর কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাশক্তির বিশিষ্টতার মধ্যেই ছিল। তাঁহার বলিষ্ঠ কল্পনা জীবনের যে মহীমাময় রূপ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে, সমসাময়িক সমাজের পঙ্গুতার মধ্যে তাহার উপযুক্ত পটভূমি ছিল না। তাই আপন কল্পনার যোগ্য বিচরণক্ষেত্র তিনি রচনা করিয়াছিলেন সুদূর অতীত হইতে বর্তমান পর্যন্ত প্রসারিত বিস্তীর্ণ কালের পটভূমিতে। প্রতিদিনের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে জীবনের মহত্ত্ব-মণ্ডিত রূপ চিত্রণের জন্য এমন সব মানুষের চরিত্র অবলম্বন করিতে হইয়াছে যাহাদের উত্থান-পতনের সহিত দেশ-কালের সর্বাত্মক পটভূমি আলোড়িত হইতে থাকে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা পরিতৃপ্ত বোধ করে নাই, তাঁহার কল্পনা অবলম্বন করিয়াছে এমন সব চরিত্র—"যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ।" রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এইরূপ সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য চিত্রণপদ্ধতি সম্পর্কে বলা যাইতে পারে, "তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে, তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূল রাগিণী বাজে, এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর একটা সুদূরবিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।" অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গযুক্ত উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের উপকরণ ব্যবহারের তারতম্য আছে এবং দুর্গেশনন্দিনী ও রাজসিংহ ভিন্ন অন্য কোন রচনায় তিনি একান্তভাবে ইতিহাসের উপরে নির্ভর করেন নাই। রাজসিংহ ভিন্ন অন্য উপন্যাসগুলিতে কাহিনীর মূলবৃত্ত পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের পটাশ্রিত, কিন্তু পারিবারিক বা সামাজিক জীবনভূমি হইতে উদ্ভূত সমস্যা চিত্রণে তিনি কাহিনীর বৃত্তকে ইতিহাসের সুবিশাল রঙ্গভূমির মধ্যে প্রসারিত করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার "হৃদ্‌বিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর' যুক্ত হওয়ায় ঐতিহাসিক-রসের মিশ্রণে প্রণয় কাহিনীগুলি "চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।" এই যে সুপ্রত্যক্ষ জীবনের রূপের সহিত ইতিহাসের মিশ্রণ, ইহার রসবৈচিত্র্যকে সমালোচকেরা রোমান্সের রস বলিবেন। রোমান্স ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে কল্পনা অনেক পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্যের বন্ধনে বাঁধা পড়ে; কিন্তু রোমান্সে কল্পনার অবাধ পক্ষ-

বিস্তারে কোন বাধা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গযুক্ত রচনাই রোমান্সধর্মী। কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ ও সীতারাম উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যের বন্ধন স্বীকারে তারতম্য আছে, তবে মূলতঃ এগুলি রোমান্সধর্মী রচনা। ইহাদের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রশেখরেই ঐতিহাসিক অংশটুকু অপেক্ষাকৃত তথ্যনির্ভর ও অবিকৃতভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরে দুটি সমান্তরাল কাহিনীধারা পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের উপাখ্যানের পাশে মীরকাশিমের সহিত ইংরেজ শক্তির বিরোধজনিত অনিশ্চিত আকস্মিকতায় পূর্ণ পরিমণ্ডলের উপস্থিতি মূল কাহিনীর মধ্যে নানাভাবে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য সঞ্চারের সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। এবং বাংলাদেশে ইংরেজ শক্তি নিজেদের কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহার তথ্যবহুল ইতিহাস না হইলেও সেই ইতিহাসের মর্ম-রূপরেখা এই উপন্যাসে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এইসব রচনা—এমন কি চন্দ্রশেখরকেও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার বিবেচনায় রাজসিংহই একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতেও রাজসিংহের মতই অবিমিশ্রভাবে ইতিহাসের উপকরণ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং দুর্গেশনন্দিনীকে বাংলা সাহিত্যের "প্রথম উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাস" রূপে সমালোচকেরা স্বীকারও করেন। বঙ্কিম-প্রতিভার লক্ষণ দুর্গেশনন্দিনীতে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় নাই—তাঁহার নিজের আদর্শ অনুসারে তাই হয়তো এই উপন্যাসকে তিনি স্বীকৃতি দিতে চান নাই। 'রাজসিংহ' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং বাংলা সাহিত্যের আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসের প্রধান ঘটনাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে অবিকৃতভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন, প্রধান ঘটনা এবং চরিত্রগুলির আবহ জীবন্তবৎ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি বহু ক্ষুদ্র ঘটনা এবং গৌণচরিত্র কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজসিংহ উপন্যাসে অনুসৃত আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের মূল সত্যকে অবিকৃত রাখিতে বাধ্য; তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাপারে কল্পনা আপনার স্বাধীনতা দেখাইতে পারে। ইতিহাসের কার্যকারণ যেখানে যথেষ্ট পরিস্ফুট নহে, কল্পনা সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নূতন যোগসূত্রের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ স্ফুটতর করিয়া তুলিতে পারে।

ইতিহাসের যে সমস্ত ঘটনা আকস্মিক, তাহাদিগকে মানব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে পারে। ইতিহাসকে dramatic বা নাটকীয় গুণমণ্ডিত করিবার জন্ত তাহার বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত রসকে ঘনীভূত করিয়া তুলিতে পারে। বঙ্কিম রাজসিংহে এইজাতীয় রূপান্তরসাধনের উদাহরণ দিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্তাস ঠিক ইতিহাসের পুনর্লিখন কখনোই নয়, রসসৃষ্টিই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। অতীতকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে না পারিলে উপকরণ যতো নিপুণভাবেই বিন্তস্ত হোক না কেন, তাহা সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে না।—অতীতের মধ্যে প্রাণাবেগ সঞ্চারের জন্ত কল্পনার সহায়তা যতোটা প্রয়োজন গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই, শুধু বর্ণনীয় যুগের ঐতিহাসিক সত্য-বিরোধী কিছু অনুপ্রবিষ্ট যাহাতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি জাগ্রত রাখা প্রয়োজন। মূল ঘটনাগুলি বিকৃত করিলে তাহাকে আর ঐতিহাসিক উপন্তাস বলা যায় না। রাজসিংহে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক সত্যকে অবিকৃত রাখিয়া একটি যুগের জীবনসত্য-চিত্রণে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পরবর্তী লেখকেরা সেই আদর্শ ই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

[একুশ] বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্তাসগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নভেল লিখিয়াছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের প্রতি জীবনের পটভূমিতে নানামুখী প্রবণতাসম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের গ্রন্থনে। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে তিনি যথার্থ নভেলের সূচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার দীনতা সম্পর্কে অবহিত থাকিয়াও বলা যায় সমাজ-বাস্তবতা আশ্রিত উপন্তাসের শিল্পরূপ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। প্যারীচাঁদের পরে বাংলা উপন্তাস আশ্চর্য সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিতে, কিন্তু সমাজ-পট আশ্রিত খাঁটি নভেলের চেয়ে সুদূর ইতিহাসের বর্ণাঢ্য পটভূমি আশ্রিত রোমান্সের প্রতিই তিনি বেশি আকর্ষণ বোধ করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ উপন্তাসেই কাহিনীবৃত্ত পরিবার এবং সমাজের পটভূমির মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া বর্ণোজ্জল ঘটনা-বৈচিত্র্যময়-ইতিহাসের পটে প্রসারিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণায়ত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) এবং কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) —এই দুটি মাত্র রচনাকে নভেল নামে অভিহিত করা যায়। আর তাহার

ছোট আকারের রচনার মধ্যে ইন্দিরা (১৮৭৩) এবং রজনী (১৮৭৭) নভেলের লক্ষণযুক্ত। নভেল, যাহাকে বাংলায় সামাজিক উপন্যাস বলা হইয়া থাকে—সেই জাতীয় রচনায় সমাজ ও ব্যক্তি-মানুষের সম্পর্কের জটিলতাই উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক নীতি-নিয়মের বন্ধনের মধ্যে ব্যক্তিচরিত্র তাহার স্বতন্ত্র বাসনা-কামনা চরিতার্থতার জন্য, স্বকীয় জীবনদৃষ্টিপ্রসূত মূল্যবোধগুলি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উদ্যমশীল হইয়া সমাজের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উপন্যাসের প্লট গড়িয়া ওঠে এই ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের টানা-পড়েনে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জীবন-সমস্যার কেন্দ্রে আছে প্রেম নামক হৃদয়বৃত্তি। বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল—দুটি উপন্যাসকেই বলা যায় ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী। বিষবৃক্ষে সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনী এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমর-গোবিন্দলাল-রোহিণীর পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণের সূত্রে চরিত্রগুলির স্বকীয় বাসনা-কামনার জগতের সহিত সামাজিক নীতি-নিয়মের সংঘর্ষজনিত জটিল উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। নর-নারীর বিবাহিত সম্পর্কের বন্ধন সমাজের দৃষ্টিতে পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয়। নগেন্দ্রনাথ এবং গোবিন্দলাল প্রবৃত্তির টানে এই দাম্পত্য বন্ধনের অলঙ্ঘনীয়তা অস্বীকার করিয়াছে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে কুন্দনন্দিনী যখন একটি প্রাচীরের অন্তরাল রচনা করিল এবং নগেন্দ্রনাথের মনপ্রাণের বাসনা একাগ্রভাবে কুন্দনন্দিনীকেই ঘিরিয়া চরিতার্থ হইতে চাহিল তখন শুধু যে নগেন্দ্রনাথের আচরণে একটি সামাজিক নীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহাই নয়, নগেন্দ্রনাথের উপরে একান্ত-নির্ভর সূর্যমুখীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সে সূর্যমুখীর ব্যক্তিত্বের জগতেও সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। উপন্যাসে সূর্যমুখী শুধু পত্নীত্বের প্রতীক মাত্র নয়, তাহার ব্যক্তিত্বের জগৎটিও একটি জীবন্ত সত্য। ফলে কাহিনীর মধ্যে একদিকে যেমন সামাজিক নীতির সহিত ব্যক্তিচরিত্রের বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে অন্যদিকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষও তেমনি কাহিনীকে গ্রন্থিজটিল করিয়া তুলিয়াছে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি কুন্দনন্দিনী চরিত্রের সম্পূর্ণতা। এই চরিত্রটির উপরে দৈব প্রভাব আরোপ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে অলৌকিকত্ব যোজনা করিয়াছেন তাহাতে উপন্যাসের বাস্তবতা অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নিয়তি নিয়ন্ত্রিত কুন্দনন্দিনী অস্পষ্টতার জন্যই নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার

কারণগুলিও বিশ্বাসযোগ্য হইয়া ওঠে না। উপন্যাসটির এই প্রধান উপাখ্যান-ধারার পাশে আর একটি উপকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে দেবেন্দ্র এবং হীরার চরিত্র অবলম্বনে। মূল কাহিনীর গতি এবং পরিণামের পক্ষে এই উপকাহিনীর প্রয়োজন অনিবার্য মনে হয়। সূর্যমুখী, নগেন্দ্র এবং কুন্দনন্দিনীর সম্পর্কের জটিলতা নূতন গ্রন্থি যোজনা করিয়াছে হীরা এবং শেষ পর্যন্ত সে-ই কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যায় সহায় হইয়া সমগ্র কাহিনীটিকে শোচনীয় পরিণামে উপনীত করিয়াছে। হীরা গৌণ চরিত্র, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য। মূল কাহিনীর মধ্যে তাহার ভূমিকা villain-এর, কিন্তু তাহার প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবনের শোচনীয়তা এই উপন্যাসের ট্র্যাজিডির মধ্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। মূল কাহিনীর ধারার সহিত উপকাহিনীটিকে বঙ্কিমচন্দ্র নিপুণভাবে সংযুক্ত করিয়া উপন্যাসের গ্রন্থ রচনায় অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে ঘটনা এবং চরিত্রের পরিণাম চিত্রণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে বাস্তব ঘটনাগুলির অন্তর্নিহিত যুক্তিক্রমের উপরে নির্ভর করিয়াছেন, কোন অলৌকিক শক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয় নাই। চরিত্রসৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলেও কৃষ্ণকান্তের উইলকে বিষবৃক্ষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর উপন্যাস মনে হয়। এই উপন্যাসে ভ্রমর এবং রোহিণী—উভয়েই অপরিমিত ব্যক্তিত্ব-শক্তির অধিকারিণী। ভ্রমরের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় গোবিন্দলালের প্রতি তাহার ক্ষমাহীনতায়। রোহিণীর প্রতি আকর্ষণে গোবিন্দলাল দাম্পত্য সম্পর্কের পবিত্রতা লঙ্ঘন করিয়া পাপ করিয়াছে কি করে নাই এই প্রশ্নের চেয়েও গোবিন্দলালের আচরণে ভ্রমরের আত্মমর্যাদার অপমানটাই ভ্রমরের দিক হইতে প্রধান, আর হিন্দুসমাজের বিধান অনুযায়ী রোহিণীর জীবনের কোন তৃষ্ণাই চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয় একথা নিশ্চিত জানিয়াই রোহিণী যেন তাহার অবরুদ্ধ যৌবনের বাসনা কামনা পরিতৃপ্তির জন্য গোবিন্দলালকে নিজের আয়ত্তে আনিতে বিচিত্র ছলনা বিস্তার করিয়াছে। তাহার অসাধারণ রূপ এবং কৌশলী চাতুর্য গোবিন্দলালকে স্থির জীবনের বৃত্ত হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। রোহিণীর ট্র্যাজিডির বীজ নিহিত ছিল তাহার অশান্ত প্রবৃত্তির মধ্যে। রোহিণীর নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেও ভ্রমরকে বিস্মৃত হওয়া গোবিন্দলালের পক্ষে সম্ভব ছিল না, গোবিন্দলাল এবং রোহিণীর সম্পর্ক সমাজের আনুকূল্য লাভ করিবে ইহাও বাস্তববিরোধী।

তদুপরি শেষদিকে রোহিণীর মনেও গোবিন্দলাল সম্পর্কে অনাসক্তি এবং অন্য কোন অবলম্বনের জন্য আগ্রহ স্পষ্ট হইয়া ওঠে। উপন্যাসটির কাহিনীর ভিতর হইতে বিপর্যয়ের লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে রোহিণীর মৃত্যু তাই খুব আকস্মিক মনে হয় না।

বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল উভয় উপন্যাসেই সমাজ কর্তৃক অস্বীকৃত প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কাহিনীর এই পরিণতিতে বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পনীতি লঙ্ঘন করিয়া সমাজনীতিকেই জয়ী করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়া থাকে। উপন্যাসের মধ্যে লেখকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি হইতে এই অভিযোগ যে কিছু পরিমাণে সত্য তাহা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু সব উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে জীবনের তাৎপর্য পরিস্ফুট করা হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনায় যদি সমাজের প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ থাকিয়া থাকে এবং তাহা যদি কাহিনীর গতিকে প্রভাবিত করিয়া থাকে তাহা হইলে উপন্যাস বিচারের রীতি অনুসারে আপত্তি করিবার কোন হেতু নাই। দেখা প্রয়োজন যে, তিনি কাহিনী এবং চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশধারায় বাধা সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়াছেন কিনা। বিষবৃক্ষে তো নয়ই এমন কি রোহিণীর চরিত্রেও পরিণাম চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র কোন অস্বাভাবিক পন্থা অনুসরণ করেন নাই। রোহিণী বা কুন্দনন্দিনীর প্রতি লেখকের সমবেদনার অভাব ছিল না, তাহাদের জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য আমরা দুঃখবোধ করি, এই দুঃখবোধ আমাদের মনে আসে চরিত্র দুটির প্রতি সমবেদনা হইতে। লেখক অপরিসীম মমতায় চরিত্র দুটিকে সমবেদনার যোগ্য করিয়া গড়িয়াছেন। নীতিবাদ কতোটা আছে বা নাই তাহা উপন্যাস দুটির রসবিচারের পক্ষে নিতান্তই অবান্তর প্রশ্ন।

ইন্দিরা এবং রজনী পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়। এই দুটি রচনাকে ছোট উপন্যাস বা novelette বলা যায়। রচনা-পদ্ধতির দিক হইতে এই উপন্যাস দুটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। লেখক নিজে কাহিনী বিবৃত করিয়া উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে দিয়া বিবৃত করাইয়াছেন। 'ইন্দিরা'র গল্প বিবৃত করিয়াছে একমাত্র ইন্দিরা চরিত্রটি, কিন্তু 'রজনী'তে কাহিনী বানানো হইয়াছে বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের জবানীতে। অবশ্য চরিত্রগুলির স্বভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে

বঙ্কিমচন্দ্র সফল হন নাই। ইন্দিরায় ভাব-কল্পনার বিস্তার কোথাও নাই, কোন গভীর জীবনানুভূতি রূপায়ণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস রচনা করেন নাই। বাঙালি জীবনের নিতান্ত সাধারণ স্তরের মানুষগুলির বাস্তব জীবনচিত্র এই উপন্যাসে যেমন আছে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য-কোন রচনায় তাহা পাওয়া যায় না। 'রজনী'তে বাস্তবের বন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল। "শচীন্দ্র-রজনীর প্রেমের মধ্যে সন্ন্যাসীর তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রক্ষেপই প্রমাণ করে যে ইহার মানবিক দিকের চিত্রকে আলৌকিকত্বের রং ঝাল দিয়া আবৃত করিতে হইয়াছে। লবঙ্গলতার নিরুদ্ধ প্রেমের কাহিনীও খানিকটা অতিনাটকীয় মনে হয়;···ইহার মধ্যে এক অমরনাথের উক্তি ও আচরণের মধ্যেই সত্যানুভূতির সুর ও জীবনসমীক্ষার দার্শনিক সার্বভৌমতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমের নিজের জীবনজিজ্ঞাসার আর্তি, জীবনরহস্যের সন্ধান ইহার মধ্যে পরিস্ফুট" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

[বাইশ] রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসগুলির পরিচয় দাও।

উত্তর। রমেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যচর্চা শুরু করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায়, বাংলাসাহিত্যে তিনি যখন প্রবেশ করেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যক্ষেত্রের অবিসংবাদিত সম্রাট। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করা তখন কোন লেখকের পক্ষেই সহজ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে এবং রমেশচন্দ্রের প্রিয়তম লেখক ওয়াল্টার স্কটের আদর্শ অনুসরণের আগ্রহে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা ছয়খানি, ইহার মধ্যে চারটি উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু অতীত ইতিহাস হইতে সংগৃহীত।

রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার পরে 'মাধবীকঙ্কণ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই দুটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব খুব স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনীকে তিনি ইতিহাসের পটভূমিতে প্রসারিত করিয়া দিয়া রোমান্সরস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। বঙ্গবিজেতার কাহিনীর পটভূমি আকবরের রাজত্বকাল। টোডরমল্লের বিরুদ্ধে একজন বাঙালি জমিদার অমর-সিংহের বিদ্রোহ এবং যুদ্ধবিগ্রহ ঐতিহাসিক অংশের প্রধান ঘটনা। ইতিহাস অংশের চেয়ে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে ইন্দ্রনাথ এবং সরলার প্রেমের কাহিনী। এই উপন্যাসে রমেশচন্দ্র শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। কোন

চরিত্রই বিশ্বাসযোগ্যভাবে অঙ্কিত হয় নাই, ইতিহাসের প্রসঙ্গটুকুও স্থূল ঘটনা-বিকৃতির পর্যায়ের।

'বঙ্গবিজেতা'র পরের উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ'-এ অবশ্য রমেশচন্দ্র সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি অতিক্রম করিয়া প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। মাধবীকঙ্কণের মূল কাহিনীটি পারিবারিক পটভূমি আশ্রিত। নায়ক নরেন্দ্রনাথের ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ এক কর্মচারীর চক্রান্ত, তাহার মানসিক সংকটের হেতুও কর্মচারী-কন্যা হেমলতার সহিত প্রণয়ের ব্যর্থতা। এই বিপর্যয় ও ব্যর্থতা তাহাকে ঘরছাড়া করিয়াছে এবং সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার লইয়া যে বিরোধ সংঘর্ষ দেখা দিয়াছিল এই উপন্যাসের নায়ক সেই ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তের মধ্যে পতিত হইয়াছে। পারিবারিক কাহিনীর সহিত ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ এ উপন্যাসে যুক্তিসঙ্গতভাবেই সাধিত হইয়াছে এবং ইতিহাসের ঘটনাচিত্রণে রমেশচন্দ্র অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। অতীতকে জীবন্ত করিয়া তোলাই ঐতিহাসিক উপন্যাসে সবচেয়ে বড়ো কথা, এ বিষয়ে রমেশচন্দ্রের শক্তির সন্দেহাতীত প্রমাণ মাধবীকঙ্কণ উপন্যাসেই পাওয়া যায়।

স্কটের সহিত রমেশচন্দ্রের তুলনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা প্রধান আকর্ষণ এই যে ইহারা আমাদিগকে এই নীরস, যন্ত্রবদ্ধ, বণিগ্‌ধর্মী জীবন হইতে অতীতের এক বীরত্বপূর্ণ, গৌরবমণ্ডিত যুগে লইয়া যায়, যেখানে আমরা একটি মুক্ততর, বিশালতর জীবনের আস্বাদ পাই, যেখানে জীবন দুইটি পরস্পর-বিরোধী মহান্ আদর্শের দ্বন্দ্বক্ষেত্রে, যেখানে কেবল বাঁচিয়া থাকিবারই প্রবল চেষ্টায় মানুষের সমস্ত জীবনী-শক্তি ব্যয়িত হইত না। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও আমরা এই বিপদসংকুল, গৌরবময় বীরত্ব কাহিনীপূর্ণ অতীত যুগে নীত হই। এই হিসাবে রমেশচন্দ্র স্কটের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য।" শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে যথার্থ উদাহরণ হিসাবে রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৭৯) উপন্যাস দুই-খানিকে গ্রহণ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ এবং রমেশচন্দ্রের এই দুখানি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঔরংজেবের আমলে শিবাজীর

নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের জাতীয় জাগরণ এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাজপুত জাতির শেষ গৌরবময় দিনগুলির কথা এই দুটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু। রমেশচন্দ্র উপন্যাসের বিষয়রূপে যে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপট গ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগে মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কোন মর্যাদা ছিল না। একটি জাতির জাতীয়-সমাজের গঠনের মধ্যে মানুষ ছিল ছকে নিবদ্ধ। সমাজ-নির্দিষ্ট ভূমিকার অতিরিক্ত মানুষের কোন ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য সেই সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে থাকা অসম্ভব ছিল না। অনিবার্যভাবে তাই রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা চরিত্রগুলির মধ্যে কোন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই না। তিনি মহারাষ্ট্র এবং রাজপুতানার জাতীয় নায়কদের বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড এবং তাহাদের নেতৃত্বে দেশপ্রেমে উদ্দীপিত সমগ্র জাতির সংগ্রামের কাহিনী উপন্যাসে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। পটভূমির বিস্তারে, ঘটনাবৈচিত্র্যে এবং বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে উপন্যাস দুখানি মহাকাব্যোচিত মহিমা অর্জন করিয়াছে। মহারাষ্ট্র এবং রাজপুতানার ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণের পশ্চাতে রমেশচন্দ্রের তীব্র জাতীয়তাবোধই প্রচ্ছন্ন আছে। পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ এবং দেশাত্মবোধ যেসব মনীষী জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন, রমেশচন্দ্র তাঁহার অন্যতম। মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র এবং রাজপুতানার স্বাধীনতারক্ষার সংগ্রামের কাহিনীর মধ্যে রমেশচন্দ্র নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ প্রক্ষিপ্ত করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন।

অবিমিশ্র সামাজিক প্রসঙ্গ অবলম্বনে রমেশচন্দ্র 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) নামে দুখানি সামাজিক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ এবং অসবর্ণ-বিবাহের কথা প্রচার করিবার সজ্ঞান অভিপ্রায় হইতে উপন্যাস দুটি রচিত হইয়াছিল। রমেশচন্দ্র সুদূর অতীতের বর্ণাঢ্য ঘটনার বৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করিতেন, কিন্তু তাঁহার এই উপন্যাস দুখানিতে সেই সুদূর বিস্তারিত কল্পনার পরিচয় কোথাও নাই। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের নিতান্ত সাধারণ চিত্র রমেশচন্দ্র বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সহিত এই উপন্যাস দুখানিতে অঙ্কন করিয়াছেন। তুচ্ছতম ঘটনা ও দৃশ্য যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহাতে রমেশচন্দ্রের জীবন-পর্যবেক্ষণ-শক্তির অসাধারণত্বের কথা স্বীকার করিতে হয়। উদ্দেশ্যমূলক রচনা হইলেও 'সংসার' উপন্যাসটিতে কাহিনীটিকে প্রচারধর্মী মনে হয় না, এই গ্রন্থটিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। 'সমাজ'-

এ রমেশচন্দ্র বক্তব্য উপস্থাপনে ঔপন্যাসিকের যোগ্য নিরাসক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। প্রচারধর্মিতা বড়ো বেশি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

[তেইশ] আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দানের মূল্য নির্ণয় কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস ও ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) একটি বিশেষ স্থান আছে। এই শিল্পী অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিলেও মূলতঃ ছোটগল্প রচয়িতারূপেই সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। "মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণনৈপুণ্য, অন্তর্লোকচারী গভীর আবেগের ঘাত-প্রতিঘাত, জীবনের বিপুল বিস্তার প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের এইসব লক্ষণ তাহার উপন্যাসে আমরা পাই না, জীবনের দুরবগাহ ও জটিল দিকগুলির মর্মোদ্‌ঘাটনে তিনি বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নাই। সে ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবনের যে ক্ষুদ্র নদীটি আমাদের কুটীর-প্রাঙ্গণের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত, তাহার শান্ত, স্তিমিত ধারা, সুখ-দুঃখের একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ আবেগের লঘু চপল ফেনোচ্ছ্বাস—ইহার চিত্রণে প্রভাতকুমার বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিজস্ব সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই তিনি তাঁহার বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। লঘু, হাস্যতরল ভাবকল্পনা জীবনের সরল, স্বচ্ছন্দ বিকাশ, শেষ পর্যন্ত অনুকূল দৈবের দাক্ষিণ্যে সমস্ত স্বল্পস্থায়ী দুর্ভাগ্যের মধুর পরিণতি ঘটনায় আবর্তহীন একটানা প্রবাহ—এইগুলিই তাঁহার উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

প্রভাতকুমার রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৭) ও 'সিন্দুরকৌটা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'নবীন-সন্ন্যাসী'তে নায়ক মোহিত ধর্মপরায়ণ, উচ্চশিক্ষিত; সংসার বিতৃষ্ণায় সন্ন্যাসীজীবন গ্রহণ করিয়া অবশেষে পীড়িত অবস্থায় এক ভদ্রলোকের গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। লেখক নায়কের কৃচ্ছ্রতাসাধনকে লইয়া স্নিগ্ধ-বিদ্রূপমিশ্রিত কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উপন্যাসের কুটচক্রী গদাই পাত্র একটি অবিস্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি। 'রত্নদীপ'ই প্রভাতকুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এখানে কাহিনী আকস্মিক দৈবসংগঠনের উপর নির্ভরশীল হইলেও দ্বন্দ্বময় বেদনায় ও আবেগ গভীরতায় চরিত্র-চিত্রণ সার্থক হইয়াছে সন্দেহ নাই। নায়ক রাখালের

চরিত্রসংযম আত্মোৎসর্জনোন্মুখ গূঢ় প্রণয়াবেগ, বৌরাণীর তীব্র বেদনা ও চারিত্রিক শুচিতা পাঠকের হৃদয়কে মুগ্ধ করে।

বস্তুত ছোটগল্প রচনায় প্রভাতকুমার সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে আমাদের ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ বাঙালী জীবন ছোটগল্পের পক্ষেই উপযোগী। তাহার গল্পগ্রন্থগুলি হইতেছে, 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পবীথি' (১৯১৩), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭), 'হতাশপ্রেমিক' (১৯১৬), 'যুবকের প্রেম' (১৯২৮), 'নূতন বউ' (১৯২৯) ও 'জামাতা বাবাজী'। প্রভাতকুমারের গল্পগুলির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কল্পনা, অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতা বা আবেগের গভীর ঘাত-প্রতিঘাত পাই না, বাঙালির জীবনের ছোটখাট সুখ-দুঃখের স্নিগ্ধ, সহানুভূতি রূপায়ণে, বাস্তব জীবনের নিখুঁত চিত্রণে ও ও লঘু কৌতুকরসে ইহারা আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই শিল্পীর ছোটগল্প রচনার শিল্পকুশলতা সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন : "জীবনের খণ্ডাংশ নির্বাচনে তাহার ছোট-খাটো বৈষম্য অসংগতির উদ্‌ঘাটনের দ্বারা তাহার উপর মৃদু হাস্যকিরণ-সম্পাতে আলোচনার লঘু কোমল স্পর্শে, দ্রুত অথচ অকম্পিত রেখাঙ্কনে সকল প্রকার গভীরতা ও আতিশয্যের সযত্ন পরিহারে, আকস্মিক অথচ অভ্রান্ত যবনিকা-পাতের সমাপ্তি-কৌশলে—এই সমস্ত দিক দিয়াই তিনি উচ্চাঙ্গের নিপুণতার নিদর্শন দিয়াছেন।···ছোটগল্পের আর্ট ও রচনাকৌশল, ইহার পরিমাণ-বোধ ও সমাপ্তি বিষয়ে তাহার দক্ষতা অসাধারণ।" শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের এই মন্তব্যেও ছোটগল্পরচয়িতা প্রভাতকুমারের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে : 'প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাঁহার কল্পনার সহজ রসিকতা ; আর একটা কারণ, সে চিত্রগুলি সমাজ ও পরিবারের সংকীর্ণ ফ্রেমে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যে সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গতার যোগ আছে, যে বিপুলতর রহস্যের ছায়ায় সকল ক্ষুদ্রতা একটা অসীমতা লাভ করিয়াছে, প্রভাতকুমারের কল্পনায় তাহার কিছুই নাই। তাই সেগুলি খাঁটি গল্প হিসাবেই মুগ্ধ করে।" সমালোচকেরা ছোটগল্পরচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরেই প্রভাতকুমারের স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

[চব্বিশ] **বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগের কয়েকজন ঔপন্যাসিকের পরিচয় দাও।**

উত্তর। সকল যুগেই সাহিত্যে অপ্রধান লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। দু একজন বড়ো প্রতিভাসম্পন্ন লেখক যে নূতন শিল্প-রূপ উদ্ভাবন করেন— অপ্রধান লেখকেরা তাহার অনুবর্তন করিয়া সৃষ্টি-প্রাচুর্যে পাঠকদের রস-রুচি সেই নূতন শিল্পবস্তুর উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলেন। কিন্তু বিশেষ যুগের পরিচয়স্বরূপ প্রধান লেখকদের সৃষ্টিই জাগিয়া থাকে, অপ্রধান লেখকেরা বিস্মৃতির অতলে মিলাইয়া যান। বাংলা উপন্যাসের যথার্থ সূচনা হইয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়, এই নূতন শিল্পমাধ্যমটিতে ব্যাপক চর্চাও তাঁহার কালেই সূচিত হইয়াছিল। বহু লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে সাহিত্যের এই শাখায় নিজেদের প্রতিভা বিকাশের আগ্রহে নানা ধরনের বিষয়বস্তু লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। উপন্যাসের পাঠকসমাজ গড়িয়া তোলার ব্যাপারে এই-সব লেখকদের দানের মূল্য কম নয়। ইঁহাদের সমবেত প্রয়াসে যতো গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে বর্জনীয় রচনার সংখ্যাই অধিক সন্দেহ নাই, কিন্তু রসোত্তীর্ণ রচনা আদৌ নাই এমন নহে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত পাঠকসমাজে এইসব রচনার সমাদর অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে বাংলা উপন্যাস নূতন পথে প্রবাহিত হওয়ায় পূর্বযুগের অপ্রধান লেখকেরা পাঠক-সমাজ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইয়াছেন। একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত ভিন্ন বঙ্কিমযুগের লেখকদের নাম পর্যন্ত আজ সাধারণ পাঠকেরা বিস্মৃত হইয়াছেন।

বঙ্কিমযুগের অপ্রধান লেখকদের মধ্যে যাঁহাদের রচনায় কোন না কোন সৃষ্টি-কুশলতার পরিচয় প্রস্ফুট হইয়াছিল—এখানে তাঁহাদের কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই অপ্রধান লেখকদের মধ্যে প্রধানরূপে বিবেচিত হইতে পারেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৯৫৫-৩২), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৯৩-১৯৩১), শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮) এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকারূপে স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এই ভারতী পত্রিকাই ছিল তাঁহার সাহিত্যচর্চার প্রধান ক্ষেত্র। স্বর্ণকুমারী ঐতিহাসিক

এবং সামাজিক—উভয়শ্রেণীর উপন্যাসই রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেবাররাজ, বিদ্রোহ এবং ফুলের মালা। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় স্বর্ণকুমারী বঙ্কিম এবং রমেশচন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত গভীর ও সর্বায়ত কল্পনাশক্তি তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিষয়বস্তু বিন্যাসে, তথ্য সমাবেশ এবং ঐতিহাসিক সত্য রূপায়ণে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের সহিত তাঁহার রচনার সাদৃশ্য বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার উপন্যাসের "ভাষা, মন্তব্যের সারবত্তা ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের দিক দিয়া" তিনি রমেশচন্দ্রের চেয়ে অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রধান—'ছিন্নমুকুল', 'স্নেহলতা' এবং 'কাহাকে'। 'কাহাকে'ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। ঠাকুর পরিবারের বিশেষ ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক মতবাদের আবহাওয়ার মধ্যেই স্বর্ণকুমারী দেবীর মানস পরিমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে নানামুখী বিচারবিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গিতে নারী-সুলভ স্নিগ্ধতা পরিস্ফুট।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমযুগের একজন প্রতিভাশালী লেখক ; কিন্তু তাঁর প্রতিভার যোগ্য কোন সৃষ্টি তিনি রাখিয়া যান নাই। তাঁহার রচনার বিন্যাসে অযত্ন এবং পরিশীলনের অভাব-জনিত শিথিলতায় তাঁহার কোন রচনাই সুসংহত শিল্প রূপ লাভ করে নাই। ঔপন্যাসিকের প্রাথমিক কর্তব্য কাহিনীর মধ্যে যুক্তি-শৃঙ্খলা রচনা এবং চরিত্র ও ঘটনাধারার পারস্পরিক সহযোগে অখণ্ড প্লট গড়িয়া তোলা। সঞ্জীবচন্দ্রের অন্যমনস্ক ভাবুক মন উপন্যাসের এই দায়িত্ব পালনেও অনেক পরিমাণে উদাসীন। ফলে তাঁহার উপন্যাসে খণ্ডচিত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনায় গল্পরসের নিবিড়তা অনেক সময়ে আমাদের চমৎকৃত করিলেও রচনাগুলি ঠিক অখণ্ড উপন্যাসের আকার গ্রহণ করে না। তাঁহার উপন্যাসজাতীয় রচনার মধ্যে প্রধান মাধবীলতা, কণ্ঠমালা, রামেশ্বরের অদৃষ্ট এবং দামিনী। ইহার মধ্যে একমাত্র 'মাধবীলতা'তেই উপন্যাসের লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিম-প্রভাবিত যুগের রোমান্স-রচনায় ব্যাপক আগ্রহের মধ্যে **তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়** স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বাস্তব জীবনাগ্রহ

এবং জীবনের বাস্তব রূপ শিল্পিত করিবার পদ্ধতিতে একজন খাঁটি নভেলিস্ট-এর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্বর্ণলতা সে যুগে ব্যাপক সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং কোন কোন সমসাময়িক সমালোচক এই গ্রন্থটিতেই বাংলা-সাহিত্যে যথার্থ নভেলের সূচনা হইয়াছে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বর্ণলতা উপন্যাসের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে একটি একান্নবর্তী পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া। সাধারণ বাঙালী জীবনের অতিবাস্তব পটভূমি হইতে উদ্ভূত সমস্যা উপন্যাসে প্রতিফলিত করার প্রচেষ্টায় এই রচনাটি বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ। স্বর্ণলতা ভিন্ন তারকনাথের অন্যান্য রচনার নাম—'ললিত-সৌদামিনী', 'হরিষে বিষাদ', 'তিনটি গল্প' এবং 'অদৃষ্ট'।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের নব-জাগরণের নায়কদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছে নানাবিধ সামাজিক এবং ধর্মীয় আন্দোলন সংগঠনের কাজে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে শক্তিশালী সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল। তাহার সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় আছে 'মেজ-বৌ', 'যুগান্তর', নয়নতারা' প্রভৃতি উপন্যাসে। 'যুগান্তর' তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে শিল্পোৎকর্ষের বিচারে শ্রেষ্ঠ রচনা। এই উপন্যাসের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সৃজন, এমন সরল হাস্য, এমন সরল হৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।" কিন্তু "নবযুগের চালকবর্গ মধ্যে" প্রধান ব্যক্তি শিবনাথ শাস্ত্রী নিরাসক্তভাবে উপন্যাসটির নিজস্ব জগৎ সম্পূর্ণ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই। উপন্যাসের পটভূমি যতক্ষণ নদিপুর গ্রাম ছিল ততক্ষণ তিনি নিপুণ কৌশলে গ্রামখানি এবং গ্রামের মানুষগুলিকে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসের পরবর্তী অংশে বিচার বিতর্ক প্রবণতা ও নীতি-প্রচারের অতিরিক্ত চেষ্টায় তিনি উপন্যাসটির শিল্পগুণ অনেক পরিমাণে বিনষ্ট করিয়াছেন। নিজের জীবনে নবযুগের উদ্বোধনের জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী যে বিরুদ্ধতার সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতেন—সেই বিরোধী মতাদর্শের সহিত বিচার-বিতর্ক তাহার উপন্যাসেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ফলে উপন্যাস অখণ্ডরূপে তৃপ্তিদায়ক হইয়া ওঠে নাই।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুরাতত্ত্বের গবেষণা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার বহু উপকরণ আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু

হরপ্রসাদের স্বভাবের মধ্যে ছিল সাহিত্যিক রুচিশীলতা এবং সৃষ্টিশক্তি। তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার প্রমাণ 'কাঞ্চনমালা' এবং 'বেণের মেয়ে' উপন্যাস দুইখানি। হরপ্রসাদ তাঁহার উপন্যাসে সুদূর অতীতের বাংলা দেশের আবহ জীবন্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। বেণের মেয়ে উপন্যাসকে তিনি দশম একাদশ শতাব্দীর সপ্তগ্রাম অঞ্চলের পটভূমিতে একটি কাল্পনিক আখ্যান রচনা করিয়াছেন। দূর ইতিহাসের পটভূমি ব্যবহার করিলেও তাঁহার উপন্যাসটি ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। সেকালের সামাজিক জীবনযাত্রার সম্ভাব্য রূপই তিনি এই উপন্যাসে রূপায়িত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু **শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের** 'ফুলজানি' গ্রন্থটি এই যুগের উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ফুলজানি উপন্যাসটির বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীশচন্দ্রের বর্ণনা-রীতির স্বচ্ছতা, সরলতা ও স্নিগ্ধ কৌতুকরসের উজ্জ্বল সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। . পল্লীগ্রামের প্রকৃতি ও মানব-সমাজের পটভূমিতে সহজ জীবনের উপাখ্যান রচনায় শ্রীশচন্দ্র দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে রোমান্সের প্রতি আকর্ষণে তিনি উপন্যাসের মধ্যে আকস্মিকভাবে এমন 'রোমহর্ষণ-ঘটনাবলী'র অবতারণা করেন যাহা উপন্যাসের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনভাবে প্রবিষ্ট হইয়া রসাভাস ঘটায়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এইযুগের শুধু নয়—সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত লেখক। ত্রৈলোক্যনাথের গল্প উপন্যাসের রসকে বলা যায় অদ্ভুত কৌতুকরস। তিনি গল্প বলিয়াছেন এক অসম্ভবের রাজ্যের। তাঁহার কল্পনায় সম্ভব অসম্ভবের সীমাটি মুছিয়া গিয়া এমন একটি জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে যেখানে মানুষ-পশু এমন কি ভূত প্রেত পর্যন্ত পরস্পরের সহিত একত্র পরমাত্মীয়ের মতো বসবাস করে। তিনি যে রূপকথার মায়ালোক রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে বিসদৃশ ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট কল্পনার নিদর্শন বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এই বিসদৃশ এবং অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া জগৎ রচনাতেই একধরনের কল্পনার সংযম সর্বত্র আছে। কল্পনার নিয়ম-সংযম আছে বলিয়াই তাঁহার সৃষ্ট অসম্ভবের জগৎটিও নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্য হইয়া ওঠে। "কল্পনাশক্তি, সমবেদনা, মাত্রাজ্ঞান এবং সরলতা এই কয়টি গুণের সমাবেশ না হইলে গল্পে অদ্ভুত কৌতুকরস মিশ খায় না এবং

'রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য-সারল্য, আহার কুসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু' ফুটিয়া উঠে না। এই কয়টি গুণের দুর্লভ সমাবেশ হইয়াছে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়।" ত্রৈলোক্যনাথের রচনাবলীর শ্রেষ্ঠ 'কঙ্কাবতী' এবং 'ডমরু চরিত'।

[পঁচিশ] বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তিনি যখন আবির্ভূত হন তখন রবীন্দ্র-প্রতিভার জ্যোতিতে বাংলা সাহিত্য উদ্ভাসিত, রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করিয়া কোন লেখকের পক্ষে প্রতিষ্ঠা অর্জন তখন অকল্পনীয় ছিল। শরৎচন্দ্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিবার কোন সজ্ঞান প্রয়াস দেখা যায় নাই, তবুও তিনি বাঙালী পাঠক-সমাজের হৃদয়ের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এবং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই জনপ্রিয়তার মূল কারণ তাঁহার উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং ভাবপ্রবণ ভঙ্গিতে গল্প-কথনের নিজস্ব পদ্ধতি। বঙ্কিমচন্দ্রের দূরপ্রসারিত কল্পনা বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে কখনও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে নাই। তিনি উপন্যাসের পটভূমিরূপে সাধারণ জীবনের প্রেক্ষাপট কদাচিৎ ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'নষ্টনীড়' বা 'চোখের বালি'র মতো রচনায় পারিবারিক জীবনের বৃত্তের মধ্যে নানামুখী হৃদয়বৃত্তির সংঘাতজনিত বিচিত্রতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় জীবনের জটিলতা প্রতীকিত করার জন্য যেভাবে কাহিনী নির্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তাহার প্রখর মনীষা এবং গূঢ়চারী কল্পনাশক্তির আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসরণের যোগ্যতা আর কোন ঔপন্যাসিকের ছিল না।

শরৎচন্দ্র বিষয়বস্তুর ব্যবহার বা রচনারীতির দিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করেন না। বাঙালি-সমাজের নানা-স্তরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মন ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। সামাজিক রীতিনীতি একটা অনতিক্রম্য শক্তির মতো মানুষের জীবনের স্বাধীন বিকাশের পথগুলি চিরদিনের মতো অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, পাপ-

পুণ্যের সহজ হিসাবে মানুষের বিচার করিতেই এই সমাজ অভ্যস্ত। শরৎচন্দ্র দেখিয়াছেন—সমাজ যাহাদের ললাটে বর্জনের ছাপ আঁকিয়া দেয় তাহাদের মধ্যেও মনুষ্যত্বের আশ্চর্য শক্তি নিহিত থাকে। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি অনুভব করিয়াছিলেন পাপ-পুণ্যের অতিসরলীকৃত বিচারে মানুষের শেষ বিচার হয় না। এই অভিজ্ঞতা হইতেই সমাজের সুচিরাগত দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারগুলির বৈধতা সম্পর্কে তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তাঁহার উপন্যাসে তিনি নানাশ্রেণীর মানুষের জীবনের স্খলন-পতন এবং অধঃপতিত দশার মধ্যেও তাহাদের অনির্বাণ আত্মিক শক্তির পরিচয় পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছিলেন। কোন কল্পিত পটভূমিতে আশ্রিত মানুষ নহে, আমাদের অতিপরিচিত সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের পটভূমি-আশ্রিত সাধারণ মানুষের কাহিনীই তিনি রচনা করিয়াছেন। সমাজ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে একটি বাহিরের শক্তি মাত্র নয়, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি মনের জগতে একদিকে যেমন স্বাধীন হৃদয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার বাসনা একটা প্রবল শক্তির আকারে দেখা দেয় তেমনি সামাজিক সংস্কারগুলিও এইসব চরিত্রের অস্থি-মজ্জায় জড়িত রূপেই দেখা দেয়। ফলে সৃষ্টি হয় প্রবল অন্তর্বিরোধ। চরিত্রগুলির যেন নিজেদের মনের বাধা নিজেরা কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না। যে সামাজিক রীতিনীতি শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে মানবতাবিরোধী, তাহার দুর্মর শক্তি তিনি এইভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। বাহিরের শাসন বা সমস্যার কথার চেয়ে চরিত্রের অন্তর্জগতের সমস্যার উপরেই শরৎচন্দ্র গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং এই সমস্যা-চিত্রণের জন্য তাঁহাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে মনোবিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' উপন্যাসে গল্পের চরিত্র-গুলির অন্তর্জগতের পরিচয় উপস্থাপনের জন্য যে মনোবিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সেই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

এই ভাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাংলাদেশের মানুষ তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রতিচ্ছবি, তাহাদের মনের জগতের সামগ্রিক পরিচয় রূপায়িত হইতে দেখিয়াছি। তিনি অতি সাধারণ জীবনের উপরকার তুচ্ছতার আবরণ অপসৃত করিয়া তাহার অন্তরালবর্তী গ্রন্থিজটিল মানসিকতার রূপটি উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। বাংলাদেশের মানুষ তাঁহার রচনায় নিজেদের পরিচয়

নূতনভাবে লাভ করিয়া বিস্মিত হইয়াছে। নারীরাই বাঙালী সমাজের নিষ্ঠুরতার বড়ো শিকার। বাঙালি সমাজে যে অদৃশ্য বিধি-বিধানের বন্ধন ব্যক্তির হৃদয়ের আত্মবিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে, পুরুষ অপেক্ষা নারীদের জীবনেই তাহার পীড়নের দিকটি বেশি পরিমাণে পরিস্ফুট। আত্মনিগ্রহ এবং দুঃখবরণের মাঝ দিয়া বাঙালি পরিবারের মেয়েরা নানা সমস্যায় আকীর্ণ এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রাচীন কাঠামোটি টিকাইয়া রাখিবার জন্য যে মূল্য দিতে বাধ্য হয়, তাহাতে একদিকে যেমন জীবনের ভিত্তিমূলে প্রকীর্ণ অর্থহীন বিধিবিধানের দুর্মর শক্তি প্রমাণিত হয়, তেমনই এর দুঃখভোগের নীরব সাধনায় নারীচরিত্রের অসাধারণ শক্তিও প্রকাশ পায়। জীবনের চতুর্দিকে আস্থা স্থাপনের এবং শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের মতো কিছুই শরৎচন্দ্র খুঁজিয়া পান নাই, শুধুমাত্র বাঙালি মেয়েদের সর্বংসহা প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়মনের সংটুকু শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে পুরুষ-চরিত্রের তুলনায় নারী-চরিত্র অনেক বেশি উজ্জ্বল। অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, অচলা, সাবিত্রী, অলকা প্রভৃতি নারী-চরিত্র বাংলা-জগতে চিরদিনের মতো স্থান করিয়া লইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে পল্লীসমাজ, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ এবং দেনাপাওনা শ্রেষ্ঠ রচনা। এই উপন্যাসগুলিতেই শরৎচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, তাহার শক্তি ও দুর্বলতার সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার শিল্পী-মানসের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা, অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা। করুণ বা শোকাবহ পরিস্থিতি সৃজনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া পাঠকের ভাবাবেগ জাগ্রত করিবার সহজ কৌশল তাঁহার ছোট-বড়ো সকল রচনাতেই চোখে পড়ে।

[ছাব্বিশ] বাংলা সাহিত্যে ছোট-গল্পের উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

উত্তর। ছোটগল্প কথাসাহিত্যের এই বিশিষ্ট শিল্পমাধ্যমটি আধুনিকতম, উপন্যাসের পরেই ইহার আবির্ভাব। সুদূর প্রাচীনকালেই সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইতালীয় ও ফরাসী ইত্যাদি ভাষায় টেল বা আখ্যান রচিত হইয়াছে; মানুষের গল্প শুনিবার আগ্রহ চিরন্তন। কিন্তু প্রাচীন আখ্যান আর আধুনিক কালের ছোটগল্প স্বরূপধর্মের দিক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। উপন্যাসের বিকাশ একটি নির্দিষ্ট পরিণতির স্তরে পৌঁছিবার পরেই ছোটগল্পের উদ্ভব হয়। এডগার এলান পো, মোপাঁসা, শেকভ ও হেনরী প্রভৃতি শিল্পীদের চর্চায় ইহা আংশিকভাবে

উৎকর্ষ লাভ করে। বিদেশী সমালোচক ছোটগল্পের স্বরূপবৈশিষ্ট্য এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন : "A short story must contain one and only one informing idea and that this idea must be worked out of its conclusion with absolute singleness of methods." আয়তনের ক্ষুদ্রতাই ছোটগল্পের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, গীতিকবিতার মতো ছোটগল্পেও এক নির্দিষ্ট, সুনির্বাচিত সীমায় জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্যা-যন্ত্রণার একটিমাত্র দিক, জীবনের খণ্ডাংশ-বিদ্যুতের মতই মুহূর্তজীবী দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে ; বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদের মতই জীবনের একাংশের চকিত স্ফুরণের মানবজীবনের অপরিমেয়তা আভাসিত হয়। ছোটগল্পকে সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত, গাঢ়বন্ধ সংহত হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত কাব্য-পংক্তিগুলিতে ছোটগল্পের প্রাণধর্ম আশ্চর্য সুন্দরভাবে দ্যোতিত হইয়াছে :

"ছোটপ্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ-কথা
নিতান্তই সহজ সরল ;
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ ;
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।" (বর্ষাযাপন)

বাংলা কথা-সাহিত্যের সমৃদ্ধতম শাখা ছোটগল্পের যথার্থ সূচনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা, রাধারাণীর মতো ছোট আকারের রচনাকে অনেকে ছোটগল্পের পূর্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেইসব রচনাকে ছোট-উপন্যাস বলাই সঙ্গত। ছোটগল্পে একটিমাত্র সংহত ভাবে কয়েকটি মুহূর্তের পটে রচিত পরিস্থিতির মধ্যে স্বল্প কয়েকটি চরিত্র অবলম্বনে অখণ্ড আকারে প্রকাশ পায়। ভাব-সংহতি এবং রূপগত সংহতি ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ভাষায় এই শিল্পরূপটি যথার্থভাবে প্রথম দেখা দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম 'ঘাটের কথা' এবং 'রাজপথের কথা' নামক দুইটি রচনায় এই শিল্প-মাধ্যমটির পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর 'হিতবাদী' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনার দায়িত্ব-

গ্রহণের ফলে এই সাপ্তাহিক পত্রিকার চাহিদা মিটাইবার জন্তই তাঁহাকে ছোটগল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে হিতবাদী পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, এই পত্রিকার জন্য প্রতি সপ্তাহে একটি গল্প তাঁহাকে রচনা করিতে হইত। গল্পগুচ্ছে যে প্রায় একশতটি গল্প আমরা পাই তাহার রচনা এইভাবেই শুরু হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন গ্রাম বাংলার নিকট সংস্পর্শে। জমিদারি পরিচালনার জন্য পাবনার পদ্মা-তীরবর্তী অঞ্চলে তাঁহাকে বসবাস করিতে হইত, বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে আন্দোলিত জীবনপ্রবাহের নিবিড় পরিচয় জানিবার সুযোগ এই সময়ে কবি লাভ করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের মানুষের ছোটপ্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ-কথা লইয়া মহৎ উপন্যাস রচনায় সুযোগ হয়ত কম, কিন্তু জীবনের সুনিবিড় ব্যথা-বেদনার মুহূর্তগুলি ছোটগল্পের সংহত অবয়বে নিপুণভাবে তুলিয়া ধরা যায়। রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছে বাংলা-দেশের মানুষের জীবনধারার বিচিত্র পরিচয় উপস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আর কোন রচনায় বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের নিবিড় পরিচয় উপস্থিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখকদের সমপর্যায়ে স্থানলাভ করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলিতে মানব-হৃদয়ের সামগ্রিক পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়াই তিনি এই সম্মানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে তিনটি স্তরে ভাগ করিয়া দেখা যায়। প্রথম স্তরের গল্পগুলির রচনাকাল ১৮৯১ হইতে ১৯০১ পর্যন্ত প্রসারিত। এই পর্যায়ের গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা মেঘ ও রৌদ্র, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, পোস্টমাস্টার, কঙ্কাল, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ, সমাপ্তি। তাঁহার দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পের ধারা সূচিত হইয়াছিল 'সবুজপত্র' পত্রিকা অবলম্বনে ১৯১৪ হইতে এই পর্বের সূচনা বলা যায়। আর জীবনের শেষ পর্বের তিনটি গল্প 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল। এই তিনটি স্তরের রচনার মধ্যে প্রথম পর্বের গল্পগুলিই শ্রেষ্ঠতর।

(রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩—১৯৩২)। রবীন্দ্রনাথের গল্পে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানব জীবনের যে গূঢ় গভীর সংযোগ এবং ভাব ও ভাষার অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে—তাহা প্রভাতকুমারের গল্পে নাই, কিন্তু তাঁহার রচনায় সমাজ

ও পরিবারের সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল জীবনচিত্র অপরূপভাবে ধরা পড়িয়াছে। প্রভাতকুমারের গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভাব আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোটগল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মত···।" ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখকদের সমপর্যায়ের লেখক মনে করিতেন। প্রভাতকুমারের প্রধান ছোটগল্প সংগ্রহগুলির নাম 'নবকথা', 'ষোড়শী', 'গল্পাঞ্জলি', 'গল্পবীথি' এবং 'জামাতা বাবাজী'। প্রভাতকুমার কয়েকটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ছোটগল্পেই তাঁহার প্রতিভার শক্তি যথার্থভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার গল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "প্রভাত-কুমারের ছোটগল্প বাঙালীর সহজ জীবনের প্রসন্ন কৌতুকরস, উহার খেয়ালী কল্পনার রঙীন বুদ্‌বুদ্-বিলাস, ছোট ছোট পারিবারিক বিরোধের ক্ষণিক আলোড়ন ও মুহূর্ত পরে অবসান, ক্ষুদ্র অসঙ্গতির আত্মপ্রকাশ ও হাস্যকর ফল-শ্রুতির মধ্যে উহার সংশোধন—এইগুলিই রূপ পাইয়াছে।")

শরৎচন্দ্র উপন্যাসরচনায় যে পরিমাণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, ছোটগল্পে তাঁহার কৃতিত্ব সেই তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ; ছোটগল্পের সংহতি এবং মাত্রাবোধ তাহার ছিল না বলিলেই হয়। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি প্রভৃতি রচনা গ্রন্থনামে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এ সব রচনা ছোটগল্পের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ছোট উপন্যাসের আকার লাভ করিয়াছে। তাহার ছোট আকারের রচনার মধ্যে মহেশ বা অভাগীর স্বর্গের মতো দু, একটি রচনায় তিনি যথার্থ ছোটগল্পের শিল্পরূপ সৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের যুগের পরে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারাটি বিচিত্রপথে প্রবাহিত হইয়াছে এবং বহু শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে সাহিত্যের এই শাখায়। সৃষ্টি বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আধুনিক গল্পের ধারাটির সামান্য পরিচয়ও একটিমাত্র প্রবন্ধে উপস্থাপন করা অসম্ভব, শুধু প্রধান লেখকদের কয়েকজনের নামই এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রকৃতি ও মানব জীবনের গভীর রহস্যময়তা বাংলা ছোটগল্পে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে উদ্‌ঘাটন

করিয়াছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন বাংলা সাহিত্যে নৈরাশ্য-পীড়িত মধ্যবিত্ত মানসিকতা ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল সেই সময়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের অতিপরিচিত সাধারণ পরিবেশের মধ্যে এক রহস্যময় জগৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনার সূক্ষ্ম রসাবেশ জীবনের সকল তুচ্ছতার উপরে এক অনৈসর্গিক রহস্যময়তার আবরণ রচনা করিয়াছে। তাঁহার 'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল', 'যাত্রাবদল' প্রভৃতি গ্রন্থের গল্পগুলিতে অপরিসীম বিস্ময়বোধ লইয়া জীবনরহস্যের সম্মুখীন এক কবি-হৃদয়েরই পরিচয় আমরা পাই।

বাংলা ছোটগল্পের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিষয়বস্তুর ব্যবহার দেখা দেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায়। সভ্যতার উপরিতলের পরিবর্তে নেপথ্যের অন্ধকার-ময় জীবনের নিষ্ঠুর সত্য তিনি সাহিত্যের বিষয়রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, মৃত্তিকা, ধূলিধূসর, মহানগর প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত গল্পে সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকের অন্তরালবর্তী অন্ধ একটি স্তরের জীবনসত্য প্রখর বস্তু-নিষ্ঠার সহিত তুলিয়া ধরা হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের মাত্রাতিরিক্ত ভাব-প্রবণতায় অভ্যস্ত বাঙালি পাঠক-সমাজ প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পূর্ণ আবেগ-বর্জিত রচনাভঙ্গির মধ্যে জীবনের বাস্তব-সত্যের নিষ্ঠুরতারই পরিচয় লাভ করিয়াছিল। বাংলা ছোটগল্পে এই নিষ্ঠুর রূঢ় বাস্তব-জীবনের সংগ্রামক্ষুব্ধ চিত্র আরো স্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্পে নিপুণভাবে মনঃসমীক্ষণ রীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। গল্পের বিষয়বস্তুর জন্ম তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অবতরণ করিয়াছেন সমাজের নীচুতলার মানুষের পঙ্কিল জীবনে। তাঁহার প্রধান কয়েকটি গল্প-গ্রন্থের নাম—প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, হলুদপোড়া, আজ-কাল-পরশুর গল্প। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে সাধারণভাবে রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি এবং মানুষের জীবন উপজীব্য। তাঁহার গল্পে যে জীবন-সমস্যা রূপায়িত হইয়াছে তাহা রাঢ় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য-যুক্ত সমাজ গঠনের মাঝ হইতে উদ্ভূত। এই অঞ্চলের বিলীয়মান জমিদারতন্ত্রের সহিত আধুনিক জীবনধারার সংঘাত ও সংঘর্ষ তাঁহার বহু গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়, তৎসহ এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্যও তাঁহার গল্পের পরিবেশে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। ছলনাময়ী,

জলসাঘর, রসকলি, বেদেনী প্রভৃতি সংকলনের গল্পগুলিতে রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতির রুক্ষতা, প্রকৃতির সহিত মানুষের সংগ্রাম এবং সমাজের নানাশ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক জীবনবোধের দ্বন্দ্ব—এক স্বতন্ত্র জগৎ রচনা করিয়াছেন।

আধুনিক গল্প সাহিত্যে আর একটি বিশিষ্ট প্রতিভা রাজশেখর বসু। পরশুরাম ছদ্মনামেই তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। হাস্য-রসাত্মক গল্পের তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক। "রাজশেখর বাবুর হাস্যরসের মধ্যে একটা স্বতঃউৎসারিত প্রাচুর্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে। তাঁহার রসিকতার প্রবাহ বুদ্ধির বক্র-ক্রীড়ায় ঘোলাটে হয় নাই, সূর্যকরোজ্জ্বল নির্ঝরের ন্যায় সহজ, সাবলীল নৃত্যভঙ্গে হাসির ঝিকিমিকি ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া চলিয়াছে।" জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার মনের এই ঔজ্জ্বল্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার কোন কোন গল্পে প্রাচীনকালের আবহ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক জীবনের নানাবিধ অসঙ্গতিই ছিল তাঁহার গল্পগুলির প্রধান উপকরণ। গড্ডালিকা (১৯২৪), কজ্জলী (১৯২৭), হনুমানের স্বপ্ন (১৯৩৭) প্রভৃতি গ্রন্থের গল্পে তিনি কৌতুকপ্রদ পরিস্থিতি উদ্ভাবনের যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই।

পঞ্চম অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ

[সারাংশ] রবীন্দ্রনাথের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি অবলম্বনে তাঁহার কাব্যের বিকাশধারার একটি রূপরেখা রচনা কর।

উত্তর। 'মানসী' (১৮৯০) হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার যথার্থ সূত্রপাত হইয়াছে, কবি নিজেও এইরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন। অবশ্য 'মানসী'র পূর্বে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির সহায়তা ভিন্ন তাঁহার মানসপ্রকৃতির যথার্থ পরিচয় গ্রহণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। 'মানসী'র পূর্ববর্তী যুগের কাব্যের মধ্যে প্রধান 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৫)। তাঁহার স্বকীয় উপলব্ধি ও আঙ্গিকের ক্রমপরিণামের পরিচয় এই চারিটি কাব্যগ্রন্থের নানামুখী পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে পাওয়া যায়। বিশ্বজগতের সহিত নিজের অন্তর-গত ভাবনার

জগৎটিকে সামঞ্জস্যে বাঁধিবার বিচিত্র প্রয়াস এই যুগের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সন্ধ্যাসঙ্গীত এবং প্রভাত সঙ্গীতে কবি যেন হৃদয় অরণ্যের মধ্যে দিশাহারা, নিজের ভাবনা বেদনায় একটি স্বতন্ত্র জগৎ গড়িয়া তুলিয়া তাহারই মধ্যে নিরুদ্ধ দশার পীড়ায় ব্যাকুল। এই হৃদয় অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের আবেগে কবি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলেন। প্রভাত সঙ্গীতে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটিতে বাহিরের বিচিত্র বিশ্বে অন্তর-নিরুদ্ধ ভাবকল্পনাকে মুক্ত করিবার প্রথম প্রয়াস দেখা দিল। ক্রমে কড়ি ও কোমলে বিশ্বের বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়া অস্পষ্ট ভাবনারাশির স্পষ্টমূর্তি দেখা দিল। প্রকৃতি-প্রীতি, প্রেম, বস্তুবিশ্বের রূপময়তার প্রতি আকর্ষণ কড়ি ও কোমলেই প্রথম সংহত আকারবদ্ধরূপে দেখা দিয়াছে। তবুও কড়ি ও কোমল পর্যন্ত জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণাগুলি কোন অবিচ্ছিন্ন ভাব-সত্যে পরিণত হয় নাই।

মানসী সম্পর্কে কবি লিখিয়াছেন, "মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বই-গুলির কবিতায় ভালোমন্দ মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।" মানসীর প্রেম ও প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলিতেও কবির হৃদয়গত দ্বন্দ্বের পরিচয় আছে, আপন কল্পনায় তিনি প্রেম এবং সৌন্দর্যের যে অখণ্ড জগৎ রচনা করিয়াছেন তাহার সহিত পার্থিব জগতের সীমাবদ্ধতার বিরোধ কবিকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছে। তবুও এই কাব্যে তাঁহার রোমান্টিক কবি-কল্পনার পূর্ণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সীমাবদ্ধ রূপের জগৎ, দেহের সীমায় বদ্ধ প্রেমের অনুভূতিই একমাত্র সত্য নয়—ইহার অন্তরালে কবি অখণ্ড সৌন্দর্যের এবং প্রেমের জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চিত প্রত্যয়ে উপনীত হইয়াছেন। সেই অসীমের ভাবনার সহিত সীমায়তের মিলন সাধনের চেষ্টাই তাঁহার কাব্যের রসস্ফূর্তির হেতু। শুধু ভাব পরিণতি নয়, কবিতার রূপ নির্মাণের দিক হইতেও 'মানসী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিণত কাব্য।

মানসীর পরে 'সোনার তরী' এবং 'চিত্রা'য় কবি জীবন ও জগতের সকল বিচ্ছিন্নতাকে এক অখণ্ড সৌন্দর্য-কল্পনায় ধারণ করিয়াছেন। প্রকৃতি শুধু রূপ বিচিত্রতা লইয়া কবিকে মুগ্ধ করে নাই, প্রকৃতির বিচিত্র রূপময়তার অন্তরালে তিনি এক অনিঃশেষ প্রাণপ্রবাহের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। সমুদ্রের প্রতি, বসুন্ধরা প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতি দেখা দিল এক সচেতন সত্তারূপে।

বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত কবির নিজের একাত্মবোধ 'সোনার তরী' কাব্যে প্রকাশিত। বিশ্বাত্মবোধের চিত্ত-বিস্ফারক আনন্দানুভূতিই সোনার তরী কাব্যের মূল প্রেরণা। মহাবিশ্বলোকের কোন বস্তুই আর কবির দৃষ্টিতে তুচ্ছ নয়, চলমান বিশ্বের সহিত কবিও যেন অগ্রসর হইতেছেন কোন নিগূঢ় চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে। বিশ্বজীবন, কবির ব্যক্তিজীবন এবং তাঁহারই রচিত কবিতার জগতের মধ্যে সুনিবিড় ঐক্যচেতনা ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইয়াছে। কোন শক্তি তাঁহার অন্তরের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া বিশ্বের সহিত তাঁহার জীবন এবং কাব্য-সাধনাকে সামঞ্জস্যে বাঁধিতেছে—এই প্রশ্ন দেখা দিল 'চিত্রা' কাব্যে। চিত্রায় এই সামঞ্জস্যবিধায়ক শক্তিকেই কবি 'জীবনদেবতা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। চিত্রার কবিতাগুলি এই জীবনদেবতার সহিত কবির লীলারসে সঞ্জীবীত। সকল বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে এই যে এক অখণ্ড ঐক্যচেতনা চিত্রা কাব্যে দেখা দিল তারই আর এক রূপ প্রকাশ পাইয়াছে এই পর্বের অন্য দুটি কাব্য 'চৈতালী' ও 'কল্পনা'য়। কবি বর্তমানের সীমা অতিক্রম করিয়া অতীত ভারতের সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করিয়াছেন এই কাব্যদুটিতে।

রবীন্দ্রকাব্যের পূর্ব ও উত্তরপর্বের সীমাসন্ধিতে রহিয়াছে 'গীতাঞ্জলী'। গীতাঞ্জলির পূর্বে 'নৈবেদ্য' কাব্য হইতেই তাহার অধ্যাত্ম-চেতনার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়, গীতাঞ্জলিতে তিনি ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে নিঃসংশয়ে নিবেদন করিয়া দিলেন। ঈশ্বরের আহ্বানে জীবন ও জগতের বিচিত্রতার কূল হইতে নিজেকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া একের উদ্দেশ্যে যাত্রার কথা 'খেয়া' কাব্যের বহু কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছিল, জীবনের বিচিত্রতাকে অতিক্রম করিয়া কবি গীতাঞ্জলিতে সকল বিচিত্রতাকে এক ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

এই অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে নিবিষ্ট হইয়া তিনি যে পরিণাম লাভ করিলেন, সেখানেই যদি তাঁহার কবি জীবনের সমাপ্তি হইত তাহা হইলে তাহাকে স্বাভাবিত পরিণামই বলা চলিত, কিন্তু কবির দুর্মর অশান্ত কল্পনাশক্তি নূতনভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিল 'বলাকা' কাব্যে। তাঁহার কাব্য-সাধনার আর একটি পর্বের এবং বিস্ময়কর পর্বের সূচনা হইল 'বলাকা' হইতে। 'বলাকা' কাব্যের পটভূমি বিশ্বের ইতিহাসে প্রসারিত। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সূচনা হইতে সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতায় যে দ্রুত রূপান্তরশীলতা সঞ্চারিত হইয়াছিল কবি সেই গতিচাঞ্চল্যকেই আশ্রয় করিয়া জীবন-রহস্যকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা

করিয়াছেন 'বলাকা'য়। নিরন্তর রূপান্তরশীলতাকে কবি একমাত্র সত্যরূপে গ্রহণ করিলেন। এই গতিচেতনার স্পর্শে তাঁহার প্রেম ও সৌন্দর্যভাবনায় মৌলিক রূপান্তর দেখা দিল। শাজাহান, ছবি, বলাকা, চঞ্চলা প্রভৃতি কবিতায় মানুষের হৃদয়ানুভূতি এবং বিশ্বরহস্যের নূতন তাৎপর্য কবি উদ্ঘাটন করিয়াছেন। শুধু ভাবে নহে, কবিতার আঙ্গিকের দিক হইতেও বলাকা বিস্ময়কর গ্রন্থ। এক সুগভীর দার্শনিক উপলব্ধি মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য ভাষাকে কবি নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন, পয়ার ছন্দের চরণ বিন্যাসের রীতিতে পরিবর্তন সাধন করিয়া ছন্দকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছেন।

বলাকায় কবিহৃদয় নব উদ্দীপনায় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই উদ্দীপনা অক্ষুণ্ণ ছিল। বলাকার পরে পলাতকা, পূরবী, মহুয়া, বনবাণী, পরিশেষ, পুনশ্চ, বীথিকা, পত্রপুট, শ্যামলী, প্রান্তিক, সেঁজুতি, নবজাতক, সানাই পর্যন্ত বচিত্র কবিতার ধারায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি কল্পনার অপরিম্লান রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে। এই পর্বে তাঁহার জীবন ভাবনার মধ্যে মৃত্যুচেতনার উপস্থিতি একটি নূতন সুর যোজনা করিয়াছে। রূপে-রসে পরিপূর্ণ পৃথিবীর সহিত তাঁহার বন্ধন মৃত্যু ছিন্ন করিয়া দিবে—এই চিন্তার প্রতিক্রিয়া নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে এই পর্বের কাব্যে। কোথাও মৃত্যু-ভাবনা জনিত বিষণ্ণতার করুণ সুর বণিত হইয়াছে, কোথাও কবি বিশ্বের অনিঃশেষ [illegible] প্রবাহের প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া মৃত্যুর অন্ধকারময়তাকে [illegible]ার করিয়াছেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলিতে রচিত রোগ-শয্যা[illegible] [illegible]রোগ্য, জন্মদিনে—কাব্যত্রয়ে আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় কবির ক্লান্ত প্রা[illegible] [illegible]প বড়ো করুণভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। একদিকে পীড়ায় [illegible] স্তিমিত-শক্তি দেহমনের ক্লান্তি, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে [illegible] সংকটজনিত নৈরাশ্যবোধ এই পর্যায়ের কবিতায় সর্বব্যাপী বিষাদ [illegible]করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে জীবনে আস্থা স্থাপনের কোন অবলম্বন যেন কবি খুঁজিয়া পান নাই, মৃত্যুশয্যায় রচিত 'শেষলেখা' কাব্যের কবিতা কয়েকটিতে এই আশা আশ্বাসহীন মানসিকতাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সর্বব্যাপী নৈরাশ্যের মধ্যে কবি সত্যের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী—এইরূপ একটি প্রত্যয় তবুও শেষ পর্যন্ত জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহত্ত্বের শুধু একটিই সান্ত্বনা—

"সত্যের সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।"

[আঠাশ] রবীন্দ্রনাথের প্রধান নাটকগুলি অবলম্বনে তাঁহার নাটক রচনাধারার পরিচয় দাও।

উত্তর। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটককেও রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্ব হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি নিরন্তর ধারায় নাটক রচনা করিয়াছেন এবং আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে তাঁহার নাটকগুলি বাংলা সাহিত্যের পূর্বাপর ধারা বহির্ভূত সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি। গীতিনাট্য, শেকস্পীয়রীয় রীতির নাটক, কাব্যনাট্য, সাংকেতিক নাটক, এবং নৃত্যনাট্য—এই কয়েকটি শ্রেণীতে তাঁহার নাটকগুলি ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্বে তিনি নাট্য-রসের বাহনরূপে গানের উপযোগিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আগ্রহে যে নাটক কয়েকটি রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১) এবং 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) প্রধান। দেশী,বিদেশী সুরের মিশ্রণে এই নাটকের গানগুলি রচিত, নাট্যরস সৃষ্টি অপেক্ষা গানের নূতন পরীক্ষা হিসাবেই এই জাতীয় রচনার মূল্য বেশি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক যাহা "গানের ছাঁচে ঢালা নয়"। এই নাটকটিতেই প্রথম ঘটনা একটি বহমান ধারা বিভিন্ন চরিত্রের আশ্রয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ রচনার পরে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ওরানী' (১৮৮৯) এবং 'বিসর্জন' (১৮৯০) নামে দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন। এই দুটি নাটকে তিনি শেকস্পীয়রীয় নাট্যাদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই নাটক দুটিতে পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত বিভিন্ন দৃশ্যে শাখা প্রশাখায় জটিল বিয়োগান্ত পরিণতিসম্পন্ন নাট্যকাহিনী রচিত হইয়াছে। 'রাজা ও রানী'র মূল নাট্যবিষয় রাজা বিক্রমদেব ও রানী সুমিত্রার জীবনাদর্শ এবং প্রেমের বিরোধ, এই মূল কাহিনীর মধ্যে কুমারসেন ও ইলার শাখাকাহিনী যুক্ত হইয়া নাটকের প্লটকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শাখাকাহিনীটি অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করায় এবং ইলা-কুমারসেনের প্রেমের দৃশ্যগুলিতে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের অসংযত প্রকাশে নাটকের কাহিনীধারা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে নাই। 'বিসর্জন' 'রাজা ও রানী'র তুলনায় শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রেমের ধর্মের

সহিত প্রথাবদ্ধ ধর্মের বিরোধ এই নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়। অর্পণার আকুল ক্রন্দনে বিচলিত গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরা রাজ্যে পূজার নামে জীববলি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া চিরাগত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেন। প্রথাগত ধর্মের রক্ষক রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যকে আঘাত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়া কাহিনীটির মধ্যে নানামুখী জটিলতা আনে। সমস্ত বিরোধের অবসান হয় জয়সিংহের আত্মদানে। এই নাটকের ঘটনা গ্রন্থন এবং পরিণতি মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই সাধিত হইয়াছে।

নাটকের সংলাপে কবিতার ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের সব নাটকেই অল্লাধিক পরিমাণে দেখা যায়, তবে শুধুমাত্র কবিতায় রচিত সংলাপের ব্যবহারে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রচনা 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'মালিনী' (১৮৯৬) এবং কাহিনী কাব্যের কর্ণকুন্তী সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতি। কাব্য-নাট্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় এই সংহত নাটকগুলিতেই আছে। চিত্রাঙ্গদা এবং মালিনীতে কবি নাট্যকাহিনীর মধ্যে ঘটনার বিচিত্রতা পরিহার করিয়াছেন, নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছে চরিত্রগুলির বিপরীতমুখী আবেগের সংঘাতে। মালিনীতে যেটুকু ঘটনা আছে, কাহিনীর কাব্যনাট্যগুলিতে তাহাও বর্জিত হইয়াছে। এক একটি মুহূর্তের উজ্জ্বল পটে সামান্য দু একটি চরিত্রের হৃদয়গত বিরোধ আবেগের দ্বন্দ্বের মধ্যে মানব-জীবনের সুগভীর রহস্যময়তা কাহিনীর নাট্যকাব্যগুলিতে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে সংহতি সাধনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলা যায়।

সাংকেতিক নাটককেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ স্বকীয় নাট্যাঙ্গিক বলা হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকেই প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে কোন না কোন তত্ত্বভাবনা প্রকাশের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। দৃশ্যমান ঘটনাগুলি এবং চরিত্রের সংলাপ কবির মানসধৃত তত্ত্বভাবনাকেই প্রকাশ করে, এই প্রবণতা হইতেই সাংকেতিক নাটকের আঙ্গিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাঁহার সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে রাজা (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯২২), মুক্তধারা (১৯২২), এবং রক্তকরবী (১৯২৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজা এবং ডাকঘরে নাট্যবিষয় অধ্যাত্ম অনুভূতি। ডাকঘরে অসুস্থ গৃহবন্দী অমলের চিত্তে বাহির সংসারের প্রতি ব্যাকুলতায় বন্ধন অসহিষ্ণু মানবতার প্রতীক আভাসিত হইয়া ওঠে। এই নাটকটিকে মনে হয় একটি সংহত গীতি-কবিতার

মতো। না-দেখা জগতের প্রতি অমলের উধাও কল্পনা নাটকের সংলাপগুলিতে যথার্থ কবিতার রস সঞ্চার করিয়াছে। অচলায়তন নাটকে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রথাবদ্ধতাকে আঘাত করিয়াছেন। অচলায়তনের পরিবেশ রচনা এবং এখানকার নিয়মবদ্ধ জীবনযাত্রার বিবরণে জীবন-ধর্ম বিরোধী নিষ্ঠুর প্রথার প্রতি শাণিত বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে। যন্ত্রশক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্য-ক্ষুধার ভয়াবহ রূপ চিত্রণের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকটি রচনা করিয়াছিলেন। আর 'রক্তকরবী'র সমাজে যে দৃঢ় নিয়মবন্ধনের মধ্যে ভূগর্ভের সঞ্চিত সম্পদ উদ্দেশ্যহীনভাবে সঞ্চিত করিয়া তোলার আয়োজন চলে—তাহা আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজেরই রূপক। এই-সব নাটকে সর্বত্র বিকার বিকৃতি হইতে জীবনের সহজ ধারাটিকে মুক্ত করিয়াছে যৌবনের শক্তি। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া অভিজিৎ, রঞ্জন যন্ত্রের শক্তিকে আঘাত করে। তাহাদের মৃত্যুই সকল বিকারের অবসান ঘটায়।

জীবনের একেবারে শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি পূর্বলিখিত রচনাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নৃত্যনাট্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৭) এবং শ্যামা (১৯৩৯)। শ্যামাই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নৃত্যনাট্য। এই নাটকগুলি ঠিক সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না—কারণ সুর এবং নৃত্য হইতে বিচ্ছিন্নভাবে ইহাদের কথাবস্তুর রসগ্রহণ সম্ভব নয়।

[ঊনবিংশ] **রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিভিন্ন ধারার পরিচয় দিয়া বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের স্থান নির্দেশ কর।**

উত্তর। আমাদের বৈচিত্র্যহীন, ঘটনাসংঘাত-বর্জিত, শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন ছোটগল্প রচনার বিশেষ উপযোগী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনার কোন সার্থক প্রকাশ আমরা পাই না। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের শিল্পকলার সূত্রপাত করেন এবং তিনিই ইহার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ শিল্পী ১৯২১ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঘাটের কথা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প এবং ইহাতেই বাংলা সাহিত্যে এই শিল্পী মাধ্যমটির আবির্ভাব সূচিত। ইহার পর কবি 'হিতবাদী' (১৮৯১) সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া ছোটগল্প রচনা করিয়াছেন। জমিদারী তত্ত্বাবধানের সূত্রে পল্লীজীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ

মানবজীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র ও বহুমুখী ধারার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, কবির শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলি তাহারই স্বর্ণকমল। পল্লীজীবনের যে অভিজ্ঞতা তাঁহার ছোটগল্প সৃষ্টি প্রেরণাকে উদ্বোধিত ও তাহার মূলে প্রাণরস সিঞ্চিত করিয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন: "বাংলা দেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি; এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয় পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলা-মেশা করেছিল মনের মধ্যে।...ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তকরণে, যে উদ্‌বোধন এসেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অফুরন্ত বিষয়বৈচিত্র্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার কিছু সংখ্যক গল্পে সাধারণ সুখ-দুঃখের ধারায় পল্লীর জীবনযাত্রা ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আবেগস্বচ্ছতা চিত্রিত হইয়াছে, 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'শাস্তি', 'দিদি', 'রাসমণির ছেলে', 'পরীক্ষা', 'দান প্রতিদান', 'ছুটি', 'পোষ্টমাষ্টার', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি এই জাতীয় গল্প। 'হালদার গোষ্ঠি', 'ঠাকুরদা', 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'স্বর্ণমৃগ' প্রভৃতি গল্পে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক প্রচলিত ধারায় ব্যতিক্রম ঘটিলে যে বিপর্যয় ও বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়, তাহারই আলেখ্য পাই। কতকগুলি গল্পে সমাজ-সমালোচনা কারুণ্য ও শ্লেষের তীক্ষ্ণতায় প্রকাশিত: 'দেনাপাওনা', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর', 'পাত্র ও পাত্রী' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। প্রেমের বিভিন্ন নিগূঢ় আবেগ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত, তাহার বিচিত্র ও রহস্যময় বিকাশ, ব্যর্থ প্রতিহত প্রেমের গভীর বিপদ, প্রেমের মধ্য দিয়া মানবাত্মার আকুতির ব্যঞ্জনা, প্রেমের সংকীর্ণ, জটিল, স্বার্থপরতার মধ্য দিয়া এ সমস্তই তাঁহার 'একরাত্রি', মহামায়া', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মধ্যবর্তিনী', 'শাস্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', ''অধ্যাপক', 'শেষের রাত্রি' প্রভৃতি গল্পগুলিতে আশ্চর্য কাব্যব্যঞ্জনায়, প্রাকৃতিক প্রতিবেশের অর্থগূঢ় চিত্রণে, ইঙ্গিতময়তায় রূপায়িত হইয়াছে। 'নষ্টনীড়'কে ছোটগল্প বলা যায় কিনা তাহা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ, তবে উহার মধ্যে ছোটগল্পের লক্ষণ আছে। নষ্টনীড়ে

চারুর গোপনচারী প্রেমাবেগে জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যে ঐশ্বর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাংলা কথাসাহিত্যে তাহার তুলনা মেলে না। শুভা, অতিথি, আপদ, প্রভৃতি গল্পে প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধ চিত্রিত হইয়াছে। "নিতান্ত অনায়াসে, সামান্য দুই একটি রেখাপাতের দ্বারা তিনি মানবমনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সিংহদ্বারটি খুলিয়া দিয়াছেন—তাহার তুচ্ছ গ্রাম্য কাহিনীগুলিও প্রকৃতির সূর্য-চন্দ্রখচিত চন্দ্রাতপের তলে, তাহার আভাস-ইঙ্গিত-আহ্বান-বিজড়িত রহস্যময় আকাশ-বাতাসের মধ্যে এক অপরূপ গৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।" বিশেষতঃ তাঁহার অবিস্মরণীয় গল্প 'অতিথি'তে প্রকৃতির প্রাণলীলা মানবজীবনে ছন্দায়িত হওয়ার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বিশ্বসাহিত্যেই তাহার তুলনা মেলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের অতি-প্রাকৃত রসাশ্রিত ছোটগল্পগুলির মধ্যে 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'মনিহারা' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি এই সকল রচনায় নিপুণ কৌশলে, ব্যঞ্জনাময় বর্ণনায়, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে, কল্পনার বিচিত্র বর্ণবিলাসে বাস্তব জীবনের সহিত অতিপ্রাকৃতের বিচিত্র সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনা 'রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরী' প্রভৃতি গল্পের আধুনিক জীবন সমস্যার উপস্থাপনায় কোথায়ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ও বাগ্‌ভঙ্গির শাণিত দীপ্তি বিস্ময়কর হইলেও সেখানে সজীব প্রাণের কোন স্পর্শ পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের রসনিটোল ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য। তিনিই বাংলা সাহিত্যে এই শিল্পকলার গৌরবময় ঐতিহ্যের ভিত্তিটি নির্মাণ করিয়া যান, পরবর্তীকালের ছোটগল্প লেখকেরা তাঁহার পদচিহ্নিত পথই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবির ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "আমাদের এই ব্যাহত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জীবনের তলদেশে যে একটি অশ্রুসজল, ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিস্মিত মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন।···আমাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি বহির্জীবনে বাধা পাইয়া বাহ্যবিকাশের দিকে প্রতিহত হইয়া অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হয় ও সেখানে গোপন মধুচক্র রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ নিজ ছোটগল্প-গুলির মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার অবসর দিয়াছেন।"

বাংলা সাহিত্যে তাহার ছোটগল্পগুলির প্রভাব সম্বন্ধে এই সমালোচকের ভাষায়ই বলা যায় : "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কর্ম বা অঙ্গবিন্যাসের দিক দিয়াও আলোচ্য। ইহার প্রস্তাবনা, উপস্থাপন, পরিণতি ও উপসংহার কলাকৌশলের দিক দিয়াও যেমন, বিষয় ও রসস্ফুরণের দিক দিয়াও সেইরূপ বিচিত্র। এই রচনারীতির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন তাহার অনুশীলন ও সম্প্রসারণের ধারাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যিক রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারিরূপে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা এই ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যে এখনও সজীব আছে ও প্রতিভার স্ব-ধর্ম অনুযায়ী নব নব বিকাশের প্রেরণা যোগাইয়াছে। রবীন্দ্রকাব্য অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ভবিষ্যৎ প্রভাবের দিক দিয়া অধিকতর বাক্‌প্রসূ হইয়া, আমাদের আধুনিক গল্প লেখকেরা ছোটগল্পের অর্ঘ্য সাজাইয়াই রবীন্দ্র-পূজার অধিকারী হইয়াছেন, এ দাবী নিঃসংশয়ে করা চলে।"

[ত্রিশ] রবীন্দ্রনাথের প্রধান উপন্যাসগুলির পরিচয় দাও এবং বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তাঁহার রচনার স্থান নির্দেশ কর।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং দ্বিতীয় উপন্যাসে বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) ও রাজর্ষি (১৮৮৭) ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত। বিষয়-বস্তুর দিক হইতে এই প্রাথমিক রচনা দুইটিকে বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র প্রবর্তিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারার অনুবর্তী রচনা বলা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি লাভ করিয়াছে। প্রতাপাদিত্য এবং ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ইতিহাস এই উপন্যাস দুটির পটভূমি, কাহিনীর মধ্যে প্রতাপাদিত্যের নীতিহীন নিষ্ঠুরতা এবং গোবিন্দমাণিক্যের স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া অনাবশ্যক রক্তক্ষয়ের পথ পরিহার করার মহত্ত্ব ঐতিহাসিক ঘটনার উপরে নির্ভর করিয়াই রবীন্দ্রনাথ পরিস্ফুট করিয়াছেন। তবুও তাঁহার উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা কতোটা রক্ষিত হইয়াছে বা হয় নাই এই প্রশ্ন আমাদের মনে আসে না। রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন মানবিক হৃদয়বৃত্তির এবং আদর্শবোধের উপরে। বৌঠাকুরাণীর হাটে চরিত্রগুলির মধ্যে জীবনের লক্ষণ তেমন পরিস্ফুট হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাস 'রাজর্ষি'তে চরিত্রগুলি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

গোবিন্দমাণিক্য এবং রঘুপতির বিরোধ জয়সিংহের মর্মপীড়া এবং আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে "প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজা"র বিরোধ চিত্রিত হইয়াছে। এই মূল আইডিয়াটিই উপন্যাসের কেন্দ্রে বিরাজ করে।

'চোখের বালি' (১৯০৩) রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস—যাহাতে তাঁহার স্বকীয় আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে শুধু বাহিরের ঘটনাগত দ্বন্দ্ব-বিরোধের উপরে নির্ভর না করিয়া চরিত্রগুলির মনের জগৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে গভীরতা সঞ্চার করা হইয়াছে। চরিত্রের অন্তর-বাহিরের দ্বিমাত্রিক রূপ পরিস্ফুট করার এই পদ্ধতি বাংলা উপন্যাসে সম্পূর্ণ নূতন। বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণাত্মক রচনারীতির প্রথম সূচনা হিসাবে 'চোখের বালি' উপন্যাসটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন রচনা। চোখের বালি হইতে বাংলা উপন্যাসের একটি নূতন যুগ সূচিত হইয়াছে বলা যায়।

'গোরা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, শুধু রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেই নহে—সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই 'গোরা'র তুল্য মহৎ উপন্যাস আর একটিও রচিত হয় নাই। উপন্যাস যে শুধু চমকপ্রদ আকর্ষণীয় গল্প রচনা নয়, দেশ-কালের সমগ্র পরিচয়, সমাজের জটিল পটে ব্যক্তির আত্মবিকাশের সংগ্রামই যে উপন্যাসের যথার্থ বিষয়—একথা গোরা উপন্যাসেই প্রথম প্রমাণিত হইয়াছে। পটভূমির বিস্তার এবং গোরার স্বদেশ জিজ্ঞাসার সূত্রে সমগ্র আধুনিক ভারতবর্ষের জটিল সমস্যার উপস্থাপনে এই উপন্যাস যথার্থই গদ্য-এপিকের মহিমা অর্জন করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় জীবনবাদের যথার্থ মর্ম বুঝিবার জন্য গোরার চরিত্রে যে তীব্র উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যায় তাহা মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের নিজেরই স্বদেশ-জিজ্ঞাসার প্রতিরূপ। হিন্দু-সমাজের জীবনাদর্শে নিঃসংশয়ে আস্থা স্থাপন করিয়া গোরা ইহারই মধ্যে ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ অন্বেষণ করিয়াছে, তাহার প্রবল চারিত্রিক শক্তি নিয়োজিত হয় হিন্দু আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে বিরোধের অন্ত ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষকেই সে আপন করিয়া পাইতে চায় অথচ হিন্দুত্বের মধ্যে যে সমগ্র ভারতবর্ষ নাই একথা কিছুতেই তাহার চিত্ত মানিতে চাহে নাই। এই অন্তর্বিরোধের মধ্যে তাহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ এবং স্বদেশের যথার্থ স্বরূপ বুঝিবার অকৃত্রিম আগ্রহ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য রূপেই ফুটিয়াছে। শেষ পর্যন্ত গোরা জানিতে পারে যে, যে হিন্দুত্বের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য সে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে সেই হিন্দু সমাজের

সহিত তাহার বস্তুত কোনই সম্পর্ক নাই। সে একজন আইরিশম্যানের পুত্র। এই আঘাত তাহার চিত্তের চারপাশে যে দৃঢ় সংস্কারের প্রাচীর রচিত হইয়াছিল তাহা মুহূর্তেই ভাঙিয়া পড়িল। সে যেন নবজন্ম লাভ করিল। অসংশয়ে সে বলিয়াছে—"আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ ভারতবর্ষের সকল জাতিই আমার জাতি, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"

গোরার পরে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাস-দুটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে এই অন্দোলনের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। স্বদেশী-আন্দোলনের মধ্যে ভাবাবেগের প্রাবল্য এবং সহজে ফললাভের কৌশলগুলির উপর যতোটা জোর দেওয়া হইয়াছে, যথার্থভাবে দেশের মানুষের আত্মশক্তি উদ্বোধনের আয়াসসাধ্য সাধনার দায়িত্ব গ্রহণের চেষ্টা সেই পরিমাণে করা হয় নাই—রবীন্দ্রনাথ এই মূল বক্তব্যই রূপায়িত করিয়াছেন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। ঘরে বাইরে উপন্যাসে সন্দীপ-নিখিলেশ-বিমলার পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের উপরে স্বদেশী-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে উপস্থাপন করিয়াছিলেন। আর 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদীদের বিপ্লবী আয়োজনের মধ্যে অতীন এবং এলার প্রেমের মর্মান্তিক ট্র্যাজিডিতে ওই আন্দোলনের মনুষ্যত্ব-বিরোধী দিকটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসের নায়ক শচীশের চরিত্রে গোরার মতো প্রবল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন চরিত্র পরিকল্পনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসের চারটি অধ্যায় চারটি বিচ্ছিন্ন গল্পের আকারে রচিত। শচীশের চরিত্র বিচ্ছিন্ন অধ্যায় চারটির মধ্যে যোগসূত্র। শচীশের প্রখর জীবন-জিজ্ঞাসা গোরার সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু পরিণামে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যে শচীশের সমাহিত দশায় উপন্যাসের বক্তব্য যেন অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আর একটি প্রধান উপন্যাস 'যোগাযোগ' (১৯২৯)। যোগাযোগের নায়িকা কুমুদিনী চরিত্রে নারী-ব্যক্তিত্বের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে দুটি বিরোধী জীবনাদর্শের বিপরীতমুখী সংঘাতের পটে। প্রাচীন আভিজাত্যের শালীনতা এবং আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের বিত্তবান মানুষের প্রবল স্বাধিকারবোধের স্থূলতার বিরোধের রূপটি

কুমুদিনীর দ্বন্দ্ব-বিক্ষত হৃদয়ের চিত্রে করুণভাবে প্রকাশ পায়। যোগাযোগ অসম্পূর্ণ রচনা, একটি বৃহৎ পরিকল্পনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস রচনা শুরু করিয়াছিলেন কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি রূপায়িত করেন নাই।

'শেষের কবিতা' (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে ভাষার ঔজ্জ্বল্য এবং কবিত্ব-শক্তির প্রকাশের দিক হইতে অনন্য-সদৃশ রচনা। অমিত-লাবণ্যের প্রণয় কাহিনী এই উপন্যাসের মূল বিষয়, তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের অগভীর চটুলতা-সর্বস্ব জীবনের চিত্র। সমসাময়িক রবীন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিচ্ছায়াপাতে উপন্যাসটি কিছু পরিমাণে তদানীন্তন সমাজের একাংশের রুচি প্রকৃতির পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছে। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনসমস্যা হইতে তাঁহার দৃষ্টি প্রত্যাবৃত করিয়া লইয়াছেন। তাই তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে যেমন ভারতবর্ষীয় সমাজ এবং জীবনধারার নানামুখী সংকটের গভীর বিশ্লেষণ পাই ইহাতে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। শেষের কবিতার ভাষা ও রচনাশৈলীগত সৌন্দর্য আমাদের চমৎকৃত করে, কিন্তু ইহাকে মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ে স্থান দেওয়া যায় না।

বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিক ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং বিন্যাস রীতি ও ভাষা প্রয়োগে তিনি মহৎ ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাহাকে অনুসরণ করিবার মতো শক্তি পরবর্তীকালের আর কোন ঔপন্যাসিকের মধ্যে দেখা যায় নাই, বাংলা উপন্যাসের তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীর সাক্ষাৎ আজ পর্যন্ত আমরা পাই নাই। যথার্থ ঔপন্যাসিক জীবন-দৃষ্টির সহিত অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভার মিলনের ফলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে মহৎ শিল্পরূপ রচিত হইয়াছে—তাহাকে বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিক ইতিহাসের বহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র জগৎরূপেই গ্রহণ করা উচিত।

[একত্রিশ] আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে বীরবল নামে পরিচিত। ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে প্রমথ চৌধুরী খ্যাতি অর্জন করেন। সবুজপত্র প্রকাশের পূর্বে তাঁহার কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই পত্রিকাই তাহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার প্রধান

হেতু। সবুজপত্র আর দশখানি সাহিত্য-পত্রিকার মতো ছিল না। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া রীতিমতো একটি সাহিত্যিক আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। সাহিত্যে সর্বাধিক প্রয়োজনে চলতি ভাষা ব্যবহারের আন্দোলন আরম্ভ করিয়া প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিতর্কের সূত্রপাত করেন। বাংলা গদ্যের রূপান্তর সাধনে প্রমথ চৌধুরীর এই প্রয়াসের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছে। বস্তুত প্রমথ চৌধুরীর আন্দোলনের ফলেই চলতি ভাষা সাহিত্যে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করে। সবুজপত্রের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথও সর্ববিধ ব্যবহারে চলতি ভাষাকেই একমাত্র মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেন। ভাষার চেয়েও ভাবের রাজ্যে প্রমথ চৌধুরীর আন্দোলনের তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বাধিক সংস্কার এবং জড়ত্বের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম আক্রমণ সুরু করেন। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের রুচি এবং বিচারবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি যুগান্তর সাধন করেন। প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব সাহিত্যিক কৃতিত্ব খুব মহৎ না হইলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রুচি প্রকৃতির পরিবর্তন সাধনে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব অসামান্য।

'বীরবলের হালখাতা' নামক একটি সংকলনে প্রমথ চৌধুরীর অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছিল। সাম্প্রতিককালে দুইখণ্ডে তাঁহার প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। কথাসাহিত্যে তাঁহার উল্লেখযোগ্য দান 'চার ইয়ারী কথা', এবং 'নীললোহিত'। প্রমথনাথের কবি-প্রতিভার পরিচয় বহন করিতেছে 'সনেট পঞ্চাশৎ' এবং 'পদচারণ' নামক দুটি সনেট সংকলন। কৃত্রিম ভাবালুতা-বর্জিত এই সনেটগুলি বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রচনা।

প্রমথ চৌধুরীর গদ্যভাষা শাণিত বুদ্ধির আলোকে উজ্জ্বল। তাঁহার প্রায় সকল রচনাই বিতর্কমূলক। বাক্যগুলি তাঁহার হাতে তীক্ষ্ণধার শরের মতো ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন এবং অব্যর্থ হইয়া ওঠে। শ্লেষ এবং মার্জিত ব্যঙ্গমিশ্রিত ভাষায় তিনি আমাদের ভাবপ্রবণতা এবং আবেগ-বিহ্বলতাকে ক্রমাগত আঘাত করিয়া জাতীয় চিত্তকে সজাগ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় অনেক সময়ে বিতর্কপ্রবণতা যে কিছুটা অনাবশ্যকভাবেই স্থান পাইয়াছে একথাও সত্য। প্রশান্ত প্রত্যয়বোধের পরিবর্তে উদ্ধত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিই প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০—১৮৯৯) রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহার

সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে। 'সাধনা' ও 'ভারতী' পত্রিকার লেখকরূপে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত হন। বলেন্দ্রনাথ কবিতা এবং গদ্যপ্রবন্ধ রচনা করিতেন। তাঁহার কবিতায় অবশ্য তেমন কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই। কবি হিসাবে নহে, প্রাবন্ধিক এবং গদ্যলেখক হিসাবেই বলেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে নাই। মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন—তাহা হইতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পরে ঠাকুর পরিবারে তিনিই সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিভার অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তৎকালে বলেন্দ্রনাথ 'চিত্র ও কাব্য', 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী'—এই তিনখানি মাত্র ছোট বই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য রচনাই পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি এইসব রচনা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশিত হওয়ায় একালের পাঠকদের সহিত নূতন করিয়া বলেন্দ্রনাথের রচনার পরিচয় সাধিত হইয়াছে। নানা বিষয় অবলম্বনে বলেন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এইসব প্রবন্ধে বিষয়ের গুরুত্বকে অতিক্রম করিয়া লেখকের ব্যক্তিত্ব, তাঁহার সৌন্দর্যচেতনা এবং রসবোধের পরিচয়ই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য বিষয়ে প্রখর চেতনা এবং বিচারবুদ্ধি তাঁহার মানসিকতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিল্পবস্তু বা কাব্যরসের বিশ্লেষণে তিনি সর্বত্র গভীর রসদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এইসব সমালোচনামূলক প্রবন্ধ একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সহিত তুলনাযোগ্য। লেখক হিসাবে তাহার বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হিসাবে 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা', 'উত্তরচরিত', 'মৃচ্ছকটিক', 'জয়দেব' প্রভৃতি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) আধুনিক ভারতবর্ষের শিল্পগুরু, রং এবং তুলির মাধ্যমেই তাঁহার প্রতিভা বিকাশের প্রকৃষ্ট মাধ্যম ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রশিল্পীকে সাহিত্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তুলির পরিবর্তে কলম ব্যবহার করিতে গিয়া অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার মূল চিত্র-শিল্পীর স্বভাব হইতে বিচ্যুত হন নাই। চিত্রে তিনি রঙের সাহায্যে যে রূপ নির্মাণ করিয়াছেন, সাহিত্যে

ঠিক সেই রূপ নির্মাণের কাজই করিয়াছেন ভাষার সাহায্যে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যকে বলা যায় চিত্ররূপময় গদ্য। ছবি প্রস্ফুট করিয়া তোলা এ ভাষার প্রধান গুণ। তাঁহার চিত্ররূপময় গদ্যভাষা বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

ছোটদের জন্য রূপকধর্মী 'ক্ষীরের পুতুল' এবং 'শকুন্তলা'"এই দুইটি বই অবনীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা। কালিদাসের নাট্যকাহিনীটিও তাঁহার হাতে চিত্রময় বর্ণনাত্মক গদ্যে একটি রূপকথায় পরিণত হইয়াছে। 'ক্ষীরের পুতুল'-এ বহুশ্রুত একটি রূপকথাকেই নূতন ভঙ্গীতে পরিবেশন করিয়াছেন।

নিছক শিল্পের উপকরণ সন্ধানেই বাংলা দেশের মেয়েলি ব্রতগুলির প্রতি অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই অনুসন্ধানের ফল তাহার 'বাংলার ব্রত' নামক পুস্তিকাটি। এই রচনাটি আকারে সংক্ষিপ্ত হইলেও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং লোকায়ত সংস্কৃতির মর্মোদ্ঘাটনের দিক হইতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলোচনা। মোগল-রাজপুত যুগের শিল্প আঙ্গিক যেমন অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পে দক্ষতার সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন, সাহিত্যেও অনুরূপ দক্ষতার সহিতই সেই যুগের কয়েকটি কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, 'রাজকাহিনী' নামক গ্রন্থটি এই জাতীয় রচনার সংকলন। ছোটদের জন্য লেখা 'নালক' এবং 'বুড়ো আংলা'র কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন 'বাগেশ্বরী অধ্যাপক' হিসাবে কাজ করেন। এই অধ্যাপনাসূত্রে শিল্প প্রসঙ্গে তিনি নানাদিক হইতে যে সব আলোচনা করিতেন, 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থে সেই আলোচনাগুলি সংকলিত হয়। বাংলার শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচনা বিশেষ কিছুই নাই। 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' এ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ। উদ্ভটরসের দিকে অবনীন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল। এই প্রবণতা হইতেই 'ভূতপত্রীর দেশ' রচিত হয়। বাংলা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা', 'ঘরোয়া' এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে'—তিনটি উজ্জ্বল রচনা।

---

who, though much older than myself, was my contemporary and lived long enough for me to see him, was the first pioneer in the litetary revolution which happened in Bengal about that time……… There was yet another movement started about this time called the National. It was not fully political, but it began to give voice to the mind of our people trying to assert their own personality." কবির জন্মকাল আমাদের দেশের ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। ধর্ম আন্দোলন, সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ—এই তিনটি প্রধান আন্দোলনের সূত্রপাত এই কালে। রবীন্দ্রনাথদের পরিবার এই ত্রিবিধ আন্দোলনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাঙলার নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছিল যাঁহাদের উদ্যোগে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিকট সান্নিধ্যে, তাঁহাদেরই অভিভাবকত্বে শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছেন। সাহিত্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য যে, 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে, 'মেঘনাদবধ কাব্য, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থত্রয়ে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও শৈশবেরই সমকালীন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাধারণ পাঠকেরাও কবির ছেলেবেলায় পরিবেশ বিষয়ে অবহিত আছেন। সুবৃহৎ পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথ বাড়ির রীতি অনুসারে অনেকটাই অনাত্মীয় ভৃত্য সম্প্রদায়ের হাতে মানুষ হন। অভিভাবকদের অহরহ স্নেহ বা শাসনের দৃষ্টির বাহিরে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত বলিয়াই এই শিশু নিজের কল্পনার জগতে স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। প্রকৃতির প্রতি, মানুষের প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গির যে একটি অনন্যসদৃশতা আমরা লক্ষ্য করি—মনে হয় সেই দৃষ্টির উন্মেষে আশৈশব অভ্যস্ত নিভৃতি এবং একাকীত্ব বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। "I had a deep sense almost from infancy of the beauty of Nature, an intimate feeling of companionship with the trees and the clouds, and felt in tune with the musical touch of the seasons

in the air. At the same time, I had a peculiar susceptibility of human kindness" (*The Religion of An Artist*)। অভিজাত পরিবারের সন্তানদের জন্য তখনকার দিনের নির্দিষ্ট যে শিক্ষাপদ্ধতি—ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রভাব এড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ছাত্র হিসাবে তাঁহাকে প্রথাবদ্ধ শিক্ষার বন্ধন স্বীকার করিতে হয় নাই। পারিবারিক পরিবেশে নিয়ত শিল্পকলার নানা শাখায় যে সৃজনশীল উদ্যোগ চলিত, সেই উদ্দীপনাময় আবহাওয়ায় তাঁহার কৈশোর ও বয়ঃসন্ধির দিনগুলি কাটিয়াছে। মাতৃভাষার প্রতি, দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ এই পরিবেশের প্রভাবেই তাঁহার ব্যক্তিত্বে অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিক হইয়াছিল বলা যায়। পিতা দেবেন্দ্রনাথের মহৎ-আদর্শে উদ্বোধিত, শালীনতামণ্ডিত ব্যক্তিত্বের প্রভাবও বালক রবীন্দ্রনাথের চরিত্র গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। কাব্যচর্চা ভিন্ন শিল্পের আর যে শাখাটিতে তিনি আবাল্য আকর্ষণ বোধ করিতেন—তাহা সংগীত। রীতিমত চর্চার দ্বারা নিতান্ত কৈশোরেই তিনি সংগীতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যাইতে পারে যে, সাহিত্যে নহে—সংগীতেই তাঁহার প্রতিভার লক্ষণ প্রথম রসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সংগীত রচনায় তাঁহার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর সস্নেহ পরিচর্যায় কিশোর রবীন্দ্রনাথের সুপ্ত প্রতিভার শক্তি স্বাধীন বিকাশের পথ পায়। সাহিত্য-সংগীত-চিত্রবিদ্যা, শিল্পের নানা শাখায় প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সূক্ষ্ম রসবোধের অধিকারিণী কাদম্বরী দেবীর প্রতি ঋণের কথা কবি তাঁহার নানা রচনায় শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন। "পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোন বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতা দ্বারাই তিনি আমার চিত্ত বিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তাহলে ভেঙেচুরে তেড়ে বেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো

একেবারেই হত না" (জীবনস্মৃতি)। কাদম্বরী দেবীর সহিতও কবির ছিল বন্ধুতার সম্পর্ক। সাহিত্য সাধনার এই নিত্য-সঙ্গিনীর মৃত্যু (১৮৮৪ খৃ.) রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম শোকের অভিঘাত বহিয়া আনে। তাঁহার কাব্যসাধনায় মৃত্যু-প্রসঙ্গ বারবার ফিরিয়া আসিয়াছে, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোকেই রবীন্দ্রমানসে মৃত্যুচেতনার সূচনা।

কবির বালক বয়সের জীবন-পরিবেশ এবং তাঁহার চিত্তবিকাশের গতি-প্রকৃতির এই বিবরণে কবির ব্যক্তি-স্বরূপটি চিনিয়া লইবার কয়েকটি সূত্র মেলে। বাঙলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কাটিয়াছে য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার অভিঘাতজনিত আলোড়ন ও উত্তেজনায়। অর্ধশতাব্দীব্যাপী বাঙালা দেশের এই ইতিহাসে দেখা যায় সামাজিক রাজনৈতিক-ধর্মীয় এবং জীবনের অপরাপর নানা সমস্যা বিষয়ে চিন্তা বিতর্ক; নানা আন্দোলনে বাঙালি সমাজে এই সময়ে ধীরে ধীরে নতুন মূল্যবোধ জাগ্রত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই বিরোধ-বিক্ষোভের মধ্যে কোনো ক্ষেত্রেই নতুন সৃষ্টির সাক্ষ্য মেলে না, জাতীয় চিত্তের অশান্ত পরিমণ্ডলে নতুন কিছু সৃষ্টি করিয়া তুলিবার সম্ভাবনাও স্বভাবতই ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে ধীরে ধীরে উন্মেষিত হয় নতুন সৃষ্টির যুগ। বিশেষভাবে সাহিত্যের এক নতুন যুগের সূচনা হয়। সেই যুগের মানস-পরিমণ্ডলে যে প্রবল আশা এবং প্রত্যয়বোধ সঞ্চারিত ছিল—সতর্কভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে সেই আশার আলোক এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের সকল কর্মের মূলে উদ্দীপক শক্তির মতো কাজ করিয়াছে। নবজাগ্রত বাঙলার জাতীয় চিত্তভূমির উর্বর-শক্তি রবীন্দ্রমানসের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর উদার মানবতাবাদী ঐতিহ্যের সহিত মনে প্রাণে সংশ্লিষ্ট, সেই নবজাগ্রত জীবনবোধের উদ্দীপনাই তাঁহার প্রতিভার জাগরণ মন্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ বাড়ির পরিবেশের প্রভাব এবং অভিভাবকদের পরিচালনা গুণে রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত বালক বয়স হইতেই স্বাধীনভাবে চিত্তবিকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবগত সংস্কারহীনতা এইভাবেই চরিত্রে অনুস্যূত হইয়াছিল। সমাজে যাহা স্বীকৃত, সাধারণে যাহা প্রবলভাবে প্রচার করিতেছে—তাহার প্রতি উপেক্ষা এবং নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া বুদ্ধি ও

বিবেকের শক্তিতে সত্য নির্ধারণের অক্লান্ত চেষ্টা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই স্বভাবের মধ্যে কোথাও একটা আপোষহীনতা, মানিয়া না লইবার উগ্র মনোভাব প্রকট। এই স্বভাবের জন্যই তাঁহার জীবন অভ্যস্ত পথে স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হয় নাই। স্বেচ্ছাবৃত নানা দুরূহ কর্তব্যে বৈচিত্র্যময় তাঁহার কর্ম-জীবনের ইতিহাস চরিত্রের এই দিকটিকেই পরিস্ফুট করে। এই চারিত্রিক প্রবণতা তাঁহার সাহিত্য-সাধনায়, কাব্য-সাধনায়ও প্রতিফলিত হইয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো কাব্য-প্রথা বা 'পোয়েটিক কন্‌ভেনশন'-এর আনুগত্য তিনি স্বীকার করেন নাই, জীবন ও জগৎ বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব উপলব্ধি প্রকাশের ভাষা নিজেরাই নিরন্তন সাধনায় সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। এমনকি তাঁহার কাব্যসাধনার এক পর্বের প্রকাশরীতি, আঙ্গিকগত বিশিষ্টতা অন্য পর্বে আর অনুসৃত হয় নাই দেখিতে পাই। অর্থাৎ বাহিরের প্রথার গণ্ডিই শুধু নহে, নিজেরই সৃষ্টির সীমাচিহ্ন বারবার লঙ্ঘন করিয়া নতুনতর সৃষ্টি প্রয়াসে নিয়োজিত হইয়াছেন। এই নিরন্তন সংস্কার মুক্তির সাধনা রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২) হইতে 'শেষলেখা' (১৯৪১) পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাব্য রচনার ধারা পরিণামমুখী জীবনানুধ্যান এবং প্রকাশরীতির বিশিষ্টতার দিক হইতে তাই নানা পর্বে বিভক্ত।

'সোনার তরী' পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যধারা :

কবিকাহিনী, ১৮৭৮ (প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ)।
সন্ধ্যাসংগীত, ১৮৮২।
প্রভাতসংগীত, ১৮৮৩।
ছবি ও গান, ১৮৮৪।
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ১৮৮৪।
কড়ি ও কোমল, ১৮৮৬।
মানসী, ১৮৯০।
সোনার তরী, ১৮৯৪।

স্বয়ং কবির বিবেচনায় 'মানসী' হইতে যথার্থত তাঁহার কাব্যধারার সূচনা হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী রচনাবলী তিনি নিজে স্বীকার করিতে চান নাই। 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় এ বিষয়ে কবির মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য :

"যে কবিতাগুলি আমি নিজে স্বীকার করি তার দ্বারা আমাকে দায়ী

করলে আমার কোনো নালিশ থাকে না। বন্ধুরা বলেন, ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি, লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস।

"সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চলেছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। বালক যদি প্রধানদের সভায় গিয়ে ছেলেমানুষি করে তবে সেটা সহ্য করা বালকদের পক্ষেও ভালো নয়, প্রধানদের পক্ষেও নয়। এও সেই রকম। ওই তিনটি কবিতাগ্রন্থের আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ, লেখাগুলো কবিতার রূপ পায়নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখি হয়ে ওঠেনি, এটাতে কেউ দোষ দেবে না কিন্তু তাকে পাখি বললে দোষ দিতেই হবে।

"ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে ওই তিনটি বইয়ের যে কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।

"তারপর মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারির ভেদ আছে কিন্তু আমার আদর্শ-অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।"

কবির এই মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবুও 'সোনার তরী' পাঠের জন্য 'মানসী' পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের পূর্ববর্তী পর্যায়ের কবিতাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেরই কর্তব্য। ইহার মধ্যেও আবার পর্যায় ভাগ করা যায়। সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান এবং ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী লইয়া একটি পর্যায়। এই কাব্যগ্রন্থগুলির কবিতা সম্পর্কে কবির সংকোচের কারণ 'লেখাগুলো কবিতায় রূপ পায়নি।' 'রূপ' কথাটির উপরেই কবি জোর দিতে চান। বক্তব্যের দিক হইতে রচনাগুলির মূল্য যেমনই হোক ভাষায় তাহা রসপরিগ্রহ করে নাই। শুধু বক্তব্যের জোরে কোনো রচনা কাব্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হইতে পারে না একথা ঠিকই। সুতরাং প্রকাশ যদি শিল্পসম্মত না হয় তবে তেমন রচনা কবিতা হিসাবে গ্রাহ্য নহে। তবুও এই পর্যায়ের কবিতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন জীবন ও

জগৎবীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যটুকু বুঝিবার জন্য। কবিজীবনের এই প্রস্তুতি পর্বের অপরিণত রচনাতেও কবিদৃষ্টির বিশিষ্টতা বুঝিবার পক্ষে সহায়ক উপাদান মিলিবে।

'কড়ি ও কোমল' হইতে অনেকগুলি রচনা সঞ্চয়িতায় সংকলন করিয়াছেন। এই কাব্যগ্রন্থটিকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যসূচক প্রথম রচনা বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং 'কড়ি ও কোমল'কে এই পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনারূপে গ্রহণ করা যায়।

তৃতীয়ত 'মানসী' সর্ব অর্থেই, ভাব ও রূপের দিক হইতে প্রথম পরিণত সৃষ্টি।

প্রথম পর্যায়। সন্ধ্যাসংগীত-এর কবিতাগুলি যখন লেখা হয় কবির বয়স তখন ২০ বৎসর। যৌবনাবেগে আন্দোলিত কবিহৃদয়ে তখন নানা অস্ফুট ভাব মেঘবৎ ঘুরিয়া ফেরে। মেঘের মতেই তাহাদের কোনো আকারবদ্ধ নির্দিষ্ট রূপ নাই। এই অবস্থায় রচিত কোনো কোনো কবিতায় জীবন বিষয়ে দু-একটি গভীর জিজ্ঞাসা কোথাও বা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। জগৎস্রষ্টার সহিত, সৃষ্টির সহিত, আমার সম্পর্ক কী—ইহা সকল কবিরই একটি মৌলিক ভাবনা। 'অনুগ্রহ' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিতেছেন :

"এই যে জগৎ হেরি আমি,
মহাশক্তি জগতের স্বামী,
একি তোমার অনুগ্রহ?
হে বিধাতা কহ মোর কহ।"

... ...

ওই যে জোছনা হাসি ওই যে তারকারাশি
আকাশে হাসিয়া ফুটে রয়,
ওকি তব ভালবাসা নয়?

অনুগ্রহ নহে, ভালবাসার নিগূঢ় বন্ধনে বিধাতার সাথে বাঁধা আছি; ভালবাসাতেই জাত এবং জীবিত—এই বোধ হইতে যে আনন্দের উদ্বোধন হয় তাহাই কবির কাম্য।

"ভালবাসি আর গান গাই—
কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়—
রাত্রি এত ভালো নাহি বাসে,
উষা এত গান নাহি গায়।
ভালোবাসা স্বাধীন মহান⋯"

রচনা হিসাবে এই চরণগুলি নিতান্তই কাঁচা, ভাষা ভারতীর প্রসাদ হইতে ইহারা বঞ্চিত। তবুও ব্যক্তিহৃদয়ের সহিত বিশ্বের সম্পর্ক রচনার প্রেমে মিলিত হইবার ব্যাকুলিত এই আগ্রহটুকু মূল্যবান। এই প্রেম সম্মিলনের আগ্রহই কি রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম মূল স্বর নয়? সন্ধ্যাসংগীতের বহু কবিতায় প্রকৃতির টুকরা ছবি আছে, কারণহীন বিষাদ ও হৃদয় বেদনার কথা আছে, দুঃখানুভূতির স্বরটাই তীব্র। এ দুঃখবোধের মূল সম্ভবত অন্তরের সহিত বাহির বিশ্বের যথাথ সংযোগ রচনার অক্ষমতায়। হৃদয় অরণ্যে অবরুদ্ধ আবেগের চাপে এক অস্বাভাবিক মানসিকতার পরিচয় সন্ধ্যাসংগীতের কবিতার বৈশিষ্ট্য। রূপ রস গন্ধস্পর্শে বিচিত্রিত প্রস্তুতি ও মানব সংসারে মুক্তিলাভের জন্য সুতীব্র ব্যাকুলতাটুকু শুধু কবির ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করে। এই রচনাগুলির মধ্যেই স্বাধীনভাবে নিজের কথা বলিবার প্রত্যয়বোধ পরিস্ফুট হইয়াছে। ছন্দে এবং ভাষায় তৎসাময়িক প্রধান কবিদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। "তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। মনে কোনো ভয়ডর যেন ছিল না। লিখিয়া গিয়াছি, কাহারো কাছে কোনো জবাবদিহির কথা ভাবি নাই। কোনো প্রকার পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই। ⋯আমার কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্য হিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশী না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাবমূর্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি" (জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ)। আত্ম-

শক্তির প্রতি প্রত্যয়বোধ উপলব্ধির প্রথম নিদর্শন হিসাবেই রবীন্দ্রকাব্যধারায় সন্ধ্যাসংগীতের গুরুত্ব স্বীকার্য।

"প্রভাতসংগীত আমার অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস।" হৃদয় অরণ্যের কুহেলিকাময় অবরোধ হইতে বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে নিষ্ক্রমণের আনন্দবেগে প্রভাত সংগীতের কবিতাগুলি রচিত। হৃদয়াকাশে সমাবেশিত ভাবনাগুলি জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার আশ্রয় না পাইলে কখনোই স্পষ্ট আকার, সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিতে পারে না। জগতের সকল কবিকেই তাই বিশ্বের সহিত মিলনের পথ অনুসন্ধান করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে বিশ্বের সহিত মিলনের সেই আনন্দময় স্মৃতি বিধৃত আছে প্রভাত-সংগীত কাব্যে, বিশেষভাবে এই গ্রন্থের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায়। হৃদয়ে অবরুদ্ধ ভাবের উচ্ছ্বাসগুলি সংবৃত করিয়া জগতকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখার প্রয়াস এইকালে কবির ভাবনাবৃত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজেকে দূরে রাখিয়া বিশ্বকে নিস্পৃহ, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে উপভোগ করিবার এই প্রয়াস হইতেই বিশ্বের এক ভিন্ন রূপ যেন কবির দৃষ্টিতে একদিন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল সদর স্ট্রীটের বাড়ির একটি সকালবেলায় সেই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেমন অবিস্মরণীয় ছিল, রবীন্দ্রকাব্যের পাঠকের নিকটও তেমনই মূল্যবান। "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রি স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছ-গুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে তার স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না……শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য

দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।······সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে গতি-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই ; এমন মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহ চাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্য নৃত্যের আভাস পাইতাম" (জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ)।

জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছের প্রতি সমগ্র চৈতন্য নিবিষ্ট করিয়া তাহার অন্তরের আনন্দময় সৌন্দর্যময় সত্তাটুকু আপন অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিবার এই সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা যথার্থ শক্তিতে, স্বরূপে জাগ্রত হইয়া ওঠে। কবি এতদিনে জীবনের সত্য রূপ দেখিবার দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন। সেই আশ্চর্য সকালটিতে রচিত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিশ্বকে যথার্থভাবে জানিয়া সেই অভিজ্ঞতার সহিত ব্যক্তিস্বরূপের সামঞ্জস্য সাধনের ফলে যে প্রত্যয় দেখা দিল—তাহাই রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের কাব্য-সাধনাকে আপন সৃষ্টির মর্যাদা ও মূল্য বিষয়ে সুদৃঢ় নিশ্চয়তা-বোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাহিরের নিন্দাপ্রশংসার প্রভাব অস্বীকার করিয়া তিনি যে নিষ্ঠাপূর্ণ শিল্পী জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের অতি প্রবল শক্তিরই প্রমাণ, আর সেই শক্তির প্রথম উন্মেষ ঘটিয়াছিল প্রভাত সংগীত রচনার যুগে। 'প্রভাত উৎসব' কবিতার শেষ স্তবকটিতে কবির এই আত্মোপলব্ধি, এই প্রত্যয়বোধ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে :

"জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান!
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসো না তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখো আমার মুখপানে—
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে,

আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে
অরুণকর দিয়ে মুকুট দেন শিরে,
নিজের গলা হতে কিরণমালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি !
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি-পরে,
জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে।"

রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনে, এই অভিজ্ঞতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী লিখিয়াছেন, "সেই কবি-কৈশোরের জ্যোতির্ময় প্রভাতে যে সব দিব্যবাণী তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহির ও অন্তর সমস্তর সমন্বয়ে এক অখণ্ড সচল সমগ্রতাকে তিনি অনুভব করিয়াছেন—তাহাই রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার জগৎ, রবীন্দ্রনাথের কবি জগৎ।"

"চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ" (রবীন্দ্রনাথ)। চিত্র ও সংগীত, ছবি ও গানের সম্মিলনেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের জন্ম। এই সূত্রটি মনে রাখিয়া ছবি ও গান-এর কবিতাগুলি পাঠ করিতে গেলে পদে পদে মনে হয় ভাবকে আকারবদ্ধ করা আর সেই রূপবদ্ধ ভাবের দেহে প্রাণ-সঞ্চার—এই দুই কবিকৃত্য এখানে সম্মিলিত হইতে পারে নাই। কবি নিজেও বোধ হয় এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন, তাই কাব্যগ্রন্থটির ঐরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। প্রভাতসংগীতের সময় হইতেই কবির মনটি ছিল সুরে বাঁধা। বিশ্ব সংসারের প্রতি সমস্ত চৈতন্য নিবিষ্ট করিয়া চাহিয়া দেখার সুখটুকু, চলমান বিশ্ব-দৃশ্য, সেই সুরে বাঁধা মনের বীণার সহজেই ঝংকার তোলে। দৃশ্যরূপগুলি যাহা হয়তো রঙে রেখায় আঁকিয়া রাখিবারই বিষয়—তাহাই কবি ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এইভাবেই 'ছবি ও গান' অধিকাংশ কবিতার জন্ম। "নানা জিনিষকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা পরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র

আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা" (রবীন্দ্রনাথ)। বিশ্ব-জীবনের প্রতি সদ্যো-জাগ্রত আকর্ষণই প্রত্যক্ষের রূপটুকু ভাষায় ধরিয়া দিবার এই উদ্যোগের মূল। কবিতাগুলিতে কল্পনার নহে, বাস্তব সংসারের মানব-মানবী ও ভূ-দৃশ্য ভাষায় রূপলাভ করিয়াছে। প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি, প্রস্তুতির প্রত্যক্ষ রূপের প্রতি আগ্রহে কবিমানসের ঋজুতা এবং অনির্দেশ্য ভাব ব্যাকুলতার কুহেলিকা মুক্ত সুস্থ মনোভাব প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের মানস পরিণতির দিক হইতে ছবি ও গান-এ প্রকাশিত মনোভঙ্গির এই বিশিষ্টতাটুকু মনে রাখিবার মতো।

এই পর্যায়ের আর একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ **ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী**। ইহার কবিতাগুলি সন্ধ্যাসংগীতেরও পূর্বে রচিত, ভাব ভাষা প্রকাশভঙ্গি সমস্তই বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবসঞ্জাত। শিক্ষানবিশ চিত্রকর যেমন প্রখ্যাত চিত্রাবলীর অনুলেখনের দ্বারা বর্ণ ও রেখা সন্নিপাতের কলাকৌশল আয়ত্ত করে এখানে কিশোর কবিও সেইরূপ মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবিতা বৈষ্ণব পদাবলী সম্মুখে রাখিয়া একের পর এক পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সবটুকু শুধুমাত্র অনুলেখন নয়। বিশেষত বৈষ্ণব পদে যে তত্ত্বের রসরূপ মূর্ত রবীন্দ্রনাথের রচনার সেই তত্ত্বের প্রভাব কোথাও নাই। নিজেই অপরিণত জীবন ভাবনা, সুখ দুঃখের অনুভূতি প্রকৃতির সৌন্দর্য-উপভোগ বাসনা কলাকুশলী বৈষ্ণব কবিদের অভিভাবকত্বে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় কাব্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে কালিদাস এবং বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের রচনার সর্বাধিক। তত্ত্বানু-সন্ধিৎসায় নহে, নিতান্তই কবিতার রসের আকর্ষণে, আপন রসানুভূতির সহায়তা বৈষ্ণব কবিতার মর্ম কবি ওই বয়সেই গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন। বিরহ মিলনের লীলায় আন্দোলিত বৈষ্ণব কবিতার ভাবাবহ এবং প্রকৃতির সহিত মানবিক অনুভূতির সূক্ষ্মযোগে রচিত অপরিতৃপ্ত ভালোবাসার এই গানে যে রোমান্টিক উৎকণ্ঠা সঞ্চারিত, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতিতে তাহারা চিরস্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পর্যায়। মানসীর পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে **কড়ি ও কোমল**কেই কবি অসংকোচ স্বীকৃতি দিয়াছেন। বলিয়াছেন, "আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত

প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার।.........মনের সঙ্গে মনের আপস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া।......'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবন নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্য সভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

বিশ্বজীবনে কাছে ক্ষুদ্র জীবনের এই আত্মনিবেদন" (জীবনস্মৃতি)।

'ছবি ও গান'-এর পরে রচিত দুই তিন বৎসরের কবিতা কড়ি ও কোমল-এ সংকলিত হয়। কবির বয়স তখন ২৫ বৎসর। ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়িয়াছে। বাস্তব জীবনেও কবি মানব সংসারের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ২২ বৎসর বয়সে কবির বিবাহ হয়। একান্ত নিজের জীবনবৃত্তের মধ্যেও স্ত্রী ও সন্তান লইয়া মানব সম্পর্কের বিচিত্রতা আস্বাদন করিতেছেন। আকৈশোর তিনি যে স্নেহাশ্রয়ে লালিত অকস্মাৎ কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যায় সেই নীড়টি ভাঙিয়া গেল। এই তাঁহার জীবনে প্রথম প্রবল মৃত্যুশোক। এ শোকের ছায়া সারাজীবনে সঞ্চারিত। একদিকে পূর্ণ যুবক কবির হৃদয় যৌবনাবেগে উদ্বেল, আত্মপ্রকাশের প্রবল আবেগে আন্দোলিত, অন্যদিকে জীবনের কঠোর কর্তব্যগুলি রূঢ়তম অভিজ্ঞতার অভিঘাতগুলি ভিতরে ভিতরে চরিত্রের মেরুটিকে দৃঢ় ও সবল করিয়া তুলিতেছে। জীবন রচনায় যেমন কাব্যরচনাতেও তেমনই এই প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং ভিতরের দৃঢ়তা একই সঙ্গে দেখা যায় কড়ি ও কোমল-এর রচনায়। এখন কবি নিজেকে স্পষ্টরূপে চেনেন। ইতিমধ্যেই কাব্য রচনার একটি দীর্ঘ ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে; সেই অভিজ্ঞতায় নিজের শক্তি ও দুর্বলতার পরিচয় নিজের নিকট স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের পথ চিনিয়া চলিবার প্রয়াস তাই প্রখর আত্মসচেতনতাসম্পন্ন কবির পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। পরিণত বয়সে কড়ি ও কোমল-এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই রীতির কবিতা কখনো প্রচলিত ছিল না। সেইজন্যেই কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সাহিত্য-বিচারকদের কাছ থেকে কটু ভাষায় ভর্ৎসনা সহ্য করেছিলুম। সে-সব যে

উপেক্ষা করেছি অনায়াসে সে কেবল যৌবনের তেজে। আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক। তখন হেম বাড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলেছিলুম। আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়ো দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবি প্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না, সেইজন্যে ভালোলাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারেনি। তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল।......এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বারবার প্রবাহিত হয়েছে।" সমসাময়িক বাঙলা কবিতার পরিবেশের প্রভাব অতিক্রম করিয়া সয়ম্ভর এক কাব্যলোক রচনার সামর্থ্যে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যে প্রতিভার পূর্ণ এবং বিশিষ্ট শক্তির অব্যর্থ প্রমাণ উপস্থাপন করিলেন। কবির দৃষ্টিতে এখন ভুবন সুন্দর। সৌন্দর্য আর নিরবয়ব কল্পনার সত্য নহে, প্রত্যক্ষ জগতে ইন্দ্রিয়গম্য বাস্তব সৌন্দর্যের তৃষ্ণা তাঁহার দৃষ্টিতে। কয়েকটি কবিতা মৃত্যুর অভিজ্ঞতাজনিত শোকের ছায়া বিষাদের সঞ্চার করিলেও বিষাদ কড়ি কোমল-এর মূল সুর নয়। বরং কবির মানসিকতার মূল কথাটি প্রকাশ পাইয়াছে 'যৌবন স্বপ্ন' কবিতায়, সে কথা—"আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।"

আধুনিক বাঙলার সদ্যোদ্ভূত লিরিক কবিতায় এমন বাস্তব জীবনাগ্রহ, যৌবনস্বপ্নে মদির সৌন্দর্যদৃষ্টি এবং আবেগের উচ্চনিচ গ্রাম ও সূক্ষ্মতা অনুসারে ভাবাভঙ্গির বিচিত্রতা সেকালের সাহিত্যিক পরিবেশে বিস্ময়কর মনে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার পরবর্তী বিকাশধারা বিষয়ে অবহিত আজিকার পাঠকের পক্ষে এই কাব্য বিস্ময়ের নহে, বরং ইহাই যথার্থত

রাবীন্দ্রিক অভিজ্ঞানযুক্ত প্রথম অব্যর্থ স্বাভাবিক রচনা। কড়ি ও কোমল-এর কিছু কবিতায় (যেমন চুম্বন, স্তন, বাহু, চরণ, দেহের মিলন, তনু, স্মৃতি প্রভৃতি) প্রখর ইন্দ্রিয় সচেতনতার স্বাক্ষর আছে। কবি হয়তো ইহাকেই বলিয়াছেন বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা। বিশ্বে পরিকীর্ণ সৌন্দর্যের প্রত্যক্ষ আস্বাদের জন্য এসব কবিতায় যে ব্যাকুলতা আছে—তাহা সুস্থ মানসিকতারই পরিচায়ক। মূর্ত সৌন্দর্যের প্রতি চিত্তের এই শালীনতাপূর্ণ আকর্ষণ তাঁহার পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যে আরও সূক্ষ্মভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ বিষয়ে রচিত কবিতাগুলির কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতি প্রসঙ্গে রচিত অধিকাংশ কবিতাই অবশ্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে রচিত চিত্র, কিন্তু ইহারই মধ্যে 'সমুদ্র'-এর মতো কবিতায় আলোড়িত সমুদ্রের বিক্ষোভের সহিত কবি অনুভূতির যোগে একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। এই প্রবণতাই মানসীতে, সোনার তরীতে, চিত্রায় রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রকৃতি-চেতনা, বিশ্বানুভূতির ভাবপরিণতিতে উপনীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্যে কাব্যপ্রসঙ্গের যে অনন্ত বৈচিত্র্য এবং কল্পনার অপরিসীম বিস্তার আমাদের বিস্মিত করে—'কড়ি ও কোমল' হইতেই যেমন তাহার সূচনা, তেমনই স্বকীয় ভাষা ও কাব্যপ্রকরণ সৃষ্টির সার্থক পরীক্ষার দিক হইতেও এ কাব্য স্মরণীয়। উচ্ছৃঙ্খল, অনিয়ন্ত্রিত কাল্পনিকতা হইতে কোনো সার্থক শিল্পসৃষ্টি হইতে পারে না। কল্পনাপ্রতিভার স্বেচ্ছাকৃত সংযমই শিল্পসৃষ্টির মূল। এই শিল্প-চেতনা কড়ি ও কোমল-এর সকল রচনাতেই অনায়াসলক্ষ্য। স্বপ্নাবিষ্ট ভাববিলাস এখানে সংযমিতা মনন-কল্পনার দৃঢ়তায় আশ্রিত। কাব্যভাষাও এখানে এক নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। এমন স্পর্শসচেতন, ভাবকল্পনার সূক্ষ্মতম ইংগিতটুকুও ধারণে সমর্থ সৌন্দর্যময় ভাষা আধুনিক বাঙলার লিরিকে এই প্রথম দেখা গেল। সনেট-এর নিয়মবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত অবয়ব এ কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় কবির সংযমিত আবেগের যথার্থ আধার হইয়া উঠিয়াছে। কড়ি ও কোমল-এ প্রধানত মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দই (তানপ্রধান বা অক্ষরবৃত্ত) ব্যবহৃত হইয়াছে। এ ছন্দে ইতিপূর্বে মধুসূদন যে নমনীয়তা দান করিয়াছেন—তাহার চেয়ে নতুন কিছু করা সম্ভব ছিল না, রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারে এই ছন্দের নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু বাঙলা কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দের শুদ্ধরূপ প্রথম দেখা

গেল কড়ি ও কোমল-এর 'বিরহ' কবিতায়। ছন্দ-বিষয়ক পরীক্ষার দিক হইতে এই দৃষ্টান্তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানসী এবং পরবর্তী কাব্য-পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে নানারূপ বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন।

তৃতীয় পর্যায়, মানসী। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয়বার বিলাত প্রবাস হইতে ফিরিবার পর। দীর্ঘদিন ধরিয়া লেখা নানা ধরণের কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য কবিতাগুলি প্রেম ও সৌন্দর্য, প্রকৃতি এবং স্বদেশ ও সমাজ—এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া লওয়া সঙ্গত। শুধু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত কাব্যসাধনার ধারাতেই নয়, সামগ্রিকভাবে বাঙালা কবিতার ইতিহাসেই 'মানসী' হইতে এক নতুন যুগের সূচনা হইয়াছিল। আধুনিক বাঙালীর সাহিত্যিক প্রতিভা গীতি-কাব্যের শিল্পগত সিদ্ধির নিঃসংশয়িত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আর বাঙলা গীতিকবিতার এই সমৃদ্ধির সূচনা 'মানসী' হইতে।

মানসীর কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয় ও আঙ্গিক উভয় দিক হইতেই কবি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তিভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এইসব কবিতার পশ্চাতে কবির মানসিকতার বৈশিষ্ট্যটুকু বিশেষভাবে আলোচ্য। কবি অনুভব করিয়াছেন, নিজের বাহিরে যে পরিকীর্ণ বিশ্ব (বিশ্ব বলিতে এখানে প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ ও সমাজের রীতিনীতি সকল কিছুই বুঝিতে হইবে) তাহাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অস্বীকার করিলে আপন চিত্তগত ভাব-ভাবনা নিতান্ত নিরালম্ব অবয়বহীন হইয়া পড়ে। আবার বিশ্বের পরিকীর্ণ রূপরাশি, মানব সম্পর্কের নানা রূপ, সামাজিক বন্ধন—ইত্যাদি অতি প্রত্যক্ষ যাহা, তাহাকেই যদি সত্য মানা যায় তবে সত্যের সহস্র মূর্তি আছে, বিশ্বে বৈচিত্র্যই একমাত্র সত্য, ঐক্য কোথাও নাই মানিতে হয়। বিচিত্র এই বিশ্ব কোনো সামান্য (universal) সত্যের ঐক্যবন্ধনে গ্রথিত এবং বিধৃত—এইরূপ উপলব্ধি যতক্ষণ না জাগিতেছে ততক্ষণ Ideal ও Real-এর দ্বন্দ্বের অবসান সম্ভব নয়। যে বিশ্বে Real, সেই বিশ্বই ব্যক্তিকে নিরন্তর বাহিরের টানে। আবার Ideal-এর টান বাস্তব হইতে মনকে প্রত্যাবৃত করিয়া লয়, নির্বিকল্প তত্ত্বধারণায় সমগ্র মানসিকতাকে নিবিষ্ট করে। দার্শনিকের পক্ষে ইহার কোনো একটিকে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে বাধা হয় না, কিন্তু কবি যিনি, যিনি রূপস্রষ্টা তাঁহার পক্ষে এ দ্বন্দ্বের সমাধান এত

সহজে হইবার নয়। সমাধান হয়তো সম্ভবপরও নয়, সমাধান হইলে রূপসৃষ্টির সম্ভাবনাও চিরতরে ঘুচিয়া যায়। সত্যের নির্বিশেষ ধারণা এবং বিচিত্র রূপময় বিশ্বের প্রমূর্ত রূপগত সত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টাতেই, এই দ্বন্দ্বেই শিল্পের উৎসার। কবি বলেন, "অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal-এর মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য। কল্পনার centiifugal force, Ideal-এর দিকে Real-কে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের centripetal force, Real-এর দিকে Ideal-কে আকর্ষণ করে, কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না—এবং নিতান্তই সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।" মানসীর সূচনায় 'উপহার' নামক কবিতাটিতে কবি এই সত্যই প্রকাশ করিয়াছেন :

"এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।"

এই কথাটাই 'জীবনস্মৃতি'-গ্রন্থে অন্যভাবে বলিয়াছেন, "আমার তো মনে হয় আমার কাব্য-রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।......এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আছে।" অসীমে বিধৃত, অসীমেরই অভিব্যঞ্জক বলিয়া সীমার মর্যাদা, অন্তত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সীমা অসীমের সম্পর্ক এইভাবেই ধরা দিয়াছে। ইহাই মানসীর যুগে, শুধু মানসীর যুগেই বা কেন, তাঁহার সমগ্র কবিজীবনেরই জীবনদৃষ্টির মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এই দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রকৃতির বিশেষ রূপদৃশ্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার কল্পনা বিস্তার লাভ করে বিশ্বের অন্তরালবর্তী জীবনরহস্যের মর্মে, বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসার সুখ-দুঃখানুভূতির মধ্যে অসীম প্রেমের তাৎপর্য আভাসিত হইয়া ওঠে। দেশের প্রতি কর্তব্যের টানে কর্মের পথে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, দেশ ও দেশবাসীর সর্বাত্মক সমুন্নতির ভাবনার দিক হইতে তাহার মূল্য বিচার না করিয়া পারেন না। প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশ—মানসীর এই তিন পর্যায়ের কবিতায় মধ্যেই সীমা অসীমের, Real ও Ideal-এর দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় প্রচেষ্টা অনুভূত হয়।

'মানসী' কাব্যের প্রধান 'থীম' বা কাব্য-বিষয় প্রেম। কাব্যের

নামকরণেও ইহার ইঙ্গিত আছে। প্রেম ও সৌন্দর্য এ কাব্যে একাকার-ভাবে পাই। সুন্দর-এর কল্পনামূর্তি পায় নারীকায়ায়। হৃদয় আসনে কবি যে সৌন্দর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চান তাহা 'অনুপম জ্যোতির্ময় মাধুরী মূরতি'। নারীর রূপ, নারীহৃদয়ের রহস্য, নারীর দেহ-মনের মাধুর্যের প্রতি বিচিত্র আকর্ষণ তাই অধিকাংশ কবিতায় কেন্দ্রগত বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য-কল্পনা নারী দেহাধিষ্ঠিত বলিয়াই অনিবার্যভাবে আসে বাসনার উত্তাপ, নর-নারীর বাস্তব মিলন-বিরহে বিচিত্রিত সম্পর্কের জটিলতা ছায়া ফেলে। এইভাবে প্রেমের কবিতায় একটা সুস্থ বাস্তবাবহ রচিত হয়। নিরুদ্দেশ উধাও কল্পনা বাঁধা পড়ে মৃত্তিকা সংলগ্ন বাস্তবতায়। মানসীর কবিতায় সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষার টান যেমন সত্য, দেহাশ্রিত বাস্তব বাসনার আকর্ষণও অনুরূপ সত্য। দুয়ের মিলনে, অরূপ ও রূপের সম্মিলনেই কবিতার রস নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবনরহস্যের মর্মভেদের জন্য বারংবার তিনি প্রকৃতির দ্বারস্থ হইয়াছেন। প্রকৃতির সহিত মানবজীবনের সম্পর্ক, ব্যক্তিজীবন ও পরিব্যাপ্ত বিশ্বের মর্মগত সংযোগ আবিষ্কারের আগ্রহ প্রথম মানসী কাব্যেই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। দেখা যায় প্রকৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা। প্রকৃতির খুব কম কবিতাতেই প্রকৃতির বিশেষ রূপের বর্ণনা পাই। বরং প্রকৃতি কবিব্যক্তির ব্যক্তিত্বের জগৎ বহির্ভূত একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্বরূপেই প্রবলভাবে কবির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। ধরা দিয়াছে প্রকৃতির ভাবমূর্তি। তাই 'মানসী' কাব্যের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য বর্ণনায় কবির দক্ষতা অনুসন্ধেয় নয়। মানবজীবনের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে কবির নানামুখী জিজ্ঞাসাই প্রধান বিবেচ্য। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় কোথাও কবির সংশয়িত মনোভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠুর সৃষ্টি, প্রকৃতির প্রতি, সিন্ধুতরঙ্গ—প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতি মানবজীবনের পক্ষে একান্ত প্রতিকূল নিয়মহীন, শৃঙ্খলাহীন এক অন্ধজড়শক্তি রূপে চিত্রিত। যেমন :

"মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে, এই উঠে, এই পড়ে—
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।" (নিষ্ঠুর সৃষ্টি)

অথবা,

"পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই—
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা-আশা একত্র বেঁধেছে বাসা,
এক-সাথে রয়।
কে বা সত্য, কে বা মিছে, নিশিদিন আকুলিছে
কভু ঊর্ধ্বে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।
জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে—
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
একি দুই দেবতার, দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময় ?
চিরদিন অন্তহীন জয় পরাজয় ?" (সিন্ধুতরঙ্গ)

এই মনোভাব অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও চেতনায় একটা ব্যতিক্রম রূপেই বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি-প্রীতি গূঢ়তর প্রবর্তনায় যেখানে প্রকৃতির সহিত নির্বিরোধে মিলনের উপায় রচনা করিয়াছে সেইসব কবিতাই কবিমানসের স্বাভাবিক প্রবণতার দৃষ্টান্তরূপে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইদিক হইতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটি। প্রকৃতির সহিত একাত্মতার অনুভূতি, কবির বিশ্বাত্মবোধ এই কবিতাতেই সর্বপ্রথম প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। অহল্যার জীবনায়নের পৌরাণিক কাহিনীর রূপকে কবি বিশ্বপ্রকৃতিকে, মর্ত ধরণীকে জীবধাত্রী জননীরূপে কল্পনা করিয়াছেন এই কবিতায়। ধরিত্রীর রূপ কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সূচনা হিসাবে এই কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশ তাৎপর্যপূর্ণ :

"যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা, তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পশ্য নিত্য চুপে চুপে
ভরিছ সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে

জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে
চিররাত্রি সুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে ;
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায় ;
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।
সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা ; দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর, সরল, শুভ্র ; হয়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে।"

এই বিশ্বাত্মবোধক সোনার তরী কাব্যে পূর্ণ পরিণত রূপ লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের ভিন্ন আর একদিক প্রতিফলিত হইয়াছে স্বদেশ-ভাবনামূলক কবিতায়। কবি হিসাবে কাব্যসাধনা, সঙ্গীত সাধনাই তাঁহার জীবনের মুখ্য কৃত্য হইলেও চিরদিনই তিনি দেশের বাস্তব সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার এই কর্মীজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আধুনিক ভারতবর্ষের অনুসরণীয় আদর্শ উদ্ভাবন করিয়াছেন। দেশের সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতির মূল্য বিচার করিয়াছেন নিজের আদর্শের দিক হইতে। 'মানসী' কাব্যের দুরন্ত আশা, দেশের উন্নতি, বঙ্গবীর, নিন্দুকের প্রতি নিবেদন, কবির প্রতি নিবেদন, গুরু গোবিন্দ প্রভৃতি কবিতায় কোথাও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভ্রান্তি ও সংকীর্ণতার প্রতি তীব্র বিদ্রূপ কোথাও বা আদর্শের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা উচ্চারিত হইয়াছে।

বাঙলাদেশ হইতে দূরে গাজিপুরের অপরিচিত পরিবেশে 'মানসী' কাব্যের সূচনা হইয়াছিল। হয়তো বা এই পরিবেশগত নূতনত্বের প্রভাবেই কবির মন কবিতার নানা রূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করিয়া দিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। বিচিত্র এই প্রকাশ আত্মপ্রত্যয় আনিয়া দিয়াছে, নিজের সামর্থ্যও

বিষয়ে সকল সংশয় ঘুচিয়া গিয়াছে। ইহার পর কবির প্রবাসী চিত্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল, বিশেষভাবে বাঙলাদেশের পরিবেশে ফিরিয়া আসিলেন। দেশের মাটি, দেশের জলবায়ু এই প্রবুদ্ধ কবিপ্রতিভাকে অফুরন্ত প্রাণরসে পূর্ণ করিয়া তুলিল। 'সোনার তরী' সেই রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণ যৌবনের কাব্য।

সোনার তরী : পটভূমি :

রবীন্দ্রকাব্যধারায় মানসী পর্যায়ের পরে 'সোনার তরী'র সূচনা, সোনার তরী হইতে তাঁহার কাব্যের যে একটি নূতন পর্ব আরম্ভ হইয়াছে তাহার বিস্তার গীতাঞ্জলি পর্যন্ত। সোনার তরী পর্যায়ের কবিতার রূপ ও রসের স্বাতন্ত্র্য আপাতদৃষ্টিতেও সহজেই ধরা পড়ে। এ এক নূতন জগৎ। সোনার তরীর অভিনবত্বের দিকটি কবির নিজের উক্তিতেও প্রকাশিত। এ কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন, "সোনার তরীর লেখা আর একটি পরিপ্রেক্ষিতে। বাঙলা দেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাঙলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়।" সোনার তরী পর্বের পূর্ববর্তী কবিজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়—কবির উপর সংসারের দায়-দায়িত্ব তখনো তেমনভাবে চাপিয়া বসে নাই। কিন্তু ক্রমে ঠাকুর পরিবারের বৃহৎ ভূ-সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হয়। দ্বিতীয়বার বিলাত প্রবাস হইতে দেশে ফিরিবার (১৮৯১ খ্রী:) কিছুদিনের মধ্যেই কর্মসূত্রে তাঁহাকে উত্তরবঙ্গে যাইতে হয়। বিরাহিমপুর, কালিগ্রাম ও সাহাজাদপুর পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জমিদারির সহস্রবিধ কাজে দিনের পর দিন কবিকে নদীপথে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। নাগরিক জীবন-যাত্রার পরিচিত পরিবেশ হইতে দূরে গ্রামবাঙলার প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সান্নিধ্যে এই নূতন জীবনের স্বাদ কবিকে যে কতো বিচিত্রভাবে আলোড়িত করিয়াছে 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থের চিঠিগুলিতে তার পরিচয় মেলে। গ্রামাঞ্চলে

কবিকে বসবাস করিতে হইত নদীর উপরে বোটে নয়তো নদীর তীরবর্তী কুঠিবাড়িতে। দিনের পর দিন নদীস্রোতে ভাসিয়া চলিতেন। ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রকৃতির রূপ পালটায়, আকাশ বাতাসে পরিবর্তনের সাড়া জাগে—কবি দেহেমনে এই নিয়ত রূপান্তরশীল বিশ্বপ্রকৃতির স্পর্শ অনুভব করেন। প্রকৃতির সহিত এই যে যোগ—ইহা কল্পনার যোগ নয়, একেবারেই ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা। যেমন কবি বলেন, "তীরে যেখানে নৌকো বাঁধা আছে সেইখান থেকে একরকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকে থেকে পৃথিবীর একটা গরম ভাপ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে—মনে হয়, এই জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী আমার খুব নিকটে থেকে নিশ্বাস ফেলছে, বোধ করি আমারও নিশ্বাস তার গায়ে গিয়ে লাগছে।" দেহমনের নিবিড় আশ্লেষে এমনভাবে প্রকৃতিকে পাওয়ার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে কখনো হয় নাই। এ জীবনে কোথাও ত্বরা নাই, আকস্মিকতার আঘাতে চমকিত হইতে হয় না। বিস্তীর্ণা বিপুলা বিশ্বপ্রকৃতি নিজেকে উদার আকাশের নিচে মেলিয়া ধরিয়াছে। কবি এই বিশ্বমাতার কোলের মধ্যে নিজেকে মিশাইয়া দিয়া ইহার জীবনধারার মর্ম উপলব্ধি করিতেছেন। "যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ।" প্রকৃতি-প্রীতি ব্যাপারটা এতদিন যেন কবির নিকট নির্বস্তুক (abstract) ধারণার মত ছিল। সেই ধারণা কবির পক্ষে অসত্য বা মূল্যহীন ছিল না ঠিকই, প্রকৃতির প্রতি তাঁহার আকর্ষণ তো জন্মগত। কিন্তু জীবনের এই পর্বে প্রকৃতি যেমন বাস্তব মূর্তিতে তাহার রূপরসের সম্ভার লইয়া কবির নিকট সর্বতোভাবে ধরা দিয়েছে ইতিপূর্বে কখনো প্রকৃতিকে এমন করিয়া পান নাই। এ অভিজ্ঞতা তাঁহার অন্তঃকরণ পরম চরিতার্থতায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এ চরিতার্থতার আনন্দ শিরায় শিরায় বহিয়া গিয়া কবিকে আবিষ্ট করিয়াছে। নবলব্ধ এই আনন্দিত উপলব্ধি তাঁহার কল্পনার মধ্যে এক সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছে। কবিতা বা গল্প বা প্রবন্ধ যাহাই লিখুন না কেন—সকল রচনার মধ্যে প্রত্যহের অভিজ্ঞতায় পাওয়া এই বিশ্বপ্রকৃতির স্বাদ কত বিচিত্রভাবে সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। 'পোস্টমাষ্টার' গল্প রচনা প্রসঙ্গে একটি পত্রে কবি লিখিয়াছেন, "আমিও লিখছিলুম এবং আমার

চারিদিকের আলো বাতাস ও তরুশাখার কম্পন তাদের তাহার ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল।" এই পর্বের সকল রচনা সম্পর্কেই বলা যায়, কবির কল্পনা চালিত হইয়াছে প্রকৃতির বশে। সকল রচনার মধ্যেই প্রকৃতির সজীব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সোনার তরীর কবিতায়, বিচিত্র প্রবন্ধ বা পঞ্চভূত গ্রন্থের প্রবন্ধে বা ছোটগল্পের সর্বত্র।

শুধু প্রকৃতি নয়, মানব জীবনধারার সজীব স্পর্শও কবিকে এই সময়ে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার সম্পদে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। যে সুবৃহৎ জনসমাজ লইয়া আমাদের দুঃখ পীড়িত, দারিদ্র্য লাঞ্ছিত, অশিক্ষার অন্ধকারাচ্ছন্ন স্বদেশ—তাহার পরিচয় ইতিপূর্বে কবি কতটুকুই-বা জানিতেন। জমিদারি পরিচালনার সূত্রে প্রতিদিন তাঁহাকে গ্রামের মানুষের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে। জীবনের দুঃখে বেদনার ইতিহাস তাহারা অবারিত করিয়া দিয়াছে। দেশের মানুষের যথার্থ বেদনা কোথায়, কী তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের ব্যর্থতার দৈন্যের কারণ কী— কবি প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই অভিজ্ঞতাতেই কবির হৃদয়, কবির সকল কর্মোদ্যোগ চিরদিনের মতো স্বদেশের মর্মের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নানা প্রশ্নে কবি চিরদিন এই অভিজ্ঞতাজাত দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সত্যাসত্য এবং কর্তব্যের পথ নির্ণয় করিয়াছেন। এইসব দিনের কথায় কবি লিখিয়াছেন, "অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্বপ্রকৃতির এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

এইভাবে 'সোনার তরী' পর্বে রবীন্দ্রপ্রতিভা স্বদেশের মাটিতে শিকড় মেলিয়া প্রাণরস আহরণ করিয়াছে, নিজের নিহিত সামর্থ্যকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিভা যতোই বড়োই হোক, স্বদেশের স্বজাতির জীবনের সহিত যোগ ভিন্ন তাহার আত্মবিকাশ কখনো সম্ভবপর হয় না। দেশের ঐতিহ্য, দেশের লোক-

জীবনের বহতা ধারা, মাতৃভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সহিত মর্মগত যোগ সাধনা শিল্পসাধনা, সাহিত্য সাধনা চরিতার্থ হইতে পারে না। শিল্প-সাহিত্য ফুলের মতো ফোটে, কিন্তু ফোটানো সম্ভব হয় দেশের মাটির প্রাণরসে। প্রতিভাধর কবি-শিল্পীকে তাই স্বদেশের সহিত নিজেকে মিলিত করিবার সাধনা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সেই যোগ সাধনের সুযোগ আসিয়াছিল সোনার তরীর যুগে। সাহিত্যে-সংগীতে, রাজনীতি ও গঠনমূলক কর্মধারায় রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের যে বহুমুখী প্রকাশ আমাদের বিস্মিত করে, সেই ব্যক্তিস্বরূপ পূর্ণতা অর্জন করিয়াছিল এই পর্বে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রভাবে। বাঙলাদেশের প্রকৃতি, বাঙালি সমাজের জীবনযাত্রা, বাঙালার লোকসাহিত্য এবং লোকসংগীত, বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত বাঙলা ভাষার বৈচিত্র্য এই সময়ের নিয়ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতারূপে রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনার অঙ্গীভূত হইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে বাঙালাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতে পরিণত করিয়াছে। মহীরুহ আকাশে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, কিন্তু তাহার মূল প্রোথিত থাকে মৃত্তিকায়। রবীন্দ্রপ্রতিভাও মহীরুহের ন্যায় বিশ্বের আকাশে আপনার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু বিশেষভাবে বাঙালাদেশের মাটিই তাঁহার অধিষ্ঠান-ভূমি, বাঙলাদেশের জীবনে শিকড় মেলিয়া মহিমান্বিত আত্মবিকাশের শক্তি তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আর বিশেষভাবে সোনার তরী পর্বেই তিনি সর্বতোভাবে স্বদেশের সংলগ্নতা অর্জন করেন।

'সোনার তরী' কাব্যে কবির জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা :

(কাব্যের উৎস কবির মন, কবির ব্যক্তিত্বের জগৎ। কিন্তু এই মনোবিশ্ব গড়িয়া ওঠে জগতের সহিত কবিব্যক্তির নিরন্তর সংযোগে।) বাহির বিশ্ব (বিশ্ব বলিতে এখানে প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ ও সমাজের রীতিনীতি সবকিছুই বুঝিতে হইবে) আপন স্বরূপে অধিষ্ঠিত। কবিব্যক্তি যখন এই বিশ্বের সম্মুখীন হন তখন প্রথমেই বিশ্বের সহিত নিজেকে মিলিত করিবার সমস্যাটা বড়ো হইয়া ওঠে। (বিশ্বের সত্য স্বরূপ কী ভাবে গ্রহণ করিবেন, বিশ্বসত্যের সহিত নিজের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাগুলি কী ভাবে সম্মিলিত করিবেন—ইহাই সকল শিল্পীর সকল কবির প্রাথমিক সমস্যা।) একই কালসীমায়, একই সমাজ পরিবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়াও জগৎ সম্পর্কে ধারণার ভিন্নতা ঘটে কবিতে কবিতে।

ইহার কারণ, দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতার জন্যই বিশ্বসত্য কবিবিশেষের নিকট স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হইয়া ওঠে! বিশ্বসত্যের সে রূপ তাঁহার কাব্যে প্রকাশ পায় তাহা একান্তভাবে সেই কবিরই চেতনাগত বিশ্বসত্য, তাঁহার জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা দ্বারা চিহ্নিত।

(রবীন্দ্রকাব্যের মর্মে প্রবেশ করিবার জন্যও তাই তাঁহার জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁহার জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে দেখিলে বিষয়ের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিভিন্ন কবিতার মধ্যে একটা ঐক্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্থূল বস্তুরূপের প্রতিচিত্রণ কোথাও নাই। প্রকৃতি বা মানবজীবন—কবিতার বিষয় যাহাই হোক, সর্বত্রই দেখা যায় কবি কাব্য-বিষয়টিকে তাহার স্ব-রূপে গ্রহণ করেন না। প্রবল কল্পনাশক্তির দ্বারা বিশ্বের বস্তুরূপের অন্তরালবর্তী কোনো গূঢ়তর সত্য আবিষ্কার এবং সেই সত্যকে নিজের ভাবনাবেদনার রসে জারিত করিয়া কাব্যে প্রকাশ করাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। স্থূল ঘটনা বা দৃশ্যরূপের বস্তুগত দিকটিকেই সামগ্রিক সত্যের মূল্য না দিয়া তাহার মধ্যে কোন বিশ্বনীতি বা বিশ্বসত্য উদ্ঘাটনের এই প্রয়াস বিশেষ-ভাবে রোমান্টিক মনোধর্মের লক্ষণ। রোমান্টিক মানসিকতাসম্পন্ন কবি শিল্পীদের দৃষ্টি বাহিরের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে সন্ধান করে না, তাঁহাদের লক্ষ্য 'inner experiences of life'। এই দৃষ্টিতে বস্তুর রূপের চেয়ে তাহার মর্মগত স্বরূপটি প্রাধান্য পায়। অভিজ্ঞতা বিশেষের মধ্যে নিহিত কোনো তৎপর্য আবিষ্কার এবং সেই তাৎপর্যের দিক হইতে বিশেষ অভিজ্ঞতাটিকে জগৎ সম্পর্কে অখণ্ড কোনো সত্যানুভূতির সহিত গ্রথিত করিয়া দেখা রোমান্টিক কবিদৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ দৃশ্যের অভিঘাত কবির মনে এক সুদূরপ্রসারী কল্পনাবৃত্তি ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে। অভিজ্ঞতা-বিশেষ সর্বদাই সীমায়ত, তাহার বস্তুগত পরিচয় সীমাবদ্ধভাবেই চোখে পড়ে। কিন্তু কবি সেই সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে জীবনের সমগ্রতার সহিত গাঁথিয়া তুলিয়া তাৎপর্যমণ্ডিত করেন। তাঁহার কল্পনাবৃত্তির এই ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কাব্যসৃষ্টির নিহিত মর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "আমার তো মনে হয় আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন

সাধনের পালা।" সীমাকে, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলিকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু তাহাকেই শেষতম, সমগ্র সত্য মনে করেন না কবি। মূর্ত স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া তাহারই মধ্যে রূপাতীত সামান্য-সত্যের (universal) ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিতে চান। ধারনায় যাহা অসীম অরূপ শিল্পে তো শিল্পী তাহারই কায়া প্রস্তুত করেন। সেই কায়ার আদর্শ বাস্তব সংসারের অভিজ্ঞতা হইতেই আসে। রূপলাভ করিয়া যাহা প্রত্যক্ষ মূর্তিতে দেখা দিতেছে তাহা সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। তাহার সত্যতা নির্ভর করে অরূপ, অসীম, সামগ্রিক জীবনানুভূতির অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্যের সহিত সম্পর্কের উপরে। অসীমে বিধৃত, অসীমেরই অভিব্যঞ্জক বলিয়া সীমার মর্যাদা, অন্তত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সীমা অসীমের সম্পর্ক এইভাবেই ধরা দিয়াছে। এই দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রকৃতির বিশেষ দৃশ্য-রূপ অবলম্বন করিয়া তাঁহার কল্পনা বিস্তার লাভ করে বিশ্বের অন্তরালবর্তী জীবনরহস্যের মর্মে, বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসার সুখ-দুঃখানুভূতির পটে অসীম তাৎপর্য পায়।

'সোনার তরী কাব্যে বিশেষভাবে প্রকৃতির প্রতি কবির আকর্ষণ ক্রমে একটি সামগ্রিক জীবনদর্শনের ভিত্তি প্রস্তুত করিয়াছে। এই পর্যায়ের কবিতায় বাংলাদেশের অঞ্চলবিশেষের প্রকৃতির রূপ অনবদ্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোনো কবিতাতেই প্রকৃতির রূপচিত্র অঙ্কন কবির লক্ষ্য নয়। দৃশ্যরূপময় প্রকৃতির রূপরস কবির মনে একদিকে সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি এক সর্বায়ত সর্বাব্যাপ্ত শক্তির রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই শক্তি, যাহাকে কবি মাতৃ-মূর্তিতেই কল্পনা করেন, তাহার স্নেহালিঙ্গনে তিনি নিজেকেও লীন করিয়া দিয়া বিশ্বের সহিত একাত্মতার স্বাদ অনুভব করিয়াছেন। 'সোনার তরী' কাব্যে প্রকাশিত কবির এই প্রকৃতিচেতনার প্রসঙ্গটি বিশদভাবে আলোচনার বিষয়।

'সোনার তরী' কাব্যে কবির প্রকৃতিচেতনার বৈশিষ্ট্য :

কবির চিত্তে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার উন্মেষ হইয়াছিল নিতান্ত বালক বয়সে। সেই বালক বয়সের কথা 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে

আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বারা-জানালার নানা ফাঁকফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে ছিল মুক্ত আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।" শহর কলিকাতায় প্রকৃতির কতটুকুই-বা অবশিষ্ট ছিল! একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর, একটি চীনাবট, নারিকেল শ্রেণী—বালকের কল্পনা নানাভাবে ওই দৃশ্যটুকুরই রস পান করিয়া সঞ্জীবিত হইত। "আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম।" প্রকৃতির প্রতি প্রণয়ের এই আকর্ষণ কবির সারা জীবনে একটা নিগূঢ় প্রবর্তনার মতো রণিত হইয়াছে। জীবন রহস্যের মর্মভেদের জন্য তিনি বারংবার প্রকৃতির দ্বারস্থ হইয়াছেন। প্রকৃতির সহিত মানবজীবনের সম্পর্ক, ব্যক্তিজীবন ও পরিব্যাপ্ত বিশ্বের মর্মগত সংযোগ আবিষ্কারের আগ্রহ প্রথম মানসী কাব্যেই দেখা যায়। মানসী কাব্যে অনেক কবিতায় প্রকৃতির নিষ্ঠুর রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। এই জাতীয় কবিতায় কবির চেতনা এক ধরণের সংশয় আচ্ছন্ন। যে সব সুকোমল বৃত্তি লইয়া মানবজীবন, কেন বারবার তাহা নিষ্ঠুরা প্রকৃতির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়—এই প্রশ্ন কবিকে ব্যাকুল করিয়াছে। আবার অন্যদিকে প্রকৃতির কল্যাণময়ী মূর্তি ধ্যান করিয়াছেন বহু কবিতায়। এই বিপরীত ভাবনার সাক্ষ্য হইতে মনে হয় প্রকৃতি সম্পর্কে কবির মনোভাব তখনো একটা সুস্থির প্রত্যয়ে উপনীত হয় নাই। কিন্তু মানসী কাব্যেই 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রকৃতিচেতনার অবিসংবাদিত প্রমাণ মেলে। প্রকৃতির কোনো বিশিষ্ট রূপ নয়, সমগ্রভাবে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের যে প্রাণের বিচিত্রলীলা প্রকাশ পায়—বিশ্বের অন্তর্বর্তী সেই প্রাণকেন্দ্রের সহিত নিজেকে সম্মিলিত করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রথম 'অহল্যার প্রতি' কবিতাতেই পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। এই অতিশয় বিশিষ্ট প্রকৃতি ভাবনার পরিপুষ্টি এবং ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায় 'সোনার তরী' কাব্যে।

'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে কবি লিখিয়াছেন, "এই জীবনযাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি তখন আর-এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের

সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মতা একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে।" শিলাইদহ পতিসর অঞ্চলে বসবাসকালে কবি একেবারে প্রকৃতির কোলের মধ্যে নির্দিষ্ট হইয়া কাল যাপন করেন। দূর হইতে আভাসে ইঙ্গিতে দেখা নয়, প্রকৃতির নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দিয়া বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতির সর্বাত্মক স্পর্শে দেহমন পূর্ণ করিয়া তুলিবার অবারিত সুযোগ তাঁহার জীবনে এই প্রথম। মানব আত্মার দম্ভ, স্বাতন্ত্র্যবোধ ঘুচাইয়া তৃণ তরুলতায়, আকাশ মৃত্তিকায়, জলধারায় নিজের অস্তিত্বকে লীন করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মতার এক নতুন স্বাদ কবিকে এই সময়ে চরিতার্থতায় পূর্ণ করিয়া তোলে। বলেন,

"মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর শ্যামস্নিগ্ধ মাতৃ মুখপানে,
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলি মাটি তোর"

এই মনোভাব ছিন্নপত্রাবলী পত্রধারায় কবি অপূর্বভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন একটি পত্রে লিখিতেছেন, "এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রতি রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কতদূর দূরান্তর দেশ দেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দ রস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই-যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্চে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।"

উদ্ধৃত এই পত্রে যে অনুভূতির কথা পাই সোনার তরী কাব্যের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় তাহাই নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে উচ্চারিত হইয়াছে। এই পত্রাংশটি হইতে কতকগুলি কথা স্পষ্ট হইয়া আসে। 'আমি প্রকৃতিকে ভালোবাসি', 'প্রকৃতি আমার প্রিয় এবং আমাকে আনন্দ দেয়'—এই জাতীয় মনোভাব রবীন্দ্রনাথের কোনো উক্তিতে প্রকাশ পায় নাই। আমিত্ব বা অহংবোধ যেন প্রিয়বস্তুর সহিত একটা ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া দাঁড়ায়। প্রেম যদি সত্য হয়, প্রীতি যদি অকৃত্রিম হয় তবে সেই প্রেম-প্রীতির দ্রাবক শক্তি প্রেমের বিষয়ের সহিত ব্যক্তির এই ব্যবধান দ্রব করিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেয়। অহংবুদ্ধি লুপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতির মধ্যে এই সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাই। বিশ্বপ্রকৃতি বলিতে যে সুবৃহৎ ব্যাপারটা, তাহার মধ্যে কবি নিজেও আশ্রিত। অকস্মাৎ কোনো শুভ মুহূর্তে নিজের মধ্যে তিনি অনুভব করিয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতি তাহাকে বাদ দিয়া একটা স্বতন্ত্র বস্তুরূপে সত্য নয়। তিনি নিজেও এই বিশ্ব-প্রকৃতিরই অঙ্গ :

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি' আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফলগন্ধরেণু।"

তাঁহার মানবদেহাশ্রিত প্রাণ-মূর্তি বিশ্ব-প্রাণেরই একটা বিশিষ্ট প্রকাশ-রূপ। এই পৃথিবী কত বিবর্তনের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইতে হইতে বর্তমান রূপে উপনীত হইয়াছে। সেই রূপান্তরধারার স্মৃতি কবির দেহের কোষগুলির মধ্যেও তো সঞ্চিত হইয়া আছে। তাই নিজের মধ্যে তিনি যুগ-যুগান্তর কাল-কালান্তর বাহিত বিশ্ব-বিবর্তনের ধারাটি আস্বাদন করিতে পারেন, বলিতে পারেন, "আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী যখন সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা

করছেন—তখন এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম। তখন পৃথিবীতে জীব-জন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলেম—নব শিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। ···তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অ'ল্প অল্পে মনে পড়ে।"

আরও সুদূর অতীত হইতে ধরিত্রীর সহিত সম্পর্কের স্মৃতির বিবরণ পাই 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়। বলেন :

"মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।"

বেশ বোঝা যায় একটা সুতীব্র আনন্দিত উপলব্ধির বশে কবির ব্যক্তিচেতনা বিস্ফারিত হইয়া বিশ্বজগৎকে নিজের মধ্যে ধারণ করিতে, বিশ্বকে আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে। মর্ত-ধরণীর সহিত ঐকাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিতেছে। সমস্ত প্রকৃতির সহিত একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সজীব সম্পর্ক অনুভব করিতেছেন। এই প্রকৃতি-প্রেম শুধু প্রকৃতির রূপ রসের সৌন্দর্যে মুগ্ধতা নয়, ইহার নাম বিশ্ববোধ বা সর্বানুভূতি। এই বিশ্ববোধ বা সর্বানুভূতি রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের মূলধর্ম, তাঁহার কাব্যের মূল সুর এবং তাঁহার জীবনদর্শনের ভিত্তি। জগৎ ও জীবনের

সত্য স্বরূপ কবির নিকট স্বচ্ছ হইয়া আসে এই সর্বানুভূতির সূত্রে। তাই বলেন, "নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে; আমার সুখ-দুঃখ বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে।"

নিজের সহিত বিশ্বব্যাপারের সম্পর্ক বিষয়ে এই যে সুনিশ্চিত প্রত্যয়—এ প্রত্যয়বোধ স্বভাবতঃই কবির মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সংশয় ঘুচাইয়া দিয়াছে। বিশ্বকে আনন্দময় রূপে অমৃতময় রূপে দেখিয়াছেন। কবি শিল্পীদের মন যখন এইরূপ সুদৃঢ় প্রত্যয়ে স্থিত হয় তখনই তাঁহাদের সৃজন-প্রতিভা পূর্ণ শক্তিতে জাগিয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রকৃতিপ্রীতিই প্রতিভার উদ্দীপন শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে। সোনার তরী কাব্যের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলি পাঠ করিরার সময়ে কবির প্রকৃতিচেতনার এই গূঢ় বৈশিষ্ট্য স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

'সোনার তরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের মর্তপ্রীতি ও মানবপ্রীতি ঃ

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—"

কবিমাত্রেরই এই এক আকাঙ্ক্ষা। কাব্যসাধনার চরিতার্থতা বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবজীবনকে কাব্যায়ত করার সফলতায়। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-বিশ্বের সহিত ঐকাত্মসাধন সহজ নয়। বহির্বিশ্বের সহিত আপন ব্যক্তিত্বের অন্বয় সূত্রটি আবিষ্কার করিতে হয়, এই প্রয়াসেই বিশেষ কবির মানস জগৎটি একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হইয়া ওঠে। কবির ব্যক্তিস্বরূপ বা পারসন্যালিটি (personality) সামর্থ্য লাভ করে, পূর্ণাঙ্গতা পায়। কোনো কবির কাব্য-জগতের বৈশিষ্ট্য বুঝিবার জন্য তাই বহির্বিশ্বের সহিত তাঁহার ব্যক্তিত্বের অন্বয় সাধন প্রয়াসের বিশিষ্টতা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রকাব্যের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় মর্তধরণী এবং মানবজীবনের সহিত আপনাকে মিলিত করিবার একটা দীর্ঘ প্রয়াসে তাহার কাব্যের নানা স্তর চিহ্নিত হইয়া আছে। একটা বয়স ছিল, যখন কবি নিজেকে জগৎ

॥ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ॥

॥ প্রথম অধ্যায় : বাংলা গদ্য ॥

[এক] শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনে বাংলা গদ্যচর্চার পরিচয় দাও এবং বাংলা গদ্যের বিকাশে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনা হইয়াছে অনেক বিলম্বে। দলিল-পত্র রচনায় বা রাজকীয় পত্রব্যবহারে প্রাচীন গদ্যের যেসব নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার সাহিত্যমূল্য কিছুই নাই এবং পরবর্তী কালের গদ্যরচনার ধারার সহিত সেইসব রচনার কোন সংযোগও নাই। প্রাচীনকালে সাহিত্য বা ধর্মগ্রন্থ রচনা—কোনক্ষেত্রেই গদ্যের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, পয়ার-ত্রিপদীর পদ্য-বন্ধে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের কাজ চলিত। পয়ার-ত্রিপদী ছন্দের সহজ নমনীয়তার জন্যই হয়ত গদ্যের প্রয়োজন তেমন তীব্রভাবে দেখা দেয় নাই। কোন বক্তব্য সহজভাবে প্রকাশের জন্য গদ্যের সক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা তাই আমাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আসে নাই, সেই চিন্তা দেখা দেয় পর্তুগীস-ইংরেজ মিশনারীদের দৃষ্টান্তে। পর্তুগীস মিশনারীরা ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলাদেশে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এই সময় হইতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্তুগীস মিশনারীদের খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের কাজও সুরু হয়। এই পর্তুগীস মিশনারীদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যে প্রথম কয়েকটি খ্রীষ্টান ধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পর্তুগীসদের রাজনৈতিক পরাভবের ফলে এদেশ হইতে পর্তুগীস মিশনারীদেরও বিদায় লইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের গদ্যচর্চার প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায় মাত্র, উত্তরকালের সহিত তাহাদের প্রচেষ্টার কোন ধারাবাহিকতা নাই।

যথার্থভাবে বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপন এবং মুদ্রাযন্ত্রের বৈপ্লবিক সহায়তায় ব্যাপক জনসমাজের সহিত সংযোগের মাধ্যম হিসাবে গদ্যের শক্তিবৃদ্ধির ঐতিহাসিক কৃতিত্ব ইংরেজ ব্যাপটিস্ট মিশনারীদেরই প্রাপ্য। ইংরেজ রাজত্বের

প্রতিষ্ঠার ফলে ধীরে ধীরে বাঙালী সমাজের মধ্যে জীবন-চেতনায় রূপান্তর দেখা দিল। শিক্ষা-দীক্ষা এবং চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতিতে পরিবর্তন যখন দেখা দিল তখন পয়ার-ত্রিপদীর বন্ধনের মধ্যে নতুন ধ্যান-ধারণার প্রকাশ সত্যই আর সম্ভব ছিল না। একদিকে যেমন আধুনিক মন জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল অন্যদিকে তেমনি আধুনিক মনের ভাষা, গদ্য নির্মাণের আয়োজনও শুরু হইয়াছিল। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে মহৎ সম্ভাবনায় পূর্ণ বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা করিয়াছিল বিদেশী ধর্মপ্রচারক-সম্প্রদায়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে উইলিয়ম কেরী শ্রীরামপুরে আসিয়া ব্যাপটিস্ট মিশনের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুদ্রাযন্ত্রস্থাপন ও বাংলা গ্রন্থপ্রকাশের কাজও এই মাস হইতেই আরম্ভ হইল। কেরীর সহযোগী ছিলেন জন টমাস, উইলিয়ম ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান। এই মিশনারী দলের বাংলা ভাষা অনুশীলনে সহায়ক ছিলেন রামরাম বসু। স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামপুর মিশনের প্রধান লক্ষ্য হইল বাংলা ভাষায় খ্রীষ্টান ধর্মপুস্তকগুলির অনুবাদ প্রকাশ। শ্রীরামপুরে আসিবার পূর্বেই কেরী রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেলের অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বাইবেলের অনুবাদ মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য তাঁহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন। 'ধর্মপুস্তক' বা বাইবেলের অনুবাদ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সমগ্র নিউ টেস্টামেণ্ট এবং ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রথম অংশের অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল। 'ধর্মগ্রন্থ' প্রকাশিত হইবার কয়েক মাস আগে মূল গ্রীক হইতে 'গস্‌পেল অব্ সেণ্ট ম্যাথু (Gospel of St. Matthew) অংশটির অনুবাদ 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর' নামে প্রকাশিত হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এবং এইটিই শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্মরণীয় এই দুটি ধর্মগ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে কোন একজনের প্রাপ্য নয়। কেরী প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীদের গদ্যচর্চার প্রেরণা-উৎস। বাংলাভাষার মূলপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। 'ধর্মপুস্তকে'র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বারবার ভাষার সংস্কারসাধন করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থের শেষ সংস্করণ শ্রীরামপুর হইতে ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সংস্করণের ভাষার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় প্রতিবারেই প্রচুর সংশোধন করা হইয়াছে এবং বাক্যের

হইতে নির্বাসিত বোধ করিতেন। কল্পিত ভাবনা বেদনার জগতে, হৃদয় অরণ্যে যেন অবরুদ্ধ ছিলেন। বাহিরের বিচিত্র জগৎ তাঁহাকে আকর্ষণ করিত, কিন্তু যেন সাড়া দিবার ভাষা তাঁহার জানা ছিল না। নিজের অনুভূতির জগৎ, নিজের ভাব-ভাবনার জগতের সহিত বহির্বিশ্বের মিলটা ঠিক কোথায় তাহা যেন স্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারিতেন না। প্রথম যেদিন একটা তীব্র উপলব্ধির আনন্দে এই যোগসূত্রটি তাঁহার নিকট ধরা দিল সেইদিনের আকুলতা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন 'প্রভাত সংগীত' কাব্যের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। 'নির্ঝর'-এর রূপকে কবি আপন চিত্তের নবজাগরণের আনন্দই প্রকাশ করিয়াছেন সেই কবিতায়। এই কাব্যেরই অপর এক কবিতায় কবি বলিয়াছিলেন :

> "হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
> জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

জগৎ আসিয়া মিলিত হইতেছে হৃদয়ের মধ্যে। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। এবং ক্রমে এই অভিজ্ঞতাজনিত আকুলতা দানা বাঁধিয়া, সংহত হইয়া একটা স্পষ্ট ব্যক্তব্যের রূপ নেয় 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। এই কাব্যেরই এক বিখ্যাত কবিতায় কবি বলেন :

> "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
> এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
> জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
> ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
> বিরহ মিলন কত হাসিঅশ্রুময়
> মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
> যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।"

এই সূর্যকরোজ্জল বিশ্ব এবং জীবন্ত মানব-হৃদয়—সেই হোক চির আশ্রয়। মৃত্যু এই আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয় হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া যায়, তাই কবির এই বিমুখতা মৃত্যুর প্রতি।

কবির চেতনার বিবর্তনে এই ভালোবাসার টান তীব্রতর হয়। ভালোবাসা শিকড় ছড়ায় আরও গভীরে। কিছুটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কিছুটা বা অভিজ্ঞতা-

নির্ভর কল্পনায় ক্রমে তিনি গোটা বিশ্বের সহিত আপন অস্তিত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনটি অনুভবের মধ্যে ধরিতে পারেন। ঐকাত্ম্যবোধ আরও গভীর হয়, পূর্ণতার অভিমুখী হয়। একটা বিশিষ্ট ভাবনা বা বলা যায় জীবন-দর্শনই গড়িয়া ওঠে ধীরে ধীরে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যায় কবি বলিয়াছিলেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব—আমার সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব।......আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরম সত্য। জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজন রহস্য ঠিক বুঝতে পারিনে—প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদার্থটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না; কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে; আমার সুখ-দুঃখ বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে। এই থেকে কী হয়ে উঠবে জানিনে, কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানিনে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরের অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্চি, আমি চলছি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎ প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—সেইজন্যেই এই জ্যোতির্ময়শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতেম? আমার সঙ্গে অনন্ত জগত-প্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য ভাষা হচ্ছে বর্ণগন্ধগীত।"

দেখা যাইতেছে ক্রমেই কবি একটি সুস্থির পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বভাবনায় উপনীত হইতেছেন। মর্তপৃথিবীর প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণটা শুধু অস্পষ্ট অনুভূতির ব্যাপার আর নয়। ক্রমে একটা তত্ত্বদৃষ্টির খুলিয়া যাইতেছে, জীবন ও জগত-এর প্রতি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা attitude গড়িয়া উঠিতেছে। কাব্যের ক্ষেত্রে প্রথম 'মানসী' গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গি কোনো কোনো কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবির মর্তপ্রীতির বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট রূপ লাভ করে। দৃশ্যরূপের বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্য খণ্ডখণ্ডভাবে আস্বাদনের পরিবর্তে—মর্তধরণীকে সামগ্রিকরূপে প্রাণধাত্রী জননীরূপে কল্পনা প্রথম এই কবিতাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। অহল্যার জীবনায়নের কাহিনীর সূত্রে কবি এই প্রাণধাত্রী জননীর সহিত আপন অস্তিত্বের যোগ উপলব্ধি করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে জগতের প্রাণীলোকের সহিতও ঐকাত্ম্যচেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় যে চেতনার সূচনা—তাহারই বিস্তৃতি এবং পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় 'সোনার তরী' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃত কবিতায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সমসাময়িককালে রচিত 'ছিন্নপত্রাবলী'র বহু চিঠিতে কবি এই মর্তপ্রীতি ও মানবপ্রীতি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'সোনার তরী' কাব্যে 'দরিদ্রা' নামে একটি সনেট আছে। মর্তধরিত্রীর সহিত কবির স্নেহবন্ধনের অনুভূতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এই সনেটে :

"দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোরে বেশি ভালো লাগে
বেদনা কাতর মুখে সকরুণ হাসি
দেখে মোর মর্ম-মাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।
আপনার বক্ষ হতে রসরক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস সন্তানের দেহে,
অহর্নিশি মুখে তার আছিস তাকিয়ে,
অমৃত নারিস দিতে প্রাণপণ স্নেহে।
কত যুগ হতে তুই বর্ণগন্ধগীতে
সৃজন করিতেছিস আনন্দ-আবাস,

আজো শেষ নাহি হল দিবসে নিশীথে—
স্বর্গ নাই, রচেছিস স্বর্গের আভাস।
তাই তোর মুখখানি বিষাদ কোমল,
সকল সৌন্দর্যে তোর ভরা অশ্রুজল।”

ধরিত্রীকে শুধু যেন মাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন তাহা নয়, একেবারেই মানবী মাতায় পরিণত করিয়াছেন। মানুষ স্বর্গকে মনে করে সকল দিক হইতে সুসম্পূর্ণ। সেখানে বেদনা নাই, দুঃখ নাই, কোনো অসম্পূর্ণতা নাই। এমন যে সর্বতোভাবে পূর্ণতার স্বর্গ কবি তাহার প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করেন না। তাঁহার আকর্ষণ নিতান্ত অসম্পূর্ণ এই মর্তের প্রতি। এখানে প্রেম জাগে, স্নেহ জাগে, স্নেহেপ্রেমে বাঁধা নীড়গুলি আনন্দ নিকেতনের মতো। কিন্তু কিছুই এখানে চিরন্তন নয়, নিত্য নয়:

“মরণপীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন ’পরে
অশ্রুবাষ্প-সম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদকুয়াশা
বিশ্বময়।”

লক্ষ্য করিতে হইবে, কবির দৃষ্টিতে জড়প্রকৃতি আর জড় নাই। বিশ্বপ্রকৃতি একটা সজীব চৈতন্যময় সত্তায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তাই কবি ইহার সহিত সর্ববিধ মানবিক সম্পর্কে কথা অতি সহজভাবে বলিতে পারেন।

এই যে মর্তের সহিত কবির সম্পর্ক বন্ধন, ইহা শুধু বর্তমানে নিবদ্ধ নয়। এই সম্পর্ককে তিনি সুদূর অতীত হইতে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত এক রূপান্তর-শীল সম্পর্কধারা রূপে কল্পনা করিয়াছেন। মৃত্তিকাময়ী ধারিত্রী যখন সমুদ্রের ভ্রূণরূপে ছিল—তখনও কবি ছিলেন সেই ভুবনভ্রূণের অঙ্গীভূত। তারপর রূপান্তরধারায় ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে প্রাণের নানা রূপ জাগিয়াছে। সেই সব রূপেও কবি এই পৃথিবীতে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আজ তাহার মানব অস্তিত্বের মধ্যে সেই জন্মান্তরীণ সম্পর্কের স্মৃতি মাঝে মাঝে জাগ্রত হইয়া ওঠে। এইভাবে মর্ত ধরণীর সহিত একটা জন্মান্তরীণ সম্পর্কের অনুভূতি ক্রমে

কবিচিত্তে স্পষ্ট মূর্তিলাভ করিয়াছে, তাঁহার কাব্যে গানে এই অনুভূতি বহুবার বহু বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

শুধু মর্ত ধরণী নয়, ধরিত্রীর সকল মানবের প্রতি কবি ঐকান্তিক আকর্ষণ অনুভব করেন। পৃথিবীর মানবজীবনের বিচিত্র রূপ তিনি প্রত্যক্ষভাবে জানেন না। কিন্তু আপন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত সকল জাতির মানুষের জীবন-ধারায় নিজেকে মিলিত করিবার আকুলতা কোনো কোনো কবিতায় তীব্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তির দিক হইতে 'বসুন্ধরা' কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি বলিয়াছেন:

"ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে ;"

আরব, তিব্বতী, পারসীক, তাতার, জাপানী, চীনা কিংবা আরণ্যক অসভ্য সব মানুষের জীবনধারায় নিজেকে মিলিত করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে কবিতাটির এই অংশে। কবির মর্তপ্রীতিরই আর এক দিক এই মানবপ্রীতি। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সহিত নিতান্ত মানবিক আত্মীয়তা রচনার ঐকান্তিক বাসনা এ যুগের এবং পরবর্তী কাব্যেরও একটি মূল সুর। 'সোনার তরী' কাব্যেই প্রথম কবির এই মনোভাব একটা স্পষ্ট পরিণত রূপ লাভ করিয়াছে।

কাব্যগ্রন্থের নামকরণ:

এ কাব্যের প্রথমেই যে কবিতাটি আছে তাহার নাম 'সোনার তরী' এবং বলাবাহুল্য এই কবিতার নামেই কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করা হইয়াছে। প্রথম কবিতার নামে বা মুখ্য ভাবব্যঞ্জক কবিতার নামে সমগ্র কাব্যগ্রন্থের নামকরণ রবীন্দ্রকাব্যে আরও আছে, 'চিত্রা', 'বলাকা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের নামকরণে এই রীতিই অনুসৃত হইতে দেখি। তবে বলিতে হয় 'সোনার তরী' নামক কবিতার মধ্যে এ কাব্যের কোনো একটি প্রধান কথা প্রতিফলিত হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই কাব্যগ্রন্থের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা 'মানসসুন্দরী' এবং 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় তরণী ও তরণীর কর্ণধারিণীর উল্লেখ আছে। 'মানসসুন্দরী' কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু নিম্নরূপ:

"কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি ? সংগীত তোমার
কতদূরে নিয়ে যাবে—কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী গানের পুলকে
বিমুগ্ধকুরঙ্গসম ? এই-যে বেদনা
এর কোনো ভাষা আছে ? এই-যে বাসনা,
এর কোনো তৃপ্তি আছে ? এই-যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ?"

'সোনার তরী', 'মানসসুন্দরী' এবং 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'—তিনটি কবিতাতেই প্রশ্ন এবং সংশয়ের ভাব খুব প্রকট। কবি যে ফসল সঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা 'সোনার ধান', স্বর্ণের উল্লেখেই সেই ফসলের মূল্য সম্পর্কে কবির প্রত্যয় বুঝিতে পারা যায়। কবির সৃষ্টি ফসল অর্থাৎ তাঁহার কাব্যসম্ভার বহুমূল্য, সোনার তরীর নেয়ে যে ফসল আদরে তরীতে তুলিয়া লইয়াছে কিন্তু কবিকে লইতে সম্মত হয় নাই, আর জায়গা ছিল না। মানসসুন্দরীতে কিন্তু কাব্য-ফসলের কথা নয়, কবি নিজের কথাই বলিয়াছেন। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী তাঁহার মানসসুন্দরী কবিকে লইয়া সমুদ্রে তরী ভাসাইয়াছে। এই যাত্রার শেষে কোথাও কি কোনো চরিতার্থতার, সাফল্যের তীর্থ অপেক্ষা করিয়া আছে ? হয়তো আছে, কারণ কবি মানসসুন্দরীর 'অভয় আশ্বাস ভরা' বিশাল নয়ন হেরিয়া আশ্বাস পান। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'তেও 'সোনার তরণী'র হাল যার হাতে সে স্পষ্টভাবে কিছু না বলিলেও আভাসে ইঙ্গিতে ভরসার ভাব জাগাইয়া তোলে। এই যে বার বার যাত্রা, তরী বাহিয়া চলা এবং তরীর কোনো কর্ণধার বা কর্ণধারিণীর উল্লেখ দেখি এগুলির একটা রূপকার্থ অবশ্যই আছে।

'সোনার তরণী' কবির কাব্য ফসল তুলিয়া নেয়, আবার কবিকেও অচেনা অজানা সমুদ্রতীরের দিকে বহন করে। প্রথম কবিতায় তরণীটি কবি

ব্যক্তির জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি সকলের দ্বারে বহন করিয়া লইয়া যায়। কবিব্যক্তির সহিত বিশ্বজনের সংযোগ সাধন করিয়া দেয় তাঁহার কীর্তিগুলি অবলম্বন করিয়া। ব্যক্তিটিকে বিশ্বের কোনো প্রয়োজন নাই, ব্যক্তিটি বোঝার মতো, সেই ব্যক্তির সাধনার ফলগুলিই বিশ্বের জন্য নিবেদন করা যায় শুধু। সোনার তরী এই দৌত্যে নিযুক্ত। মানসসুন্দরী বা নিরুদ্দেশ যাত্রায় কিন্তু তরণীর ব্যবহার ভিন্নতর। এখানে কবি ব্যক্তি এবং তাঁহার কীর্তির মধ্যে পার্থক্য করা হয় নাই। তরণীর আরোহী কবি, মানসসুন্দরী বা রহস্যময়ী নারী তাহাকে কল্পনার নূতনতর জগতে লইয়া চলিয়াছে। এক সফলতা হইতে ভিন্নতর সফলতায় উপনীত হইবার আকাঙ্ক্ষাটাই এ যাত্রার মূলে।

এই যে দুটি ভিন্ন প্রসঙ্গে সোনার তরী বা তরণীর প্রসঙ্গটি ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রসঙ্গ দুটিই এ কাব্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এক অর্থে কবি বলিতে পারেন, এ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুচ্ছ তাঁহার বহু সাধনার ফসল। সেই ফসল তুলিয়াছিলেন সোনার তরীতে, বিশ্বজনের চিত্তের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলেন। এই সাধনার দুঃখ বেদনা লইয়া যে ব্যক্তিগত জীবন তাহা নৈবেদ্য হইতে পারে না, শুধু সাধনালব্ধ ধনগুলিই তাই নিবেদন করিতেছেন। অন্য অর্থে কোনো এক কল্পনাসুন্দরী, মানসসুন্দরী কবিকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া অজানার উদ্দেশ্যে লইয়া চলিয়াছেন। এই কাব্যই শেষ নয়, আরও ভিন্নতর সাধনা, ভিন্নতর সিদ্ধি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। কবি যাত্রী। এই অর্থে 'সোনার তরী' নামকরণও অসঙ্গতি মনে হয় না।

॥ সোনার তরী ॥

[নাম-কবিতা]

প্রাসঙ্গিক তথ্য ঃ

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা সোনার তরী রচিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। কবিতাটিতে বর্ষার চিত্র আছে, মেঘমন্দ্রিত আকাশ এবং ঘন বরষা ইহার পটভূমি। কিন্তু কবিতাটি লিখিত হয় বসন্তে, ফাল্গুন মাসে। কোনো এক বর্ষার স্মৃতি কবির মনে সঞ্চিত ছিল, তাহা ভাষায় রূপলাভ করিয়া কবিতায় আকারপ্রাপ্ত হইয়াছে অনেক পরে। কবি একটি চিঠিতে এই প্রসঙ্গে লেখেন, "যে দিন বর্ষার অপরাহ্ণে, খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাটা ধানে ডিঙি নৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসছে সে দিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজও আমার মনে আছে। সেই দিনেই সোনার তরী কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে, তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই। এইরকম অবস্থায় ইতিহাসের ভুল হবারই কথা। কারণ, আমার মনে সোনার তরীর যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্ছে সেই শ্রাবণ-দিনের ইতিহাস, সেটা কোন তারিখে লিখিত হয়েছিল সেইটেই আকস্মিক—সে দিনটা বিশেষ দিন নয়, সে দিনটা আমার স্মৃতিপটে কোনো চিহ্ন দিয়েই যায় নি।····· আমার দলিলের তারিখ কবিতার অভ্যন্তরেই আছে—'শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘনমেঘ ঘুরে ফিরে।' তুমি বলবে ওটা কাল্পনিক, আমি বলব তোমাদের তারিখটা রিয়ালিস্টিক।" এই কবিতা প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে কবিতাটির অর্থ লইয়া বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক প্রবল বাদানুবাদ শুরু হয়। কবি এই বিতর্কে যোগ দিতে বাধ্য হন। বিরূপ সমালোচনা যাঁহারা শুরু করেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কবিতাটির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলা হয়। প্রথমত, ইহাকে বলা হয় দুর্বোধ্য রচনা। দ্বিতীয়ত, রচনার মধ্যে নানারূপ বর্ণনাগত অসঙ্গতি আছে। যেমন শ্রাবণ মাসে কোথাও ধান পাকে না, ধান কাটাও হয় না। চারিদিকে বাঁকা জলে ঘেরা দ্বীপের মতো চর জমিতে ধানের চাষ হয় না। ভরা পালেই যদি নৌকা চলে তবে আবার তরী-বাওয়ার কথা আসে কী প্রকারে—এইরূপ নানা অভিযোগ ওঠে। তৃতীয়ত, কবিতার শেষ স্তবকটিকে বলা হয় সম্পূর্ণই

অর্থহীন। আজ মনে হয় এইসব সমালোচনার মূলে রবীন্দ্রবিদ্বেষ ছাড়াও অন্য কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা কবিতার ভাব ও ভাষায় যে অভিনবত্ব সঞ্চার করিয়াছিলেন তখনো তাহার মর্ম গ্রহণের যোগ্য পাঠকগোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ধর্ম এবং এই প্রতিভার বিকাশ অনুসরণ করিয়া নিজেদের রসরুচি পরিশীলিত করিয়া তুলিয়াছেন—এইরূপ পাঠক খুব বেশি ছিলেন না। তাই যে কবিতায় স্পষ্টভাবে কিছু বস্তুগত অর্থ নাই যাহা একটা বিশেষ মুহূর্তে অনুভূত কবিহৃদয়ের সত্যানুভূতির নির্যাসিত রূপটুকু প্রকাশ করে—তাহা নিন্দিত হইবে এ ঘটনা খুব অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে বাঙলা কবিতার যে জন্মান্তর সাধিত হইয়াছিল তাহা অনুধাবন করিতে, সেই নতুন জাতের রচনার রসগ্রহণে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তাহা সময়সাপেক্ষ। বাঙালীর কাব্যরুচির বিবর্তনের ইতিহাসের দিক হইতে 'সোনার তরী' কবিতার সমালোচনাগুলির কিছু মূল্য আছে।

'সোনার তরী' কবিতা রচনার বহুকাল পরে (৪ঠা চৈত্র, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার যে ব্যাখ্যা দেন তাহা 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে 'তরী বোঝাই' নামে সংকলিত হইয়াছে। এই কবিতার উপলব্ধিতে কবির স্ব-কৃত ব্যাখ্যা বিশেষ মূল্যবান।

" 'সোনার তরী' বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

"মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো, চারি দিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। সেইজন্য গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

"যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য ফল তা সে ওই

সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু, যখন মানুষ বলে, 'ওই-সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো' তখন সংসার বলে, 'তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।'

"প্রত্যেক মানুষ নিজের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে: সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু, মানুষ যখন সেইসঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই-যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনা স্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। এটি কোনোমতেই জমানোর জিনিস নয়।"

মর্মার্থ ঃ

[সোনার তরী কবিতাটি পড়িবার সময়ে প্রাথমিকভাবে বর্ষার চিত্ররূপময় বর্ণনা, পরিচিত স্বজন পরিবেশ হইতে দূরে নির্বাসিত কোনো এক কৃষকের বিচ্ছিন্নতার বেদনাই বিশেষভাবে আমাদের আবিষ্ট করে। যে নেয়ে তরী বাহিয়া আসিল সে শুধু সোনার ধানগুলি তরীতে তুলিয়া লইল। কৃষক একাকী ফেলিয়া চলিয়া গেল। এই একাকীত্ব ও অনিঃশেষ নিঃসহতার বেদনা গীতিস্বরে গুঞ্জরিত হইয়া আমাদের চেতনায় ঘোরে ফিরে ফেরে। পরপর ছয়টি সমদৈর্ঘ্যের স্তবকে নিঃসঙ্গ কৃষকের আশা নৈরাশ্যে আন্দোলিত মানসিকতার নাটকীয় মুহূর্তগুলি কবি ধরিয়া দিয়াছেন।]

মেঘমন্দ্রিত আকাশ। অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে স্তূপীকৃত ধান লইয়া কৃষক অপেক্ষা করিতেছে। খেতখানি ছোটো। তাহার চারিদিক ঘিরিয়া খরস্রোতা বাঁকা জলের খেলা। ওপারে দেখা যায় গাছের ছায়ায় মেঘে ঢাকা গ্রামখানি যেন ছবির মতো আঁকা। ওপারে যাইবার কোনো উপায় নাই, গ্রামের ছবি আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে কিন্তু সেই গৃহপ্রত্যাশী আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইবে কিরূপে।

এমন সময়ে আবির্ভূত হইল কোনো এক মেয়ে। তাহার নৌকার পালে বাতাস লাগিয়াছে, আপন মনে সে গান গাহিয়া চলিয়াছে। নৌকার গতিতে প্রহত তরঙ্গ দুদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মনে হইল লোকটি যেন পরিচিত। কৃষক তাহাকে আহ্বান করিল। একবার শুধু এই পারে আসিয়া তরী ভিড়াইতে অনুরোধ জানাইল। তাহার অনুনয়, যেখানে খুশি যাও, যাহাকে ইচ্ছা দিয়া দিও, তবুও এই তীরে সোনার ধানগুলি তোমার তরীতে তুলিয়া নাও। অনুরোধ নিষ্ফল হয় না। তরী তীরে আসে। এতকালের সাধনার ধন সব ফসল তরীতে বোঝাই করিয়া দিল সেই কৃষক। নিজের সঞ্চয় নিঃশেষ করিয়া দিল। তারপর তাহাকে তুলিয়া লইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু মেয়ে এই অনুরোধ রক্ষা করে নাই। তরীতে আর স্থান ছিল না। সোনার ধানে সবটুকু ভরিয়া গিয়াছে, কৃষককে স্থান দিবার আর উপায় নাই।

অতএব, তরী চলিয়া গেল সোনার ফসলের সঞ্চয় লইয়া। আর কৃষক শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া রহিল। তখনো আকাশে মেঘের খেলা। বর্ষণ তখনো ক্ষান্ত হয় নাই। কবিতার এই অন্তিম পর্যায়ের শূন্যতাবোধ আরও তীব্র। কারণ এতদিন নদীতীরে যাহা লইয়া সে ভুলিয়াছিল সেই হৃদয়ছেঁড়া ধনগুলি সব দূরযাত্রী মেয়ের নৌকায় তুলিয়া দিয়াছে। ভরসাহীন অবলম্বনহীন নিঃশেষ শূন্যতাবোধের ব্যঞ্জনায় কবিতাটি শেষ হইয়াছে।

কবিতার রূপময় চিত্রগুলি, নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত কৃষকের শূন্যতার বেদনাটি আমাদের আকৃষ্ট করে এবং দ্বিতীয় চিন্তায় সঙ্গে সঙ্গে মনে এ কৃষক কোনো লৌকিক কৃষক নয়। কবির নিজেরই কবি-ব্যক্তিত্ব ওই কৃষকের মধ্যে প্রতিফলিত। কাব্যসাধনা তো একক সাধনা। অক্লান্ত সাধনায়, বহু ধৈর্যে সৌন্দর্যসম্পদগুলি সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয় শিল্পীকে। নিজের মনোলোকে তিনি স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন ভোগ করেন। যে ফসল তিনি সৃষ্টি করিয়া তোলেন সেগুলি নিবেদন করিয়া দেন বিশ্বজনের উপভোগের জন্য। লোকে সেই শিল্পবস্তুর, সেই কাব্যসম্পদের স্বাদ গ্রহণ করে, আনন্দ পায়, বেদনা পায়। কিন্তু সেখানে ব্যক্তিগতভাবে কবির আর কোন ভূমিকা নাই। জগৎ কবির কাব্যকেই গ্রহণ করে, কবিকে নয়। কবি তাঁহার ভাবনা বেদনার বৃত্তের মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করেন। এ কবিতায় কবি নিজেই সেই অলৌকিক কৃষক যিনি সোনার ধানের মতো সৌন্দর্যময় কবিতা সৃষ্টি

করিয়াছেন। কে এই কাব্যসম্ভার সমাদরে গ্রহণ করিবে তিনি জানেন না। তবুও বিশ্বজনের উদ্দেশ্যে কালের তরণীতে সেই বহু বেদনায় সৃষ্টি কাব্য তুলিয়া দিলেন। যে তরণীতে স্থান লাভ করিবার, অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে নিজেও বিশ্বজনের সহিত মিলিত হইবার দুর্বল আকাঙ্ক্ষা একবার মনে জাগিয়াছে। বলিয়াছেন 'এইবার মোরে লহ করুণা করে'। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়াছেন তাঁহার জন্য তরণীতে ঠাঁই নাই। কবিশিল্পীমাত্রই ব্যক্তিজীবন এবং সেই জীবন হইতে সৃষ্ট শিল্পবস্তুর মধ্যে একটা বিচ্ছেদ মানিয়া লইতে বাধ্য হন। এই অনিবার্য বিচ্ছেদের বেদনায় কবির ব্যক্তিসত্তা ভাবাক্রান্ত, শূন্যতাবোধে আচ্ছন্ন হইলেও শিল্পলোকের এই বিধি অনতিক্রম্য। রবীন্দ্রনাথকেও এই সত্য মানিতে হইয়াছে। কবিতার শেষ স্তবকে কবির ব্যক্তিসত্তার বেদনাই তীব্রভাবে রণিত হয়। তবুও সেই বেদনার মধ্যে একটা চরিতার্থতার তৃপ্তি আভাসিত হইয়াছে। তাঁহারই সৃষ্ট কাব্যসম্পদে কালের তরণীখানি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিশ্বজনের উদ্দেশ্যে নিজের সৃষ্টিগুলি নিবেদন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিল্পীর চরিতার্থতা ইহাতেই।

সমালোচনা :

ছয়টি সংক্ষিপ্ত স্তবকে গঠিত ক্ষুদ্রকায় একটি কবিতা 'সোনার তরী'। কিন্তু এই একটি কবিতার মর্ম ব্যাখ্যা এবং অর্থ উদ্ধার লইয়া বাংলা সাহিত্যে যতো আলোচনা হইয়াছে—তেমন আর কোনো কবিতা লইয়া হয় নাই। নানামুখী সমালোচনা সেই অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের নিজের আলোচনা অনুসরণে কবিতাটির ভাববস্তুর পরিচয় পরিস্ফুট করা যায়।

কবিতাটির প্রেরণামূলে একটি বাস্তব স্মৃতির প্রেরণা আছে। চর জমিতে জল প্রবেশ করায় অসময়ে কাঁচা ধান কাটিয়া নেওয়া চাষীদের পক্ষে একটা মর্মান্তিক দুঃখের ব্যাপার। এই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে 'ছিন্নপত্রে' একটি চিঠিতে কবি লিখিয়াছেন, "আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষীরা নৌকা বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে, আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকা যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি—যখন আর কয়েকদিন থাকলে ধান পাকতো তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষীর পক্ষে কি নিদারুণ তা বুঝতেই পারা যায়।" চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা আর একটি

চিঠিতে কবি লিখিয়াছেন, এই ধান কাটার দৃশ্যই তাঁহার মনে 'সোনার তরী' কবিতাটি লিখিবার প্রেরণা জাগায়। "যে দিন বর্ষার অপরাহ্ণে খরস্রোতা পদ্মার ওপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙি নৌকো বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসছে সেই দিনটি সন তারিখ মাস পার হয়ে আজো আমার মনে আছে। সেই দিনই 'সোনার তরী' কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে……।" এই বাস্তব দৃশ্যের অভিজ্ঞতায় সোনার তরী কবিতার প্রবর্তনা।' কিন্তু, কবিতাটি যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার সহিত এই অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ যোগ সামান্যই। কবিতায় দেখি, সোনার ধানের কথা বলা হইতেছে। নিশ্চয়ই তাহা অসময়ে কাটা কাঁচা নয়। দ্বিতীয়ত, কবিতায় উল্লিখিত কৃষক চারিদিকে বাঁকা জলে ঘেরা দ্বীপের মতো জমিতে একাকী অপেক্ষমান। কে তাহাকে পার করিয়া দিবে, কে তাহার সোনার ধানগুলি পরপারে লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। কোনো এক নেয়ে যদিবা সেই ধানগুলি নৌকায় তুলিয়া লইল, কৃষক পড়িয়া রহিল একাকী। বাহিরের দিক হইতেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত এই বর্ণনার অমিল খুব স্পষ্ট। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো কবির মনে বাহিরের অভিজ্ঞতা যে অভিঘাত আনে তাহার প্রতিক্রিয়ায় নিজেরই ধ্যানধারণাগত কোনো সত্যানুভূতি জাগাইয়া তোলে। কবিতার বিষয় সেই সত্যানুভূতি, নিজেরই উপলব্ধি কোনো জীবন-সত্য। ভাষায় সেই উপলব্ধি প্রকাশ করিতে গিয়া কবি হয়তো বাস্তব অভিজ্ঞতার কোনো ছবি, কোনো ঘটনা ব্যবহার করেন মাত্র। এ কবিতার জন্ম অনুরূপ প্রক্রিয়ায়। তাই কবিতাটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিজেও ভিতরের অর্থ, সেই উপলব্ধিগত জীবনসত্যের স্বরূপই বিশদভাবে বুঝাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

'সোনার তরী' ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একটা দার্শনিক তত্ত্বের আভাস দেন। আয়ুসীমায় ঘেরা মানবজীবন যেন একখানি চাষের জমি, সে যেন একটি দ্বীপ। চারিদিকের অব্যক্তের মধ্যে ওই একটুখানি অংশ ব্যক্তিমানুষের কাছে ব্যক্ত এবং স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ। এই জীবনের খেতটুকুতে সে সারাজীবনের চেষ্টায় যে ফসল ফলায়, যে কীর্তিগুলি উপার্জন করে, দিন যখন শেষ হইয়া থাকে তখন সেই বহু চেষ্টায় অর্জিত সম্পদ সে সংসারের তরণীতে তুলিয়া দেয়। সংসার তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষ যখন বলে, "ওইসঙ্গে আমাকেও

নাও, আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে, তোমার জন্যে জায়গা কোথায়। তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী। তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমিতো রাখবার যোগ্য নাও। প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না-কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে।" 'এখন আমারে লহ করুণা করে' এই করুণ প্রার্থনার উত্তরে সংসার বলে—"তোমার জন্য স্থান নাই। তোমার কীর্তি তোমার সৃষ্টি সবই আমি সংরক্ষণ করি, কিন্তু তোমাকে আমার প্রয়োজন নাই।" রবীন্দ্রনাথ এই যে তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন ইহা সাধারণভাবে সমগ্র মানবজীবন সম্পর্কেই প্রয়োগযোগ্য। এখন দেখা যাইতে পারে—বিশেষভাবে কবি রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের দিক হইতে এই তত্ত্বের সূত্রে কবিতাটির অর্থ কী। কবি হিসাবে, শিল্পী হিসাবে তিনি যাহা সৃষ্টি করেন সেই কাব্যসম্পদ বহু বেদনার, বহু সাধনার ধন। কাব্য তো সংসারের মানুষের জন্যই সৃষ্টি। সংসারের উদ্দেশ্যে কবির শ্রেষ্ঠ দান এই কাব্য। এ দান সংসার গ্রহণ করে। কালের তরণী সেই সকল সৃষ্টি মানুষের চিত্তের দ্বারে বহন করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু কবি মানুষটি, যাহার জীবন নিংড়ানো ধন ওই কাব্য তাহাকে সংসারের কাহারো কোনো প্রয়োজন নাই। অহংবুদ্ধির বশে কবি যখন ব্যক্তি হিসাবে নিজেকেও সংসারের উপরে চাপাইতে চান তখন তাঁহার ভাগ্যে জোটে প্রত্যাখ্যান। কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত জীবনতত্ত্বটি এইভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে এবং মনে হয় ইহাই কবিতার নিহিত মর্ম। কবির নিকট ব্যক্তিজীবন ও কাব্যের মধ্যে একটা ভেদজ্ঞান জাগ্রত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আরও পরবর্তী কালে, চিত্রা কাব্যে কবি ব্যক্তিজীবন, কাব্য এবং বিশ্বজীবনের মধ্যে নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধি করিয়াছেন। আলোচ্য কবিতায় কিন্তু ভেদজ্ঞানটাই তীব্র-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন, "মহাকালের দৃষ্টিতে কবি ও তাঁহার কাব্য এখনও একই দিব্য প্রভাবের বন্ধনে একীভূত হয় নাই; সাধারণ সত্য হিসাবে নয়, কবির নিজস্ব জীবনবৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া, যে আধারে কবি কল্পনার পরিপক্ব ফল স্থান পাইয়াছে, সেখানে কবির স্থূল, কামনা-বাসনা-ক্ষুধা-মোহ

জড়িত ঘটনা-তরঙ্গে আবর্তিত জৈব সত্তার স্থান হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে তাঁহার গান ভগবানের চরণ স্পর্শ করে, কিন্তু তিনি পারেন না, এখানে যেন তাহারই সদৃশ অবস্থা সঙ্কটের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সোনার তরী কেবল কবি-আত্মার ছন্দোময় প্রকাশ, উহার সূক্ষ্ম ভাববিগ্রহ ও রূপচ্ছটা বহন করিতে পারে, বস্তু উপাদান গঠিত স্থূল জীবনের ভার উহার পক্ষে অত্যধিক।"

এই কবিতার সমালোচনায় আর একটি প্রশ্ন অনিবার্য বিচার্য। তৃতীয় স্তবকে যে মেয়ের কথা বলিয়াছেন, যাহাকে দেখিয়া চেনা চেনা মনে হয়—**সেই মেয়ে কে?** প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, এই কাব্যেরই 'মানসসুন্দরী' কবিতায় জীবন ও কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীর উল্লেখ আছে। আবার 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় এক রহস্যময়ী কর্ণধারিণীর বর্ণনা পাই। বার বার বিভিন্ন কবিতায় কখনো নারী কখনো পুরুষরূপে এইরূপ কোনো একটি ব্যক্তিত্বের কল্পনা ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই ব্যক্তিত্ব কখনো কবির সৃষ্টি সোনার ফসল, তাহার কাব্য-সম্ভার বিশ্বজনের উদ্দেশে বহন করিয়া নেন, কখনো জীবনের ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে বিজড়িত হইয়া সকল অভিজ্ঞতাকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া মনে প্রেম ও সৌন্দর্যের সুবলয়িত উপলব্ধি জাগান। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাহাকে মানস-সুন্দরী নামে অভিহিত করেন। আবার কখনো কোনো এক অলৌকিক তরণীতে তুলিয়া কবিকে অজ্ঞান কোনো জগতের উদ্দেশে বহন করিয়া লইয়া যান। দেখা যাইতেছে, কবি ক্রমেই তাহার অতিশয় আত্মসচেতন, সজ্ঞান প্রয়াসে নিয়মিত জীবনের এবং কাব্যসাধনার উপরে ভিন্ন আর একটি শক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়া লইতেছেন। জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (কখনোবা দেবী) রূপে একটা স্বাতন্ত্র্য শক্তি কবি স্বীকার করিয়া সেই শক্তিকে জীবনদেবতা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কবির জীবন, তাঁহার কাব্যসাধনা সমস্তই সেই জীবনদেবতার নির্দেশে চালিত। বিশেষভাবে চিত্রা কাব্যে এই জীবন-দেবতা-তত্ত্ব স্পষ্ট রূপ লাভ করে। কবি এই জীবনদেবতার স্বরূপ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন. "শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখ, তাহার সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া

তুলিয়াছেন।......আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনা দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন।......এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি।" জীবনদেবতা 'ভগবান' নন, কবির ব্যক্তিগত জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্যক্তি-জীবন, বিশ্বজীবন এবং কাব্যসাধনা—কবির অস্তিত্বের ত্রিস্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহার সকল প্রয়াস সকল কর্মকে একটা অখণ্ড তাৎপর্যের সূত্রে গাঁথিয়া তোলেন এই জীবনদেবতা। চিত্রা কাব্যে এই যে জীবনদেবতার কল্পনা পূর্ণ তত্ত্বের রূপ লাভ করিয়াছে, আলোচ্য কবিতার 'মেয়ে'তে তাহারই পূর্বাভাস। ইনি কবির সৃষ্টি বিশ্বজনের উদ্দেশে বহন করিয়া লইয়া গেলেন, কিন্তু কবিকে গ্রহণ করেন নাই। এখনও কবি ব্যক্তিজীবন, কাব্যসাধনা এবং বিশ্বজীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য সূত্রটি উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। তাই তাহার সৃষ্টির সহিত নিজের অস্তিত্বের ভেদজনিত বেদনায় ব্যথিত হয়। উত্তরকালে এই ভেদবোধ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কবিতাটির তত্ত্বগত ব্যাখ্যা লইয়া মতৈক্যের সম্ভাবনা নাই, ভিন্নভাবেও এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিভিন্ন সমালোচক নানা দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এ কবিতার অসামান্য কাব্যমূল্য সম্পর্কে কোনো মত-বিরোধের অবকাশ নাই। তত্ত্বগত বক্তব্য যেমনই হোক, কবিতাটি বর্ষা-প্রকৃতির চিত্ররূপময়তায়, কবির ব্যক্তিগত নিঃসহতার দীর্ণ অনুভূতি প্রকাশে, করুণ মধুর গীতিমূর্ছনায় অপরূপ রসমূর্তি লাভ করিয়াছে। "কবিতাটিতে রূপক বিন্যাসের নিপুণতা অসাধারণ। পদ্মাতীরস্থ বর্ষাপ্লাবিত শস্যক্ষেত্রে ধান কাটা ও কর্তিত ধান্য নিরাপদে বহন করিবার জন্য চাষীর যে উৎকণ্ঠা, সেই নদীমাতৃক বাঙলা দেশের সুপরিচিত দৃশ্যই ইহার ভাবপরিমণ্ডল রচনায় নিয়োজিত হইয়াছে। এই সুপরিচিত বাস্তব দৃশ্যই কবির অপূর্ব রূপক দ্যোতনায় মায়ারহস্য নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার আচ্ছন্নতা থাকিয়া থাকিয়া মেঘগর্জন, নিঃসঙ্গ তীরে নিরাশা চাষীর নৌকার জন্য প্রতীক্ষা, ভরা নদীর ক্ষুরধার স্পর্শে মুহূর্তেই নদীগর্ভে বিলীন হইবার আশঙ্কা, এই ক্ষুদ্র

ভূমিখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া বাঁকা জলের লোলুপ গ্রাসোন্মুখতা, পরপারে তরুচ্ছায়ার ঘনীভূত মেঘান্ধকারে লুপ্তপ্রায় গ্রামের অস্পষ্ট ছবি—এই সমস্ত মিলিয়া চাষীর আবাল্য পরিচিত জগতের উপর এক অজ্ঞাত সম্ভাবনা-কণ্টকিত, অন্তর্লোক হইতে বিচ্ছুরিত যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। অকস্মাৎ এই যবনিকা ছিন্ন করিয়া একটি তরী নদী অতিক্রম করিতেছে দেখা গেল। উহার নাবিক পরিচয়-অপরিচয়ের সীমায় অবস্থিত থাকিয়া প্রাণে আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব জাগাইতেছে; তাহার মুখভাব নিয়তির ন্যায় নির্বিকার; সে কোন দিকে না তাকাইয়া দুর্বল মানুষের ন্যায় নিরুপায় ঢেউগুলিকে দলিত-মথিত করিয়া তাহার বিজয়াভিযানে অগ্রসর হইতেছে। কেবল তাহার গানই কবির সঙ্গে তাহার দূর আত্মীয়তার বার্তা ঘোষণা করিতেছে। সেই আশ্বাসেই কবি তাহাকে পরিচিত বলিয়া দাবী করিতেছেন।······সোনার ধান যখন তরীতে সঞ্চিত হইল, কবির কাব্যকৃতি অমরতার অধিকারী হইল, তখন কবি তাঁহার ······ব্যক্তিসত্তার জন্যই তরণীতে একটু স্থান চাহিলেন। কবি···ঘনায়মান মেঘান্ধকার আকাশের নীচে, অপরিসীম বেদনায় পরিত্যক্ত হইলেন।" কোনো এক লৌকিক কৃষকের আশা-নৈরাশ্যে আন্দোলিত হৃদয়ানুভূতির রূপকে কবি এইভাবে নিজেরই ভাবনা বেদনার স্বরূপ মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই বেদনার সুর আমাদের চিত্তের মধ্যে বর্ণিত হইয়া কারুণ্যের আপ্লুত করে। তত্ত্বের কথাটা বড়ো নয়, কবিতাটির এই রসাবেদনই মুখ্য।

টীকা, শব্দার্থ ও মন্তব্য

[**প্রথম স্তবক**] **গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা**—এই প্রারম্ভিক চরণে সামান্য কয়েকটি শব্দে কবি বর্ষার আবহটি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যে এবং গানে প্রাকৃতিক রূপের যত বর্ণনা আছে তাহার মধ্যে বর্ষার প্রসঙ্গই সর্বাধিক। বর্ষার সহিত একটা নিঃসঙ্গতার ভাব জড়িত হইয়া থাকে। 'মেঘদূত' বা বৈষ্ণব কবিতার মাথুর অংশে বিচ্ছেদ বেদনার পটভূমিরূপে বর্ষার চিত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও সর্বত্রই সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুবর্তনে বর্ষাকে বিরহের, বিচ্ছেদ-বেদনার পটভূমিরূপে গ্রহণ করেন। আলোচ্য কবিতায় একটা নিঃসঙ্গতার বেদনা তীব্রভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। জলে ঘেরা বিচ্ছিন্ন এক ভূখণ্ডে একাকী যে কৃষক (বা কবি) অপেক্ষমান তাহার

মন পড়িয়া আছে পরপারের তরুছায়ামসীমাখা গ্রামখানির দিকে। কিন্তু মাঝখানে বাঁকা জলস্রোত অতিক্রম করিয়া সেখানে পৌছিবার কোনো উপায় নাই। শেষ পর্যন্ত এ কবিতায় বিচ্ছেদ ও নিঃসঙ্গতার কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং সেই সঙ্গীহীন নিঃসঙ্গতার অনুভূতির পটভূমিরূপে বর্ষার এই চিত্রটুকু তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া ওঠে। প্রকারান্তরে বলা যায়, বর্ষাপ্রকৃতির প্রভাবই হয়তো কবির চিত্তে বিশ্বের সহিত বিচ্ছেদের অনুভূতি জাগাইয়া তুলিয়াছে, সেই অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছে নিঃসঙ্গ কৃষকের রূপকে। **নাহি ভরসা**—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে কৃষক রাশি রাশি কর্তিত ধান জমা করিয়া তুলিয়াছে, কী ভাবে সে এই ধান্যরাশি পরপারে লইয়া যাইবে ভাবিয়া পাইতেছে না। কবিতার রূপকার্থের দিক হইতে বলা যায়, কবি যে কাব্যসম্পদ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা কে গ্রহণ করিবে, কেহ সমাদর করিবে কি না—কবি এই অনিশ্চয়তাবোধে নিমজ্জিত। **ধান কাটা হল সারা**—কবিতাটির অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়া অনেক সমালোচক বর্ষায় ধানকাটার প্রসঙ্গ লইয়া অনেক বিরূপ সমালোচনা করেন। তাঁহাদের অভিযোগ, বর্ষায় কোথাও ধান কাটা হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলে, "নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচা ধান কেটে বোঝাই চাষীদের ডিঙি নৌকো হু হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ওই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলিধান। আর কিছুদিন হলেই পাকত। ভরা পদ্মার উপরকার ওই বাদল-দিনের ছবি সোনার তরী কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।" অকালে কাঁচা ধান কাটিয়া লইবার এই দৃশ্যের স্মৃতিই যোজিত হইয়াছে সোনার তরী কবিতায় শ্রাবণ মাসে ধানকাটার প্রসঙ্গরূপে। **ক্ষুরধারা**—ক্ষুরের ধারের মতো, জলের তীব্র স্রোতবেগ বুঝাইতে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তুলনীয়: 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা' (কঠোপনিষৎ)।

[**দ্বিতীয় স্তবক**] **একখানি ছোট খেত**—রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যা: "মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা যে বেষ্টিত—ওই একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে।" প্রসঙ্গতঃ রামপ্রসাদ সেন-এর গান মনে পড়ে, "এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।" কৃষকের নিকট যেমন তাহার জমিটুকু কর্মের ক্ষেত্র, তাহার কৃষি-নৈপুণ্যে সোনার ধান ফলাইয়া

তুলিবার স্থান, কবির নিকট নিজের জীবনটুকু সেইরূপ সোনার ফসলের মত সকল কাব্য-সম্পদ সৃষ্টি করিয়া তুলিবার ক্ষেত্র। এই সৃষ্টির কাজে বাহিরের কাহারো সহায়তা মেলে না। একক সাধনায় কাব্যসম্ভার সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়। **চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা**—দ্বীপের মতো জমিটুকুর চার-পাশে বক্রকুটিল জলস্রোত। কবির কাব্যসৃষ্টির ইতিহাসের দিক হইতে এই অংশটির অন্য একটি অর্থ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রথমদিকে বাঙলা-দেশের পাঠকমণ্ডলীর নিকট সমাদর লাভ করে নাই। নিয়ত বিরুদ্ধ সমালোচনার বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সেই প্রতিকূলতার পরিপ্রেক্ষিতে বাঁকা জল কথাটিকে বক্রকুটিল সমালোচনা অর্থে গ্রহণ করা যায়। মোহিতলাল মজুমদার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। **পরপারে দেখি……প্রভাতবেলা**—এই বর্ণনাটুকুর চিত্রময়তা অপরূপ। দক্ষ শিল্পীরা যেমন ধূসর বর্ণালিম্পনে দূরের দৃশ্য আভাষিত করিয়া তোলেন এখানে কবি সেই পদ্ধতিতে দূর ওপারের গ্রামের আভাসটুকু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ওই লোকালয় ওই মানব সংসারের উদ্দেশে কবি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন। নিবিড় গাছের ছায়ায় ঢাকা গ্রামখানি, তাহার উপরে ঘনায়মান মেঘের ছায়া সঞ্চারিত হইয়াছে। কবি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহার মানব সংসারে মানুষের দ্বারা গৃহীত হইবে, সমাদৃত হইবে ইহাই তাহার আকাঙ্ক্ষা, এখানে সকালবেলার মেঘের উল্লেখটি রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ বর্ণনাত্মক এই গানটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়ঃ

"এই সকাল বেলার বাদল আঁধারে
আজি বনের বীণার কী সুর বাঁধা রে॥

……………………………

মন যে আমার পথ-হারানো সুরে সকল আকাশে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে রে,
শোনে যেন কোন ব্যাকুলের করুণ কাঁদা রে॥"

[**তৃতীয় স্তবক**] **গান গেয়ে তরী বেয়ে………চিনি উহারে**—নিঃসঙ্গ দ্বীপে একাকী কবি যখন পরপারে পৌছিবার কোনো ভরসা নাই দেখিয়া হতাশায় নিমগ্ন হইতেছিলেন তখন অকস্মাৎ কাহার যেন গানের সুর শুনিলেন, চাহিয়া দেখিলেন কেহ একজন নৌকা বাহিয়া আসিতেছে। তাহাকে চেনা মনে হইল। কবির মনে আশা জাগিয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার

বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত পাঠকমাত্রেরই মনে এই অকস্মাৎ আবির্ভূত নাবিক সম্পর্কে একটা নিহিত অর্থের ভাবনা দেখা দেয়। সোনার তরী এবং চিত্রা— এই দুই কাব্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবতার কল্পনা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন জীবনদেবতা (সমালোচনা দ্রষ্টব্য)। চিত্রাতেই জীবনদেবতার ধারণা স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। জীবনদেবতা কবির ব্যক্তিসত্তা, কাব্যসাধনা এবং বিশ্বজীবনের মধ্যে নিগূঢ় ঐক্যবিধান করিয়া কবির জীবন ও কাব্যকে একটা সুনিশ্চিত পরিণামমুখী অখণ্ডতার মধ্যে গাঁথিয়া তোলেন। এখানে যে নাবিকের উল্লেখ আছে তাহাকে সেই জীবনদেবতারই পূর্বাভাসরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত। ইনি কবির কাব্যসম্ভার বিশ্বসংসারের উদ্দেশে বহন করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু কবিকে গ্রহণ করেন নাই। এখনও কবির মনে ব্যক্তিজীবনে ও কাব্যসাধনার মধ্যে ভেদ-বোধ জাগ্রত। এইজন্য যে বেদনাবোধ করেন আলোচ্য কবিতায় সেই বেদনার কথাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। উত্তরকালের কবিতায় এইরূপ ভেদবোধ লুপ্ত হইয়া কবির ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তা একাকার হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাই। চিত্রা কাব্যে জীবনদেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন।

'বলিতেছিলাম বসি এক ধারে
আপনার কথা আপন জনারে
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত—
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।"

ব্যক্তিগত কথাই এখন কাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে।

[**চতুর্থ স্তবক**] **ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে**—নিজের পরিচিত জীবনবৃত্তের বাহিরে যাহা কিছু, এক অর্থে তাহাই বিদেশ। কবি যে বিশ্বসংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের সাধনার জগতে নিমগ্ন, সেই বিশ্বসংসারও এইদিক হইতে কবির পক্ষে বিদেশ। ওই নেয়ে, যাহাকে দেখিয়া মনে হয় চেনা, সে সেই বিদেশের সহিত, অপরিজ্ঞাত সংসারের সহিত

কবির যোগসাধন করিবে। ব্যক্তিগতভাবে কবিকে না হোক, তাঁহার কাব্য-সম্ভার এই জগতের উদ্দেশ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। **শুধু তুমি নিয়ে যাও··· কূলেতে এসে**—এখানে কবির প্রার্থনাটুকু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নিজে তরীতে পরপারে যাইবেন এতটা দাবী করিতে যেন কুণ্ঠিত। শুধু সোনার ধানগুলি বা কাব্যসম্ভারই ওই তরীতে তুলিয়া দিতে চাহিতেছেন। নিজের সৃষ্টির মূল্য সম্বন্ধে কবির কোনো সংশয় নাই। তিনি বহু সাধনায় যে কাব্য-সম্ভার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা অসংকোচে বিশ্বসংসারের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিবার যোগ্য।

[**পঞ্চম স্তবক**] **এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে**—বড়ো করুণ এই উক্তি। একজন কবি কতো যত্নে, কত নিষ্ঠায় কাব্যসম্ভার সৃষ্টি করিয়া তোলেন। নিজের সেই সৃষ্টিগুলির সহিত তাহার জীবন সর্বতোভাবে বিজড়িত। নিজের ভাবনা-বেদনার সবটুকু নিংড়াইয়া তিনি কাব্যরূপের মধ্যে ধরিয়া দেন। এই সৃষ্টির বেদনা তাঁহাকে একাকী বহন করিতে হয়। কবিতার সহিত কবির প্রতিমুহূর্তের সম্পর্ক, সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার সম্পর্কের এই মর্মই আলোচ্য অংশে কেমন একটা বেদনার সুরে প্রকাশ পাইয়াছে। বেদনা জাগিতেছে, কারণ, এতদিন যাহা একান্তভাবে নিজের অস্তিত্বের অঙ্গীভূত ছিল, এবারে তাহা আর দশজনের সামগ্রী হইবে। **এখন আমারে লহ করুণা করে**—চতুর্থ স্তবকে বলিয়াছিলেন 'শুধু তুমি নিয়ে যাও/ক্ষণিক হেসে/আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।' নিজেকে নিবেদন করিতে ভরসা পান নাই। এবারে সেই কথাটা উচ্চারণ করিলেন। কাব্যের সহিত কবি ব্যক্তিগতভাবে নিজেও অমরত্ব প্রার্থনা করিতেছেন, বিশ্বজনের হৃদয়ে নিজের জন্যও একটু স্থান প্রার্থনা করিতেছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই কবিতায় কবি ব্যক্তিসত্তা এবং কাব্যসম্পদে ভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। সেই ভিন্নতাবোধ এখানে প্রকট।

[**ষষ্ঠ স্তবক**] **ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই**—কবির শেষের প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। তরীখানিতে তাঁহার নিজের জন্য স্থান হয় নাই। এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে, সোনার তরী কাব্যের শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় কিন্তু কবি নিজেই তরণীর যাত্রী। সেখানে কবিভাবনা আরও পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ব্যক্তিসত্তা এবং কবিসত্তার মধ্যে ভেদ-বোধ ঘুচিয়া গিয়াছে।

এখানে কিন্তু এই দুই সত্তার মধ্যে ভিন্নতাবোধের জন্যই ব্যক্তিসত্তার নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধ করুণ সুর জাগাইয়া তুলিয়াছে। **শ্রাবণগগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে**—কবিতার মধ্যে প্রকৃতি চিত্র কেমন অপরূপভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কবির হৃদয়ানুভূতির সহিত প্রকৃতি চিত্রের বুনোটেই এই কবিতার কাব্যরূপ নির্মিত। প্রথম চরণে বর্ষা-প্রকৃতির উল্লেখে কবিতাটির শুরু, একেবারে শেষে পুনরায় সেই বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি জাগানো মেঘ ও বর্ষার কথা ঘুরিয়া আসিতেছে। **যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী**—এতদিন বসিয়া যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বিশ্বজনের উদ্দেশ্যে সকলই নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিলেন। তাহার সৃষ্টির উপর হইতে নিজের অধিকার যেন শিথিল হইয়া গেল। কবিতা তো অপরের উপভোগের জন্যই রচিত হয়। দশজনে যদি সমাদর করে তাহাতেই কবির তৃপ্তি। আর নেয়ে সমাদর করিয়া তাহার নৌকায় তুলিয়া লইয়াছে। কবির পক্ষে ইহা আনন্দের হওয়াই উচিত। কিন্তু পরিবর্তে বিষাদেই কবিতাটি শেষ হইয়াছে। কেন এই বিষাদ? যে সৃষ্টি এতদিন একান্তভাবে আপনার ছিল, দশজনের উদ্দেশ্যে তাহা তুলিয়া দেওয়ায় স্রষ্টার মনে একটা বেদনা জাগিতেছে। বেদনাবোধের আর একটা কারণ বিশ্বজগতের সহিত তাঁহার ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছেদ। তাঁহার শিল্পীমনের জগৎটি একাকীত্বে ঘেরা। এই একাকীত্বে বেষ্টিত জগতে সৃষ্টিক্রিয়ায় যে স্বতন্ত্র সাধনার দুঃখ কবি যেন তাহার অবসান কামনা করিয়াছেন। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় লিখিয়াছেন :

> "অলৌকিক আনন্দের ভার
> বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার,
> তার নিত্য জাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান
> ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।"

নিজেকে দগ্ধ করিয়া এইভাবে দশজনের আনন্দের উপকরণ সৃষ্টি করা যে শিল্পীর কাজ, জগতের সাধারণ মানুষের মতো দুঃখ আনন্দ তাহার যেন প্রাপ্য নয়। এইদিক হইতে বিশ্বজনের সহিত কবিশিল্পীদের কোথাও একটা অনতিক্রম্য ব্যবধান আছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় কবি এই শিল্পীজনোচিত একাকীত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার ভাবেই ব্যথিত।

ব্যাখ্যা

[এক] একখানি ছোট খেত, আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা—
এ পারেতে ছোট খেত, আমি একেলা।

[দ্বিতীয় স্তবক]

আলোচ্য অংশটি 'সোনর তরী' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কোনো এক কৃষকের স্বগত ভাষণরূপে গ্রহণ করিলে কবিতাটির এই অংশে নিজের গ্রাম হইতে দূরে জলঘেরা একটা চর-জমিতে নিঃসহতার অনুভূতি মিশ্রিত, চোখে দেখা একটি দৃশ্যের বর্ণনা করা হইয়াছে বলা যায়। ছোট খেতখানি ঘিরিয়া অবিরল ধারায় বক্র-কুটিল জলস্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে দৃষ্টি পড়ে। সকালবেলাতেই বাদল-মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। জলরাশির ওপারে গ্রামের উপরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরত্ব এবং মেঘের ছায়ার জন্য স্পষ্টভাবে গ্রামখানি দেখা যায় না। নিবিড় গাছপালার পাতার রঙ এতদূর হইতে দেখায় কৃষ্ণবর্ণ। সেই কালোরঙমাখা গ্রামের ঘরবাড়ির অস্পষ্ট আভাসটুকু শুধু চোখে পড়ে। একাধিকবার, প্রথম এবং শেষ চরণে 'একেলা' শব্দটি ব্যবহার করায় নিঃসঙ্গতার ভাবটুকু প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কোনো নিঃসঙ্গ মানুষ দূর হইতে লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতেছে এবং বিচ্ছিন্নতার বেদনায় আপ্লুত হইতেছে—এইভাবে দেখিলে কবিতার এই অংশ করুণ রসে মিশ্রিত অনুপম একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা মনে হয়।

সমগ্র কবিতার রূপকার্থের দিক হইতে আর একটি অর্থ করা যায়। এই লৌকিক কৃষককে যদি কবি-ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করি তবে বলা যায় যে, কবি মানব সংসার হইতে দূরে একাকী কাব্য-সাধনায় নিরত। তাঁহার সৃষ্ট কাব্যসম্ভার ওই মানব সংসারের জন্যই রচিত। অপরের আনন্দের জন্যই

কবির দুঃখময় সাধনা। সাধনার ধনগুলি লইয়া তিনি অপেক্ষা করিয়া আছেন। কে কেমনভাবে ইহাদের গ্রহণ করিবে কবি জানেন না। তবুও ওপার অর্থাৎ ওই বিশ্বসংসারই তাঁহার লক্ষ্য। দূর হইতে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তিনি লোকালয়ের দিকে চাহিয়া আছেন। আশঙ্কা, কেহ তাঁহার কাব্যসম্ভার ওখানে পৌছাইয়া দিক! দশজনের জন্য যাহা রচনা করিয়াছেন তাহা দশের উপভোগে লাগুক।

শিল্পী-জীবনের নিঃসঙ্গতার বেদনাটুকু এখানে একটি বাস্তব দৃশ্যের রূপকে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

[দুই] গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরাপালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দুধারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

[তৃতীয় স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতাটির প্রথম দুই স্তবকে বর্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ও নির্জন চর-জমিতে কাটা ধানের রাশি লইয়া অপেক্ষমান কৃষকের মানসিক অবস্থার উল্লেখ আছে। এই ধানের রাশি বহন করিয়া পরপারে যাইবার কোন উপায় নাই, তাই সে নৈরাশ্যে নিমগ্ন। এমন সময়ে কোন এক নাবিকের গানের সুর শুনিতে পাইল। আপন মনে সেই নাবিক তরী বাহিয়া চলিয়াছে কোথায়, কোন বিদেশের উদ্দেশ্যে। পালে হাওয়া লাগিয়াছে, দ্রুত গতিশীল তরণী। চলমান তরণীর সংঘাতে ঢেউগুলি দুধারে ভাঙিয়া পড়িতেছে। দূর হইতে দেখিয়া মনে হইল নাবিক যেন পরিচিত।

কবিতাটির রূপকার্থের দিক হইতে স্তবকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ কবিতায় লৌকিক কৃষককে যদি কবির নিজেরই ব্যক্তিসত্তার প্রতিভূরূপে গ্রহণ করা যায় তবে একটা সুসঙ্গত অর্থ মেলে। কবি নিজের জীবনের বৃত্তটুকুর মধ্যে, নিজের ভাবনা বেদনার সঞ্চয়গুলি কাব্যে রূপ দিয়াছেন। সেই

সম্পদ যেন সোনার ধান। বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে এ দৃষ্টি তিনি নিবেদন করিতে চান, কিন্তু কে এই কাব্যসম্ভার বহন করিয়া লইবে ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে এক নাবিক আবির্ভূত হইয়াছে। কবিতার শেষ অংশে বলা হইয়াছে, সোনার ধান বা কবির বহু সাধনার ধন—যে কাব্যসম্পদ তাহা তরণীতে তুলিয়া লইল। কবিকে একাকী রাখিয়া সেই তরী-বোঝাই সম্পদ সে লইয়া গেল। সোনার তরী এবং চিত্রা কাব্যের অন্যান্য কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতাটি পাঠ করিলে মনে হয় এই কালে কবি ক্রমে ক্রমে তাঁহার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবতার কল্পনা পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। এই দেবতা, যাহাকে উত্তর কালে রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতা নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইনি কবির ব্যক্তিসত্তা, তাঁহার কাব্য-সাধনার এবং বিশ্বসংসারের মধ্যে অখণ্ড যোগাযোগ রচনা করিয়া কবির সকল প্রয়াস সকল কর্মকে তাৎপর্যময় করিয়া তোলেন। জীবনদেবতার কল্পনা বিশেষভাবে চিত্রা কাব্যেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু সোনার তরী কাব্য হইতেই ইহার সূচনা। মনে হয় আকস্মিকভাবে আবির্ভূত এই নাবিককে জীবনদেবতার পূর্বাভাস। ইনি কবির কাব্যসৃষ্টি বিশ্বসংসারের উদ্দেশ্যে বহন করিয়া নিয়া গেছেন, বিশ্বের সহিত কবির কাব্য-সাধনার যোগ রচনা করিয়া দিয়াছেন। জীবনদেবতা কবির নিজেরই ভাবজীবনের ইষ্টদেবতা, বিশেষভাবে তাঁহারই কল্পনার সৃষ্টি। তাই এই ইষ্টদেবতার মূর্তি কবির অপরিচিত নয়। দেখিয়া পরিচিত মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

[তিন] ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোটো সে তরী
আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী। [ষষ্ঠ স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'-নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতাটির তিনটি স্তর। প্রথম স্তরে পাই জলে ঘেরা চরজমিতে

কাটা ধান লইয়া অপেক্ষমান এক কৃষকের কথা, যাহার দৃষ্টি পড়িয়া আছে দূর গ্রামের দিকে। দ্বিতীয় স্তরে এক নাবিক আবির্ভূত হয় এবং সোনার ধানগুলি তরণীতে তুলিয়া লয় এবং ওই তরণীতে একটু স্থান লাভের জন্য কৃষক অনুনয় জানায়। তৃতীয় স্তরে আসে সোনার ধানগুলি তরণীতে তুলিয়া লইয়া নাবিকের বিদায়ের দৃশ্য, কৃষক একাকী শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া থাকে। সোনার ধানে তরী ভরিয়া গিয়াছে, তাকে তুলিয়া লইবার মতো স্থান নাই। এই কৃষক নিশ্চয়ই কবি নিজেই। যিনি একাকী বহু দুঃখের সাধনায় কাব্য-সম্পদ সৃষ্টি করিয়া তোলেন, সেই কাব্যসম্পদ অকস্মাৎ আবির্ভূত নাবিকের বা কবির জীবনদেবতার নৌকায় তুলিয়াছেন। নাবিক বিশ্বজনের উদ্দেশ্যে বোঝাই তরী বহিয়া যায়, কিন্তু কবিকে গ্রহণ করে না বা সেই তরীতে কবির স্থান হয় না। এই শেষ বর্ণনাটুকুর মধ্যে শিল্পী-জীবনের একটা গভীর সত্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

শিল্পী বা কবি নিজের জীবন নিংড়াইয়া শিল্পবস্তু, কাব্য সম্পদ সৃষ্টি করেন। শিল্পীর সাধনা তাহার একক সাধনা ঃ সেই সৃষ্টিময় জীবনের দুঃখ যন্ত্রণার সহিত বাহিরের কাহারো যোগ নাই। বাহির সংসার শুধু এই সাধনার ফলগুলি গ্রহণ করে, সমাদর করে, সযত্নে রক্ষা করে। কবি যখন নিজের প্রতিমুহূর্তের বেদনায় সৃষ্টি করিয়া তোলা কাব্য-সম্পদ দশের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছেন তখন হয়তো আকাঙ্ক্ষা জাগে, বিশ্বসংসার ওই কাব্যের সহিত কবি-ব্যক্তিকেও গ্রহণ করুক। কিন্তু সংসার ব্যক্তিকবিকে গ্রহণ করে না। আমাদের আলোচ্য কাব্যাংশে শিল্পী-জীবনের সেই বেদনার কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বসংসারের উদ্দেশ্যে যাত্রী তরণীখানি কবিরই সোনার ধানে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে তরণীতে কবির জন্য স্থান হয় নাই, তিনি শূন্য নদীর তীরে একাকী পড়িয়া রহিলেন। এই জলরেখা বলয়িত দ্বীপের মতো খেতটুকু, ইহা কবিরই ব্যক্তিসত্তা। এখানেই কাব্যের ফসল ফলে। সে কাব্য বিশ্বের সকলের জন্য। রবীন্দ্রনাথ ভিন্নভাবে এই একই কথা বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করেছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করেছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্চে।" কবির অহংটুকু, তাহার ব্যক্তিসত্তার ভারটুকু, সংসার বহন করিতে চায় না।

প্রশ্নোত্তর

[এক] সোনার তরী কবিতাটি সাধারণভাবে একটি বর্ষার চিত্ররূপময় কবিতা হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা কিংবা ইহাকে রূপকার্থে গ্রহণই সঙ্গত আলোচনা কর। রূপকার্থই প্রধান মনে হইলে কবিতায় উল্লিখিত সকল প্রসঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সংক্ষেপে রূপকার্থটি বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। যে কোন মহৎ কবিতাই কবির উপলব্ধিগত জীবনসত্যের রসমূর্তি। অনুভূতি প্রকাশের জন্যে কবিতায় যে ভাষাচিত্র রচিত হয় তাহার সৌন্দর্য নিশ্চয়ই প্রাথমিকভাবে আমাদের মুগ্ধ করে। কবির যাহা কিছু বক্তব্য তাহা ওই ভাষার শিল্পরূপের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। যদি কোনো পাঠক এই আপাত-মাধুর্যেই তৃপ্তি পান, কবিতার অপর কোনো তাৎপর্য সম্পর্কে আগ্রহ যদি না জাগে তবে তিনি কবিতার রস হইতে বঞ্চিত, এমন কথা বলা চলে না। সার্থক রচনার ধর্মই এই যে তাহা সকল শ্রেণীর, সকল প্রবণতার পাঠককে তৃপ্ত করে। কিন্তু কোনো মহৎ কবির কবিতা পাঠের সময়ে সেই কবির বিকাশমান প্রতিভার পরিণামের দিক হইতে বিশেষ কবিতার নিহিত মর্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা অনিবার্য হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের নানা পর্যায়ে বিচিত্র বিষয় অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। বিচ্ছিন্নভাবে কবিতাগুলির রসাবেদন নিশ্চয়ই আছে। আবার তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির পটভূমিতে রাখিয়া বিচার করিলে বিশেষ একটি কবিতার মধ্যে কবির ভাবজীবনের ব্যাপকতার সত্যানুভূতির আভাস ধরা যায় না। কবিকে বুঝিবার পক্ষে এই দৃষ্টিতে বিশেষ রচনার বিচার অনিবার্য। 'সোনার তরী' কবিতাটি সম্পর্কেও এ কথা সত্য যদি কেহ এ কবিতাকে কোনো তত্ত্বের রূপক হিসাবে না দেখিয়া আপাত অর্থই গ্রহণ করেন—তিনি নিশ্চয়ই ইহার রসরূপের স্বাদ পাইবেন। পরিশ্রমী কোনো পাঠক এইটুকুতেই যদি সন্তুষ্ট না হন, যদি তিনি রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনধারার পরিপ্রেক্ষিতে এ কবিতার তাৎপর্য উদ্ধার করিতে চান তবে তাঁহার নিকট কবিতাটির ব্যাপকতর আবেদন বহন করিয়া আনিবে।

'সোনার তরী' কবিতার ছয়টি স্তবকে নিবিড় বর্ষাপ্রকৃতির পটভূমি এবং একজন নিঃসঙ্গ মানুষের বিচ্ছিন্নতার বেদনা গীতিরসে আপ্লুত ভাষায় প্রকাশিত

হইয়াছে। সামান্য দু একটি কথায় যে প্রাকৃতিক চিত্রগুলি মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার শিল্পনৈপুণ্যও অসাধারণ। আকাশে পরিব্যাপ্ত মেঘ এবং মেঘগর্জনের উল্লেখে বর্ষাপ্রকৃতির পরিবেশটি কবিতার প্রথম চরণেই প্রমূর্ত হইয়া ওঠে। কাটা ধানের রাশি লইয়া নিঃসঙ্গ একটি মানুষ দূর পরপারের দিকে চাহিয়া আছে। ওপারের গ্রামখানি ধূসর রঙের আলিম্পনে আঁকা, কিন্তু ওখানে উত্তীর্ণ হইবার কোন উপায় নাই। এমন সময়ে কাহার যেন গান শোনা গেল, কে একজন তরী বাহিয়া চলিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় চেনা। নিঃসঙ্গ মানুষটির আকুল আহ্বানে সেই নাবিক সাড়া দিল। তরী তীরে ভিড়ল। রাশি রাশি সোনার ধান সে নৌকায় তুলিয়া লইল। স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় ভারাক্রান্ত মানুষটি নিজের জন্য একটু স্থান ভিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আর স্থান নাই তরণীতে। তাহারই সোনার ধানে তরণী পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রাবণ মেঘে আচ্ছন্ন আকাশের নীচে সেই নির্জন চর জমিতে মানুষটি একাকী পড়িয়া রহিল, কবে তাহার এ নির্বাসন শেষ হইবে কেহ জানে না। এই তো কবিতাটির সমগ্র বর্ণনা। যদি অপর কোনো তত্ত্বের কথা না ভাবিয়া নিঃসঙ্গ মানুষটিকে একজন লৌকিক কৃষকরূপেই গ্রহণ করা যায় তবুও নিবিড় বর্ষাপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তাহার গৃহপ্রত্যাশী আকাঙ্ক্ষা বেদনা এবং উপায়হীনতা আমাদের ব্যথিত করিয়া তোলে। অন্তহীন নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের কারুণ্য মর্মস্পর্শী হইয়া ওঠে সজল বর্ষার চিত্র-রূপগুলির মিশ্রণে। আমাদের অন্তঃকরণ বেদনারসে টলটল করিয়া ওঠে। এই স্বাদটুকুর জন্য কবিতাটির চিরদিনের মতো আমাদের মনে গাঁথা হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে কবির নিজেরই একটি উক্তি বিশেষভাবে মনে পড়ে। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে একজায়গায় কবি বলিয়াছেন, "পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল", তাই বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কবিতার রসাবেদন যেমনই হোক কবির ভাব-জীবনের দিক হইতে তাহার তাৎপর্যও অপরিহার্য আলোচ্য হইয়া ওঠে। কবির ভাব-জীবনের দিক হইতে দেখিলে সোনার তরী কবিতার কৃষক, চাষ এবং চাষের জমিটুকু, সোনার ফসল, অকস্মাৎ আগত নাবিক, তরীতে ফসল তুলিয়া দেওয়া

এবং নিজে স্থান না পাওয়া—এই সকল প্রসঙ্গই মনে হয় অপর একটি ভাবগত উপলব্ধির রূপক। কৃষক কবিরই ব্যক্তিসত্তার প্রতিভূ; চাষ কবির কাব্যসৃষ্টি প্রয়াস; কৃষিক্ষেত্র কবির জীবনের বৃত্ত; সোনার ফসল কবির সৃষ্ট কাব্য; নাবিক এমন কোনো কল্পিত পুরুষ যিনি কবির সহিত বিশ্বসংসারের দৌত্য করেন; অন্তত কবির কাব্য বিশ্বজনের নিকট পৌঁছাইয়া দেন (আরও পরে, চিত্রা কাব্যে ইঁহাকেই কবি জীবনদেবতা নামে সম্বোধন করিয়াছেন); বিশ্বসংসার কবির কাব্যকেই সমাদর করে, কবিব্যক্তিকে নহে, তাই তরীতে কবিতার স্থান হয় কিন্তু কবির স্থান হয় না। কাব্যসৃষ্টি কবির একক সাধনা। সেই দুঃখের সাধনায় যে কাব্যসম্পদ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা বিশ্বজনের হাতে তুলিয়া দিলেন। লোকে তাহার ভালোমন্দ বিচার করিবে; সমাদর করিবে; রক্ষা করিবে। কিন্তু কবিকে কেহ মনে রাখিবে না। জানিবে না কত দুঃখের ধন এই কাব্য। কবি-শিল্পীদের ইহাই বিধিলিপি। দুঃখের অগ্নিতে নিজেকে দগ্ধ করিয়া অপরের জন্য আনন্দের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়। কবিতার শেষ অংশে যে বেদনার সুর বাজে তাহা কবির ব্যক্তিসত্তার শূন্যতাবোধজনিত। এখানে কবি ব্যক্তিজীবন ও কাব্যের মধ্যে একটা ভেদবোধকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন। আরও পরবর্তী পর্যায়ের কবিতায় এই ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে দেখা যায়। জীবনদেবতা কবির ব্যক্তিজীবন কাব্যসাধনা এবং বিশ্বজীবনের মধ্যে একটা সুগভীর সামঞ্জস্য রচনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু অখণ্ডতার উপলব্ধি আরও পরবর্তীকালের ব্যাপার।

[দুই] 'সোনার তরী' কবিতার মূল ভাব কি আশা না নৈরাশ্য ? বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর।

উত্তর। কবির সাধনা একক-সাধনা। নিবিষ্টভাবে আনন্দ-বেদনার অনুভূতি তিনি কাব্যে গাঁথিয়া তোলেন। সঞ্চিত কাব্যসম্ভার তাঁহারই জীবন-মন্থন করা ধন। এই যে একাকীত্বের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ—ইহাই কবির ব্যক্তি-জীবন। এই বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের যত কিছু দুঃখ তাহাকেই বহন করিতে হয়। কিন্তু এই জীবনে তিনি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়া তোলেন, সেই শিল্পসম্পদ, সেই কাব্যসম্ভার তিনি নিবেদন করিয়া দেন বিশ্ববাসীর উদ্দেশে। বিশ্ববাসীর উপভোগের সামগ্রী হইবে—ইহাতেই কাব্যের উপযোগিতা। 'সোনার তরী' কবিতাটিতে এই তিনটি প্রসঙ্গ আছে। একদিকে কবির বিচ্ছিন্ন জীবন ও সেই জীবনের কাব্যসাধনা। দ্বিতীয়ত, এই সাধনায় সঞ্চিত কাব্য বা সোনার ফসল

তৃতীয়ত, যাহাদের জন্য এই কাব্য সৃষ্টি সেই বিশ্বজন। বিশ্ববাসীর কবির সৃষ্টিকেই সমাদর করে, কবির ব্যক্তিজীবনের সুখ দুঃখের প্রতি তাহাদের কোনো আকর্ষণ নাই, মনোযোগ নাই। 'সোনার তরী' নেয়ে সোনার ধান (কাব্যসম্ভার) নিঃশেষে তুলিয়া লইয়াছে। বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। কবি ক্ষণিকের দুর্বলতায় সে আপনার জন্য সেই তরীতে একটু স্থান ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। তরী চলিয়া গিয়াছে। কবি তাঁহার একক অস্তিত্বের বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পড়িয়া রহিলেন।

কবির মূলগত অভিপ্রায় সৃষ্ট কাব্য বিশ্ববাসী সমাদরণীয় হোক। রবীন্দ্রনাথ জানেন, তাঁহার সৃষ্টি ব্যর্থ হয় নাই। বিশ্ববাসী সেই বেদনার ধানগুলি আপন করিয়া লইয়াছে। তাই সোনার ধানে তরী বোঝাই-এর চিত্র আসে কবিতায়। এইদিক হইতে কবির আশা পূর্ণ হইয়াছে, তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণভাবে চরিতার্থ হইয়াছে। সাধনা বিফল হয় নাই। সুতরাং এদিক হইতে নৈরাশ্যের প্রশ্ন ওঠে না। তবুও যে কবিতায়, বিশেষভাবে কবিতার শেষ কয়েকটি পঙক্তিতে একটা নৈরাশ্যের সুর বাজে, তাহার কারণ এই দুর্বল মুহূর্তের প্রার্থনা অপূর্ণতার বেদনা। এই বেদনাটুকুর উৎস কবির নিজের কথাতেও জানা যায়। একস্থানে বলিয়াছেন, "সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে, ওইসঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে, তোমার জন্যে জায়গা কোথায়।· প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করেছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করেছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে।" বেদনা তবে ওই অহংবুদ্ধির বশে চাওয়া অসঙ্গত আবদারটুকুর জন্য। এই বেদনা কবিতায় কোথাও নৈরাশ্যের আকারে মূর্ত হয় নাই। বরং কবি একটা সত্যোপলব্ধির মতো ইহা মানিয়া লইয়াছেন যে এখনও সাধনার শেষ হয় নাই। একাকী দীর্ঘ সাধনায় আরও বিচিত্র কাব্যসম্ভার সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হইবে। এই উপলব্ধিটাই বড়ো হইয়া ওঠে।

'সোনার তরী' কবিতার মূল সুরে নৈরাশ্যবাদের প্রভাব নাই কোথাও। আছে শিল্পী-জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি বিষয়ে ভাবনায় ব্যক্তিজীবনের দিক হইতে একটা বিচ্ছিন্নতার বেদনাবোধ। এই বেদনাটুকু কাব্যে অপূর্ব রসমূর্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাকে কখনোই নৈরাশ্য বলা চলে না। নৈরাশ্য বা দুঃখবাদ রবীন্দ্রনাথের মনোধর্মের বিরোধী।

॥ বসুন্ধরা ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য :

রবীন্দ্রনাথের অতিশয় বিশিষ্ট প্রকৃতি-চেতনার পূর্ণ পরিণাম 'বসুন্ধরা' কবিতায় কাব্যমূর্তি লাভ করিয়াছে। এইজন্যই সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে এই কবিতাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের মানস প্রকৃতি, তাঁহার জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত ভাবনার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এই কবিতার মর্ম গ্রহণ অপরিহার্য। এই কারণেই রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচকদের আলোচনায় 'বসুন্ধরা' বিশদভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে, স্বয়ং কবিও যখন নিজের কাব্যধারার বিবর্তনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন তখন এই কবিতাটির মর্মবস্তুর প্রতি বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবে কবির নিজের এবং প্রধান সমালোচকদের কিছু মন্তব্য এখানে সংকলিত হইল।

'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে কবি লিখিয়াছেন, "এই জীবনযাত্রার অবকাশ কালে মাঝে মাঝে শুভ মুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষ-দৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি তখন আর এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে।...তখনি একথা বলিয়াছি—

> আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে,
> কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
> বিপুল অঞ্চল-তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
> তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
> দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
> বসন্তের আনন্দের মতো।

আমার স্বাতন্ত্র্য গর্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি আমার কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।"

'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থে সংকলিত একটি পত্রে 'বসুন্ধরা' কবিতায় অভিব্যক্ত ভাববস্তুর গদ্যরূপ আছে। পত্রখানির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ :

"এই পৃথিবী আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সব মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি চলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেলছে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটিত এবং সব পল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীতি হিরণ্য-অঞ্চল প'রে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে, গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি—বহু-সন্তানবতী মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃকপাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না; আর আমি কেবল অবিশ্রাম বলে যাচ্ছি। এইভাবে একরকম কেটে যাচ্ছে। প্রায় বিকেল হয়ে এল। এখন শীতের বেলা কিনা, দেখতে দেখতে রোদ্দুর পড়ে যায়।" (শিলাইদহ, ৯ ডিসেম্বর ১৮৯২)।

অধ্যাপক প্রথমনাথ বিশী এই কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন,

"বসুন্ধরা একটি অপূর্ব কবিতা। বিজ্ঞানের কোনো একটি মতবাদের সহিত সুসঙ্গত অথচ পরিপূর্ণভাবে কাব্য, এমন কবিতা প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাতে বিশ্বকে জানিবার দুর্দম্য আকাঙ্ক্ষার সহিত, অন্তঃপুরবাসিনী ধরিত্রীকে জড়াইয়া থাকিবার ব্যাকুল আগ্রহ টানা-পোড়েনের মত বুনিয়া গিয়া বিচিত্র এক রসের সৃষ্টি করিয়াছে।······কবিতাটির প্রথম অংশ কবির মানস ভ্রমণের চিত্রে পূর্ণ। কবি কল্পনায় নব নব রাজ্য দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু এখনো ইহা মানস ভ্রমণ মাত্র। গৃহের তৃষ্ণা মিটিলে তবে বাহিরের প্রতি টান সত্য হইয়া দেখা দেয়। ইহাতে ঘরের টানটাই বাস্তব, বাহিরের জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষা। বিশ্বের বৈচিত্র্যের জন্য আকুলতা এবং ঘরের প্রতি বালকোচিত অসহায় ও করুণ আসক্তির সম্মিলনে সে রসসঙ্গম হইয়াছে—ইহাতেই কবিতাটির বিশেষত্ব।"

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম বসু রবীন্দ্রনাথের ক্রম-উন্মেষশীল প্রকৃতি চেতনার পটভূমিতে এই কবিতার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "মানসী কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবির বিশ্বাত্মবোধের বাসনা প্রথম প্রকাশিত হ'ল। তারপর সোনার তরী কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা'য় এই বাসনা সম্যক পরিস্ফুট হয়ে অনন্য কবিদুর্লভ সুগভীর মর্তপ্রীতির জন্ম দিয়েছে। এই বোধের স্বরূপ হ'ল প্রবল কল্পনাশক্তির রসে নিখিলের তাবৎ বস্তুর সঙ্গে কবি-আত্মার নিগূঢ় যোগ স্থাপন করা। এর ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্বকীয়। এই বিশিষ্ট কল্পনা যে কবিতাগুলিতে প্রকাশ লাভ করেছে তাদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা অবশ্য স্মরণীয়। প্রথম, এগুলির মধ্যে মর্তকে একটি জীবন্ত সত্তারূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিশ্বাতিরিক্ত অন্য কোনো সত্তা বর্তমানে স্বীকার করা হয়নি······। দ্বিতীয়, পূর্বোক্ত প্রকৃতি-প্রীতির ব্যাকুলতাই বিশ্বকে সমগ্র-ভাবে আত্মস্থ করার ব্যাকুলতা এনে দিয়েছে। তৃতীয়, এই ব্যাকুলতার ফলে পৃথিবী ও মানুষকে নির্বিচারে ভালোবাসার প্রেরণা কবির চিত্তে জেগেছে। চতুর্থ, ঐ ব্যাকুলতা অভিনব এবং বিশুদ্ধ কবিকল্পলোকের বস্তু,—দ্বৈত বা অদ্বৈত পুরাণ বা উপনিষদে কথিত প্রাগনির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বের মধ্যস্থতায় কবি বিশ্বকে গ্রহণ করছেন না।······বসুন্ধরা কবিতায় দেখা যায় জন্ম জন্মান্তরের সংস্পর্শ-ক্রমে আগত সৌহৃদ্যের বাসনা প্রবল বিরহভাবে মিলনের আগ্রহে কবিকে অস্থির করে তুলেছে।······তারপর কবি বসুন্ধরার বহু বিচিত্র প্রকৃতি

এবং জীবনযাত্রার যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং যে বিরহবিলাপে সমস্ত কবিতা মুখরিত করেছেন এখানে ভাষায় তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।……কবির এই বাসনা যে জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্য-ক্রমে আগত স্থির রোম্যান্টিক বাসনা এ সম্পর্কে আর সংশয় নেই। অথচ এই বাসনার দুই বিভিন্ন প্রকাশ তাঁর এই সময়কার কাব্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটি হচ্ছে সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা—নিরুদ্দেশ সুদূরশায়ী ও বস্তুর অতীত কোনো সৌন্দর্যসত্তার প্রতি আকর্ষণ, আর একটি বসুন্ধরার তাবৎ প্রাণের প্রকাশের প্রতি আকর্ষণ। একটি সৌন্দর্য-বিরহ অপরটি নিসর্গ-বিরহ, উভয়ই কল্পনামূলক। নিসর্গ থেকে সৌন্দর্যস্পৃহা আবার নিসর্গ থেকেই বিশ্বাত্মবোধের বাসনা—মূলতঃ এই এক রোমাণ্টিক ভাবপ্রবাহ কবির এ যুগের সমস্ত কবিতা পরিব্যাপ্ত ক'রে বিদ্যমান।"

মর্মার্থ ঃ

মানবসত্তার সহিত সম্পৃক্ত অহংবোধ, স্বাতন্ত্র্যবোধ বিস্মৃত হইয়া কবি মাতৃস্বরূপা বসুন্ধরার সহিত নিজেকে লীন করিয়া দিতে চান। স্বাতন্ত্র্য গর্বের সংকীর্ণ প্রাচীর মানুষকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। কবি সেই বিচ্ছেদ ঘুচাইয়া বিশাল বিশ্বের মৃত্তিকায়, তৃণে তরুতে প্রবাহিত প্রাণরসের মধ্যে নিজেকে বিমিশ্রিত করিয়া একান্তভাবে বিশ্বের সহিত একাত্মতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। মানবিক ভাবনা বেদনার বৃত্তটুকু কতো সংকীর্ণ। সে এক নিরানন্দ অন্ধ কারাগার। অন্যদিকে বিশ্বের বিশাল পটে জীবনধারা নানা রূপবৈচিত্র্যে আপনাকে প্রমূর্ত করিয়া তুলিতেছে। তৃণ তরুলতা সরস হইয়া ওঠে নিগূঢ় জীবনরসে, পাকা ফসলের ভারে শস্যক্ষেত্র আনমিত হইয়া আসে, নব পুষ্পদল বিচিত্র বর্ণে অপরূপ রূপ ধারণ করে, মহাসিন্ধু স্বাধীনভাবে তীরে তীরে নৃত্য করিয়া ফেরে, শৈলশৃঙ্গে তুষাররাশি শুভ্র উত্তরীয়ের মতো বিস্তীর্ণ হইয়া বিরাজ করে। এই যে পরিব্যাপ্ত বিশ্বের অপার বৈচিত্র্য, এই যে বিপুলতার মহিমা—কবি-প্রাণ মুক্তি চায় এই বিশ্বে। বিচ্ছেদ ঘুচাইয়া বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে নিজেকে লীন করিয়া দিয়া মুক্তির বিপুল আনন্দে আপ্লুত হইতে চান।

বিশ্বের সহিত এই একাত্মতার জন্য কবির এ আকুলতা বহুদিনের। অন্তরের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সত্যিই তো

মানব অস্তিত্বের গণ্ডি মুছিয়া ফেলা যায় না। বিচ্ছিন্নতা কিছুতেই ঘুচিবার নয়। তাই আপন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত জগতের কথা জানিবার জন্য অপার আগ্রহে অপরের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করিয়াছেন। বিস্তৃত অধ্যয়নের মাধ্যম জানার সীমা সম্প্রসারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃসাহসী পরিব্রাজকদের বিবরণ অবলম্বন করিয়া নিজের কল্পনাকে দূর দূরান্তরে প্রেরণ করেন। কল্পনায় জগৎকে আলিঙ্গন করিতে চান।

কত বৈচিত্র্যময় এই বিশ্ব। কোথাও পথশূন্য রৌদ্রদগ্ধ মরু, বসুন্ধরা সেখানে যেন জরাতুরা। আবার কোথাও শৈলমালাবেষ্টিত স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ সরোবর, শৈলশ্রেণীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে মেঘমালা। দূর সিন্ধুপারের মেরুদেশ, সেখানে বসুন্ধরার কৌমার্য যেন চিরন্তন। কোনো মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নাই সেখানে। রাত্রি সেখানে নিদ্রাহীন অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে। এই বিচিত্র সব ভূদৃশ্যের বর্ণনা অধ্যয়ন করিতে করিতে কবি ইহাদের স্পর্শ করেন। কোথাও বা সমুদ্রতীরে পর্বতবেষ্টিত লোকালয়, মৃদু মন্দ ছন্দে জীবনধারা বহিয়া চলিয়াছে বহুমানুষের কর্মের গতিতে। সেই লোকালয়-খানিকে হৃদয় দিয়া বেষ্টন করিবার ইচ্ছা জাগে। কঠিন পর্বত হইয়া আপনার ক্রোড়ের মধ্যে নতুন মানুষের আবাস রচনা করিতে। বিশ্বের সকল মানুষের আত্মীয়তা প্রত্যাশা করেন। উষ্ট্রদুগ্ধপায়ী আরব জাতি, তিব্বতের বিচরণ করে যে বৌদ্ধ জাতি, অশ্বারূঢ় তাতার, শিষ্টাচারী জাপান, প্রবীণ চীন—কবির অনন্ত প্রসারিত কল্পনা সকলকেই আত্মীয়রূপে, আপন রূপে পাইতে চায়। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডি হইতে মুক্ত হইয়া দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন, জীবনাবেগে উন্মুখর জীবনযাপন করিতে চান। সেই বলিষ্ঠ দেহমন কবির কাম্য যাহা আঘাত করিবার এবং আঘাত সহিবার শক্তি রাখে। অতীত লইয়া যাহার ক্ষোভ নাই, ভবিষ্যতের জন্য দুর্ভাবনা নাই। বর্তমানের তরঙ্গচূড়াকেই একমাত্র সত্য জানিয়া জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াইবার যে দুঃসাহস—সেই দুঃসাহসী জীবন তিনি কামনা করেন।

শক্তিময়তার স্বাদ লাভ করিবার আগ্রহে কবির মনে আসিয়াছে পাশবিক জীবনের প্রসঙ্গ। অরণ্যচারী ব্যাঘ্র আপনার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলশালী দেহখানি কেমন অনায়াসে বহন করে, প্রয়োজনে সমগ্র শক্তি লইয়া ক্ষিপ্র বেগে শিকারের উপরে ঝাপ দেয়—সেই পাশবিক জীবনের প্রচণ্ডতাও

কবিকে প্রলুব্ধ করে। গোটা পৃথিবীটাকেই ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধিয়া, দৃঢ় আলিঙ্গনে আপনার করিয়া নিতে চান। প্রভাতরৌদ্র যেমন সমস্ত পৃথিবীর উপরে আপনাকে বিস্তীর্ণ করিয়া দেয় কবিও সেইরূপ কম্পমান পল্লবের উপরে, কুসুমকলিকার উপরে, তৃণে শস্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়া জগতের সহিত মিলনের আনন্দ প্রত্যাশা করেন। নিদ্রার মতো নামিতে চান সারা বিশ্বের উপরে, সকল জীবের নীড়ে নীড়ে।

কবির বিস্ফারিত হৃদয়ানুভূতি শেষে একটা প্রত্যয়বোধে উপনীত হইয়াছে। বিশ্বাত্মতার আকাঙ্ক্ষা কিছু অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা নয়। অনুভব করিয়াছেন, বিশ্ব তো তাহাকে বাদ দিয়া সত্য নয়। তিনিও এই বিশ্বের অঙ্গীভূত, এই বসুন্ধরারই সন্তান। এই যে পৃথিবী সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষ হইতে সূর্যকে আবর্তন করিতেছে—কবিও পৃথিবীর অঙ্গীভূত হইয়া সূর্য পরিক্রমা করিতেছেন। কতো পরিবর্তনের ফলে জীবনের চিহ্নশূন্য এই পৃথিবীতে ধীরে ধীরে প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে। কবি বিশ্বের সহিত একাত্মতার সূত্রে নিজের মধ্যেই সেই বিবর্তনের পর্যায়গুলি অনুভব করিতেছেন। সর্বানুভূতির বশে এখন কবি নিজেকে বিশ্বের সহিত একাকার করিয়া দেখিতেছেন। তিনি এই পৃথিবীর সহিত সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষ হইতে সূর্য পরিক্রমা করিতেছেন। প্রাণহীন বিশ্বে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয়তো তৃণরূপেই হইয়াছিল। সেই আদিম প্রাণের জাগরণের স্মৃতি তাঁহাকে রোমাঞ্চিত করে। বিশ্বের সকল প্রাণরূপ কবিকে আহ্বান করে, সকলের সহিত চিরদিনের পরিচয়সূত্রটি অকস্মাৎ অনুভব করেন নিজের হৃৎস্পন্দনে, নিজের শোণিতধারায়। মানবসত্তার সীমার মধ্যে সেই বৃহৎ বিশ্বের আত্মীয়তার স্বর, তাহার আহ্বান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। এ বিরহের অবসান চান কবি। মাতা বসুন্ধরার স্নেহরসে লক্ষ কোটি প্রাণী নিয়ত পরিপুষ্টি অর্জন করিতেছে। কবি নিজেও তো সেই বসুন্ধরার সন্তান। তবে কেন বিশ্বপ্রাণীদের সহিত তাঁহার এ বিচ্ছেদ? সকলের সহিত মিলনের আনন্দ হইতে কেন তিনি বঞ্চিত থাকিবেন? আর কবির আনন্দের স্পর্শ কি বসুন্ধরাকেও আনন্দিত করিয়া তুলিবে না? সহস্র প্রাণীর সুখের, আনন্দের স্পর্শে যে বসুন্ধরার সর্বাঙ্গ রঞ্জিত হইয়া আছে কবি নিজের হৃদয়ানন্দের রঙে তাহার অঞ্চলখানি সজীব বর্ণে বিচিত্রিত করিয়া তুলিবেন। নদীজলের

কলতানে মিশিয়া যাইবে কবির গীতিস্বর, উষার আলোকে তাহার হাসি মিশিয়া যাইবে। জগতের মধ্যে কবির আনন্দ অক্ষয় হইয়া রহিবে—ইহাই তাঁহার কামনা। শতবর্ষ পরের অরণ্যমর্মরে তাঁহার প্রাণের আবেগ প্রকম্প জাগিয়া উঠিবে, মানুষের সংসারে প্রেম-প্রীতির মধ্যে তাঁহার প্রেম মিশিয়া রহিবে হয়তো। বসুন্ধরা কবিকে একেবারেই বিস্মৃত হইবেন—ইহা ভাবিতে পারেন না। যিনি পৃথিবীর সহিত নিজেকে সর্বতোভাবে একাত্ম মনে করেন—তাঁহার দৃষ্টিতে অস্তিত্বের অখণ্ডতাবোধই স্বাভাবিক। কবি অনুভব করিয়াছেন, এই পৃথিবীর সহিত বিচিত্র সম্পর্কের সূত্রে তাঁহার অস্তিত্ব অতীত বর্তমান বহিয়া ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। এ সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হইতে পারে না। তাই গভীর প্রত্যয়ের সুরে নানাভাবে এই অচ্ছেদ্য, অনিঃশেষ সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন।

মাতৃরূপা বসুন্ধরার স্নেহরসে সিঞ্চিত কবির চিত্ত চিরঅপরিতৃপ্ত। কিছুতেই মর্ত ধরণীকে ভালোবাসিয়া, তাহার ভালোবাসা পাইয়া তৃষ্ণা মেটে না। শিশু যেমন মাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আঁকড়াইয়া ধরে কবির মনোভাবও সেইরূপ। তিনি একেবারেই বসুন্ধরার অন্তরের মধ্যে আশ্রয় লাভের আকুলতা প্রকাশ করিয়া এই কবিতা শেষ করিয়াছেন।

সমালোচনা :

রবীন্দ্রনাথের মানস প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বুঝিবার পক্ষে তাঁহরে কাব্যধারায় যে কবিতাগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হয়, 'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' তাহার অন্যতম। যে কোনো কবিরই কাব্যরচনার বিষয় সাধারণভাবে বিশ্বজগৎ ও মানবজীবন। জগৎ ও জীবনের সহিত প্রত্যেক কবিকেই যোগসাধন করিতে হয়। এই যোগসাধন, বিশ্বকে নিজের মধ্যে গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা হইতে জীবনের সত্য স্বরূপ নির্ণয়ের এই পদ্ধতি প্রত্যেক কবির ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র। জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যের ফলে একই জগৎ ও জীবন বিভিন্ন কবির নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হয়। কাব্যে প্রকাশ পায় সেই বিশিষ্ট সত্যানুভূতি, সত্য উপলব্ধি। রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশের প্রাথমিক স্তরগুলিতে কবি-মানসের যে প্রয়াসটি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, জগৎ ও জীবনের সহিত নিজেকে মিলিত করিবার প্রয়াস। হৃদয় অরণ্য হইতে বাহিরে আসিয়া

জগতের সহিত নিজেকে মিলিত করিয়া জীবনোপলব্ধির পূর্ণতা সাধনের এই প্রয়াস যে সব কবিতায় বিশেষভাবে মূর্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথম উল্লেখ-যোগ্য কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। কলিকাতার সদর ষ্ট্রীটের বাড়িতে কবি তখন বাস করিতেছেন। এখানে এক সকালবেলায় অকস্মাৎ একটি নতুন উপলব্ধির আনন্দ কবিকে কিভাবে আপ্লুত করিয়াছে—'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তাহার বিবরণ আছে। বলিয়াছেন, "চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার মেঘাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।" জগতের সহিত সংযোগসূত্রটি এইভাবে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হইল। অন্তরের মধ্যে বিশ্বের আলোক প্রবেশ করিল। জগৎকে কবি প্রত্যক্ষ করিলেন আনন্দ মূর্তিতে। ব্যক্তি এবং বিশ্ব দুইই সত্য, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। প্রেমের যোগে, আনন্দের যোগে ব্যক্তি বিশ্বের সহিত মিলিত—এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার ভিত্তি। বিশ্বের সহিত নিজের অস্তিত্বকে মিলিত করিয়া দেখিবার এই দৃষ্টির জন্যই কবির নিকট সুখ দুঃখে তরঙ্গিত জীবনধারা একটা ব্যাপকতর তাৎপর্য বহন করিয়া আনে। মনে হয় এ বিশ্বে এক অনিঃশেষ আনন্দনির্ঝর বহিয়া চলিয়াছে, নিজের জীবনটার সেই ধারারই অঙ্গ। তাঁহার জীবন দর্শনের এই মূল কথাটা ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন, "জীবনে সমস্ত সুখ দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারিনে—প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না; নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্য যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহনক্ষত্র-চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে; আমার সুখ দুঃখ বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার স্থান গ্রহণ করছে। এই থেকে

কী হয়ে উঠবে জানিনে কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানিনে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্তদেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখিতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এই থেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—সেইজন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়?" বিচ্ছিন্নতা নয়, একাকীত্বের বেদনা নয়, বিশ্বচরাচরের সহিত ব্যক্তি-সত্তার এই সজীব, নিয়ত বিবর্তনশীল, সক্রিয় যোগই রবীন্দ্রনাথের আনন্দ। ইহা বিশ্বের সহিত ব্যক্তির পূর্ণ সামঞ্জস্যের উপলব্ধি। ইহাকে কবি বিশ্বানুভূতি, সর্বানুভূতি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হইতে উপলব্ধির সূচনা হইয়াছিল, মানসী কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় এই উপলব্ধির স্বরূপ স্পষ্টতর হইয়া ওঠে, সোনার তরী কাব্যের বসুন্ধরায় ইহার পূর্ণ পরিণাম। এই দীর্ঘ কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সর্বানুভূতি বা বিশ্বাত্মবোধ বিকাশের স্তরগুলি যেমন কাব্যায়ত করিয়াছেন তেমনই পরিপূর্ণ উপলব্ধির স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতি কবির নিকট জড়স্বরূপ নয়, অনন্ত বৈচিত্র্যে পূর্ণ প্রাণময়। তৃণলতা হইতে মানব অবধি সকল সপ্রাণিতের জননী, তাহাতেই সকলের জন্ম। বসুন্ধরাকে কবি তাই মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করিয়াছেন। ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যগর্ব ঘুচাইয়া কবি ওই মাতৃ অঙ্কে লীন হইতে চান। এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের ভিত্তিতে সঠিক সবল, সর্বাতিশায়ী কল্পনারূপে। নিজের সহিত বিশ্বের ভেদ মানেন না বলিয়াই কবি এই বিশ্বের বিবর্তনের স্তরগুলি নিজের মধ্যেই সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। বসুন্ধরা কবিতায় যে স্থানে (১৪৮ পঙক্তি হইতে ১৮৩ পঙক্তি পর্যন্ত) এই একাত্মার ভাবটুকু বাণীবদ্ধ হইয়াছে—সেই অংশের কাব্যিক অভিব্যক্তি অতুলনীয়। যেমন এইসব পঙক্তি :

‘অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি’ আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফলগন্ধরেণু।”

নিজেরই বিস্ফারিত অস্তিত্বের মধ্যে যেন সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন। কিশলয় উদ্‌গম, ফুল ফোটা, পল্লবমর্মর—এই প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি যেন কবির নিজেরই শারীরিক অনুভূতির অঙ্গীভূত। ইহা ঠিক সাধারণ প্রকৃতি-প্রীতি নয়। বিশ্বপ্রকৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া একাত্মার আনন্দিত অনুভূতি। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার বৈশিষ্ট্য।

কবিতাটি প্রবহমান পয়ার ছন্দে লিখিত। কোথাও দশ পঙক্তির শেষে পূর্ণ যতি ব্যবহৃত হইয়াছে। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহারও প্রচুর। হৃদয়াবেগ একটা বাধাবন্ধহীন প্রবাহের মত বহিয়া গিয়াছে এই কবিতায়। যতি চিহ্নের বিরলতার ইহাই কারণ। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ক্রমিক ব্যবহার সাধারণতঃ একঘেয়েমির সৃষ্টি করে। কিন্তু ‘বসুন্ধরা’ কবিতায় অসমাপিকা ক্রিয়াপদ প্রসারণশীল হৃদয়ানুভূতির সহিত সুসঙ্গত ভাষাশৈলী নির্মাণের অপরিহার্য উপকরণরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন এই অংশে:

“হিল্লোলিয়া মর্মরিযা,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, চমকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে…”

‘সোনার তরী’ কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষার পূর্ণ সৌন্দর্য বিকশিত। উপমার ঐশ্বর্যে, চিত্ররূপময়তা পরিস্ফুট করিবার নৈপুণ্যে, গভীর অনুভূতির লীলা ভাষায় ধরিয়া দিবার অনায়াস দক্ষতায় বসুন্ধরা’ কবিতার ভাষা আদর্শস্থানীয়।

কবিতাটির ভাব ও রূপগত সৌন্দর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “দার্শনিক ভাব-সংস্কার কবি-কল্পনায় রূপান্তরিত হইয়া, কাব্যানুভূতিতে গভীর প্রাণস্পন্দন জাগাইয়া অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যাভিপ্রায় যে কত নিগূঢ় রূপ ধারণ করিতে পারে, কত বিচিত্ররূপে সৌন্দর্য সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতে পারে, কিরূপ

বেগবান প্রাণহিল্লোলে আপনার জীবনীশক্তির পরিচয় দিতে পারে, এই কবিতায় তাহার এক অভাবনীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে, কবি বসুন্ধরার বিচিত্র জীবনধারার সহিত অব্যবহিত সংস্পর্শের আকৃতি জানাইয়া উহার সূক্ষ্মতর, নিগূঢ় জীবনরসসঞ্চারে আপনাকে বিলীন করিতে চাহিয়াছেন।.........তাহার পর কবি বিভিন্ন দেশের অসংখ্যবিধ চিত্রসৌন্দর্য জীবনছন্দের অন্তরে অনুপ্রবেশাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।...এমন কি হিংস্র শ্বাপদও উহার প্রাণোচ্ছাসমহিমায় কবির অনুচিকীর্ষা জাগাইয়াছে।... ..পৃথিবীর সহিত একাত্ম মিলনস্পৃহার পিছনে কবির যে যুগযুগান্তরের পূর্বস্মৃতি সক্রিয় আছে তাহা অকস্মাৎ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে।......কিন্তু প্রকৃত কবি কখনো নিষ্ক্রিয় দানগ্রহিতারূপে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি বহির্জগতের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করেন তাহার প্রতিদানস্বরূপ নিজস্ব অনুভূতির কিছুটা প্রত্যর্পণ করিতে চাহেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কবিজনোচিত মনোবৃত্তি লইয়াই প্রকৃতির এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যমেলায় নিজ কল্পনার অতিরিক্ত ভাবসম্পদ ও রূপের চমক সংযোজনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।......তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে প্রকৃতির রূপ ও মানুষের আবেগ তাঁহার কবিমনের বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যবোধ ও অনুভূতি-গভীরতায় মধুরতম হইবে ও ভবিষ্যৎ যুগের নিকট গাঢ়তর আবেদন বহন করিবে। কবির জীবন পিপাসা এখনও অতৃপ্ত; পৃথিবীর সহিত আরও নিবিড়তর সম্পর্কে তিনি ঘনিষ্ঠ হইতে ব্যাকুল। তাই পৃথিবীর প্রাণশক্তির গোপন উৎস, তাহার লীলা—অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকারের অন্তিম আবেদনের সহিত তিনি কবিতা শেষ করিয়াছেন।"

টীকা, শব্দার্থ ও মন্তব্য

[**প্রথম স্তবক**] **আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে**—যাবতীয় বস্তু এবং জীব এক অর্থে বিশ্বের অঙ্গীভূত। কিন্তু মানুষ আপন স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির বশে নিজেকে বিশ্ব হইতে পৃথক মনে করে। ব্যক্তিসত্তার গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ এই স্বাতন্ত্র্য কবি ভুলিতে চাহেন। সর্বতোভাবে বিশ্বের সহিত একাত্মতা কামনা করেন। তুলনীয়ঃ

"মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।"

দিগ্বিদিক আপনারে..........আনন্দের মতো'—বিশ্বের সহিত মিলন আনন্দের মিলন। এই মিলনে বিশ্বের বিরাট স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব হইবে। বসন্ত যেমন ধরিত্রীর মর্মের মধ্যে নতুন প্রাণের সাড়া জাগাইয়া তোলে, বসন্তের আগমনে ধরিত্রী যেমন ফুল্ল-কুসুমিত হইয়া ওঠে, কবি সেই আনন্দ জাগানো বসন্তের মতো বসুন্ধরার মর্মের মধ্যে নিজেকে মিশাইয়া চরিতার্থ হইতে চাহিতেছেন। **বিদারিয়া এ বক্ষপঞ্জর .... অন্ধ কারাগার**—এখানে বক্ষ-পঞ্জর বিদারণ, পাষাণপ্রাচীর ভাঙিয়া ফেলা, অন্ধ কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসা—এই কথাগুলি ব্যক্তিসত্তার গণ্ডির বাহিরে আসার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছে। স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির বশে কবি এতদিন নিজেকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্যগর্ব যেন একটা প্রাচীরের মতো বৃহৎ বিশ্বের মুক্ত অঙ্গন হইতে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বিশ্বের সহিত একাত্মতার প্রবল আবেগ বাধাগুলি চূর্ণ করিয়া কবিকে বিশ্বের মধ্যে মুক্ত করিয়া দিবে। অনুরূপ অনুভূতির প্রকাশ দেখা গিয়াছিল বহুপূর্বে লেখা 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' কবিতায়, যেখানে অবরুদ্ধ নির্ঝরের নিষ্ক্রমণের রূপকে কবির নিজেরই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র আবেগসহ ভাষায় প্রকাশিত :

"থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
... ...
কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তার বাঁধন কেন ?
ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্।"

জগতের সহিত বিচ্ছেদজনিত বেদনাই নিরানন্দতার কারণ, এইজন্যই লিয়াছেন, 'আপনার নিরানন্দ অন্ধ কারাগার'। **হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া, কম্পিয়া.....শিহরিয়া**—একাদিক্রমে এখানে অনেকগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া

ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপ শব্দ ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবল আবেগ-প্রবাহ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহারে। **শাদ্বলে**—শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত স্থান। **শৈবালে শাদ্বলে……নিঃশব্দ নিভৃতে**—এই অংশটিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে চিত্রটি আঁকা হইয়াছে তাহার মধ্যে একদিকে প্রকৃতির প্রাণময়তা যেমন মূর্ত তেমনি সকল সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকেই নিঃশেষে মিলিত করিয়া দিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত। তৃণে, শস্যে, বৃক্ষশাখায়, শস্যের ভারে আনমিত শস্যক্ষেত্রে সর্বত্র প্রাণের সজীবতা সৌন্দর্য সঞ্চার করিতেছে। কবি সেই প্রাণশক্তির সহিত নিজেকে মিলাইয়া দিয়া বিচিত্ররূপে, অনন্ত সৌন্দর্যে বিশ্বের মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করিতে চাহিতেছেন। বলিতেছেন, পাপড়িগুলি বর্ণে বিচিত্রিত করিয়া ফুলগুলি গন্ধে মধুতে পূর্ণ করিয়া তুলি; মহাসমুদ্রের নীল জলরাশির সঙ্গে মিলিয়া গিয়া তীরে তীরে নৃত্য করিয়া ফিরি; সেই সমুদ্র গর্জনই যেন প্রকৃতির ভাষা, সেই ভাষা দিক দিগন্তরে প্রসারিত করিয়া দেই; উত্তুঙ্গ নির্জন-পর্বত-শিখরের উপরে শুভ্র তুষারের মতো নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দেই।

[**দ্বিতীয় স্তবক**] **সিঞ্চিতে তোমায়**—তোমাকে অর্থাৎ বসুন্ধরাকে সেচন করিতে। কবির হৃদয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন হইতে সঞ্চিত হইয়াছে বিশ্বের সহিত একাত্মতার আকাঙ্ক্ষা। আজ সেই আকাঙ্ক্ষা যেন পরিপূর্ণ হইয়া উদ্বেল উদ্দাম প্রবাহে ধরিত্রীর উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছে। **ব্যথিত সে বাসনারে**—বিশ্বজগতের সহিত নিজের বিচ্ছিন্নতাবোধের ফলেই বেদনাবোধের জন্ম। 'ব্যথিত বাসনা' অর্থে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তার গণ্ডির অবরোধ হইতে বাহির হইয়া বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে হইবে। **বসি শুধু গৃহকোণে লুব্ধচিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন**—বিশ্বকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা যতই তীব্র হোক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমগ্র জগৎকে জানা সম্ভব নয়। কবি সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দৈন্য মোচনের জন্য অপরের ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করেন। ঠিক এইরূপ উক্তি আছে 'ঐক্যতান' কবিতায়। তুলনীয়:

"বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।"

[তৃতীয় স্তবক] **মহাপিপাসার রঙ্গভূমি**—মরুভূমি। **দিগন্ত বিস্তৃত ·····তপ্তদেহ**—ধরিত্রীর তাপিত মূর্তি চোখে পড়ে মরুভূমিতে। **খণ্ড মেঘগণ······শিখর আঁকড়ি**—উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে সংলগ্ন মেঘগুলি দেখিয়া মনে হয় উহারা যেন শিশুর মতো মায়ের বুকে সংলগ্ন হইয়া স্তন্যপান করিতেছে। **নিশ্চল নিষেধ**—কুমারসম্ভব কাব্যে বর্ণনা আছে, মহাদেবের তপোবন-দ্বারে দণ্ডায়মান দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি মুখের উপর রাখিয়া চপলতা প্রকাশ করিতেছে। হয়তো এই প্রসঙ্গের স্মৃতি হইতেই রবীন্দ্রনাথ এখানে সমুন্নত পর্বতশিখরগুলিকে তপোবন-দ্বারের নিশ্চল-নিষেধরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। **যেখানে লয়েছে ধরা অনন্তকুমারীব্রত**—মেরুপ্রদেশের বর্ণনা। এখানে কোন মানুষের পদপাত ঘটে নাই, ধরিত্রী যেন এখানে কুমারীর মতো। **রাত্রি আসে, ঘুমবার কেহ নাই**—মেরু প্রদেশের উপরেও রাত্রি নামে। কিন্তু প্রাণীহীন এই প্রদেশে কাহারো চোখে নিদ্রা নামে না। **শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো**—ইহাও মেরু প্রদেশেরই বর্ণনা। নিদ্রাতন্দ্রাহীন মেরুপ্রদেশ যেন সেই জননী যাহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। শোকে তাহার নয়ন হইতে নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে। একটু আগে মেরু প্রদেশকে অনন্তকুমারীব্রতধারিণী বলিয়াছেন, এখানে আবার 'মৃতপুত্রা' বলিতেছেন। 'কুমারী' এবং 'মৃতপুত্রা' শব্দদুটি ব্যবহারে কল্পনার অসঙ্গতি ঘটিয়াছে মনে হয়। **নদীস্রোতোনীরে আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তারে, ইত্যাদি**—তুলনীয় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়:

"আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া
দিবরে পরাণ ঢালি।"

ইচ্ছা করে মনে মনে, স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে—রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশ্বের সহিত একাত্মতার অর্থ শুধু প্রকৃতির সহিত একাত্মতা নয়। বিশ্বের বুকে আশ্রিত বিচিত্র মানবজাতির সকলের সহিত তিনি ঐকাত্ম্য বোধ করেন। এই অনুভূতির প্রকাশের সূত্রে আলোচ্য অংশে কবি আরব, তিব্বতী, পারসিক, তাতার, জাপানী, চীনা প্রভৃতি জাতির নামও উল্লেখ করিয়াছেন। **অক্লুগ্ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা**— তুলনীয়, মানসী কাব্যের 'দুরন্ত আশা' কবিতা :

"ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন।
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।"

আলোচ্য অংশে কবি সভ্যতার কৃত্রিমতা হইতে মুক্ত সকল সংস্কারহীন এক মুক্ত জীবনের কল্পনা করিয়াছেন। এই জীবন প্রাণশক্তির প্রচণ্ডতায় অকুতোভয়। অতীতের প্রতি চাহিয়া বৃথা ক্ষোভ বা ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তায় কালক্ষয় না করিয়া একান্তভাবে বর্তমানকেই দৃঢ়বলে আলিঙ্গন করে। সফলতা বিফলতার হিসাব মেলানো আর ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের ভারবহন এই জীবনের ধর্ম নয়। বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জীবনের এই প্রচণ্ডতার জয়গান করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে বাঙালী জীবনের গতানুগতিকতা

এবং সংকীর্ণতার প্রতি কবির মনে চিরদিনই একটা ঘৃণা ও বিদ্রূপের ভাব ছিল। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই তিনি সবসংস্কারমুক্ত স্বাধীন এমন কি উচ্ছৃঙ্খল জীবনকেও কখনো কখনো বরণীয় মনে করিয়াছেন। 'বর্ষশেষ' নামক বিখ্যাত কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত অংশটি কবির এই মনোভাব বুঝিবার পক্ষে সহায়ক :

> "শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,
> শরমের ডালি,
> নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
> ধূমাঙ্কিত কালি,
> লাভক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ
> কলহ সংশয়—
> সহেনা সহেনা আর জীবনের খণ্ড খণ্ড করি
> দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।"

ইহার সহিত 'বসুন্ধরা' কবিতার

> "উচ্ছৃঙ্খল সে-জীবন সেও ভালোবাসি ;
> কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণ ঝড়ে
> ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
> লঘুতরীসম"

ইত্যাদি পঙক্তি তুলনা করিলেই কবির মনোভাব স্পষ্ট হইয়া আসে। **নাহি চিন্তাজ্বর**—সভ্যতার স্তরে উপনীত মানুষ নানা জটিল ভাবনার দ্বন্দ্বে পীড়িত। এই চিন্তাজনিত ক্লেশকে কবি এখানে 'চিন্তাজ্বর' বলিয়াছেন। আদিম বর্বর মানুষ চিন্তাজনিত ক্লেশ হইতে মুক্ত। তাহাদের জীবনে সমস্যা কম। **বর্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়, ইত্যাদি**—প্রতিপদে লাভক্ষতির হিসাব মিলাইতে বলা এবং জীবনের সফলতা বিফলতার ভাবনায় পীড়িত হওয়া আমাদের স্বভাব। তাই আমরা অতীতের বিফলতার জন্য ক্ষোভ করি, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুরাশা পোষণ করি। কবি এই অভ্যস্ত জীবনের ছক হইতে মুক্তি কামনা করেন। প্রবল বীর্যে বর্তমানের সম্মুখীন হওয়া এবং যাহা উপস্থিত সত্য তাহাকেই সানন্দে স্বীকার করিয়া লইবার অক্লান্ত উৎসাহ

তাঁহার কাম্য। বর্তমানকে তরঙ্গচূড়ার সহিত উপমায় এবং তরঙ্গচূড়ার উপরে নৃত্য করিয়া চলিবার আকাঙ্ক্ষায় এক ধরণের বেপরোয়া মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অভ্যাসজীর্ণ প্রাত্যহিকতায় যে ক্লান্তি আনে তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এইসব উক্তির তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে। **সেই প্রাণঝড়ে ছুটিয়া……লঘুতরীসম**—সমুদ্র ও ঝড়ের উপমায় প্রচণ্ডতার দিকটিই অভিব্যক্ত। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে সাহসী নাবিক যেমন লঘুভার নৌকাখানি ভরাপালে বাহিয়া যায়, কবি সেইভাবে জীবন-তরণী বাহিতে চান।

[**চতুর্থ স্তবক**] **অটবী**—অরণ্য। **দেহ দীপ্তোজ্জ্বল অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল বজ্রের মতন**—অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উপমা। অরণ্যের অন্ধকারে বিচরণশীল বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল দেহধারী প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন ব্যাঘ্র যেন মেঘের অন্তরালবর্তী অগ্নিগর্ভ বজ্র। **অনায়াস সে মহিমা……লভি তার স্বাদ**—বন্যপ্রাণী বাঘের শক্তি, তাহার হিংস্রতা—সে প্রকৃতির শক্তিরই এক সহজ প্রকাশ। এই হিংস্রতায় কোনো কুটিলতা নাই বলিয়াই ইহার মহিমা কবিকে আকৃষ্ট করে। অরণ্যচারী শ্বাপদ জীবনের স্বাদ লাভ করিবার জন্য কবির এ আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বে অভিব্যক্ত প্রাণের সকল বৈচিত্র্যের সহিত একাত্মতার বাসনা প্রকাশ পায়। ঠিক ইহার পরের পঙক্তিগুলিতে এই মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে :

“পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দ-মদিরাধারা নব নব স্রোতে।”

[**পঞ্চম স্তবক**] **সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ**—‘মেখলা’ শব্দের অর্থ কটিভূষণ। কটিভূষণ যেমন কটিদেশ বেষ্টন করিয়া থাকে সমুদ্র তেমনি পৃথিবীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছে। তাই সমুদ্রকে কবি পৃথিবীর মেখলা বলিয়াছেন। **প্রভাত-রৌদ্রের মতো**—সকালবেলায় নবোদিত সূর্যের আলো যেমন বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়ে, অরণ্যে পর্বতে তরুপল্লবে কুসুমকলিকায় তৃণের উপরে ছড়ানো সেই আলোর মতো কবি নিজেকে বিকীর্ণ করিয়া দিতে চান। **রজনীতে চুপে চুপে……সুস্নিগ্ধ আঁধারে**—বিশ্বে নিদ্রার সঞ্চার সম্পর্কিত এই পঙক্তি কয়েকটি ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশের সহিত তুলনীয় :

"যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে
ধরণী লইত টানি শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষ-'পরে ; দুঃখশ্রম ভুলি
ঘুমাত অসংখ্য জীব—জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক—
মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটি জীবস্পর্শসুখ
কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?"

এখানে অবশ্য কবির বক্তব্য ভিন্ন। নিজেই তিনি বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত হইতে চান। নিদ্রা যেমনভাবে সমস্ত জগৎকে আবিষ্ট করে তেমনি করিয়া তিনি বিশ্বকে আবিষ্ট করিতে চাহিতেছেন।

[ষষ্ঠ স্তবক] **আমার পৃথিবী তুমি……পত্রফুলফলগন্ধরেণু**—ইতিপূর্বে মর্ত পৃথিবীর সহিত একাত্মতার আকাঙ্ক্ষার কথা বলিয়াছেন। এখানে কবি সেই ঐকাত্ম্য উপলব্ধি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি পৃথিবীর অঙ্গীভূত, পৃথিবী হইতে ভিন্ন নন। সুতরাং পৃথিবীর সহিত একাত্ম হইয়া তিনি সূর্য-পরিক্রমা করিয়া ফিরিতেছেন। বিস্ফারিত কল্পনায় নিজেকে জগতের সহিত একাকার রূপে ভাবিতে পারেন বলিয়াই অনুভব করেন "আমার মাঝারে/উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে ফুটিয়াছে।" তুলনীয়ঃ "এক সময়ে যখন আমি পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল-স্থল-পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে থাকতুম—তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।" এই মনোভাব বসুন্ধরা কবিতার আলোচ্য অংশ এবং ইহার পরবর্তী পঙক্তিগুলিতে অপূর্ব কাব্যভাষায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। **সেথায় ফিরায়ে লহ মোরে আরবার**—মানব অস্তিত্বের গণ্ডি হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বের সহিত লীন হইবার আকাঙ্ক্ষা। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কবি নিজের বর্তমান মানব অস্তিত্বকে একটা

বিবর্তনধারার পরিণামরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের উপরে ভিত্তি করিয়া কবির এ ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে। সূর্য হইতে জলন্ত বাষ্পপিণ্ডরূপে পৃথিবীর জন্ম। তাহার পর বিবর্তনের ধারায় পৃথিবীতে জল স্থল তৃণ, তরু এবং জীব উদ্ভূত হইয়াছে। এই বিবর্তনের চূড়ান্ত পরিণাম চেতনা-সমৃদ্ধ 'মানব'। মানুষ হিসাবে আমরা আমাদের অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যকে বড়ো করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের দেহের প্রাণকোষগুলি অতীতের সুদীর্ঘ বিবর্তনের ধারার স্মৃতি বহন করিতেছে। এইদিক হইতে দেখিলে পৃথিবীর সহিত, ধূলিমাটি তৃণ তরু এবং ইতর প্রাণীদের সহিত আমাদের অস্তিত্বের যোগ ধরা পড়ে। কবি এই একাত্মতাকেই বড়ো করিয়া দেখিতেছেন এবং মানব অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য গর্ব দূর করিয়া পুনরায় সেই ঐকাত্ম্য অনুভব করিতে চাহিতেছেন। **মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী……বিষাদ-ব্যাকুল**—বিশ্বের সহিত একাত্মতার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা এখানে অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। কবির ব্যক্তিসত্তা একদিকে, অপরদিকে রহিয়াছে এই বিশাল বিশ্বজগৎ। অনুভব করিতেছেন, একদিন তিনি এই পৃথিবীতে মৃত্তিকা-রূপে তৃণ-তরুরূপে একাকার হইয়াছিলেন। আজ মানব অস্তিত্বের স্তরে যেন সেই একাত্মতায় ছেদ রচিত হইয়াছে। তাই বিশ্বের প্রতি চাহিয়া বিরহ বোধ করেন, বিচ্ছেদ বেদনা তাঁহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। নিজেকে এই বিশ্বে প্রবাসী মনে হয়। সমগ্র বিশ্বকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার আকুলতা ব্যাহত হয় বলিয়াই বিষণ্ন বোধ করেন। একজন মানুষের পক্ষে বাস্তবভাবে সমগ্র বিশ্বকে নিজের অঙ্গীভূত করা সম্ভব নয়। কিন্তু মানব অস্তিত্বের পূর্বে, ভিন্নরূপে, পৃথিবীর অঙ্গীভূত ছিলেন—মিলনে তখন কোনো বাধা ছিল না। সেই অদ্বৈত মিলনের স্মৃতি আজিকার দ্বৈত ('আমি' এবং 'বিশ্ব'—এই দুই) বোধের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া বিশ্বের সহিত সর্বতোভাবে মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। **আমারে ফিরায়ে লহ সেই সর্বমাঝে**—তুলনীয় :

"হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা,

যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।"

দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু—অভীষ্ট ফলদানকারী গাভীকে বলা হয় কল্পধেনু। এখানে বসুন্ধরাকে শ্যাম কল্পধেনু বলিয়াছেন। বসুন্ধরাই তৃণ-তরুলতা ও সকল প্রাণীর প্রাণশক্তি প্রদায়িনী। 'তোমারে সমস্ত দিকে করিছে দোহন'—বসুন্ধরার প্রাণরস দোহন করিয়া অর্থাৎ তাহারই প্রাণরসে সঞ্জীবিত হইয়া সকলে প্রাণ ধারণ করিতেছে। **আমার আনন্দ লয়ে হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার?**—"প্রকৃতি কবি কখনও নিষ্ক্রিয় দানগ্রহীতারূপে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি বহির্জগতের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করেন তাহার প্রতিদানস্বরূপ নিজস্ব অনুভূতির কিছুটা প্রত্যর্পণ করিতে চাহেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কবিজনোচিত মনোবৃত্তি লইয়াই প্রকৃতির এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যমেলায় নিজ কল্পনার অতিরিক্ত ভাবসম্পদ ও রূপের চমক সংযোজনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।......তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে প্রকৃতির রূপ ও মানুষের আবেগ তাঁহার কবিমনের বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যবোধ ও অনুভূতির গভীরতায় মধুরতর হইবে ও ভবিষ্যৎ যুগের নিকট গাঢ়তর আবেদন বহন করিবে" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। সোনার তরী কাব্যের 'পুরস্কার' কবিতায় কবির এই মনোভাবের প্রকাশ আছে :

"অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিচরণ,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।
....
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাস-পরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।

সংসার মাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তারপরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।"

আজ শতবর্ষ পরে এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে কাঁপিবে না আমার পরান?—জগতে কিছুই বিনষ্ট হয় না। কবি নিজের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যে অতীত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি সঞ্চিত আছে অনুভব করেন। অতীতের সহিত বর্তমানের নিরবচ্ছিন্ন এই যোগ যদি সত্য হয় তবে বর্তমানেই সবকিছু শেষ হইতে পারে না। এই বর্তমানের সহিত ভবিষ্যৎ কোনোভাবে যোগ রক্ষা করা চলিবে—ইহাই কবির বিশ্বাস। তাই মনে করেন, আজিকার আনন্দ, আজিকার উপলব্ধি সূক্ষ্মতর স্মৃতিরূপে এই জগতেই ধরা থাকিবে। ভবিষ্যতের সেই পৃথিবীর অরণ্যের পল্লব কম্পনে কবির প্রাণাবেগ মিশিয়া থাকিবে, মানব সংসারের হাসি খেলায় ভালোবাসায় কবির হৃদয়ানুভূতি সঞ্চারিত রহিবে। অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে:

"যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
....
তখন কে বলে গো, সেই প্রভাতে নেই আমি?
সকল খেলায় করবে খেলা এই-আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই-আমি।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে॥"

কবির এই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা বহু কবিতায় এবং গানে ফিরিয়া আসিয়াছে। **ছেড়ে দিবে তুমি আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি**—এই প্রশ্নের ভঙ্গির মধ্যেই উত্তরের আভাস আছে। মানবজীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

পৃথিবীর সহিত, মাতা বসুন্ধরার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইতে পারে না। হয়তো ভিন্নরূপে, ভিন্ন আকৃতিতে এই বসুন্ধরার সহিত সংলগ্ন হইয়া বিরাজ করিবেন। বসুন্ধরার সহিত এই জন্মান্তরীণ সম্পর্কের ভাব রবীন্দ্রনাথের মর্তপ্রীতি ও প্রকৃতিচেতনার একটি বিশেষ দিক। 'কীট পশু পাখি তরুগুল্ম লতা' যে রূপেই হোক বারবার নানারূপে এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবেন। রূপ হইতে রূপান্তরের মধ্য দিয়া অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বধারা বহিয়া চলিবে। এই আশ্বাস ও ভরসার বাহির সত্তা বসুন্ধরার সহিত নিবিড় বন্ধনে সংযুক্ত। **জননী, লহগো মোরে·····রাখিয়ো না দূরে**—কবিতাটির এই শেষ কয়েকটি পঙক্তিতে মাতৃসমা বসুন্ধরার বক্ষে লীন হইয়া তাহার স্নেহসুধারস আস্বাদনের আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

ব্যাখ্যা

[এক]

ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো ; বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার— [প্রথম স্তবক]

আলোচ্য অংশটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বসুন্ধরা' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনার বৈশিষ্ট্য বুঝিবার পক্ষে বসুন্ধরা একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা।

এখানে কবির যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ঠিক প্রকৃতির সৌন্দর্যমুগ্ধতা নয়। ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য বিশ্বের সহিত বিচ্ছেদ রচনা করে। বাহিরের বিশাল বিশ্বের সহিত নিজের সম্পর্ক রচনার উপায় অন্বেষণ করিতে হয় সকল কবিকেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই সম্পর্ক একটা বিশেষ তাৎপর্য-সম্পন্ন। তাঁহার প্রকৃতিচেতনাকে বলা যায় বিশ্বাত্মবোধ। কবি আপন মানব-অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ঘুচাইয়া সর্বতোভাবে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঐকাত্ম্য

কামনা করিয়াছেন। চরাচরে যাহা কিছু সপ্রাণিত তাহা বসুন্ধরারই সৃষ্টি—সেই অর্থে বসুন্ধরা আদিমাতা। কবি তাই বসুন্ধরাকে মাতৃসম্বোধন করেন। তারপরেই প্রকাশ পাইয়াছে সেই আদি জননীর অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে লীন করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা। জগতে নতুন প্রাণসৃষ্টির শক্তিরূপে বসন্ত যেমন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আপনাকে সঞ্চারিত করিয়া দেয় কবিও সেইভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া বিশ্বের সহিত সর্বাত্মক মিলন কামনা করেন। মানব-অস্তিত্বের অহংকার বিশ্বের সহিত বিচ্ছেদ রচনা করে। নিজেকে মনে হয় একাকীত্বের মধ্যে নির্বাসিত পাষাণবদ্ধ অন্ধকারাগারে বন্দী। এই বিচ্ছেদ প্রাণের আনন্দ ম্লান করিয়া আনে। কবির মনে বিরহ ব্যাকুলতা জাগিতেছে। তাঁহার সমস্ত সত্তা একাগ্র আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বের সহিত মিলন প্রত্যাশী। স্বতন্ত্র অস্তিত্বের গণ্ডি-ঘেরা ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মুক্তির বাসনা, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঐকাত্ম্যের আকাঙ্ক্ষাই এই কাব্যাংশের ভাববস্তু। এই মনোভাবকে বলা যাইতে পারে বিশ্বাত্মবোধ। এই বিশ্বাত্মবোধই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার বৈশিষ্ট্য।

[দুই] বসি শুধু গৃহকোণে
লুব্ধ চিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন,
দেশে দেশান্তরে কারা করিছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে। [দ্বিতীয় স্তবক]
[ক. বি. ১৯৭১]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্যের অন্তর্গত 'বসুন্ধরা' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশ্বের সহিত ঐকাত্ম্য ভাবনায় কবি মনের বিচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে এই কবিতার বিভিন্ন অংশে। বিশাল এ বিশ্ব। এই বহুধাবিস্তৃত বিশ্বের সর্বত্র যাওয়া, সকল রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কবি জানেন, শত প্রয়াস সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বে পরিভ্রমণ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সারা পৃথিবীকে জানার বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। তাই গৃহকোণে

বসিয়া ভ্রমণকাহিনী অধ্যয়ন করেন। অপরিজ্ঞাত ভূখণ্ডে যাহারা ভ্রমণ করিয়াছে তাহাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠ করিয়া কবি নিজের অভিজ্ঞতার দৈন্য মোচন করেন। সেইসব পরিব্রাজকদের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া কবি কল্পনায় পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য আস্বাদন করেন। বাস্তবতঃ পৃথিবী বেষ্টন করা সম্ভব নয়, কিন্তু কবির উধাও কল্পনা সর্বত্রগামী। কল্পনায় তিনি বেষ্টন করেন সমগ্র পৃথিবীকে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ এক আফ্রিকা ভিন্ন সকল মহাদেশে বহুবার ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য এবং বিচিত্র মানব সমাজের পরিচয় লাভের কৌতূহলই তাঁহার এই উদ্যোগের প্রেরণা ছিল। বসুন্ধরা কবিতার আলোচ্য অংশে কবির মনের এই বিশেষ দিকটি প্রকাশ পাইয়াছে।

[**তিন**] ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি—
উচ্ছৃঙ্খল সে-জীবন সেও ভালোবাসী ;
কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
লঘুতরীসম। [তৃতীয় স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্যের অন্তর্গত 'বসুন্ধরা' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই কবিতায় একদিকে যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মতার আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে তেমনই অন্যদিকে প্রকাশিত হইয়াছে বিশ্বমানবের সহিত ঐকাত্ম্যবোধ। কবি বলিয়াছেন, "ইচ্ছা করে মনে মনে, স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে দেশে দেশান্তরে।" পৃথিবীর দেশে দেশে কত বিচিত্র জাতির বাস, কত বিচিত্র তাহাদের জীবন-ধারা। সেই অপরিচিত মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পরিচয় লাভের জন্য অদম্য আগ্রহ জাগে কবির মনে। শুধু বাহিরের পরিচয় নয়, তাহাদের একজন হইয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়া অপরিজ্ঞাত মানবগোষ্ঠীর জীবন-স্বরূপ অঙ্গীকার করিতে চান। কবির মন টানে, এমন কি দুর্দান্ত অসভ্য

মানবগোষ্ঠীর বর্বর জীবনের উদ্দামতা। আলোচ্য অংশে বিশেষভাবে এই বর্বর জীবনের উদ্দামতার প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

কবির এই মনোভাবের মূলে আছে আমাদের সঙ্কীর্ণতা ও নিয়মবদ্ধতায় স্তিমিত জীবনের ক্লান্তিজনিত প্রতিক্রিয়া। এই মনোভাব হইতেই কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন :

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!"

এখানেও এই একই মনোভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। কৃত্রিম আচার অনুষ্ঠান এবং নিয়মবন্ধনে যাহাদের জীবন পঙ্গু হয় নাই, বসুন্ধরার সেই সব বর্বর সন্তানদের সবল প্রাণশক্তি কবিকে মুগ্ধ করে। তাহারা অতীতের বিফলতা বা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা লইয়া দুশ্চিন্তা করিতে বসে না। আসন্ন বর্তমানের প্রতিই তাহাদের সকল লক্ষ্য একাগ্রভাবে নিবিষ্ট। লাভ ক্ষতির হিসাব মিলাইতে বসার অবকাশ নাই তাহাদের জীবনের। বর্তমানের হাত হইতে জীবনের প্রাপ্য ছিনাইয়া লইতে পারাতেই তাহারা কৃতার্থ। উচ্চাশা নাই, জটিল ভাবনাজনিত কোনো পীড়া নাই, এমন যে আদিম জীবনের সারল্য ও বলিষ্ঠতা--ইহা সভ্যতার নিয়মশৃঙ্খলার বন্ধনপীড়িত কবিকে সুতীব্র-ভাবে আকর্ষণ করে। সভ্যতার সকল প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া কবি ওই প্রচণ্ড জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে চান। কামনা করেন, জীবন হোক ভরাপালে ছুটিয়া চলা একখানা লঘুতরীর মতো। ভয় ভাবনা তুচ্ছ করিয়া পূর্ণ প্রাণের ঝোড়ো হাওয়ায় জীবন তরণী ভাসাইয়া চলার আনন্দ কবির অভিপ্রেত।

[চার]

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে

ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। [ষষ্ঠ স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্যের অন্তর্গত 'বসুন্ধরা' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মতার আকাঙ্ক্ষা এই কবিতার বিষয়। কবিতাটির প্রথমদিকে কবির ব্যক্তিসত্তা এবং বিশ্বের মধ্যে বিচ্ছেদের অনুভূতিই তীব্র, কিন্তু আলোচ্য অংশ হইতে কবির ভাবনা ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। অনুভব করিতেছেন, আজ এই যে চেতনাসমৃদ্ধ মানব-অস্তিত্বে তিনি উপনীত হইয়াছেন—ইহা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। পৃথিবীতে সুদীর্ঘ বিবর্তনের পথে জলস্থল এবং তৃণ তরুলতা প্রাণী ইত্যাদি উদ্ভূত হইয়াছে। এই বিবর্তনের পরিণত পর্যায়ে মানুষের আবির্ভাব। পৃথিবীর বিবর্তন সম্পর্কিত এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে মানিতে হয়, মানবসত্তা লাভ করিবার পূর্বে আমরা প্রাণের নানা স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এমন কি যেদিন কোথাও প্রাণের কোন রূপ পরিস্ফুট হয় নাই, তখনকার সেই নিষ্ফলা মৃত্তিকার সহিতও আমাদের অস্তিত্বের ধারাবাহিক যোগ আছে। এইরূপ ভাবনায় কবি অনায়াসে মৃত্তিকাময় আদিম পৃথিবীর সহিত নিজেকে একাত্মবোধ করেন। অনুভব করেন, এই পৃথিবীর লীন অবস্থায় তিনি কোটি কোটি বৎসর সূর্য পরিক্রমা করিয়া ফিরিয়াছেন। বিশ্ব এবং ব্যক্তি-সত্তা, এই দ্বৈত বোধ লুপ্ত হইয়াছে। এখন পৃথিবী এবং কবির ব্যক্তিসত্তা কল্পনায় একাকার। তাই বলিতে পারেন, আমারই মধ্যে তৃণ জন্মাইয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, প্রাণের বিচিত্ররূপ প্রকাশিত হইয়াছে দিনে দিনে। এখানে 'আমি' বা 'আমার' এই সর্বনামবাচক শব্দ শুধু কবিকে বুঝাইতেছে না। কবি ও বিশ্বপ্রকৃতি ঐকাত্ম্যবোধে মিলিত হওয়ায় বিশ্ব হইয়া উঠিয়াছে কবিরই সম্প্রসারিত অস্তিত্ব।

[**পাঁচ**] আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান

শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু ;
দাঁড়ায়ে রয়েছে তুমি শ্যাম কল্পধেনু। [ষষ্ঠ স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'বসুন্ধরা' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিশ্বপ্রকৃতির বিশাল অঙ্কে প্রাণের বিচিত্ররূপ বিকশিত হইয়া আছে। তৃণ তরুলতায়, বিচিত্র প্রাণীজগতে জীবনের যে রূপবৈচিত্র্য ইহার মূলে আছে জননী বসুন্ধরার প্রাণপ্রদায়িনী শক্তি। সেই এক উৎস হইতে, সেই প্রাণ-কেন্দ্র হইতে সকলে জীবনরস আহরণ করিতেছে। সেই আদি প্রাণকেন্দ্রটিকে যেন আবৃত করিয়া আছে বিশ্বপ্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যময় একখানি যবনিকা। কবির দৃষ্টিতে বসুন্ধরা এক শ্যাম কল্পধেনু। তাহারই প্রসাদে জীবনের এত বিচিত্র রূপ সম্ভব হইয়াছে। এই বিচিত্রিত যবনিকার, এই প্রাণরঙ্গশালার অন্তরালবর্তী যে মাতৃস্বরূপিণী, কবি তাহার স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। মাতা বসুন্ধরার হৃদয়লগ্ন হইয়া তাহার স্নেহরসে অভিষিক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন আলোচ্য কাব্যাংশে। বসুন্ধরার প্রাণকেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট হইতে পারিলে, আপনাকে সেই প্রাণ উৎসে লীন করা সম্ভব হইলে জগতের সকল প্রাণ-স্বরূপের ঐকাত্ম্য সম্ভবপর হইবে। সকল ব্যবধান ঘুচিয়া যাইবে। কবির সর্বানুভূতির আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে। আপন সত্তার মধ্যে বিশ্বে প্রাণের বিকাশের সকল রহস্য অনুভব করিতে পারিবেন। পৃথিবীর প্রতিটি ঘাসে, গাছের শিকড়ে, সকল প্রাণীর দেহের শিরায় শিরায় যে প্রাণপ্রবাহ অবিরত বহিয়া চলিতেছে আপন চেতনাপ্রবাহ তাহার সহিত যুক্ত করিয়া দিতে সক্ষম হইবেন। প্রাণময় বিশ্বের সকল সঙ্গীত, তাহার লীলায়িত ছন্দ নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া ধন্য হইবেন। এমনভাবে জগতের সহিত একাত্ম হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে জগৎকে আর অনাত্মীয় রহস্যময় মনে হয় না। ব্যক্তিসত্তার সহিত বিশ্বের সকল বিচ্ছেদ ঘুচিয়া যায়। বিশ্ব ও ব্যক্তির অদ্বৈত মিলন সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সহিত এই অদ্বৈত মিলনই কামনা করেন।

[ছয়] আমার আনন্দ লয়ে
হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার ?
প্রভাত-আলোক-মাঝে হবে না সঞ্চার
নবীন কিরণকম্প ? মোর মুগ্ধ ভাবে
আকাশ ধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে— [ষষ্ঠ স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'বসুন্ধরা' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এ বিশ্বের প্রাণরঙ্গশালার দিকে চাহিয়া কবির মন বিচিত্র আনন্দে পূর্ণ হইয়া ওঠে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিজের এক জন্মান্তরীণ সৌহার্দ্যের অনুভূতি জাগে মনে। মানব-আত্মার দম্ভ ঘুচাইয়া এই পৃথিবীর ধূলিতে ধূলি, তৃণতরুতে তৃণতরু হইয়া মিশিয়া যাইবার বাসনা কবিকে আকুল করিয়া তোলে। মর্ত-ধরণীকে ভালোবাসার এমন নিবিড় আনন্দে কবি নিজেকে চরিতার্থ বোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ভাবনা আসে কবির মনে। পৃথিবীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি শুধুই গ্রহীতার সম্পর্ক ? পৃথিবীকে কি কিছুই ফিরিইয়া দিবার নাই ? এই বিশ্ব যে আনন্দিত উপলব্ধিতে কবিচিত্ত পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে—সেই আনন্দ কবি তাঁহার কাব্যে গানে চিরন্তন করিয়া রাখিবেন। প্রাকৃত সৌন্দর্যের উপরে কবি হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি আলিম্পন আঁকিয়া দিবে। সুন্দর এ বিশ্বকবির অনুভূতির বর্ণালিম্পনে সুন্দরতর হইয়া উঠিবে। কবির হৃদয়ের আনন্দানুভূতির স্পন্দন মিশিয়া যাইবে সকালবেলার আলোর কম্পনে, তাঁহার চিত্তের মুগ্ধতা আকাশ ধরণীতলে নবতর মায়া রচনা করিয়া দিবে। শিল্পী, কবি পৃথিবী হইতে শুধুই গ্রহণ করেন না, পৃথিবীকে যাহা ফিরাইয়া দেন তাহার মূল্য কম নয়। জগতের সৌন্দর্য শুধু প্রকৃত বস্তুর সৌন্দর্য নয়, শিল্পীর কল্পনার যোগে প্রাকৃত সৌন্দর্য কালে কালে সমৃদ্ধতর হইয়াছে। মানুষের সৌন্দর্য-ধারণার একটা বড়ো অংশ কবি-শিল্পীদের দান। এখানে রবীন্দ্রনাথ শিল্পোজনোচিত মনোবৃত্তির বশেই আপন কল্পনার সম্পদে পৃথিবীকে সুন্দর করিয়া তুলিবার কথা বলিয়াছেন। শিল্পীর রচিত জগতে বিশ্বপ্রকৃতি নতুন তাৎপর্যে নবতর

সৌন্দর্য সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। কবি বিশ্ব হইতে যে আনন্দ পান, নিজের সৃষ্টিতে সেই আনন্দের ঋণশোধ করিয়া চলেন।

[সাত] উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্যবাসী
নিদ্রা হতে উঠি? আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি? [ষষ্ঠ স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'বসুন্ধরা' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে কবির যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে এক অর্থে বলা যায় অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মতা উপলব্ধির পূর্ণ আনন্দানুভূতি হইতে বসুন্ধরা কবিতাটির জন্ম। চিত্তের এইরূপ পরিপূর্ণতার অবস্থায় আবির্ভূত উপলব্ধিকে কবি কিছুতেই একটা আকস্মিক ব্যাপাররূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। জগতের সহিত এই যে নিবিড় ঐকাত্ম্য—ইহাকে সুদূর অতীত এবং সুদূর ভবিষ্যৎ অবধি প্রসারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। জাগতিক নিয়মে একদিন কবির মানব অস্তিত্বের উপরে মৃত্যুর যবনিকা নামিয়া আসিবে। কিন্তু মৃত্যুতেই কি সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়? কবি বিশ্বাস করিতে চান, প্রাণের শেষ নাই, আনন্দের লয় নাই। এক বিশেষ অস্তিত্বের বিলয় হইতে পারে, কিন্তু সেই সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া চলে প্রাণের প্রবাহ, আনন্দের প্রবাহ। আজ কবির চিত্ত যে আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে জগতে তাহার স্মৃতি কোথাও না কোথাও অক্ষয় হইয়া থাকিবে। নবীন উষায় আলোকের আভাসে কবির আনন্দিত চিত্তের দ্যুতিই আভাসিত হইবে হয়তো। আপন শিরায় শিরায় যে প্রাণ প্রবাহিত হইতেছে শতবর্ষ পরেও এই প্রাণস্পন্দন অক্ষয় হইয়া থাকিবে, মানবিক শরীরে না হোক অরণ্যের পল্লবস্পন্দনে এই প্রাণ স্পন্দিত

হইবে। নতুন কালের নরনারীর প্রেমের খেলায় কবির প্রেমানুভূতিই যেন ফিরিয়া আসিবে এই ধরণীতে।

সুদূর অতীত হইতে এই বিশ্বের সহিত আপন নিগূঢ় সম্পর্কের ধারণা অভিব্যক্ত হইয়াছে বসুন্ধরা কবিতার প্রথম অংশে। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহার অস্তিত্বধারা পৃথিবীর বুকে বহিয়া আসিয়াছে—ইহা তিনি বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাস হইতেই কবির মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যয়বোধ জাগে। মানবসত্তার সীমায় আসিয়া সেই অস্তিত্বধারা ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে না। কবির বিশ্বাস, জগতের সহিত তিনি নিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। রূপের পরিবর্তন হয়, কিন্তু প্রাণ কখনো বিনষ্ট হয় না, আনন্দ কখনো লয়প্রাপ্ত হয় না। অখণ্ড অস্তিত্বপ্রবাহে বিশ্বাস হইতেই অমরত্ব বিষয়ে কবির প্রত্যয় এমন সুদৃঢ়।

[আট] ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়মাঝে ; কীট পশু পাখি
তরু গুল্ম লতা রূপে বারম্বার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে ;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তনে দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান। [ষষ্ঠ স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'বসুন্ধরা' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক উপলব্ধি এবং এই সম্পর্ককে চিরন্তনরূপে গ্রহণ—ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতির বৈশিষ্ট্য। সুদীর্ঘ 'বসুন্ধরা' কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির এই জন্মান্তরীণ সম্পর্কের অনুভূতিই প্রকাশিত হইয়াছে। জাগতির নিয়মে একদিন মানব অস্তিত্বের অবসান ঘটিবে। মানবসত্তায় উপনীত কবির অস্তিত্বধারা কি তবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হইয়া যাইবে? এখানেই কি বিশ্বের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ সম্পর্কের সমাপ্তি? কবিতাটির শেষ অংশে এই ব্যাকুল প্রশ্ন বারবার উচ্চারিত

হইয়াছে। সেই শূন্য পরিণাম কল্পনা করা কবির পক্ষে একান্তই অসম্ভব এবং তাঁহার জীবন-বিশ্বাসের বিরোধীও বটে। মৃত্যুতে মানব অস্তিত্বের উপরে ছেদ নামিয়া আসিবে ইহা স্বীকার করিয়াও তাই কবি মর্তধরণীর সহিত ভিন্নতর, রূপান্তরিত সম্পর্ক বন্ধনের কথা কল্পনা করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন প্রাণ অবিনাশী, রূপ হইতে রূপান্তরের মাঝ দিয়া প্রাণধারা অক্ষয় প্রবাহে বহিয়া চলে। যে প্রাণশক্তি চেতনাসমৃদ্ধ মানবদেহে পূর্ণ মহিমায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, মানবজন্মের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা শেষ হইতে পারে না। মানবজন্মের শেষ আবার তিনি নতুনরূপে এই জগতে উঠিবেন। তাঁহার দেহধৃত প্রাণশক্তি হয়তো বা কীট পশুপাখি অথবা তরুগুল্মরূপে নতুন অবয়ব গ্রহণ করিবে। রূপ যেমনই হোক, মাতা বসুন্ধরার অঙ্গেই আশ্রয় লাভ করিবেন। বিশ্বমাতার স্নেহরসে পরিপুষ্ট হইবেন, তাহার বক্ষলগ্ন হইয়া বিরাজ করিবেন। এইভাবে এক প্রসারিত কল্পনায় কবি পৃথিবীর সহিত নিজের সম্পর্ককে দূর অতীত হইতে অনাগত ভবিষ্যৎ অবধি প্রবাহিত অখণ্ড অস্তিত্বের ধারারূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহার ছেদ নাই, সমাপ্তি নাই। রূপান্তর আছে শুধু। পৃথিবীকে ভালোবাসার চির অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে এমন এক জন্মান্তরীণ সম্পর্ক কল্পনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। একজন্মে এ তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইবার নহে। তাই বারবার বসুন্ধরার মাতৃবক্ষে ফিরিয়া আসিবার কথা ভাবেন। মাতা বসুন্ধরা জন্মে জন্মে তাহার স্তন্যরসসুধা পান করাইয়া কবিকে ধন্য করিবেন। যুগে যুগে নব নব রূপে বসুন্ধরার মাতৃ অঙ্কে আশ্রয় লাভের নিশ্চিত প্রত্যয়বোধ কবি আশ্বস্ত হইয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর

[এক] 'বসুন্ধরা' কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করিয়া কবির প্রকৃতি-প্রীতির স্বরূপ বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার বিশিষ্টতা বুঝিবার পক্ষে 'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতাটির বিশেষভাবে সহায়ক। কারণ এই সুদীর্ঘ কবিতার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি কবির মনোভাব একটা পূর্ণাঙ্গ ভাবানুভূতির আকারে প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র-

জীবনের কাব্যধারায় নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে যে প্রকৃতিপ্রীতির পরিচয় পরিস্ফুট, এই কবিতায় তাহার পূর্ণাঙ্গ ভাবমূর্তি বিধৃত হইয়াছে।

বসুন্ধরার প্রথম ২৮ পঙক্তিতে বিশ্বের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষার বিবৃতি পাই। ব্যক্তিসত্তার গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ কবিহৃদয় বিশ্বের সহিত একটা বিচ্ছেদের ভাব অনুভব করিয়া ব্যথিত। আপন ভাবনা-বেদনার জগৎটিকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন বোধ করায় কবি বেদনাবোধ করিতেছেন এবং এই জগৎ হইতে মুক্তির জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। মুক্তি চান পরিব্যাপ্ত বিশ্বচরাচরে যেখানে প্রতিনিয়ত প্রাণের সহস্র রূপ অঙ্কুরিত মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে। জলে স্থলে আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে উদার মুক্ত প্রকাশ—সেই প্রাণরঙ্গশালায় মুক্তি চান কবি। কবিতার মধ্যবর্তী অংশের দীর্ঘ বর্ণনায় প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য এবং বিশ্বের নানা প্রান্তের বিচিত্র মানগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বর্ণনা আছে। যে ভূদৃশ্য কবি কখনো দেখেন নাই, যে সব মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই—কল্পনায় সেই অপরিজ্ঞাত জগৎ ও জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন। এইসব বর্ণনাও আসে মুক্তি আকাঙ্ক্ষারই সূত্রে। বিশাল বিশ্বের তৃণতরুর সহিত, সকল মানুষ ও প্রাণীর সহিত ঐকাত্ম্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষার সূত্রেই এই সুদীর্ঘ বর্ণনা কবিতাটির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। মনে মনে কবি এই-ভাবে সমগ্র বিশ্বকে আবেষ্টন করিয়াছেন, নিজেকে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন বিশ্বের সর্বত্র। ধীরে ধীরে এক ভিন্ন ভাবনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি এ বিশ্বকে পূর্ণভাবে জানিবার সুযোগ পান নাই। তবুও পৃথিবী তাঁহার অনাত্মীয় নয়। তিনি এই পৃথিবীরই অঙ্গীভূত। পৃথিবীতে সুদীর্ঘ বিবর্তনধারার মধ্য দিয়া মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে। মানুষ হিসাবে কবি নিজেকে যতোই স্বতন্ত্র মনে করুন না কেন তাঁহার দেহের প্রাণকোষগুলিতে তো সেই সুদীর্ঘ বিবর্তনের স্মৃতি বিধৃত রহিয়াছে। এই নতুন দৃষ্টির উন্মেষের ফলে কবি অন্তরের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এক নিগূঢ় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক উপলব্ধি করিয়াছেন। অনুভব করিয়াছেন, একদিন তিনি মাটিতে মাটিরূপে মিশিয়া ছিলেন। ঘাসরূপে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য প্রাণীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এই পৃথিবীতে, বসুন্ধরা মাতার কোলে। আজিকার মানব-অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বধারারই পরিণতি। বিশ্বের সকল প্রাণময় সত্তার সহিত তাঁহার

অস্তিত্বের এক নিগূঢ় সংযোগ আবিষ্কার করিয়া কবির বিচ্ছেদ বেদনা দূরীভূত হইয়াছে। কবির এই অনুভূতিকে বলা যায় সর্বানুভূতি বা বিশ্বাত্মবোধ। সর্বানুভূতির উপলব্ধি বিশ্বের সহিত কবিকে অদ্বয় সম্পর্কে যুক্ত করিয়া দিয়াছে। আপন বিস্ফারিত অস্তিত্বচেতনার মধ্যে এইভাবে সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মতার আনন্দিত উপলব্ধিতে কবিচিত্ত উদ্দীপিত হইয়াছে। এই সর্বানুভূতি বা বিশ্বাত্মবোধই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার বৈশিষ্ট্য। সর্বানুভূতির বশে কল্পনায় তিনি বিশাল এই মর্তধরণী এবং ইহার অন্তর্গত জ্ঞাত অজ্ঞাত মানবসাধারণকে কল্পনায় আলিঙ্গন করিয়াছেন।

কবির বিশ্বাস, সুদূর অতীত হইতে যে অস্তিত্বধারা প্রবাহিত হইয়া আজ এই মানবসত্তায় মূর্তিলাভ করিয়াছে তাহার প্রবাহ ভবিষ্যতেও অব্যাহত রহিবে। মানব অস্তিত্বের উপরে মৃত্যুর যবনিকা নামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে না। যুগে যুগে নব নব রূপে বসুন্ধরার মাতৃ অঙ্কে ফিরিয়া আসিবেন। হয়তো বা কীট পশু পাখিরূপে কিংবা তরু-গুল্ম-লতারূপে যুগ যুগান্তরের মহা মৃত্তিকা-বন্ধন অকস্মাৎ ছিন্ন হইতে পারে না। অতীত বর্তমান-ভবিষ্যৎব্যাপী এক অখণ্ড অস্তিত্বপ্রবাহে আস্থা এবং বসুন্ধরার সহিত নিত্য অচ্ছেদ্য বন্ধনের উপলব্ধি প্রকাশিত হইয়াছে কবিতার শেষ স্তরে।

সমগ্র কবিতাটির মধ্যে এইভাবে ক্রমোন্মেষশীল বিশ্বাত্মবোধ বিকশিত হইয়া একটি পূর্ণ পরিণামে উপনীত হইয়াছে। কবির এই প্রকৃতিপ্রেম নিছক প্রকৃতির রূপমুগ্ধতা মাত্র নয়, বিশ্বজগতের সহিত অক্ষয় সম্বন্ধের উপলব্ধি। এই উপলব্ধি তাঁহার জীবনদর্শনের ভিত্তি। বিশ্বের সহিত আপন ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাঁহার চিন্তায় কখনো দুঃখবাদ বা নৈরাশ্য প্রশ্রয় পায় নাই। জীবনকে পূর্ণতর পরিণাম অভিমুখী প্রবাহরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অভিজ্ঞতা সেই পূর্ণতার দিকেই যে কবিকে অগ্রসর করিয়া লইতেছে—চিরদিন এই বিশ্বাস অটুট রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। 'বসুন্ধরা' কবিতাটি তাই সাধারণ প্রকৃতি-প্রেমের কবিতা নয়, ইহা রবীন্দ্রনাথের মৌলিক জীবনদর্শনেরই রসভাষ্য।

[দুই] "বিজ্ঞানের কোনো একটি মতবাদের সহিত সুসঙ্গত অথচ পরিপূর্ণ কাব্য, এমন কবিতা প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাতে বিশ্বকে জানিবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষার সহিত, অন্তঃপুরবাসিনী ধরিত্রীকে

জড়াইয়া থাকিবার ব্যাকুল আগ্রহ টানা-পোড়েনের মত বুনিয়া গিয়া বিচিত্র এক রসের সৃষ্টি করিয়াছে।" 'বসুন্ধরা' কবিতা সম্পর্কে এই মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। 'বসুন্ধরা' কবিতা পাঠকালে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি কবির ভালোবাসার অনুভূতি তিনি একটা তত্ত্বগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থে সংকলিত কয়েকখানি চিঠিতেও এইরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য কোথাও কবি স্পষ্টভাবে বিশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নাম করেন নাই। সমালোচকেরা এই প্রসঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেন তাহা 'অভিব্যক্তিবাদ' বা Theory Evolution. জীবজগতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত এই অভিব্যক্তিবাদ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও আবিষ্কারের ফল। অভিব্যক্তিবাদের প্রবক্তা হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লামার্ক, চার্লস ডারুইন ও হিউগো। এইসব বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্যে পারস্পরিক বিরোধ আছে এবং আধুনিক গবেষণায় অনেক প্রতিষ্ঠিত অভিমত খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তবুও পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্টি ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সম্ভব হইয়াছে এই দৈব বিশ্বাস খণ্ডন করিয়া প্রাণের বিকাশ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কারণ আবিষ্কারের চেষ্টায় ইঁহাদের যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—তাহার মূল্য অসাধারণ। ইঁহাদের চেষ্টাতেই বিশ্বসৃষ্টির মূলে অলৌকিক দৈব ইচ্ছার ক্রিয়া সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস দূর হয়। সাধারণভাবে এই সত্য স্বীকৃতি পায় যে জগতে প্রাণের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের কারণ প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে। প্রাণের আদিতম রূপের উদ্ভব এবং তাহার ক্রমবিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হইয়াছে। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে জটিলতর প্রাণীদেহের আবির্ভাব এবং কোনো কোনো প্রাণীর বিলুপ্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা পরস্পর-বিরোধী হইলেও প্রাণের বিকাশ যে অব্যাহত ধারায় অগ্রসর হইয়াছে এই সত্য সাধারণভাবে স্বীকৃত। এবং এইদিক হইতে দেখিলে জগতে আবির্ভূত আদিতম প্রাণীর সহিত মানুষের একটা ধারাবাহিক যোগ মানিয়া লইতে বাধা হয় না এমনকি একথাও বলা যায়, জলরেখা বলয়িত ভূখণ্ডের মধ্যেই প্রাণের উদ্ভব ঘটিয়াছে তাই এই জল ও মৃত্তিকাই প্রাণধাত্রী, প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই মাতৃস্বরূপা। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনায় বিশেষ কোনো তত্ত্বের প্রভাব প্রমাণ

করা কঠিন, কিন্তু তিনি জীবন বিকাশের মূলে কোনো ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব কল্পনা করেন নাই। বিজ্ঞান সমর্থিত প্রাকৃতিক কারণকেই তিনি সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া নিজের মানবসত্তার সহিত বিশ্বপ্রকৃতির এক নিগূঢ় অচ্ছেদ্য যোগ কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং কবির কল্পনা এবং বিজ্ঞানের সত্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিপাদন কবির উদ্দেশ্য নয়। পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করে এবং তিনি অনুভব করেন জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। এ সম্পর্ক জন্মান্তরীণ। মানব অস্তিত্বের বহু পূর্ব হইতে ইহার শুরু এবং ভবিষ্যতেও এ সম্পর্ক ছিন্ন হইবে না। যুগে যুগে জগতে নানারূপ প্রাণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কবি আপন অস্তিত্বের মধ্যে সেই প্রাণধারার সহিত নিগূঢ় সম্পর্ক অনুভব করেন। তাঁহার বিস্ফারিত অস্তিত্ব-বোধের মধ্যে সমগ্র প্রাণময় পৃথিবীকেই ধারণ করেন এবং বলেন, "আমার এই যে মনের ভাব এ যেন প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব।" বিশ্বপ্রকৃতির সহিত পরিপূর্ণ ঐকাত্মবোধ কবির বিশিষ্ট কল্পনারই ফল, এবং এ বোধ বিজ্ঞানবিরোধীও নয়।

বিশ্বের সহিত ঐকাত্ম্যের আকাঙ্ক্ষা 'বসুন্ধরা' কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে দুইভাবে। বিশাল বিশ্বের সামগ্রিক রূপ এবং এই বিশ্বের বিচিত্র মানব-জীবনের সামগ্রিক পরিচয় লাভের জন্য আকুলতা কবিতাটির একটা বড়ো অংশ জুড়িয়া আছে। মানুষ জ্ঞানে এবং অভিজ্ঞতায় যেমনভাবে জগৎকে জানে এই জানার আগ্রহ সেইরূপ। এ আগ্রহ প্রকাশ করিতে গিয়া কবি অপরিজ্ঞাত ভূদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তিব্বত পারস্য জাপান চীন প্রভৃতি ভূখণ্ডের মানব সমাজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্তরে এইরূপ তথ্যমূলক অভিজ্ঞতার পরিবর্তে বিশ্বের সহিত গূঢ়তর সংযোগের প্রসঙ্গ আসিয়াছে। প্রাণের এত যে বিচিত্র রূপ অবিরত প্রকাশিত হইতেছে—ইহার কোনো এক আদি উৎস কল্পনা করেন কবি। সেই প্রাণ উৎস, বসুন্ধরার সেই মাতৃবক্ষে লীন হইয়া বিশ্বসৃষ্টির রহস্য কবি আপন সত্তার মধ্যে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন। বলিয়াছেন:

"আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্বমাঝে, যেথা হ'তে অহরহ
অঙ্কুরিছে, মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে।"

এইভাবে একদিকে বাস্তব পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্যবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে অন্তঃপুরবাসিনী ধরিত্রীর সহিত একাত্মার বাসনা এই কবিতার মধ্যে যুগ্মধারায় বহিয়া গিয়াছে। ফলে কখনো কবির কল্পনা প্রসারিত হইয়াছে পরিব্যাপ্ত বিশ্বের বৈচিত্র্যের দিকে, আবার কখনো কবি এই বিশ্বের রূপময়তার অন্তরালবর্তী ধরিত্রী মাতার স্নেহ উৎসে নিবিষ্ট হইয়াছেন। এই-ভাবে একাধারে অনুভূতির প্রসার এবং ব্যাপ্তি ও অনুভূতির গভীরতা বিমিশ্রিত হওয়ায় কবিতাটি রসবৈচিত্র্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অপরিমিত দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও কোথাও ক্লান্তিকর হয় নাই।

[তিন] **"রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রেম ও মানবিকতাবোধ বসুন্ধরা কবিতায় প্রাণপূর্ণ আবেগে উৎসারিত হইয়াছে।"—আলোচনা কর।**

উত্তর। "হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা,
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।"

অহংবুদ্ধির বলে মানুষ যখন নিজেকে বিশ্ব হইতে দূরে সরাইয়া একাকীত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে তখন তাহার মনে জাগে বিষাদ ও বেদনা। এই আস্মিতাবোধের গণ্ডির বাহিরে আসিয়া বিশ্বের সহিত মিলনে জাগে আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের সাধনা এই আনন্দের সাধনা। বিশ্বের সহিত আপন অস্তিত্বের নিগূঢ় অচ্ছেদ্য যোগ উপলব্ধি সেই সাধনার লক্ষ্য। বলা যায়, আপন অস্তিত্ব সীমাকে সম্প্রসারিত করিয়া তিনি বিশ্বের সহিত, বিশ্বমানবের সহিত ঐকাত্ম্য প্রতিষ্ঠার দিকেই অগ্রসর হইয়াছেন। যে সব মুহূর্তে এই ঐকাত্ম উপলব্ধির পূর্ণতা তাঁহার মনপ্রাণ ভরিয়া তুলিয়াছে, তখন মাটি ও মানুষকে সুদূর না ভাবিয়া নিজেরই অঙ্গীভূত অনুভব করিয়াছেন। মাটিতে মাটি, তৃণে তৃণ হইয়া নিজেকে সম্মিলিত করায় অপূর্ব আনন্দ বোধ করিয়াছেন। ধরাতলের সকল জীবের সহিত প্রাণের যোগ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সাধারণতঃ প্রকৃতিপ্রেম বা মানবপ্রেম বলিতে, যে

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপ্রীতি ও মানবের জন্য ইষ্টচিন্তা বুঝানো হয়, রবীন্দ্রনাথের এ উপলব্ধি তাহা অপেক্ষা অনেক গভীর ও তাৎপর্যময়। প্রকৃতি তাঁহার নিকট জড়বস্তুর সমাহার মাত্র নয়, বিশ্বপ্রকৃতি একটা প্রমূর্ত সজীব সত্তা। কত যুগ যুগান্তরের বিবর্তনধারার মধ্য দিয়া এই মর্ত্য ধরণী আপনাকে প্রাণময়রূপে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। সেই বিবর্তনের ধারায় বিশ্বের বুকে প্রাণের নানা মূর্তি উন্মীলিত হইয়া উঠিয়াছে। তৃণে তরুলতার বিশ্বপ্রাণই প্রকাশিত, ফুল ফলে সেই প্রাণশক্তিরই পূর্ণ পরিণত রূপ। নিতান্ত ইতর প্রাণী হইতে প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানবে বিশ্বের প্রাণশক্তিই বিচিত্রভাবে প্রকাশিত। বিশ্বের এই প্রাণরঙ্গশালার মধ্যে কবি স্থানলাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন। মনে করেন, অনাদিকাল হইতে প্রাণসৃষ্টির যে অব্যাহত প্রয়াস, সেই প্রয়াসের সহিত তাঁহার নাড়ীর যোগ আছে। আপন দেহের শিরায় শিরায় স্পন্দিত প্রাণশক্তি বিশ্বপ্রাণেরই অঙ্গ এবং এই প্রাণশক্তির যোগে বিশ্বচরাচর এবং বিশ্বের সকল প্রাণী সকল মানব কবির আত্মীয়। এই ভাবনা-সূত্রে জগৎ কবির অস্তিত্বে মিলিত হয় আত্মীয় বন্ধনে। প্রেমের সূত্রে তিনি বাঁধা আছেন বিশ্বের সহিত। অতীতেও ছিলেন, বর্তমানেও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন। এ বন্ধন কখনো ছিন্ন হইতে পারে না। বিশ্বের সহিত কবির এই নিরবচ্ছিন্নতা যোগ বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের দ্বারা সমর্থিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেগানে ও বহু গল্পরচনায় বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানবের সহিত এই ঐকাত্ম্য চেতনা নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কবির এ বিশিষ্ট অনুভূতির নাম সর্বানুভূতি বা বিশ্বাত্মবোধ। বিশেষভাবে বসুন্ধরা কবিতায় এই বিশ্বাত্মবোধ একটা পরিপূর্ণ রসমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে বলা যায়। তাঁহার জীবন বিশ্বাসের বা জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি যে মর্ত্যপ্রীতি ও মানবপ্রীতি, 'বসুন্ধরা' কবিতাটি সে দার্শনিক উপলব্ধিরই কাব্যভাষ্য।

কবিতাটিতে কোনো তত্ত্বচিন্তার দুরূহতা নয়, বিশ্বের প্রতি প্রেমাত্মক মিলনের আনন্দ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বকে কবি মাতৃসম্বোধনে সম্বোধন করিয়া নিজের আবেগ উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন। ওই বিশ্বে, ওই মাতৃ-অঙ্কের মধ্যে লীন হইয়া দৃশ্যমান বিচিত্র রূপের অন্তরালের কোনো নিগূঢ় প্রাণকেন্দ্রের স্পন্দন দেহে মনে অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তাহার পরে আসিয়াছে বিচিত্র বিশ্বদৃশ্যের বর্ণনা। কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত

সেইসব বিচিত্রিত ভূভাগ, সেও যেন অপরিচিত নয়। তাঁহার প্রসারিত অস্তিত্বেরই অঙ্গীভূত। দূর-প্রসারিত কল্পনায় কবি সমগ্র বিশ্বকেই এইভাবে আলিঙ্গন করিয়াছেন। শুধু প্রকৃতি নয়, এই প্রকৃতির অন্তর্বর্তী প্রাণী, এমনকি হিংস্র প্রাণীও কবির কল্পনাকে আকর্ষণ করে। এইসব প্রাণীর মধ্যে প্রাণশক্তির এক মহিমাময় প্রকাশ লক্ষ্য করেন এবং ইহার সহিত নিগূঢ় আত্মীয় বন্ধন অনুভব করেন।

দীর্ঘ কবিতার আর একটি স্তরে বর্ণিত হইয়াছে বিশ্বের বিচিত্র গোষ্ঠীর জীবন-প্রকৃতি। দেশ-কাল-সমাজের একটা বিশেষ গণ্ডির মধ্যে জন্ম বলিয়া কবি একটা বিশেষ জীবনবৃত্তের সংস্কারে লালিত। কিন্তু মানবজীবনধারা কতো বিচিত্ররূপে প্রবাহিত হইতেছে এই বিশ্বে। সভ্যতার কতো বিচিত্র স্তর নিজের সীমা অতিক্রম করিয়া সকল জাতি, সকল জনগোষ্ঠীর জীবনধারার স্বাদ গ্রহণ করিতে চান। তাঁহাকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানে এমনকি অসভ্য বর্বর জাতিসমূহের চিন্তালেশহীন জীবনের প্রচণ্ডতা।

এমন যে বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ বিশ্ব, এ বিশ্ব হইতে কবি শুধু গ্রহণ করিবেন এ কথা ভাবেন না। জগৎ তাঁহার অন্তর পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে আনন্দিত উপলব্ধিতে। সেই আনন্দ প্রকাশ করিতে চান নিজের শিল্পসৃষ্টিতে, কাব্যে গানে। কবির কল্পনায় মণ্ডিত হইয়া বিশ্বসৌন্দর্য সুন্দরতর হইবে, মানুষের প্রেম আরও মহনীয় হইবে। গ্রহণে ও দানে বিশ্বের সহিত কবির সম্পর্ক পূর্ণতর, নিবিড়তর হইয়া উঠিবে।

কবিতার শেষ হইয়াছে বিশ্বমাতার গোপন অন্তঃপুরে, বিশ্বপ্রাণের উৎসের মধ্যে নিজেকে লীন করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষায়।

এইভাবে দীর্ঘ কবিতাটিতে একটি বিশিষ্ট কল্পনা পরিপূর্ণ কাব্যমূর্তিলাভ করিয়াছে। 'বসুন্ধরা' কবিতাটিকে তাই রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রীতি ও মানবপ্রীতির অভিব্যক্তিমূলক রচনাবলীর মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় বলা যায়।

॥ সমুদ্রের প্রতি ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য :

কবিতাটির শিরোনামের পরেই 'পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া'—এই কথাগুলি মুদ্রিত আছে। সমুদ্রের বাস্তব বর্ণনা যতটুকু আছে এ কবিতায় তাহা পুরীর সমুদ্রের বর্ণনা। এইদিক হইতে সংক্ষিপ্ত নির্দেশটুকু মূল্যবান।

'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের একটি পত্রে কবির এই কবিতার একটি প্রসঙ্গ আছে। পত্রটি এখানে উদ্ধৃত হইল :

"এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়। পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তর-সমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে। কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আকাঙ্ক্ষা, কতরকমের প্রলয়, কত স্বর্গনরক, কত বিশ্বাস-সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত-জটিল-সহস্ররকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। বৃহৎ সমুদ্রের তীরে কিংবা মুক্ত আকাশের নীচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না। কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই—আমায় যা মনে উদয় হয়েছে আমি তাই বলে খালাস—তার পরে সমুদ্র সমভাবে তরঙ্গিত হতে থাকুক আর মানুষ হাঁসফাঁস করে ঘুরে ঘুরে বেড়াক।"

সমুদ্রবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতার কথা এখানে স্মরণীয়, সেটি 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'সিন্ধুতরঙ্গ'। বিশ্বপ্রকৃতি, বিশেষভাবে সমুদ্র-প্রকৃতির প্রতি কবির মনোভাব ও মনোভাবের বিবর্তন বুঝিবার পক্ষে এই দু'টি কবিতা তুলনা করিয়া পাঠ করা সঙ্গত। 'সমুদ্র' সম্পর্কে আর একটি

কবিতা আছে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'সমুদ্র', 'মানসী' কাব্যের 'সিন্ধুতরঙ্গ' এবং 'সোনার তরী' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি'—এই তিনটি সমুদ্রবিষয়ক কবিতা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার মধ্যে 'সমুদ্র' কবির এই রহস্যনিলয় মহাপারাবারের প্রতি দীর্ঘকালব্যাপী মানস ঔৎসুক্যের প্রথম উন্মেষ। এখানে কবি সমুদ্রের চির অশান্তি, উহার শিশুর মত অবোধ, অবিরত রোদনপরায়ণতা, নিজ হৃদয়ের অশান্ত আবেগ ও অতৃপ্ত প্রকাশব্যাকুলতার সহিত উহার গূঢ় সাদৃশ্যের অনুভবই ব্যক্ত করিয়াছেন, উহার অন্তর্লীন কোন মানববোধাতীত তত্ত্বের কথা এখনও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। তিনি নিজের ক্ষুদ্র বেদনাকে সমুদ্রের বিরাট, সীমাহীন ব্যাকুলতার মধ্যে লীন করিতে চাহিয়াছেন, সমুদ্রের ধ্বনিগম্ভীর তরঙ্গ-কল্লোলের ভাষার সহিত নিজ ক্ষীণ প্রকাশশক্তির মিলনসাধনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার সহিত 'মানসী'র **সিন্ধুতরঙ্গ** ও 'সোনার তরী'র **সমুদ্রের প্রতি** কবিতা দুইটি তুলনা করিলেই কবিকল্পনা ও মননের নিগূঢ় রূপান্তরটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। প্রথম কবিতাটিতে কবি কেবল সমুদ্রের আচরণের অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়াছেন ও উহার সঙ্গে নিজ মনের ছন্দানুবর্তনের মিল জুড়িয়াছেন। এখানে চোখের দেখার সঙ্গে কবিমনের নতুনতম সহযোগিতা লক্ষিত হয়। দ্বিতীয়টিতে সমুদ্রে ঝড়ের এক জীবন্ত বর্ণনা, এবং ঝটিকায় বিধ্বস্তপ্রায় বাষ্পযানের আরোহীদের নিদারুণ মানস বিপর্যয়ের নাটকীয় প্রকাশ ও বিশ্বপ্রকৃতির মূলশক্তি সম্বন্ধে দার্শনিক বিবেচনা—এই দুই ভাবস্তরের একত্র সমাবেশ। এখানে সমুদ্রের ঝটিকারুদ্র মূর্তি কবির বর্ণনাশক্তি ও তত্ত্বচেতনাকে যুগপৎ উদ্রিক্ত করিয়াছে। সমুদ্রতাণ্ডব কবিমনের গূঢ়ানুপ্রবেশী শক্তির প্রবেশপথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সমুদ্রতরঙ্গের উন্মত্ত ধ্বংসলীলা কবিচিত্তের সমবেদনার শান্তিবারিষেকে শান্ত হইয়া কবির রহস্যসন্ধান প্রবৃত্তির পূর্ণ আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তৃতীয় কবিতাটিতে (**সমুদ্রের প্রতি**) কবি সমুদ্রের উপর নিজ ভাবানুভূতি প্রয়োগ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বশ্যতাস্বীকার করাইয়াছেন—তট-দেশের উপর উহার অশ্রান্ত ঝাঁপাইয়া পড়ার মধ্যে নিজ জন্মান্তরীণ স্মৃতির সমর্থন, সন্তানের প্রতি মাতৃহৃদয়ের উন্মত্ত স্নেহাতিশয্য, আদর ও পীড়নের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের নিদর্শন পাইয়াছেন। পূর্ব দুইটি কবিতার সমুদ্র যে কোন কবির সমুদ্র হইতে পারিত। তৃতীয় কবিতার সমুদ্র অবিসংবাদিতভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি; কবির জন্মজন্মান্তরের রহস্যময় অনুভূতি, নিখিল-

বিশ্বের সহিত প্রাণলীলার একাত্মতাবোধ, বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে নূতন পুরাণ-কল্পনার উদ্বোধন সমুদ্রের তরঙ্গিত বিস্ময়ের উপর কবিচিত্তের সৃষ্টি-রহস্যোম্ভেদী বিস্ময়বোধের অচঞ্চল স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে।"

ভাবার্থ ঃ

পুরীর সমুদ্রতীরে দাঁড়াইলেই চোখে পড়ে, দূর দূরান্তর হইতে ফেনশীর্ষ বিশালকায় তরঙ্গ তটের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, মুহূর্তের জন্য তটভূমি প্লাবিত করিয়া আবার সেই জলরাশি সমুদ্রে ফিরিয়া যাইতেছে। ক্রমাগত এই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি চলে। এই সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যটি কবিচিত্তে একটি অসাধারণ ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। অকস্মাৎ যেন কবির মনে পড়িয়াছে, এই মহাসিন্ধু হইতেই ভূভাগের জন্ম। পৃথিবী আজও জলরেখা বলয়িত। সমুদ্রের সহিত বসুন্ধরার সম্পর্ক মাতা ও কন্যার সম্পর্ক। বসুন্ধরা সমুদ্রের একমাত্র সন্তান। স্নেহবুভুক্ষিত মাতৃহৃদয় যেমন একমাত্র সন্তানকে ঘেরিয়া নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, সমুদ্রও সেইরূপ বসুন্ধরাকে ঘেরিয়া নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইতেছে। কবিতাটির প্রথম অংশে এই মাতৃ-সম্পর্কের রূপকল্পটিই কবি পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। নিয়ত আলোড়িত আন্দোলিত সমুদ্র যেন স্নেহব্যাকুল মাতৃহৃদয়। সন্তান বসুন্ধরাকে দূরে রাখিয়া তাহার শান্তি নাই। তাই গর্জনস্বরে সে দেবতার উদ্দেশে সন্তানের মঙ্গল কামনা উচ্চারণ করিতেছে। মুহুর্মুহু ছুটিয়া আসিয়া বসুন্ধরার সর্বাঙ্গে স্নেহ-চুম্বন আঁকিয়া দিতেছে। জলের নীল আঁচলখানি দিয়া বসুন্ধরাকে সযত্নে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। সন্তানকে লইয়া দিবা-নিশি তাহার স্নেহ-খেলার আর শেষ নাই। চুপে চুপে কপট অবহেলা দেখাইয়া কখনো সে দূরে সরিয়া যায়, আবার পরমুহূর্তে প্রবল উচ্ছ্বাসে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকুল আলিঙ্গনে বসুন্ধরাকে আবিষ্ট করিয়া দেয়। স্নেহ উচ্ছ্বাস কখনোবা প্রকাশ পায় ভয়ংকর আকৃতিতে। উন্মত্ত স্নেহক্ষুধাময়ী আদি জননীর সেই ভয়ংকর আলিঙ্গনে ধরিত্রী কাঁপিয়া ওঠে। পরমুহূর্তে উচ্ছ্বাস কাটিয়া গিয়া আসে শ্রান্তি, হয়তো বা এমনভাবে পীড়ন করার জন্য অপরাধ-বোধ। একটি প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস স্তিমিত হইয়া গিয়া যে প্রশান্ত আসে—সেই দৃশ্যের উপরেই কবি এই ভাব আরোপ করিয়াছেন। উচ্ছ্বাসে, ক্ষোভে, শঙ্কায় নিত্য আলোড়িত এই সমুদ্রের উপরে সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি আসে যায়, তাহারা যেন সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করিয়া যায়।

সমুদ্রের উপরে মাতৃভাব আরোপ করিয়া বর্ণনার পরে, কবিতার দ্বিতীয়

স্তরে, সমুদ্রসম্পর্কে কবির নিজের অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। পৃথিবীর সন্তান কবি। একদিন মাতা বসুন্ধরার অঙ্গীভূত হইয়া তিনিও সমুদ্রগর্ভে বাস করিয়াছেন। সমুদ্রের কল্লোল গর্জনের অনতিস্পষ্ট ভাষা তাই কবি দূরস্মৃতির মতো কিছুটা স্মরণ করিতে পারেন। সমুদ্রের সহিত এক আদিম আত্মীয়তা অনুভব করেন আপন দেহের অণুপরমাণুতে, মনে পড়ে আদিম সমুদ্রের প্রথম গর্ভলক্ষণের স্মৃতি। সমুদ্রজঠরে ভুবনভ্রূণ ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছে। সতর্ক ধাত্রীর মতো উষা প্রতিপ্রাতে গর্ভস্থিত সন্তানের জন্মক্ষণ অনুমান করিত। নক্ষত্র নিমেষহীন দৃষ্টিতে গর্ভিণী সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিত। কল্পনায় কবি সেই আদিম সৃষ্টিক্ষণে ফিরিয়া গিয়াছেন। কবির নিজের অন্তরতলেও চলিয়াছে সেই সৃজনরহস্যের খেলা। অনতিস্পষ্ট অনুভবরূপে ধরা দেয় চিত্ততলে এক একটা ভাবনা যেন ভ্রূণরূপে বাড়িয়া উঠিতেছে। হয়তো একদিন সেই ভাবনা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে জন্মলাভ করিবে, আজ তাহার অস্তিত্ব বাহিরে প্রমাণযোগ্য নয়, প্রমাণের অগোচর। প্রত্যক্ষের বাহিরে তাহার সত্তা অতল অনুভূতির সত্যরূপে কবির নিকট প্রতিভাত। সমুদ্র যেমন মহা-সন্তান এ বসুন্ধরাকে নিজের জঠরে স্নেহরসে লালন করিয়াছিল, কবিও সেইরূপ ভবিষ্যতে মূর্তি-পরিগ্রহ করিবে যে জীবন-সত্য, তাহাকে আপন মর্মের মধ্যে লালন করিতেছেন। সৃজনশীলতার অপর রহস্যের দিক হইতে, সৃষ্টির বেদনা ও ব্যাকুলতার দিক হইতে কবি আদিজননী সিন্ধুর সহিত এইভাবে নিজ-অন্তর-প্রকৃতির যোগ খুঁজিয়া পান।

পৃথিবীতে বেদনার অন্ত নাই। অপরিতৃপ্ত তাপে জীবন যন্ত্রণাময়। এই বেদনাকাতর পৃথিবীকে আদিজননী সিন্ধুই শান্ত করিতে পারে। মাতৃস্নেহে তাহার চিন্তাতপ্ত ললাটে চুম্বন আঁকিয়া দিয়া তাহার উদ্বেগ-আশঙ্কা প্রশমিত করিয়া দিতে পারে। কবি সমুদ্রের নিকট সেই শান্তি ও সান্ত্বনা প্রার্থনা করিয়াছেন।

সমালোচনা ঃ

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি স্পষ্টতঃ দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম হইতে "গুমরি ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে" পর্যন্ত প্রথম অংশ, এবং ইহার পরবর্তী সবটুকু দ্বিতীয় অংশের অন্তর্গত। প্রথম অংশে মাতৃস্বরূপিণী সমুদ্রের রূপ কল্পনা, দ্বিতীয় অংশ মুখ্যত কবির নিজের সৃজনশীল অনুভূতি রাজ্যের রহস্যোদ্ঘাটন। অবশ্য দুই অংশে বিভক্ত হইলেও কবিতাটির অংশ দুটির মধ্যে কোনো ভাব-বৈপরীত্য নাই, বরং একই ভাব-কল্পনার দুটি তরঙ্গরূপে দুই অংশ

পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া একটি অখণ্ড ঐক্য সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং মূল ভাববস্তুর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে মনে রাখিয়া পাঠ করিলে কবিতার রসাবেদন স্পষ্ট হইয়া আসে।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত অপত্য-সম্পর্কের কল্পনা রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় দেখা যায়। তাঁহার প্রকৃতিপ্রীতি এই মমত্ব বন্ধনের কল্পনাতেই স্বস্তি ও তৃপ্তি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে 'অহল্যার প্রতি' (মানসী), 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি প্রখ্যাত কবিতা এবং সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি প্রভৃতি কাব্যের আরও বহু রচনার কথা মনে আসে। আরও মনে আসে 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থের অনেকগুলি চিঠির কথা, যেখানে এই ভাবটিকে কবি গদ্যে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোনো ব্যক্তি যখন বিশ্বসৃষ্টির সম্মুখীন হয়, তখন তাহার মনে এই বিশাল বিশ্বের রহস্যময়তা একটা ভীতি-বিস্ময়মিশ্রিত মুগ্ধতা সঞ্চার করে। জগতের সহিত ব্যক্তির ব্যবধানটাই সেক্ষেত্রে প্রধান হইয়া ওঠে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভিন্নতর কল্পনায় এই ব্যবধান উত্তীর্ণ হইয়া জগৎ রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। জগতের সহিত কবির সম্পর্ক ভয়ের নহে, দূরত্বের নহে। তিনি আপন জীবনের এক নিয়ামক শক্তি কল্পনা করিয়া—সেই শক্তিকে জীবনদেবতা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই জীবনদেবতা কবির জীবনকে বিশ্বজীবনের সহিত সমছন্দে অগ্রসর করিয়া আনিয়াছে, বিকশিত করিয়াছে, পূর্ণতার অভিমুখী সেই অব্যাহত বিকাশধারায় কোনো শেষ নাই। এই প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য, "তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এতবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।" জীবনদেবতাতত্ত্ব আলোচ্য কবিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু এই প্রসঙ্গে কবি জগতের সহিত যে আত্মীয়তার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন সেইটুকু বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ জগৎ তাঁহার মনে কোনো ভীতি-রহস্য সৃজন করে না, ইহার সহিত কবি আপন সত্তার এক পুরাতন ঐক্যবন্ধন অনুভব করেন। এই ঐক্যচেতনা, এই আত্মীয়তার অনুভূতিই উন্নীত হয় বিশ্বপ্রকৃতির সহিত

অপত্যসম্পর্কের কল্পনায়। বসুন্ধরাকে তিনি মাতা বলিয়া সম্বোধন করেন এবং তাহার সহিত এক নিগূঢ় মমত্ব বন্ধন অনুভব করেন। 'বসুন্ধরা' কবিতায় এই মনোভাবই প্রেরণা-উৎসরূপে কাজ করিয়াছে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় কবির একই মনোভাবের ভিন্নতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বসুন্ধরা যদি জীবের জননী হয় তবে সমুদ্র আদিজননী। সমুদ্র হইতেই বসুন্ধরার জন্ম। এখানেও কবি সেই একই অপত্যসম্পর্কের সূত্রে সমুদ্রের সহিত আত্মীয়বন্ধন রচনা করিয়াছেন। কল্পনা উধাও হইয়াছে সুদূর অতীতে, যে সময় বিশ্বের বুক জুড়িয়া একমাত্র জলরাশিরই আধিপত্য ছিল। পৃথিবীর ভূখণ্ড ছিল সেই সমুদ্রমাতার জঠরে, ভ্রূণরূপে। কল্পনার এই দূর বিস্তারের মধ্যেও একটা যুক্তিস্তর আছে। পুরীর সৈকতের উপরে সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ লক্ষ্য করিয়াই কবির মনে জাগিয়াছে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার রূপকল্প। কবিতার প্রথম অংশটিতে সমুদ্রের স্নেহবুভুক্ষু মাতৃমূর্তির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আছে। সমুদ্রের ভয়াল ভয়ংকর রূপকে কবি মাতৃরূপকল্পে কমনীয় ও মাধুর্যময় করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকৃতির উপরে মানবিক স্নিগ্ধতা আরোপের এই ভঙ্গি একান্তভাবে রবীন্দ্র-কল্পনার বৈশিষ্ট্য। সমুদ্র তাই এ কবিতায় আর প্রাকৃতিক সমুদ্রমাত্র নয়, কবির কল্পনার সৃষ্টি সমুদ্রের এ এক নতুন রূপ। কেন তিনি সামুদ্রিক বাস্তব দৃশ্যের বাস্তবতা বর্ণনায় অক্ষুন্ন রাখেন নাই—এইরূপ অনুযোগ অর্থহীন। স্নেহব্যাকুলা মাতৃমূর্তিরূপে বর্ণনাতেও সমুদ্রদৃশ্যের বিশালতা ও মহিমা কবি অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহাই বিশেষ কৃতিত্বের কথা। কবির মনোযোগ কেন্দ্রিত সমুদ্রের মাতৃরূপ ধ্যানে। এই কেন্দ্রীয় কল্পনারই আর এক স্তররূপে আসে কবিতার দ্বিতীয় অংশ, যেখানে কবি নিজের সত্তার সহিত আদিমাতা সমুদ্রের একটা নিগূঢ় যোগ, অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় স্তরের এই কল্পনা মূল কল্পনাকেন্দ্র হইতেই উৎসারিত এবং সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী কবিতাটির বিরূপ সমালোচনায় লিখিয়াছেন, "কবিতাটির প্রথম অংশ কল্পনা ও ভাবের যে উচ্চগ্রামে আবদ্ধ হইয়াছে, পরিসমাপ্তিতে তাহা রক্ষিত হয় নাই। মধ্যমাংশে পৃথিবীর শিশুকবি আদিম জননীর ভাষা যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছেন, এবং যখন ঐ বিরাট জঠরে বিলীন হইয়াছিলেন তখনকার কথা স্মরণ করিতেছিলেন। সমুদ্রে যেমন এক সময় মহাদেশ জাগিতেছিল, তেমনি তিনি অনুভব করিতেছেন, মানবহৃদয় সিন্ধুতলেও একটা বিরাট সৃষ্টি চলিতেছে, যদিও কবি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু দিতে পারেন না। অবশেষে কবি সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন

যে, তোমার পৃথিবী পীড়ায় পীড়িত, চক্ষে তাহার অশ্রু, ঘন ঘন তাহার উষ্ণশ্বাস, সে তৃষিত, সে যেন বিকারের মরীচিকা-জালে পথ হারাইয়াছে, অতএব :

অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মত...

পাঠক যখন আদি জননীর সান্ত্বনাবাক্যের জন্য উৎসুক হইয়া ওঠে, তখন সে কি শোনে—শান্তি, শান্তি—ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা।

ইহা এমন কি সান্ত্বনার। অন্তত এমন তুচ্ছ সান্ত্বনা আদিম জননীর যোগ্য নহে। প্রথম হইতে পাঠকের মনে যে ঔৎসুক্য ও আশা জমিয়া উঠিতেছিল, দুর্বল পরিসমাপ্তিতে তাহা একেবারে ভাঙিয়া না পড়িলেও পাঠককে বড়ই নিরাশ করিয়া দেয়।" অনুরূপ আর একটি বিরূপ সমালোচনা আছে মোহিতলাল মজুমদারের লেখায়। তিনি লিখিয়াছেন, "শেষের পর্বটিতে যে ধরণের ভাবনা আছে তাহাতে, কল্পনার নিজস্ব গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এতবড় একটা বিরাট দৃশ্যের সম্মুখে কবি সকল ভাবনা ভুলিয়া তাহার বিরাটত্বে নিজেও ডুবিয়া যাইতে পারেন নাই ; ঐ আত্মভাবের অতিরিক্ত সজ্ঞানতা এবং নিজ মানসের একটি বিশেষ প্রবণতা বা পক্ষপাত (সব কিছুকেই সুন্দর ও মধুর দেখিবার) তাঁহাকে সমুদ্রের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধস্থাপনেও যেমন, তেমনই তাহার সহিত ঐরূপ স্বগত-আলাপ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে—সমুদ্রের সেই sublime বা বিরাট গম্ভীর রূপ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃষ্টরোমা না হইয়া কবি তাহাতে মাতৃস্নেহের মাধুর্য মিশাইয়া একটা অদ্ভুত রস বা রসভাব সৃষ্টি করিয়াছেন।" এই দুটি সমালোচনায় কবির প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। প্রমথনাথ বিশীর অভিযোগ, কবিতার প্রথমাংশের ভাবসমুন্নতি দ্বিতীয় অংশে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। ভাবসমুন্নতির উচ্চতা বা অবনতি কতোটা কোথায় ঘটিয়াছে তাহার পরিমাপের দ্বারা কবিতাটির তাৎপর্য পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না সম্ভবত। কবিতার সর্বাংশে ভাবের একটা সমুন্নত স্তর রক্ষা করিতেই হইবে—এইরূপ কোনো নিয়মও কবির উপরে আরোপ করা যায় না। কবিতাটিতে প্রথম হইতে যে মাতৃভাবের রূপকল্প সৃজিত হইয়া উঠিয়াছে সেই কেন্দ্রীয় রূপকল্পের সূত্রেই আসিয়াছে সৃষ্টির বেদনার প্রসঙ্গ, প্রথমতঃ আদিমাতা সিন্ধুর গর্ভিণী রূপ এবং তাহারই প্রতিতুলনায় কবির শিল্পীমানসে নতুন সৃষ্টির ভাবপ্রেরণা। কবির অন্তর সমুদ্রে অভাবিতপূর্ব কোন্ এক

শিল্পসম্ভাবনার জগৎ সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে—এই অনুভূতিই কবিতার শেষ অংশে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বিষয় যাহাই হোক, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাধান্য পায় কবির নিজেরই অন্তরজগতের সত্যোপলব্ধি। এ কবিতাতেও সেই একই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। ইহাকে অসঙ্গতি বা ভাবের অবনমন বলা অর্থহীন। আর কবিতার একেবারে শেষে আবেগ যেখানে শমে পৌছিয়াছে, সেখানে সমুদ্রের মাতৃস্নেহস্পর্শে শান্তিকামনা কিছু বেসুরা শুনায় না।

মোহিতলালের অভিযোগ, কবি কেন সকল ভাবনা ভুলিয়া সমুদ্রের রূপের বিরাটত্বে ডুবিয়া যাইতে পারিলেন না। এ সম্পর্কে বলা যায়, বর্ণনীয় বিষয়ের বস্তুগত রূপটি ধরিয়া দেওয়া রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব নয়। সে জাতীয় কবিতার দাবি এক্ষেত্রে তাই অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় ভাবকল্পনার দিক হইতে যে সত্যানুভূতি কবিতায় মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার রসরূপ আস্বাদনের চেষ্টা করাই শ্রেয়। যাঁহার রচনা পাঠ করিতেছি তাঁহার ভাব ভাবনার স্বরূপবিরোধী কিছু কেন তিনি লেখেন নাই—এই সমালোচনা নিতান্তই অযৌক্তিক।

এই কবিতার প্রত্যক্ষ প্রেরণা একটি বাস্তব সমুদ্রের দৃশ্য। সমুদ্রদৃশ্য কবির মনে সৃষ্টি-রহস্য বিষয়ে একটি সত্যানুভূতি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। এই উপলব্ধির দুই স্তর। সমুদ্র কিভাবে বসুন্ধরাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল—তাহার কল্পিত-চিত্র পাই প্রথম স্তরে। দ্বিতীয় স্তরে আসিয়াছে মানব মনো-বিশ্বের সৃজন রহস্যের কথা। "কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গ-নরক, কত বিশ্বাস-সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত-জটিল-সহস্ররকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার" মনের অতলে ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, পূর্ণতর মূর্তিতে আত্মবিকাশের প্রতীক্ষায় আছে। সৃষ্টিশীল শিল্পীমনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ অন্তর্লোকের এই সৃজ্যমান ভুবনের আভাস এই কবিতায় ধরিয়া দিয়াছেন। অপূর্ব এই অনুভূতির প্রকাশ :

"শুধু অর্ধ-অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা —
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।

তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পুরে।"

ভাষার এই অসাধারণ ব্যঞ্জনাশক্তি বাঙলায় একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথেরই দান। সূক্ষ্ম অনুভূতির বাহনরূপে বাঙলা ভাষা এখানে এক নতুন শক্তি অর্জন করিয়াছে। এই কাব্যভাষার, এই কবিতার রস বক্তব্যগত সঙ্গতি-অসঙ্গতির নিরিখে বিচার্য নয়, মর্মের দৃষ্টিতেই ইহার রস ধরা দেয় যথার্থভাবে।

পরিশেষে কবিতাটির ছন্দ সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই ছন্দকে বলা হয় মহাপয়ার। সাধারণ পয়ার ১৪ মাত্রায় গঠিত, কিন্তু এখানে পঙক্তিগুলি ১৮ মাত্রার। শ্বাস যতির বিভাগ অনুসারে ৮+১০ এইরূপ দুই পর্বে পঙক্তিগুলি গঠিত। কিন্তু ভাবপ্রবাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য পঙক্তির শেষে অর্থযতি স্থাপন করা হয় নাই, পঙক্তিসীমা লঙ্ঘন করিয়া পরবর্তী পঙক্তিতে ভাবপ্রবাহ অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে কবি এই গতি-বিন্যাস-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য মধুসূদনের পঙক্তির শেষে মিল নাই, রবীন্দ্রনাথ মিল রক্ষা করিয়াছেন। ছন্দের পরিভাষায় ইহাকে প্রবাহমান মহাপয়ার বলা হয়।

টীকা, শব্দার্থ ও মন্তব্য

[**প্রথম স্তবক**] **হে আদিজননী সিন্ধু**—রবীন্দ্রনাথ বসুন্ধরাকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করিতে অভ্যস্ত। এখানে বসুন্ধরার জননী বলিতেছেন সমুদ্রকে, তাই সমুদ্রের বিশেষণরূপে 'আদিজননী' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। **বেদমন্ত্রসম ভাষা**—সমুদ্রের কল্লোলধ্বনিকে বেদমন্ত্রের ধ্বনির সহিত তুলনা করিয়াছেন। নিহিত অর্থ, মন্ত্র উচ্চারিত হয় দেবতার উদ্দেশে শুভকামনারূপে। সমুদ্র যেন তাহার একমাত্র সন্তান বসুন্ধরার মঙ্গলকামনায় দেবলোকের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে, অর্থাৎ সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি দেবতাদের উদ্দেশে উচ্চারিত মাঙ্গলিক মন্ত্র যেন। **মহেন্দ্রমন্দিরপানে**—ইন্দ্রের মন্দিরের উদ্দেশে, স্বর্গের উদ্দেশে। **নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার**—পৃথিবী সমুদ্রের নীল জলের দ্বারা বেষ্টিত। নীল জলকে আদিজননী সিন্ধুর নীল বস্ত্রাঞ্চল বলা

হইয়াছে। সন্তানকে যেমন মাতা অঞ্চলে আবৃত করিয়া রাখেন সমুদ্রও সেইরূপ পৃথিবীকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। **সুকোমল সুকৌশলে**—সন্তানের প্রতি মাতার সযত্ন সতর্কতার ভাব দ্যোতনা করিতেছে এই দুটি শব্দ। আদিজননী সিন্ধু তাহার কন্যা বসুন্ধরাকে অঞ্চলে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কন্যার দেহে কোন ক্লেশ যাহাতে না হয় সেইজন্য যেন সতর্কতার অন্ত নাই। **অম্বুনিধি**—সমুদ্র। **ধীরে ধীরে পা টিপিয়া পিছু ......ঝাঁপিয়ে পড় বুকে**—এই বর্ণনার ভিত্তি সমুদ্র-সৈকতের উপরে ঢেউ ভাঙ্গিয়া পড়ার বাস্তব দৃশ্য। এক একটি ঢেউ সৈকতের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তারপর সেই জলরাশি পিছু হটিয়া যায়, আবার পরবর্তী ঢেউ আসে। ক্রমাগত এই দৃশ্যের পুনরাবর্তন চলিতে থাকে। কবি সমুদ্র-সৈকতের এই বাস্তব দৃশ্যের উপরে মানবিক ভাব আরোপ করিয়াছেন। জলরাশির পিছু হটিয়া যাওয়া যেন কন্যা বসুন্ধরার প্রতি মাতা সমুদ্রের কপট অবহেলা প্রদর্শন। পরমুহূর্তেই আবার উদ্বেলিত স্নেহে সে কন্যাকে তীব্র আলিঙ্গনে আবিষ্ট করে। **রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে**—ঢেউ যখন ছুটিয়া আসিয়া মাটির উপরে ভাঙিয়া পড়ে তখন সর্বত্র সাদা ফেনা ছড়াইয়া যায়। এই সাদা ফেনাকেই মাতা সমুদ্রের শুভ্র হাস্য বলা হইয়াছে। **নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট**—তরল জলে পূর্ণ সমুদ্রকে কবি বিগলিত স্নেহে পূর্ণ অন্তর বলিতেছেন। **তাহার অগাধ শান্তি·· তার অশ্রুরাশি**—মহাসমুদ্রের বিচিত্র রূপের উপরে কবি মাতৃভাব আরোপ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন। কখনো সমুদ্র শান্ত, কখনো উত্তাল তরঙ্গে প্রকাশ পায় কী এক অজ্ঞাত ব্যাকুলতা। কখনো গর্জন মন্দীভূত হইয়া আসে আবার কখনো জাগে কল্লোলধ্বনি। এইরূপ বৈচিত্র্য, ধ্বনি-বৈচিত্র্য লইয়া মহাসমুদ্র এক রহস্যের আলয়। কিন্তু কবির কল্পনায় এই প্রাকৃতিক রহস্য রূপান্তরিত হইয়াছে মাতৃহৃদয়ের মানবিক অনুভূতির লীলায়। স্নেহব্যাকুলা মাতা যেমন কখনো ব্যাকুল, কখনো মৌন, কখনো সমুচ্ছল কল-কথায় আপন হৃদয়ভাব ব্যক্ত করেন, কখনো তৃপ্তির হাসি ছড়ায় তাহার মুখে, কখনো অশ্রুতে প্লাবিত হয়—কবি ঠিক এই ব্যাকুল মাতার ভাবমূর্তিরূপেই সমুদ্রের বর্ণনা করিয়াছেন। **স্নেহপূর্ণস্ফীতস্তনভারে উন্মাদিনী......নির্দয় আবেগে**—প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সমুদ্র যখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে, তাহার সেই রূপের ভয়ঙ্করত্বকেও কবি মাতৃভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সমুদ্রের সেই রূপ, সে যেন প্রবল স্নেহবুভুক্ষায় উন্মাদিনী মাতার রূপ। মাতার স্তন দুগ্ধে পূর্ণ হইয়া উঠিলে সে যেমন

সন্তানকে প্রবল আকর্ষণে আপন বক্ষের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া নেয়, সমুদ্রেও কখনো কখনো সেইরূপ প্রচণ্ড আবেগে ধরিত্রীকে আলিঙ্গন করে। সন্তান যে এই প্রবল আলিঙ্গনে পীড়িত হইতেছে স্নেহের আতিশয্যে উন্মাদিনী মাতার সে চেতনা থাকে না। **উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায়··· প্রকাণ্ড প্রলয়ে**—সমুদ্রের সেই উন্মাদিনী রূপ দেখিয়া মনে হয় যেন স্নেহক্ষুধায় আপন সন্তানকে সে আবার নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া লইতে চায়। 'সন্তান' বা বসুন্ধরার পক্ষে সেরূপ ঘটনা একটা প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার সন্দেহ নাই। **পরক্ষণে মহা অপরাধী প্রায়·· ·ব্যাথায় নিষণ্ণ নিশ্চল**—ঝটিকার অন্তে সমুদ্রের প্রশান্ত রূপের বর্ণনা। যেন আবেগের আতিশয্যে অকস্মাৎ নিষ্ঠুরের মতো বসুন্ধরাকে স্নেহপীড়নে পীড়িত করিয়া মনে অনুশোচনা দেখা দিয়াছে। তাই সে অপরাধীর মতো চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। নিষণ্ণ=উপবিষ্ট, শায়িত। **সন্ধ্যাসখী ভালোবেসে······অনুতাপে ফুলে ফুলে**—স্থির সমুদ্রের উপরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, রাত্রি নামে। উচ্ছ্বাস প্রকাশের পর অপরাধবোধে মর্মাহত আদিজননীকে সন্ধ্যা যেন সান্ত্বনা দিয়ে যায়, রাত্রি যেন তাহার অনুতাপ ক্রন্দন শোনে।

[**দ্বিতীয় স্তবক**] **আমি পৃথিবীর শিশু**—এখন হইতে কবিতার দ্বিতীয় স্তব শুরু হইয়াছে। এতক্ষণ আদিজননী সিন্ধু ও তার একমাত্র কন্যা বসুন্ধরার পারস্পরিক সম্পর্ক চিত্রিত হইতেছিল। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি বা ভাবনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। এতক্ষণ কবি যেন কতকটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বসুন্ধরার সহিত সমুদ্রের স্নেহলীলা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু এ জাতীয় নৈর্ব্যক্তিকতা রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব নহে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আপনার নিগূঢ় সম্পর্ক বন্ধন রচনাই তাঁহার প্রকৃতি চেতনার বৈশিষ্ট্য। কবির এই মনোধর্মের দিক হইতে কবিতার প্রথম অংশের চেয়ে দ্বিতীয় অংশই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবি এই অংশের সূচনায় নিজেকে পৃথিবীর শিশু অর্থাৎ পৃথিবীর সন্তান বলিয়াছেন। যে বসুন্ধরা একদিন আদিজননী সমুদ্রের জঠরের মধ্যে ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে কবি তাহার সহিত সন্তান সম্পর্কে সম্পর্কিত। এবং এই সম্পর্কসূত্রে তিনি মর্মের মধ্যে আদিজননী সমুদ্রের মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা, তাহার আনন্দ-বেদনার স্বরূপ কিছুটা অনুভব করিতে পারেন। **বোবার ইঙ্গিত ভাষা-হেন আত্মীয়ের কাছে**—সমুদ্রের কল্লোলে গর্জনে যে ভাব অভিব্যক্ত হয় তাহা অনেকটা বোবার ভাষার মতো, অর্থাৎ ইঙ্গিতময় ভাষা। কবি নিজেকে সমুদ্রের আত্মীয় মনে করেন। এই

আত্মীয়তার সূত্রেই সেই ইঙ্গিতময় ভাষার মর্ম কিছুটা যেন বুঝিতে পারেন। **অন্তরের মাঝখানে……ওই ভাষা জানে**—সমুদ্রপ্রকৃতির সহিত কবির যোগ অন্তরের নিগূঢ় যোগ। কবির শিরায় শিরায় স্পন্দমান, বহমান রক্তধারার মধ্যে যেন সমুদ্রের ব্যাকুলতা, চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হইয়া আছে। **যেন মনে পড়ে……মুদ্রিত হইয়া গেছে**—কেন সমুদ্রকে এমন আত্মীয়বৎ মনে হয়? কেন তাহার ভাষা মনে হয় পরিচিত? কারণ একদিন বসুন্ধরা যখন সমুদ্রের মধ্যে গর্ভবাস করিত তখন কবিও তো বসুন্ধরার অঙ্গীভূত অণুপরমাণুরূপে সমুদ্রের গর্ভে বাস করিয়াছেন। তিনি অনুভব করিতেছেন, ভ্রূণরূপী বসুন্ধরার মধ্যেও তাঁহার অস্তিত্বের কোনো একটা রূপ সত্য ছিল। সেই সুদূর অতীতে সমুদ্রের নিয়ত-কল্লোলিত ভাষা যেন কবির সত্তার মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাই আজ সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের ভাষা নিতান্ত অচেনা মনে হইতেছে না। **গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন**—মাতা যেমন আপন প্রাণসম্পদে গর্ভস্থ শিশুকে পুষ্ট করিয়া তোলে, সেই গর্ভস্থ শিশুকে ঘেরিয়া যেমন মাতার প্রাণ নিয়ত স্পন্দিত হয়, তেমনি সমুদ্রগর্ভস্থিত পৃথিবীও সমুদ্রের দ্বারা পুষ্ট, পৃথিবীকে ঘেরিয়া সেদিন সমুদ্রের জীবন স্পন্দিত হইত। পৃথিবীর সন্তানরূপে কবি উত্তরাধিকারসূত্রে সেই স্পন্দমান সমুদ্রের প্রাণের ভাব ও ভাষা বুঝিবার শক্তি অর্জন করিয়াছেন। **দিবারাত্রি গূঢ়……নিরন্তর উচিত ব্যাকুল**—চরাচর যখন শুধু জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই আদিম অবস্থার বর্ণনা। তখনও সমুদ্র হইতে ভূভাগ জাগিয়া ওঠে নাই। দিক্-দিগন্তব্যাপ্ত তরল জলরাশি আলোড়িত হইত। কবি এই আদিম সমুদ্রের উপরে গর্ভিণী নারীর লক্ষণসমূহ আরোপ করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যকে মানবিক মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। সে সমুদ্র একাকিনী, কারণ তখনও কোলে সন্তানকে (বসুন্ধরাকে) পায় নাই। গর্ভলক্ষণের সূচনায় নারী যেমন নিজের মধ্যে এক রহস্যানুভূতি অনুভব করে—সমুদ্রের জলও সেইরূপ। নিজের মধ্যে আর একটি সত্তাকে বহন করিবার অনুভূতি, অজাত সন্তানের জন্য আশঙ্কা-ব্যাকুলতা এবং ভালোবাসার উন্মেষ—এই ভাবাবেগ কবি সমুদ্রের উপরে আরোপ করিয়াছেন। অজাত সন্তানকে ঘেরিয়া নানা আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, সন্তানকে লইয়া জীবনের যে নূতন পর্ব শুরু হইবে তাহার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। আদিম সমুদ্রের সদা চাঞ্চল্যে এই মনোভাব অভিব্যক্ত হইত—ইহাই কবির কল্পনা। **প্রতি প্রাতে উষা এসে……জন্মদিন**—ধাত্রী যেমন গর্ভিণীর গর্ভদশা মুক্তির দিনক্ষণ গণনা করে, সেই আদিম সমুদ্রের উপরে সমাসন্ন উষা সেইরূপ পদ্ধতিতে

গর্ভিণী সমুদ্রকে পর্যবেক্ষণ করিত। **হৃদয়ে আমার যুগান্তর স্মৃতি-উদিত হতেছে বারম্বার**—মৃত্তিকাহীন জলময় চরাচরের যে রূপ কবি কল্পনা করিয়াছেন তাহা লক্ষকোটি বর্ষ পূর্বেকার সত্য। আদিম সমুদ্রের সেই গর্ভিণী-ভাব সম্পর্কে তাই "যুগান্তর স্মৃতিসম" কথাটি সুপ্রযুক্তই হইয়াছে। **আমারো চিত্তের মাঝে……মর্মর স্বর**—প্রসঙ্গত ছিন্নপত্রগ্রন্থের এই পত্রখানি স্মরণীয়: "আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম (আদিম সমুদ্রের মত) তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে। কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের প্রণয়, কত স্বর্গ-নরক, কত বিশ্বাস-সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষণাতীত প্রমাণাতীত অনুভব ও অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত-জটিল-সহস্ররকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। বৃহৎ সমুদ্রের তীর কিংবা মুক্ত আকাশের নীচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না।" সমুদ্রের নীচে যেমন ধীরে ধীরে মহাদেশসমূহ সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছিল কবি অনুভব করেন তাঁহার অন্তরতলেও সেইরূপ একটা সৃজন ব্যাপার চলিতেছে। মানুষ যেসব ভাব-ভাবনা ভাষায় স্পষ্ট মূর্তিতে প্রকাশ করে, যে সকল অনুভূতি আশা-আকাঙ্ক্ষা শিল্পে সাহিত্যে স্থায়ী মূর্তিতে ধরিয়া দেয়, সেই ভাব সেই অনুভূতি দীর্ঘদিন চিত্তের গহনে, অবচেতন মনের সমুদ্রের মতোই রহস্যময় জগতে ধীরে ধীরে পুষ্ট হইয়া ওঠে। কবি এই মানসিক সৃষ্টি ব্যাপারের সহিত সামুদ্রিক সৃষ্টি ব্যাপারের সাদৃশ্য দেখাইতেছেন। **আকারপ্রকারহীন……প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা**—মানব অন্তরের মধ্যে সৃজ্যমান এই যে ভাব ও অনুভূতি-রাজি—ইহা বাহিরে প্রমাণ করিয়া দেখানোর উপায় নাই, প্রত্যক্ষের অর্থাৎ দৃষ্টিগোচরতার বাহিরে ইহার অবস্থান। ইহার অস্তিত্ব শুধু অনতিস্ফুট অনুভূতি-রূপেই অনুভব করা যায়। **জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে**—অন্তর্লীন সৃজ্যমান ভাব-ভাবনাগুলির অস্তিত্ব যে আমরা অনুভব করি—এই অনুভব গর্ভিণী নারীর গর্ভস্থিত ভ্রূণের অস্তিত্ব অনুভবের মতো। সেই ভ্রূণাবস্থার শিশুটিকে ঘেরিয়া যেমন মাতৃহৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হয়, তাহার জন্য স্তনে যেমন দুগ্ধের সঞ্চার হয়, আমাদের মনের সৃজ্যমান ভাব-ভাবনাগুলি সম্পর্কেও সেইরূপ আমাদের মনে একটা মহত্ত্বের ভাব সঞ্চারিত হয়। ইহারা

একান্তভাবে আমাদেরই সৃষ্টি। আমাদেরই অস্তিত্বের অঙ্গীভূত এইরূপ বোধ জাগিয়া ওঠে। **তুমি সিন্ধু প্রকাণ্ড হাসিয়ে ...কোলের শিশুর মতো**—কবি আপন মনের অপার রহস্যানুভূতি লইয়া রহস্যময়ী সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আছেন। সমুদ্রের সহিত একটা আন্তরিক যোগ অনুভব করিতেছেন। 'নাড়ীর টান' কথাটিতে সমুদ্রের সহিত অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার ভাব দ্যোতিত হইয়াছে।

[**তৃতীয় স্তবক**] **জান কি তোমার ধরাভূমি .....উষ্ণশ্বাস**—'ধরাভূমি পীড়ায় পীড়িত' এই উক্তিটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করিয়া ধরার সন্তান, অর্থাৎ মানবসাধারণের চিত্তপীড়া অর্থেই গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলেই পরবর্তী অংশের সহিত অর্থসঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব হয়। **নাহি জানে কী যে চায় ...... বিকারের মরীচিকা-জালে**—পৃথিবী সম্পর্কে নয়, পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কেই এই উক্তি। তুলনীয়, 'বসুন্ধরা' কবিতায় :

"নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব, নাহি ঘরপর
... ...
পরিতাপ-জর্জরপরাণে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়"—ইত্যাদি।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, উচ্চাশার অন্ত নাই, তাই ব্যর্থতার দুঃখেরও শেষ নাই। এই দুরাশাতাড়িত মানবচিত্ত যেন বিকারগ্রস্ত হইয়া মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিতেছে। 'বসুন্ধরা' কবিতার উদ্ধৃত অংশে এই বিকারের চেয়ে আদিম জীবনের বর্বরতাকেও কবি বরণীয় মনে করিয়াছেন। এখানে এই চিন্তাজ্বরতপ্ত জীবনের উপরে সমুদ্রের শান্তিপ্রদায়ী স্পর্শ প্রার্থনা করিয়াছেন। উভয়ক্ষেত্রেই কবির মনোবৃত্তি এক। **অতল গম্ভীর তব......জলদমন্দ্রের মতো**—আষাঢ়ের মেঘগর্জনের মতো গভীর গম্ভীর সমুদ্রকল্লোলধ্বনিতে যন্ত্রণাকাতর ধরিত্রীর সন্তানদের উদ্দেশ্যে শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী উচ্চারিত হোক।

ব্যাখ্যা

[এক] এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও ; আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে—
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্বসুখে
আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্মল ললাট
আশীর্বাদে। [প্রথম স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পুরীর সামুদ্রিক দৃশ্য কবিতাটির প্রত্যক্ষ প্রেরণা এবং সমুদ্রের যে বাস্তব বর্ণনাটুকু এ কবিতায় আছে তাহা পুরীর সমুদ্র সৈকতে ঢেউ ভাঙিয়া পড়ার দৃশ্যই মনে করাইয়া দেয়। দূর সমুদ্র হইতে বিপুল আকার তরঙ্গগুলি ছুটিয়া আসে, মুহূর্তে সেই জলরাশি সৈকতভূমি প্লাবিত করিয়া দেয়। কল্লোল-গর্জনে, জলোচ্ছ্বাস সমুদ্র-সৈকত পূর্ণ হইয়া যায়। তারপর আসে সেই ঢেউভাঙা ছড়ানো জলরাশির আবার সমুদ্রে ফিরিয়া যাওয়ার পালা। কবি আলোচ্য অংশে এই দৃশ্যেরই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যেরই উপরে মানবিক ব্যবহার আরোপ করিয়াছেন।

তটভূমি হইতে জল যখন সমুদ্রের দিকে নামিয়া যায় সেই প্রত্যাবৃত্ত জলরাশির গতি হয় স্বভাবতঃই স্তিমিত। কবি সমুদ্রের এই ব্যবহারে কন্যা বসুন্ধরার সহিত আদিজননী সমুদ্রের স্নেহলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সমুদ্রের এই পিছু হটিয়া যাওয়া যেন কন্যার প্রতি কপট অবহেলা প্রদর্শন। কিন্তু এমনভাবে কন্যাকে আঘাত দিয়া মাতার মন মানে না। তাই আবার পূর্ণ আবেগে সে কন্যাকে অভিনন্দন করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। ধরিত্রীর বুকে সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসকে কবি মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সমুদ্রের জলে ধরিত্রী সিক্ত হয়, কবি বলেন যে সমুদ্রমাতার স্নেহের স্পর্শ। সন্তানকে এমন আকুলভাবে ভালোবাসার আনন্দই যেন প্রকাশ পায় রাশি রাশি শুভ্র হাস্যে, অর্থাৎ ভাসমান ফেনরাশিতে। এইভাবে একটি সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য অপত্য-স্নেহের ভাবারোপে তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

[দুই] উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মতো তারে বাঁধি
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিরা ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তিমাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধী প্রায়
পড়ে থাক তটতলে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
নিষণ্ণ নিশ্চল। [প্রথম স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সমুদ্রের সহিত ধরিত্রীর অপত্য সম্পর্ক কল্পনা করিয়া কবি সমুদ্রকে এই কবিতায় স্নেহব্যাকুল মাতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। একমাত্র সন্তানের জননীর স্নেহোৎকণ্ঠা যেমন কিছুতেই ঘোচেনা, নানাভাবে তাদের আলিঙ্গনে স্নেহক্ষুধা নিবারণ করিতে প্রয়াস পায়, নিয়ত আন্দোলিত তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রকে কবি সেই একমাত্র জননীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সামুদ্রিক দৃশ্যের নানা রূপবৈচিত্র্যের উপরে এই মাতৃভাব আরোপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সমুদ্র কখনো কখনো অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করে। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশি মাটির উপরে প্রতিহত হইয়া মাটি কাঁপাইয়া দেয়। সে এক রাক্ষসীমূর্তি সমুদ্রের। কবি এই ভয়ঙ্কর সমুদ্রকেও তাঁহার মাতৃরূপ কল্পনার সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন। মাতৃস্নেহ যেন একটা প্রবল ক্ষুধার আকারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। আপন সন্তানকে আপনার বাহিরে রাখিয়া তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। তাই সমুদ্র সঘন প্রবল তরঙ্গালিঙ্গনে ধরিত্রীকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিতে, নিজের মধ্যে ফিরাইয়া লইতে উদ্যত। এ প্রবল স্নেহোচ্ছ্বাস একটা প্রলয়ের আকার ধারণ করিতেছে। আবার উচ্ছ্বাস কাটিয়া যায়, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র শান্ত হইয়া আসে। গগনস্পর্শী তরঙ্গগুলি ভাঙিয়া, ছড়াইয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, দেখিয়া মনে হয় উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে সন্তানকে পীড়ন করার জন্য তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছে কুণ্ঠা এবং অপরাধবোধ। সন্তানকে অমনভাবে নিষ্ঠুর পীড়নে পীড়িত করায় তাহার চিত্ত বেদনাভারাক্রান্ত। সমুদ্রের সেই প্রশান্ত, অচঞ্চল রূপ দেখিয়া কবির মনে হইয়াছে, এ যেন এক বিষাদখিন্ন নারী, বিষাদবেদনার ভারে নিশ্চল হইয়া শায়িত রহিয়াছে। এইভাবে সমুদ্রের রূপবৈচিত্র্যের উপরে কবি স্নেহব্যাকুলা মাতার আচরণ-বৈচিত্র্য আরোপ করিয়া সমুদ্রকে মানবিকতায় মণ্ডিত করিয়াছেন।

[তিন] সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

[দ্বিতীয় স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'সমুদ্রের প্রতি' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আলোচ্য অংশটি কবিতার দ্বিতীয় অংশের অন্তর্গত, যেখানে সমুদ্রের সহিত কবি নিজের এক জন্মান্তরীণ সম্বন্ধের প্রসঙ্গ বিবৃত করিয়াছেন। 'বসুন্ধরা' সমুদ্রের একমাত্র সন্তান। মহা-সমুদ্রের গর্ভে দীর্ঘদিন ধরিয়া পুষ্ট হইয়াছিল এই বসুন্ধরা। কবি নিজেকে পৃথিবীর শিশু বা বসুন্ধরার সন্তানরূপে পরিচয় দিয়াছেন এবং বলিতেছেন মাতা বসুন্ধরার অণুপরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বুঝিবা তিনি নিজেও একদা সমুদ্রগর্ভে বাস করিয়াছেন। কিংবা, অন্যভাবে বলা যায়, কবির দেহ গঠিত যে অণুপরমাণুতে তাহা যেহেতু বসুন্ধরারই অংশ, সুতরাং কবির দেহের মধ্যেই একদা সমুদ্রগর্ভবাসের স্মৃতি ধৃত হইয়া আছে। সেই জন্মপূর্বের স্মৃতিসূত্রে সমুদ্রের ভাষা যেন অস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন। একদা সমুদ্রের আবেগ তরঙ্গে তরঙ্গে প্রহত হইত তাহার গর্ভস্থিত বসুন্ধরার দেহে। মাতৃহৃদয়ের সেই জীবনস্পন্দন পৃথিবীর উপরে দিনে দিনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর শিশু, কবি নিজের শিরায় শোণিতে আদিজননী সিন্ধুর সেই জীবনস্পন্দন অনুভব করিতে পারেন। সমুদ্রের সহিত জন্মান্তরীণ এই আত্মীয়তার বোধ নিয়ত আলোড়িত সমুদ্রের মর্মের ভাষা বুঝিতে তাঁহাকে সাহায্য করে।

'বসুন্ধরা' কবিতায়ও যেমন তেমনি এই কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত একটা সজীব সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। অপার রহস্যময় সমুদ্রকেও তিনি আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেন। মাতৃস্নেহের অন্তরঙ্গতায় এই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত, সমুদ্র ও বসুন্ধরার সহিত কবির এই যে একাত্মবোধ, ইহাই তাঁহার প্রকৃতিচেতনার বৈশিষ্ট্য।

[চার] সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহাভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তর স্মৃতিসম উদিত হতেছে বারম্বার। [দ্বিতীয় স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'সমুদ্রের প্রতি' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'সমুদ্রের প্রতি' সাধারণ সামুদ্রিক দৃশ্য বর্ণনার কবিতা নয়। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কল্পনায় মহাসমুদ্র আদিমাতা-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। কল্পনা প্রসারিত হইয়াছে সেই সুদূর অতীতে, যেদিন চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া শুধু অপার জলরাশি বিরাজ করিত। ধরিত্রী তখনও সমুদ্রগর্ভে। কবি এই আদিম সমুদ্রকে গর্ভিণী মাতারূপে কল্পনা করিয়াছেন। সেদিন ভূভাগ বলিতে কিছু ছিল না, শুধু অতলান্ত সমুদ্রের জল বিশ্বে আলোড়িত হইত। এই সমুদ্রের গর্ভে ধীরে ধীরে ভূখণ্ড গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। সেই আদিম সমুদ্র অন্তঃসত্ত্বা নারীর মতো অজাত সন্তানের জন্য যেন হৃদয়ের মধ্যে স্নেহচাঞ্চল্য অনুভব করিত। সন্তান জন্মের মুহূর্তটির জন্য তাহার উদ্বেগ, তাহার প্রতীক্ষা, তাহার বাসনা কবি অনুভব করিতে পারেন। যুগান্তর স্মৃতির মতো অনতিস্পষ্টভাবে কবির অনুভূতির মধ্যে সেই আদিম সমুদ্রের গর্ভিণী ভাব ধরা দেয়। ধরা দেয়, অনুভব করিতে পারেন, কারণ বসুন্ধরার অঙ্গীভূত হইয়া কবি নিজেও সেদিন সমুদ্রগর্ভে বাস করিয়াছেন। বসুন্ধরারই অংশ অণুপরমাণুর দ্বারা কবির দেহ গঠিত। আর এই উপাদান একদিন আদিমাতা সমুদ্রের গর্ভেই নিহিত ছিল। সুতরাং সমুদ্রের সহিত আত্মীয় সম্পর্ক কল্পনা করেন কবি। সমুদ্রের সম্মুখীন হইতেই সেই জন্মান্তরীণ সম্পর্কের বোধ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং সমুদ্রকে আদিজননী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

সমুদ্রের দৃশ্যরূপের বর্ণনা কবির উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় কখনো সেইরূপ বর্ণনা প্রাধান্য পায় না। তিনি একটা সম্পর্ক বন্ধন স্থাপন করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঐকাত্ম্য আকাঙ্ক্ষা করেন। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাতেও সেই অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার কথা, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।

[পাঁচ] মানবহৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা—
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।

[দ্বিতীয় স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'সমুদ্রের প্রতি' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আদিম সমুদ্রের গর্ভে সৃজ্যমান বসুন্ধরার কল্পনা হইতে কবি মানবমনের সৃজন-রহস্যের প্রসঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমুদ্রগর্ভে যখন ধীরে ধীরে ভূখণ্ড গঠিত হইয়া উঠিতেছিল—সেদিন সেই সৃষ্টি ব্যাপার ছিল সংগোপন। চরাচরব্যাপ্ত জলরাশির গর্ভে এই বিচিত্র ভূখণ্ডের জন্ম যেমন একটা বিপুল সৃষ্টি রহস্যের ব্যাপার, মানুষের মনের অতলে ভাব-ভাবনার জগৎটি গঠিত হইয়া ওঠাও কবির নিকট সেইরূপ রহস্যময় বোধ হইতেছে। চিন্তা ও চেতনার পলি পড়িয়া মানুষের মনের মধ্যে এক-একটা ভাব আকারবদ্ধ হইয়া ওঠে। কতো আশা আকাঙ্ক্ষার উত্তাপে লালিত সেই ভাবনাগুলি। এই যে সৃজ্যমান ভাবজগৎ, বাহিরে ইহার কোনো প্রমাণ নাই কোথাও। সে প্রত্যক্ষের অগোচর। কিন্তু প্রত্যক্ষের অগোচর বা প্রমাণের অতীত বলিয়াই অসত্য নয়। যাহার মনে এই ভাব সৃষ্টি হয়, সে জানে কীভাবে পলে পলে তাহার অবয়ব মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। কবির মনে আছে অন্তঃসত্ত্বা নারীর উপমা। গর্ভিণী নারী যেমন আপন গর্ভের সন্তানের অস্তিত্ব জানে, ভাবুক মানুষ সেইরূপ জানে তাহার নিহিত ভাবের অস্তিত্ব। এই উপমার টানে কবি মানবমনের সৃজন ব্যাপারের সহিত আদি সমুদ্রের তুলনা আনেন। মহাসমুদ্রের গর্ভে সৃজ্যমান ভূখণ্ডের মতোই মানব মনের অতলে গঠিত হইয়া উঠিতেছে ভাব-ভাবনার অতি বিচিত্র জগৎ। সেই ভাব-ভাবনা যখন প্রস্তুত হইবে, স্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভাষার শিল্পে রূপলাভ করিবে তখন মানবমনের আনন্দ-বেদনার উৎসরূপে অভিনন্দিত হইবে। কিন্তু কবির চিন্তা নিবিষ্ট রহিয়াছে প্রকাশের পূর্বস্তরে অন্তর্নিহিত ভাবের স্বরূপ চিন্তায়।

কবি হিসাবে, শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ জানেন কতদীর্ঘ সাধনায় এক একটি ভাবমূর্তি পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। জানেন, কত প্রযত্নে ভাবগুলিকে পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। সেই প্রযত্ন, সেই প্রতীক্ষা সন্তানের জন্য মাতার চিন্তা-চেষ্টা-উদ্বেগের সহিতই তুলনীয়। সন্তান লালনের উপমার সূত্রে এইভাবে কবির মনোলোকে ভাববিগ্রহ সৃষ্টি ও সমুদ্রের গর্ভে বসুন্ধরার সৃষ্টি ব্যাপার পরস্পর সংলগ্ন হইয়াছে।

[ছয়] নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো ; স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি,
সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা,
বলো তারে 'শান্তি, শান্তি', বলো তারে, ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা।
[তৃতীয় স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' নামক কবিতার শেষ অংশ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দীর্ঘ কবিতার শেষে কবির ভাবাবেগ যখন শমে পৌঁছিয়াছে, সেই ক্ষণে আদিজননীর উদ্দেশে শান্তির স্পর্শ প্রার্থনা করিয়াছেন। আলোচ্য অংশে ঠিক আগের তিনটি পঙ্‌ক্তিতে কবি পৃথিবীর পীড়িত দশার কথা বলিয়াছেন, যদিও কবি বলিয়াছেন 'তোমার ধরাভূমি পীড়ায় পীড়িত আজি' তবুও এখানে কবিতার অর্থগত সামঞ্জস্যের জন্য 'ধরাভূমির পীড়া' অর্থে পৃথিবীর মানুষের অসুস্থতাই বুঝিতে হইবে।

কেন এই অসুস্থ দশা? মানুষের জীবন ক্রমেই এক জটিলতর পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। তাহার দুরাশার অন্ত নাই, আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিও নাই। হয়তো স্পষ্টভাবে জানেও না কী সে চায়, কিসে তৃপ্তিলাভ করিবে। এই উদ্দেশ্যহীন আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তাড়িত মানুষের জীবন বিকারের মরীচিকা জালে জড়িত। ধরিত্রীর সন্তানদের এই তাপিত ব্যথিত জীবনে আদিমাতা সমুদ্র সান্ত্বনা বহন করিয়া আনুক, ইহাই কবির প্রার্থনা। মাতা যেমন অসুস্থ

সন্তানের ললাটে স্নিগ্ধ করস্পর্শে তাহার জ্বালা যন্ত্রণা দূর করিয়া দেয়, কবির প্রার্থনা, সমুদ্র সেইরূপ স্নিগ্ধ স্পর্শ রাখুক আমাদের জীবনে। আদিমাতা সমুদ্রের স্নেহ চুম্বনে শান্ত ধরিত্রীতে, ধরিত্রীর মানুষের চোখে নিদ্রার শান্তি নামিয়া আসুক।

কবিতার শেষ পঙক্তিটিতে মাতৃকণ্ঠের ঘুম পাড়ানো সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। একটা প্রশান্তির আশ্বাসের মধ্যে এইভাবে কবিতাটি শেষ হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

[এক] **"সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের······বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে। পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকের এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত। আমার অন্তর-সমুদ্রেও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠেছ।"—রবীন্দ্রনাথের এই অনুভূতি তাঁহার 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিতে কিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে আলোচনা কর।** [ক. বি. ১৯৫৭]

উত্তর। নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রকৃতির বাস্তবরূপ বর্ণনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো আকর্ষণ নাই। দৃশ্যরূপের বৈচিত্র্যময় বিশ্বপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি সজীব সত্তারূপে প্রতিভাত হয়। কবি আপন মানবিক অভিজ্ঞতাগুলি আরোপ করিয়া প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যকে মানবিক তাৎপর্যে মণ্ডিতভাবে বর্ণনা করেন। সজীব এই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আপন অস্তিত্বের সংযোগ আবিষ্কার রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের সৃষ্টিলীলার সহিত আপন অস্তিত্বের এই নিগূঢ় সম্পর্কের উপলব্ধি প্রকাশ পাইয়াছে প্রকৃতিবিষয়ে রচিত তাঁহার অজস্র কবিতা ও গানে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি এইদিক হইতে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। সমুদ্রের রূপ বর্ণনা এখানে কবির উদ্দেশ্য নয়। সেরূপ প্রত্যাশা লইয়া এ কবিতা পাঠ করিলে নিরাশ হইতে হইবে। সামুদ্রিক দৃশ্যের যেটুকু বর্ণনা আছে, তাহার উপরে কবি একটা কল্পিত ভাব আরোপ করিয়াছেন। ফলে ওই ভাব-কল্পনাই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সামুদ্রিক দৃশ্যের বাস্তবরূপ গৌণ হইয়া গিয়াছে।

নিয়ত আন্দোলিত সমুদ্রের তরঙ্গগুলি তটভূমির উপরে প্রহত হইতেছে, ঢেউভাঙা জলরাশি পিছু হটিয়া সমুদ্রে মিশিতেছে, আবার তরঙ্গ আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে সৈকতের উপরে। এই দৃশ্য কবির মনে ধরিত্রীর সহিত সমুদ্রের অপত্য সম্পর্কের কল্পনা উদ্বোধিত করিয়াছে। এ যেন একমাত্র সন্তানকে লইয়া মহাসমুদ্রের স্নেহময় খেলা। একমাত্র সন্তানকে দূরে রাখিয়া তাহার শান্তি নাই, তাই বার বার নিবিড় আলিঙ্গনে সে বসুন্ধরাকে আবিষ্ট করিতে চায়। এইসূত্রেই কবি বসুন্ধরার জন্মের পূর্বে আদিম সমুদ্রের রূপ কল্পনা এবং আদিমাতা সমুদ্রের সহিত আপন সম্পর্ক উদ্ভাবনে প্রয়াসী হইয়াছেন। সত্যই একদিন চরাচর জলময় ছিল। সমুদ্র সেদিন ছিল একাকিনী। তখনও ভূখণ্ড জাগে নাই। সমুদ্রের কোলে সন্তান বসুন্ধরার আবির্ভাব হয় নাই। জনশূন্য জীবশূন্য সেই একাকার জলরাশি—তাহাকে কবি অন্তঃসত্ত্বা নারীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। এ ভুবন সেদিন ভ্রূণরূপে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। জলগর্ভে অণুপরমাণু সমবায়ে বিশাল ভূখণ্ড গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। কবি এই পৃথিবীরই সন্তান, এই পৃথিবীরই উপাদানে তাঁহার দেহ গঠিত। বসুন্ধরা যখন সমুদ্রমাতার গর্ভে নিহিত ছিল সেইকালে কবিও বসুন্ধরার সঙ্গীভূত হইয়া সমুদ্রগর্ভে বাস করিয়াছেন। তাই রহস্যময় মহাসমুদ্র তাঁহার নিকট আত্মীয়বৎ মনে হয়। সমুদ্রের প্রাণচাঞ্চল্য, তাহার কলধ্বনিতে উচ্চারিত স্পষ্ট অর্থহীন ভাষা যেন কবি বুঝিতে পারেন। জন্মান্তরস্মৃতির মতো কিছু কিছু মনে আসে সেই সৃষ্টির আদিপর্বের কথা :

"অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।"

সমুদ্রের সহিত এই আত্মীয়তার, জন্মান্তরীণ সম্পর্কের অনুভূতিই অন্যভাবে প্রকাশ করিয়াছেন প্রশ্নে উদ্ধৃত 'ছিন্নপত্রাবলী'র পত্রাংশে।

নিগূঢ় অনুভূতির যোগে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঐকাত্ম্য এবং বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিতুলনায় আপন জীবন ও মননের রহস্য উদ্‌ঘাটন রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের প্রধানতম দিক। সমুদ্রের প্রতি কবিতার শেষ অংশে কবির ভাবনাগত বৈশিষ্ট্যের এই দিকটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। শিল্পী হিসাবে কবি অনুভব করিয়াছেন, কোন একটি ভাব কেমন দীর্ঘ সময় ধরিয়া ক্রমে ক্রমে মনের অতলে পরিপুষ্ট হইয়া ওঠে। মানুষের মন মহাসমুদ্রের মতোই এক রহস্য-

নিলয়। সেখানে নিয়ত কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভব-অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি, সহস্র রকমের জটিল অপরিমেয় ব্যাপার নিয়ত অবয়ব লাভ করিয়া, স্পষ্ট মূর্তিলাভ করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। ভাষায় বা অন্য কোনোরূপে যতক্ষণ বাহিরে প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ তাহাদের অস্তিত্ব প্রমাণের অগোচর। কিন্তু প্রত্যক্ষের অতীত বলিয়াই তাহা অসত্য নয়। এই সৃজ্যমান ভাব-কল্পনা অকস্মাৎ একদিন পূর্ণমূর্তিতে আকারবদ্ধ হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। জন্ম-মুহূর্তের পূর্বে সেই ভাবসমূহ যে দীর্ঘ গর্ভবাস করিয়াছে এ কথা আর কেহ না জানুক ভাবুকমাত্রেই জানেন। কবি এই সত্যের উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছেন সমুদ্রের জননীসত্তার প্রতিতুলনায়। বসুন্ধরা যখন সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, তখনকার সমুদ্রের উদ্বেগ-আশঙ্কা প্রত্যাশা-ব্যাকুলতা বর্ণনার সূত্রেই কবির মনে আসিয়াছে মানবহৃদয় সিন্ধুতলে সৃজ্যমান ভাবজগতের কথা। বলিয়াছেন:

"আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্মর স্বর।"

অনুভব করিয়াছেন, গর্ভিণী সিন্ধুর মতোই তাঁহার অন্তরের মধ্যেও একটা ভাবের জগৎ সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে। সেই প্রত্যক্ষের অতীত, সৃজ্যমান ভাব-জগৎটি কবির নিকট গভীরতম সত্যরূপে প্রতিভাত। মাতা যেমন আপন গর্ভস্থিত শিশুর অস্তিত্বকে সত্য বলিয়া জানেন, কবির সত্যানুভূতিও অনুরূপ।

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় প্রকাশিত এই অনুভূতিই কবি ছিন্নপত্রাবলীর একখানি চিঠিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রশ্নে সেই পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে।

[দুই] "'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় সমুদ্রে অবিসংবাদিতভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি; কবির জন্মজন্মান্তরের রহস্যময় অনুভূতি নিখিল বিশ্বের সহিত প্রাণলীলার একাত্মতাবোধ, বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে নূতন পুরাণ-কল্পনার উদ্বোধন সমুদ্রের তরঙ্গিত বিস্ময়ের উপর কবি-চিত্তের সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদী বিস্ময়বোধের অচঞ্চল স্বাক্ষর মুদ্রিত হইয়াছে।" এই মন্তব্যের আলোকে কবিতাটির ভাববস্তুর বৈশিষ্ট্য নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। বিশ্বপ্রকৃতির কমনীয় বা রুদ্ররূপের আকর্ষণে সেই যথাপ্রাপ্ত বাস্তব

রূপকেই কবিতায় ধরিয়া দিতে যাঁহারা আগ্রহ বোধ করেন তাঁহাদের কল্পনা বাস্তবের পরবশতা স্বীকার করিয়া চলে। রবীন্দ্রপ্রতিভা এ জগতের নয়। বাস্তবকে যথাপ্রাপ্তরূপে গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব নয়। কাব্যের বিষয় যাহাই হোক, রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ করেন নিজেরই কল্পনায় উদ্ভাবিত কোনো একটি ভাবসত্য। বহির্বিশ্ব হইতে আহৃত উপাদানের উপরে সেই ভাবসত্য আরোপ করেন। ফলে কবিতার বিষয়বস্তু বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সেই বাহিরের বস্তুটুকু রবীন্দ্রনাথের রচনার একান্তই গৌণ হইয়া যায়। প্রাধান্য পায় তাঁহার উপলব্ধিগত ভাবসত্য। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের এই মানবধর্মের পরিচায়ক একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়।

আপাতদৃষ্টিতে বলিতে হইবে, সমুদ্রই এখানে কবিতার বিষয়। প্রত্যক্ষত পুরীর সমুদ্র দর্শনের ফলেই এই কবিতা রচনার প্রেরণা আসে কবির মনে। কিন্তু সমগ্র কবিতায় বাস্তব সমুদ্রের দৃশ্যরূপের বর্ণনা আদৌ নাই বলিলেই হয়। সৈকতের উপরে উদ্বেল তরঙ্গ-ভঙ্গের যে চিত্রটুকু আছে তাহাও অপর একটি ভাবসত্য প্রকাশের উপায়। সামুদ্রিক রূপবর্ণনার দিকে কবির কোনোই আগ্রহ নাই। সমুদ্র-সৈকতে তরঙ্গাভিঘাতের দৃশ্য কবির মনে একটি ভাব-কল্পনার উদ্বোধন ঘটাইয়াছে। সমুদ্র আদিমাতা, বসুন্ধরা তাহার একমাত্র সন্তান। বসুন্ধরার সহিত সমুদ্রের অপত্য সম্পর্কের রূপকটি কবির মনে আভাসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই রূপকটিই কেন্দ্রীয়-ভাবের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ফলে কবিতায় বৈজ্ঞানিক, পৌরাণিক বা অপর যে কোনো প্রসঙ্গ আসে সবই আসে ওই কেন্দ্রীয় কল্পনার সহিত সুসঙ্গতভাবে এবং এই অপত্য সম্পর্কের কল্পনাসূত্রেই কবি নিজের সহিত সমুদ্রের এক নিগূঢ় সম্পর্কের উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হন।

অপত্য সম্পর্কের রূপকটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে গিয়া কবি সমুদ্র-সৈকতে নিয়তপ্রহত তরঙ্গাভিঘাতকে স্নেহব্যাকুলা মাতার আলিঙ্গনরূপে বর্ণনা করেন। ধরিত্রীকে ঘেরিয়া সুনীল জলের আবেষ্টন যেন কন্যার দেহ ঘেরিয়া জড়ানো মাতার আঁচলখানি। একমাত্র সন্তানের জননী কখনো বা স্নেহক্ষুধায় উন্মাদিনী হইয়া নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে ধরিত্রীকে দলিত মথিত করে, আবার এমন নিষ্ঠুরতার জন্য অপরাধবোধে বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়া থাকে। সমুদ্রের ঝটিকাক্ষুব্ধতা, সমুদ্রের প্রশান্তি, সবই এইভাবে মাতৃস্নেহের অভিব্যক্তির রূপক হইয়া ওঠে। কবি এই মাতৃস্বরূপিণীর সহিত আত্মীয় সম্পর্ক কল্পনা করেন। ধরিত্রীর সন্তান কবির

দেহ গঠিত যেসব উপাদানে তাহা এই ধরিত্রীরই অঙ্গ। তিনি সর্বতোভাবে বসুন্ধরারই অঙ্গীভূত। এবং বসুন্ধরা যখন সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, সেই ভ্রূণাবস্থার বসুন্ধরার সহিত মিশিয়া কবিও সমুদ্রের গর্ভে বাস করিয়াছেন। সৃষ্টির আবেগে চঞ্চল সেই একাকিনী সমুদ্রমাতার আশঙ্কা উদ্বেগের ভাষা যেন কবির সত্তায় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের সহিত আপন অস্তিত্বের এই নিগূঢ় যোগের জন্যই আজ সমুদ্রতীরে বসিয়া আদিমাতার সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে উৎকণ্ঠার ভাষা বুঝিতে পারেন। কবির এ কল্পনা সাধারণভাবে বিজ্ঞাননির্ভর। সৃষ্টির আদিতে ছিল জল—পুরাণ একথা বলে, বিজ্ঞানও এ সত্য সমর্থন করে। ভূখণ্ড জাগিয়াছে অনেক পরে। আবার জীবনমাত্রেরই দেহ যেহেতু পার্থিব উপাদানে গঠিত, সুতরাং ধরিত্রীর সহিত এবং আরও আদি সম্পর্কের সূত্রে সমুদ্রের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা কল্পনা নিতান্ত অবাস্তব নয়। অতএব সমুদ্রের সহিত জন্মান্তরীণ সম্পর্কের কল্পনা বা সমুদ্রকে আদিমাতা, সৃষ্টির জননী কল্পনায় পৌরাণিক কল্পনার প্রভাব থাকিলেও তাহা বিজ্ঞান-সমর্থিত ভাবেই উপস্থাপিত হইয়াছে।

কবিতার ভাববস্তুর সত্য-ভিত্তি যেমনই হোক, সেই ভাববস্তু কবি হৃদয়ের বিস্ময়ানুভূতিতে পরিপুষ্ট হইয়া কবিতায় অত্যাশ্চর্য শিল্পরূপ লাভ করিয়াছে। কবিতার সৌন্দর্যের দিক হইতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেই অংশ, যেখানে কবি সমুদ্রকে অন্তঃসত্ত্বারূপে কল্পনা করিয়াছেন :

"দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি।"

সৃষ্টিমাত্রেরই মধ্যে একটা রহস্যময়তা থাকে। আদিজননী সমুদ্রের অন্তঃসত্ত্বা রূপের বর্ণনায় কবি সেই রহস্যবোধকে একটা বিপুলতার পরিসরে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসৃত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। সেইসূত্রে যোগ করিয়াছেন আপন মনের জগতে সৃজ্যমান ভাব-জগতের আস্তিত্ব সম্পৃক্ত অনুভূতি। একই কল্পনাসূত্রে বিশ্বসৃষ্টি এবং ভাবসৃষ্টি উভয় রহস্যকেই কবিতায় গাঁথিয়া তুলিয়া স্পষ্ট মূর্তিদান করিয়াছেন।

[তিন] 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা সম্পর্কে কোন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন, "কবিতাটির প্রথমাংশে কল্পনা ও ভাবের যে উচ্চগ্রামে

আরব্ধ হইয়াছে, পরিসমাপ্তিতে তাহা রক্ষিত হয় নাই।...প্রথম হইতে পাঠকের মনে যে ঔৎসুক্য ও আশা জমিয়া উঠিতেছিল, দুর্বল পরিসমাপ্তিতে তাহা একেবারে ভাঙিয়া না পড়িলেও পাঠককে বড়ই নিরাশ করিয়া দেয়।" কবিতাটির রসপরিণতি সম্পর্কে এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার কর।

উত্তর। সাধারণ গীতিকবিতার যে আয়তনে আমরা অভ্যস্ত 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি তাহা অপেক্ষা আয়তনে বড়। এইরূপ দীর্ঘ কবিতা 'সোনার তরী' কাব্যে আরও আছে, যেমন 'যেতে নাহি দিব', 'বসুন্ধরা', 'মানসসুন্দরী' 'পুরস্কার' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন দীর্ঘ কবিতায় একই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি কোনো একটি উপমা-সূত্র অকারণে দীর্ঘ করিয়া তোলা এবং কল্পনার অসংহতি লক্ষ্য করা যায়। কবিতার শিল্পরূপের দিক হইতে এগুলি মারাত্মক ত্রুটি সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ সমালোচক প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় ত্রুটির দিক বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রশ্নে উদ্ধৃত মন্তব্যটিও তাঁহার। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার ভাবপরিণতি এবং প্রকাশশৈলী বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত বিশীর অনুযোগের সারবত্তা বিচার্য।

কবিতাটিকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়া দেখা হইয়াছে। প্রথম অংশে আছে সমুদ্র ও বসুন্ধরার সম্পর্কের উপরে অপত্য সম্পর্ক আরোপ এবং সমুদ্রের রূপবৈচিত্র্যকে স্নেহোৎকণ্ঠিত মাতার ব্যাকুলতারূপে বর্ণনা। মধ্য অংশে কবির কল্পনা প্রসারিত হইয়াছে সৃষ্টির আদি পর্যায়ে। ভূখণ্ড যখন সমুদ্রগর্ভে নিহিত, জীবহীন মৃত্তিকাহীন চরাচরব্যাপী সেই সমুদ্রের উপরে কবি গর্ভিণী নারীর ভাব আরোপ করিয়াছেন। এবং প্রসঙ্গত সমুদ্রগর্ভে সৃজ্যমান ভূখণ্ডের মতো মানব মনের অতলে সৃজ্যমান ভাবের জগৎ সৃষ্টি হইয়া উঠিবার কথা আসিয়াছে। কবিতাটির তৃতীয় বা শেষ অংশে পাই বর্তমান জীবনের জটিলতায় পীড়িত কবির আক্ষেপোক্তি এবং আদিমাতা সমুদ্রের উদ্দেশ্যে শান্তি প্রার্থনা। সমালোচকের মতে, কবিতার প্রথম অংশের কল্পনার সমুন্নতি পরবর্তী অংশে অবনমিত হইয়া ক্রমে দুর্বল পরিসমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। ভাবস্তর যেমন ক্রমান্বয়ে অবনমিত হইয়াছে। ভাষা ও প্রকাশশৈলীতেও তেমনি দুর্বলতা দেখা দিয়াছে।

কবিতাটির সর্বাংশ একই ভাবস্তরে বাঁধা নয়, ইহা সত্য। কবির ভাবনা-ক্রম প্রসঙ্গান্তরে সঞ্চারিত হইয়াছে ঠিকই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সমগ্র

কবিতার মধ্যে একটি ভাবকেন্দ্র স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছে। সমুদ্র সৃজন-শক্তিময়ী মাতা, সৃষ্টির সূচনা সমুদ্র হইতে জগতের সকল প্রাণ-রূপ, এমনকি কবি নিজেও অপত্য সম্পর্কে এই আদিমাতা সমুদ্রের সহিত সম্পর্কিত। এই ভাবটিই কবিতার কেন্দ্রীয় ভাব, আর সব বক্তব্য এই ভাবকেন্দ্রকে ঘিরিয়া, ইহাই পল্লবিত বিকাশরূপে দেখা দিয়াছে। সমগ্র কবিতার কেন্দ্রে একটি ভাবসত্য স্থিরভাবে বিরাজ করায় কবির কল্পনা যতোই পল্লবিত হোক, অসংলগ্ন হয় নাই। কবিতার প্রথম অংশে সমুদ্রের মাতৃরূপটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাস্তব সামুদ্রিক দৃশ্যের প্রতিটি রূপবৈচিত্র্যের উপরে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা, অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার ভাব আরোপ করায় সমুদ্র মূর্তিমতী মাতার রূপে প্রতিভাত হয়। এই সূত্রেই নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই আসে আদিম সমুদ্রের গর্ভিণীরূপ-কল্পনা। মধ্য অংশে অন্তসত্ত্বা জননীরূপে সমুদ্রের বর্ণনায় ভাষা বিস্ময়কর প্রকাশ সামর্থ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যেমন :

"প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি যেত মহাসন্তানের জন্মদিনে,
নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই সব জাগ্রত বাসনা,
অবাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহাভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তরাস্মৃতিসম উদিত হয়েছে বারম্বার।"

এই অংশে কল্পনার প্রসার এবং সেই বিস্ফারিত কল্পনাকে ধারণের জন্য বাঙলা ভাষার প্রকাশক্ষমতাকে কবি যেভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন বাঙলা কাব্যে ইহার সহিত তুলনীয় দৃষ্টান্ত খুব বেশি নাই। রবীন্দ্রকাব্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রকৃতির যথাপ্রাপ্ত রূপ-বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব নয়। প্রকৃতির সহিত নিজের নিগূঢ় সম্পর্ক আবিষ্কার তাঁহার মনোধর্মের অন্যতন প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই বর্ণনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে কবির স্বকীয় অনুভূতি মিশ্রিত হইয়া গিয়া বর্ণনা এক গভীরে তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া ওঠে। এ কবিতাতেও সেই অপূর্বতা, সেই তাৎপর্য পরিস্ফুট। সমুদ্রগর্ভে

সৃজ্যমান বসুন্ধরার প্রসঙ্গে কবির মনে আসিয়াছে নিজের মনোলোকের রহস্ত নিলয়ে সৃজ্যমান ভাবজগতের কথা। রবীন্দ্রভাবনার বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে এই জাতীয় কল্পনা নিতান্তই প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

শ্রীযুক্ত বিশীর তীক্ষ্ণ আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছে কবিতার শেষ অংশ, যেখানে কবি পীড়িত পৃথিবীর জন্ম সমুদ্রের শান্তিময় স্পর্শ প্রার্থনা করিয়াছেন। ভাবপ্রবাহ দীর্ঘ বিস্তারের শেষে এখানে শমে পৌঁছাইয়াছে। পৃথিবীর শিশু রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ওই অপার স্নেহময়ী জননীর শীতল স্পর্শে প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইয়া লইতে চাহিবেন—ইহা প্রসঙ্গচ্যুত আকাঙ্ক্ষা নয়। এখানে কবি শুধু ব্যক্তিগত জীবনের যন্ত্রণার কথা বলেন নাই। সামগ্রিকভাবে আধুনিক মানুষের জীবনের অশান্তির উপরে আদিজননীর স্নেহকরস্পর্শ প্রত্যাশা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, 'ধরাভূমি' বলিতে ধরার মানুষের জীবনকেই বুঝিতে হইত। সমুদ্রের যে মাতৃরূপকল্পনা পূর্বাপর কবিতাটিতে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়াছে, শেষ চরণে সেই মাতার কণ্ঠস্বরে শান্তিময় নিদ্রামন্ত্র উচ্চারণ 'তুচ্ছ' বা বেসুরো মনে হয় না।

এই বিশ্লেষণের পটভূমিতে সমালোচকের মন্তব্যটি মনে হয় নিতান্তই অযৌক্তিক।

॥ নিরুদ্দেশ যাত্রা ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য ঃ

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' 'সোনার তরী' কাব্যের শেষতম কবিতা। সমগ্র সোনার তরী কাব্যের মধ্যে মর্ত্যধরণীর প্রতি, বিশ্বব্যাপ্ত প্রাণরঙ্গশালার প্রতি কবির যে আগ্রহ এবং ভালোবাসার মনোভাবপ্রকাশ দেখি, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার সুর তাহা হইতে ভিন্ন। কবিতার নামেই প্রকাশ, প্রত্যক্ষ হইতে, জানা-চেনা জগৎ হইতে কবি ভিন্ন কোনো অপরিজ্ঞাত জগতে যাত্রা করিতেছেন। অন্য প্রসঙ্গে একদা কবি লিখিয়াছিলেন, "আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ দুঃখ বিরহ মিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক-জাতীয়, উদাসীন, গৃহত্যাগী নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিক-জাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে Shelley-র Skylark, আর একটা Wordsworth-এর Skylark ; একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করছে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করছে। সুতরাং একজন সম্পূর্ণতার এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী।" কবির এই মন্তব্য অনুসরণে বলা যায় 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার মর্ত্য-বন্ধন নয়, সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

'সোনার তরী' কাব্যের একটি প্রধান কবিতা 'মানসসুন্দরী'। এই দীর্ঘ কবিতাটিতে এমন বহু ভাববীজ আছে যাহা অন্য কবিতায় পূর্ণাঙ্গভাবে পরিণত হইয়াছে। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার সহিত 'মানসসুন্দরী'র কোনো কোনো অংশের ভাবসাদৃশ্য আছে। যেমন ঃ

"সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হয়ে তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই অন্ত। কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি। সংগীত তোমার
কতদূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে

বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম। এই যে বেদনা,
এর কোন ভাষা আছে? এই যে বাসনা,
এর কোনো তৃপ্তি আছে? এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে? সৌন্দর্য-পাথারে
যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী
সে বাতাসে, কত বার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল;
অভয় আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই, বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।"

'মানসসুন্দরী' কবিতার এই অংশের সহিত নিরুদ্দেশ যাত্রার ভাবসাদৃশ্য এমন কি বর্ণনাভঙ্গিগত সাদৃশ্য আছে। অবশ্য 'মানসসুন্দরী' এবং 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র বক্তব্য এক নয়। মানসসুন্দরীতে কবির কল্পিত নায়িকার সহিত মিলনের নিশ্চিতি আছে, সকল শঙ্কা ও নৈরাশ্য সেই মিলনে আশ্বস্ত হয় শেষ পর্যন্ত। নিরুদ্দেশ যাত্রার মূলভাব ইহার বিপরীত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছেন, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' 'মানসসুন্দরী'র সুনিশ্চিত মিলন—আনন্দের সংশয়ক্ষুব্ধ অস্বীকৃতি, যে মানসী পূর্ব কবিতায় কবির অন্তঃপুর-লক্ষ্মীর মত স্থায়ী দাম্পত্য বন্ধনে ধরা দিয়াছিলেন, যাঁহার হৃৎস্পন্দন কবি প্রেরণার প্রাণাবেগের মূলগত শক্তিরূপে কবির অন্তরলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যাঁহার অভয় আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল কবিচেতনাকে সমস্ত সংশয়মুক্ত করিয়াছিল, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় সেই প্রেয়সী আবার রহস্যময়ীরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। সর্বপ্রথম, তিনি অমোঘ নিয়ন্ত্রীশক্তিরূপে কবিকে চালনা করিতেছেন, কবির স্বাধীন ইচ্ছা তাঁহার নিয়ন্ত্রণের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, 'সোনার তরী'তে কবির স্থান হইয়াছে, কিন্তু এই তরী আর পরিচিত পদ্মা-তরঙ্গে আবদ্ধ না থাকিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, বায়ুগর্জনক্ষুব্ধ,

দিকচিহ্নহীন অকূল সমুদ্রে ভাসিয়াছে। প্রেয়সী আবার 'বিদেশিনী'-রূপে সম্বোধিত হইয়াছেন; তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁহার প্রেমবিহ্বল কলভাষণের পরিবর্তে এক অস্বস্তিকর, কটাক্ষ-ইঙ্গিতে দুর্বোধ্য নীরবতা প্রেমিকযুগলের মাঝে এক মর্মান্তিক ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। কবির সংশয়োত্তেজিত, তীক্ষ্ণ প্রশ্নপরম্পরা, অপরিচিতার পরিচয়ের জন্য উদগ্র ব্যাকুলতা, প্রাকৃতিক পরিবেশের গোধূলি-অস্পষ্ট ইঙ্গিতময়তা, সমুদ্রের দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্তনমান রূপচ্ছবি, মধ্যে ঘনায়মান সংশয় ও বিশ্বব্যাপী রোদনোচ্ছ্বাসের অস্থির আন্দোলন, সর্বোপরি রহস্যময়ীর বিভ্রান্তিকর স্মিতহাস্যপ্রহেলিকা—এ সমস্তই কবির সঙ্গে মানসসুন্দরীর এক অভিনব সম্পর্ক—অনিশ্চয়তার, কবির অন্তর্জগতে এক নূতন আদর্শ-বিপ্লবের সঙ্কেতে শিহরিত। সোনার তরীর রূপকে এক অজ্ঞাত আবহ-ব্যঞ্জনা প্রবেশ করিয়াছে। কবি তাঁহার মানস পরিণতির এমন এক স্তরে উপনীত হইতেছেন যেখানে ক্ষণিক-মিলনতৃপ্তি কাব্যানুভূতির নূতন আঘাতে বিদীর্ণ হইয়াছে, পুরাতন সংশয় নবরূপে দেখা দিয়াছে, এক অনির্ণীত লক্ষ্য কবিচেতনাকে চেনা পথের বাহিরে আকষণ করিয়াছে। তাঁহার আজন্ম-পরিচিত কাব্যানুভূতির রূপকের তটরক্ষিত পদ্মা, মানস-সুন্দরীর সঙ্গে পরিপূর্ণ প্রেমের বিশ্বস্ততায় বাঁধা উষ্ণ দাম্পত্য নীড় কোন্ এক অজানা সাগরের তটহীন বিশালতায় মিশিয়াছে, এক নিরুদ্দেশ-যাত্রার শঙ্কিত অভিযানে স্বস্তির নিশ্চয়তা হারাইতে বসিয়াছে। 'মানসসুন্দরী'র অন্তর্যামিত্বে রূপান্তরের মধ্যেই বিকট, উদ্বিগ্ন পরিবর্তনের বীজ নিহিত। যে প্রেয়সীকে কবি নিজ কাব্যপ্রেরণার স্থিরত্ববিধায়ক প্রতিশ্রুতিরূপে বক্ষে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন সেই প্রেয়সীই অকস্মাৎ নিয়তিরূপে দেখা দিয়া কবির আত্মকর্তৃত্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে নিজকরধৃত বীণারূপে বাজাইতে চাহিয়াছেন। এই অভাবনীয় পরিস্থিতি যে কবিমনকে বিচলিত করিবে তাহাতে আর সংশয় কি? 'বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানসসুন্দরী'—পংক্তিতে কবি মানসীকে যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, মানসী সে আহ্বান কবির অনভিপ্রেত অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বীণা ফেলিয়া কবিকেই বীণাযন্ত্ররূপে আপনার অমোঘ শক্তির ক্রীড়নকের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র এই অপূর্বভাবে ব্যঞ্জিত নবপরিণতিদ্যোতনার মধ্যে সোনার তরীর উপর যবনিকাপাত হইয়াছে।"

প্রমথনাথ বিশী এই কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, "কবির প্রতিভার মূল দুইটি ধারার একটি···জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তি এবং সুখ-দুঃখপূর্ণ অসম্পূর্ণ

মানবের প্রতি ভালবাসা; দ্বিতীয় ধারাটিকে কবি বলিয়াছেন—একটি Despair ও Resignation-এর ভাব। ইহা সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা; ইহা মানুষের অসম্পূর্ণ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ Ideal লোকের দিকে কবিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। সোনার তরীর শেষতম নিরুদ্দেশ যাত্রায় ইহার আভাস। গোড়ার কবিতার মত এটিতেও সোনার তরী,…কেবল তাহাতে নাবিকটি অপেক্ষাকৃত মনোরম। কিন্তু এ তরী সোনার ধান, অর্থাৎ মানুষের যেটুকু পূর্ণতা, Ideal বহন করিয়া অসম্পূর্ণ মানুষকে ফেলিয়া রাখিয়া যায় না। এ তরী স্বয়ং অসম্পূর্ণ কবিকে নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যের আদর্শলোকে বহন করিয়া লইয়া যায়। মানুষের সংসারের দিকে এ তরীর গতি নয়, ইহার লক্ষ্য… সৌন্দর্যলোক, নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যলোক, এবং নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যের সম্পূর্ণলোক। গোড়ার কবিতাটি হইতে ইহা মূলত ভিন্ন।”

কবি-সমালোচক **মোহিতলাল মজুমদার** 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র ভাববস্তু সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “প্রথম কবিতার সেই সোনার তরী এখানে আরেক অর্থ বহন করিতেছে, এ তরী কল্পনার তরী এবং তাহাতে কবি নিজেই ভাসিয়া চলিয়াছেন; তথাপি তাহার সহিত একটা ভাবসাদৃশ্য আছে। সেখানে কাব্য শেষ হইয়াছে, কবি বিশ্রাম চান, এখানে কাব্য শেষ হয় নাই, এবং অসীম সৌন্দর্য সাগর পার হইবার দুশ্চিন্তা আছে—আশা ও আশঙ্কা দুইই আছে। অতএব, এই কবিতায় কবির যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, প্রথম কবিতাটিতেও তাহারই একটা ভিন্নতর রূপ আছে, অর্থাৎ সেই কবিতাও কবির ভাবজীবনের একটি ভাবনা-কামনার রূপক—তাহার কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। এ কবিতার ঐ রূপকটির মূলে দুইটি তত্ত্ব আছে; এক—কবি-মানসের সেই ভাবগ্রন্থি আরও দৃঢ় হইয়াছে, তিনি বিশ্বাস করেন—কোন এক অন্তর্যামীর শক্তি তাঁহার কবিজীবনের নিয়ন্ত্রী; পূর্ব কবিতার সেই কর্ণধারই এখানে আরও সুস্পষ্টভাবে কবির জীবনদেবতার রূপ ধারণ করিয়াছে; ইহাকেই পরবর্তী কাব্যে (চিত্রা) তিনি ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন। দুই—ঐক্ষণে কবির কবিজীবনে একটা ক্লান্তি আসিয়াছে; যে সৌন্দর্যজগৎ তাঁহার মানসে উত্তরোত্তর উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহা এমনই অসীম যে ভয় হয়, তাহা পার হইয়া শেষ তীর্থে পৌছানো অসম্ভব। কবি আশা করিয়াছেন, ঐ সৌন্দর্যসাধনায় হৃদয়ের সকল উৎকণ্ঠা দূর হইবে, উহাতেই একটি পরমা নির্বৃত্তিলাভ হইবে। যথা:

"এ বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে, আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।" (মানসসুন্দরী)

কিন্তু এখন বোধ হইতেছে এ পথের শেষ নাই,—শেষ হইবার পূর্বেই শক্তি নির্বাপিত হইবে, জীবনের দিবালোক দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই আকুল হইয়া সেই মোহিনী বহিত্র-বাহিনীকে তাঁহার ঐ আশঙ্কা নিবারণ করিতে বলিতেছেন, সে কেবল এক রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিতেছে। এ হাসির অর্থ—অন্ধকার নামিলেও কোন ভয় নাই; এখনও কত প্রভাব আছে। হোক না এই সৌন্দর্যসাগর অসীম অকূল—উহার ঐ অসীম বক্ষেই সৌন্দর্যের আলোক নানাবর্ণে বিলসিত হইবে। কবি হয়তো তাহা বুঝিতেছেন—ঐ হাসিতেই সেই আশা জাগিতেছে, তবু নিঃসংশয় হইতে পারিতেছেন না।

ভাবার্থ:

সূচনা হইতেই কবিতাটিতে সংশয়ের ও অনিশ্চয়তার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। কোনো এক বিদেশিনী কবিকে তাহার তরণীতে তুলিয়া লইয়াছে। সেই সোনার তরী কত পথ অতিক্রম করিয়া আসিল, কিন্তু যাত্রা শেষ হইবে এমন সম্ভাবনা এখনো দেখা যাইতেছে না। কবি স্পষ্টতঃ জানেন না এ তরী তাঁহাকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে। যে এই তরীর চালিকা তাহাকে প্রশ্ন করিয়া কোনো নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না। সে শুধু অঙ্গুলি তুলিয়া অকূল সিন্ধুর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের দিকে নির্দেশ করিয়া রহস্যপূর্ণ হাসি হাসে। এদিকে সূর্য অস্তায়মান, দিন শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু এখনও কূলের নিশানা নাই।

ব্যাকুল কণ্ঠে বারবার কবি তাঁহার সঙ্গিনীকে প্রশ্ন করেন। ওই যে দূর পশ্চিমে অস্তসূর্যের রাঙা আলোয় যেন দিনের চিতা জলিতেছে, প্রতিফলিত রাঙা আলোয় জলকে দেখাইতেছে তরল অনলের মতো, রাঙা আকাশ রাঙা জলে মিশিয়াছে যেখানে—সেইখানে, সেই উর্মিমুখর সাগর পারের অস্তগিরির পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া কি যাত্রা শেষ হইবে। সঙ্গিনীর কণ্ঠে কোনো ভাষা উচ্চারিত হয় না, শুধু মুখে তাহার রহস্যপূর্ণ হাসি।

রাত্রি নামিল। বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিল। সমুদ্র অন্ধ আবেগে

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। ঘন নীল জলরাশি চতুর্দিকে, কোথাও তটরেখা চোখে পড়ে না। সমুদ্রের গর্জনে, উচ্ছ্বাসে মনে হয় অসীম রোদন জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। সেই ভয়-জাগানো জলরাশির মাঝ দিয়া চলিয়াছে সোনার তরী, তরীর অভিভাবিকার মুখে আশঙ্কা উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নাই। নীরব হাসিতে তাহার মুখ উদ্ভাসিত। কেন এ বিলাস তাহার কে জানে।

এই বিলাসিনী সেই কোন সকালে 'কে যাবে সাথে' বলিয়া আহ্বান জানাইয়াছিল। সেই আহ্বানে কবি সাড়া দিয়াছেন। সেই পশ্চিম সাগরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া কী যেন বুঝাইতে চাহিয়াছিল। কবির মনে আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তরীতে উঠিয়াছিলেন। তরীতে উঠিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সিন্ধুর ওপারে কী আছে, কোন সফলতা। ওখানে কি আছে নবীন জীবন, ওখানে কি আশার স্বপ্নগুলি সাফল্যে পরিণতি লাভ করিবে। তখনও সে কোনো উত্তর দেয় নাই, শুধু মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়াছে।

তারপরে কত প্রহর গেল। কখনো সংশয়ের মেঘ ঘনাইয়াছে, কখনো জাগিয়াছে আশার আলো। বায়ুভরে সোনার তরী কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন তো রাত্রি সমাসন্ন। কবি আসন্ন রাত্রির পটে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন উচ্চারণ করিতেছেন আবার। যে অন্ধকারের দিকে চলিয়াছেন, সেখানে নবজীবন না থাক—মরণের স্নিগ্ধতাটুকু লাভ করা যাইবে কি ? এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর মেলে না।

অচিরেই রাত্রির অন্ধকার দিক-দেশ আবৃত করিবে। সন্ধ্যার আকাশের সোনার আলোটুকু অবলুপ্ত হইয়া যাইবে। সেই অন্ধকারে সঙ্গিনীর মুখখানিও আর চোখে পড়িবে না। শুধু বাতাসে তাহার দেহ সৌরভ ভাসিয়া ফিরিবে, কানে বাজিবে কলকলরব. বায়ুভরে তাহার কেশরাশি উড়িয়া গায়ে পড়িবে, আকুল হৃদয়ে প্রশ্ন করিতেই হইবে, তাহার ভরসাপূর্ণ স্পর্শ ভিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু কবি জানেন—কোনো উত্তর মিলিবে না, অন্ধকারে নীরব হাসিও চোখে পড়িবে না।

সমালোচনা :

এই কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তত্ত্বগত অর্থ যাহাই হোক—'নিরুদ্দেশ যাত্রা' একটি অপূর্ব গীতি-কবিতা। সকল তত্ত্ব-ভাবনা-বিস্মৃত হইয়া শুধু এক অপরিজ্ঞাত জগতের উদ্দেশে ভাসমান যাত্রীর

আশঙ্কা-ব্যাকুল-সংশয়িত মনোভাবের প্রকাশরূপেই কবিতাটির রসাস্বাদন সম্ভব। একদিকে এই সংশয়িত মনোভাবের অভিব্যক্ত, অপরদিকে সহযাত্রিনীর নীরব হাসির রহস্যময়তা কবিতাটির মধ্যে বুনিয়া তোলা হইয়াছে অপূর্ব দক্ষতায়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমিটুকু এই মানবিক অনুভূতির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হওয়ায় রসের অখণ্ডতা কোথাও ব্যাহত হয় নাই। অস্তরবির রশ্মি-আভায় আকাশ এবং সমুদ্র রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমবিলীয়মান সেই রাঙা আলো রাত্রির অনিবার্যতা সূচনা করিতেছে। সমুদ্রের জলতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। দিগন্তে দৃষ্টি মেলিলে মনে হয় দিক্‌বধূর আঁখি অশ্রুজলে ছল ছল করিতেছে। সোনার তরীর যাত্রীর সংশয়ই যেন প্রতিফলিত অপার সিন্ধুর নীল জলের রহস্যে :

> "সংশয়ময় ঘননীল নীর,
> কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
> অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।"

যাত্রার ছবিখানি অপরূপ হইয়া উঠে বর্ণনাত্মক শব্দপ্রয়োগের নৈপুণ্যে। নীল জলের উপরে অস্তসূর্যের রাঙা আলো প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভাসমান হিরণবর্ণ তরণীখানি। এই অংশের চিত্রময়তা আমাদের মুগ্ধ করে। কিংবা, উল্লেখ করা যায় শেষ স্তবকের বর্ণনা। অচিরেই অন্ধকার দিক্‌দেশ আবৃত করিয়া আনিবে। আকাশ ও সমুদ্র অন্ধকারে অবলুপ্ত হইবে। এখন পার্শ্ববর্তিনীর মুখখানি যে চোখে পড়িতেছে, কিছু পরে আর তাহা দেখা সম্ভব হইবে না। শুধু তাহার দেহসৌরভ বাতাসে ভাসিবে, বাতাসে উড়িয়া গায়ে পড়িবে তাহার এলায়িত কেশরাশি। কখনোই সে উচ্চারিত ভাষায় কোনো আশ্বাস না দিলেও তাহার মুখের হাসিতে যে ভরসাটুকু প্রাণে জাগিত—সেই হাসিও আর কবি দেখিতে পাইবেন না। সেই নীরবতা, সেই অন্ধকার আরও দুঃসহ হইয়া উঠিবে। এই ব্যাকুলতার প্রকাশ অনবদ্য :

> "শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
> শুধু কানে আসে জলকলরব,
> গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি।
> কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি।"

স্থূলভাবে কবিতার ভিতর হইতে যে অর্থ বাহির করিতে চাই আমরা, এ কবিতায় সেইরূপ কোনো অর্থ নিহিত আছে কিনা সন্দেহ। একজন মানুষ

কোনো একটা অনির্দিষ্ট আশায় কোনো এক বিদেশিনীর সহযাত্রী হইয়াছে। কোনো একটা সফলতা আকাঙ্ক্ষাই তাহাকে এ পথে আনিয়াছে। যাত্রারম্ভের পরে অনেক প্রহর গেল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। যাত্রার তবু শেষ হইল, না, তীরের সন্ধান মিলিল না। আর কতদূর চলিতে হইবে কে জানে। সত্যই এ যাত্রাপথের কোনো শেষ আছে কিনা এখন তাহাও মনে হইতেছে অনিশ্চিত। আর যে এপথে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে সে প্রথমেও যেমন স্পষ্টভাবে কোনো আশ্বাস দেয় নাই, এখনও তেমনই নীরব। জিজ্ঞাসার উত্তরে সে শুধু ইঙ্গিতে সম্মুখ দিক দেখাইয়া দেয়, নীরবে রহস্যময় হাসি হাসে। হয়তো বা এই হাসিতে আছে বরাভয়, অন্ততঃ নিরুদ্দেশের যাত্রী এইরূপ অনুভূতিই লালন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অন্ধকারে সেই হাসিটুকুও যখন আর চোখে পড়িবে না তখন সে কোন ভরসায় মন বাঁধিবে।—কবিতাটিতে এইরূপ একটা মানসিক অবস্থাই ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসিবার মতো বিষয়বস্তু। আকাঙ্ক্ষাটা যে কি তাহা স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। তাই পাঠকমাত্রেই স্বকীয়ভাবে এই আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। নানা মিশ্র আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় মানুষ জীবনের পথে চলে। কোনো সফলতার উপলব্ধিই তাহার লক্ষ্য। সেই পথে পদে পদে অনিশ্চয়তা। কিন্তু গোটা জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে মনে হয়, সেই অনিশ্চিত মুহূর্তগুলিও একটা অর্থ বহন করিতেছে। মনে হয়, আমি ঠিক বুঝি নাই কোথায় কীসের উদ্দেশে চলিয়াছি। কিন্তু জীবনের অন্তরালে বসিয়া কোনো একটা শক্তি সকল অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়া আমাকে চালিত করিয়া আনিয়াছে। চরিতার্থ করিয়াছে। এইরূপ উপলব্ধি সকল মানুষের জীবনেই সত্য। জীবনের অন্তরালবর্তী সেই শক্তিকে যদি একটা সজীব সত্তারূপে কল্পনা করা যায় তবে তাহার উদ্দেশে বলা যাইতেই পারে, "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী!" এইভাবে দেখিলে মানবজীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিরূপে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটি তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া ওঠে।

এই যেমন একটা অর্থ বা তাৎপর্য, তেমনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মানসিকতার দিক হইতে, তাঁহার পূর্বাপর কাব্যধারার একটা পর্যায়ের উপলব্ধিরূপেও কবিতাটির আর একটি অর্থ করা যায়। 'সোনার তরী' কাব্যের প্রথম কবিতাতে প্রথম স্পষ্টভাবে কবি আপন কাব্যসাধনার জীবনের সফলতা-বিফলতা বিষয়ে ভাবনার পরিচয় দেন। জীবনেব ছোটো দ্বীপটুকুর মধ্যে একক সাধনায় যে কাব্যের ফসল তিনি জমাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহা কোনো

এক নেয়ের সোনার তরীতে তুলিয়া দিলেন। যে সমাদর করিয়া সেই কাব্য-কৃতি, সেই সোনার ফসল লোকালয়ের উদ্দেশ্যে বহিয়া লইয়া গেল, কিন্তু কবিকে নিল না। এই প্রথম কবির জীবনের বা তাঁহার কাব্যসাধনার জগতে দেখা গেল অপর এক ব্যক্তির আবির্ভাব। ইনি কবির সহিত বিশ্বের একটা যোগাযোগের পথ করিয়া দিলেন। পুনরায় 'মানসসুন্দরী' কবিতায় নারীরূপে কল্পিত হইয়াছে এইরূপ এক কল্পনার সৃষ্টি ব্যক্তিসত্তা। সেই সত্তা, মানসসুন্দরী আর বাহিরের কেহ নন, কবির নিজেরই অন্তরে তাঁহার বাস। তাহারই প্রেমে কবি জীবনে সবংফলতার অনুভূতি আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিল। এ কাব্যের শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় আবার সেই সোনার তরীর কথা ফিরিয়া আসিল, ফিরিয়া আসিল এক কল্পিত সত্তার কথা। এবারে কবি নিজেই সোনার তরীর যাত্রী, কিন্তু যাত্রার উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট নয়। নিজেকে তিনি সমর্পণ করিয়াছেন বিদেশিনী সুন্দরী নাবিকার হাতে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে কবি নিজের জীবনের এবং কাব্যসাধনার উপরে বার বার অপর এক সত্তার প্রভাব স্বীকার করিয়া লইতেছেন। আরো পরবর্তীকালে. চিত্রা কাব্যে কবির এই কল্পনা একটা পূর্ণ পরিণামে উপনীত হইয়াছে। সেখানে তিনি এই শক্তিকে 'জীবনদেবতা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। জীবনদেবতার স্বরূপ সম্পর্কে কবির বক্তব্য, "যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি"; "আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে,......আমার মধ্যে এই যাহা গড়িয়া উঠিতেছে এবং যিনি গড়িতেছেন, এই উভয়ের মধ্যে যে একটি আনন্দের সম্বন্ধ, যে একটি নিত্যপ্রেমের বন্ধন আছে, তাহা জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিলে সুখদুঃখের মধ্যে একটি শান্তি আসে। যখন বুঝিতে পারি, আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছ্বাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, আমার প্রত্যেক দুঃখবেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জানি যে. কিছুই ব্যর্থ হয় নাই, সমস্তই একটা জগদ্ব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধন্য হইয়া উঠিতেছে।" এইভাবে নিজের সকল চিন্তা চেষ্টার পশ্চাতে আর একটা সক্রিয় সত্তার উপস্থিতি অনুভব এবং সেই সত্তার উপরে একান্তভাবে নির্ভর করিয়া শান্তিলাভ করেন কবি।

অথচ ইনি ঠিক ঈশ্বর নন। ইনি কবির ব্যক্তিজীবনেরই নিয়ন্তা। তাহার ব্যক্তিজীবন, কাব্যসাধনা এবং বিশ্বজীবনের মধ্যে ইনি সুগভীর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কবির ছোটো বড়ো সকল কাজকে চরিতার্থ করিয়া তুলিতেছেন। চিত্রা পর্বের কাব্যে এই যে জীবনদেবতার পূর্ণাঙ্গ কল্পনা, সোনার তরীর প্রথম ও শেষ কবিতায় এবং মানসসুন্দরীতে ইহারই পূর্বাভাস আছে—ইহাই মনে হয়। নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গিনীও জীবনদেবতারই পূর্বরূপ, অপরিণত কল্পনা। এখানে সেই সত্তাকে কবি নারীবিগ্রহে কল্পনা করিয়াছেন, এক রহস্যনিবিড় আবহ সৃষ্টির পক্ষে এইরূপ কল্পনা অতিশয় উপযোগী হইয়াছে। মোহিতলাল ঠিকই বলিয়াছেন, "তিনি বিশ্বাস করেন—কোন এক অন্তর্যামী-শক্তি তাঁহার কবিজীবনের নিয়ন্ত্রী; পূর্ব কবিতায় (সোনার তরী কাব্যের প্রথম কবিতা) সেই কর্ণধারই এখানে আরও সুস্পষ্টভাবে কবির জীবনদেবতার রূপ ধারণ করিয়াছে; ইহাকেই পরবর্তী কাব্যে (চিত্রা) তিনি ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন।"

'জীবনদেবতা' যিনি এখানে নারীরূপে কল্পিতা, কবি তাঁহার উপরে ভরসা করিয়া যাত্রা করিয়াছেন, সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ জগতে উত্তীর্ণ হইবেন এই আশা প্রাণে জাগিতেছে। তাঁহার নীরব হাসি একটা নিশ্চিতির আশ্বাসরূপেই প্রতিভাত হইয়াছে কবির মনে, যদিও সংশয়ের ভাবটাই এখানে প্রবল। নিজের জীবনের এবং কাব্যসাধনার দিক হইতে আশা-নৈরাশ্য-আন্দোলিত কবিমানসের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে এই কবিতায়।

টীকা, শব্দার্থ ও মন্তব্য

[**প্রথম স্তবক**] **আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে**—এই কবিতাতেই আছে 'যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি কে যাবে সাথে' অর্থাৎ এই 'বিদেশিনী সুন্দরী' কবিকে বহুদিন হইতেই নিজের প্রভাবাধীন করিয়াছেন। এই যাত্রা কোথায় কোন্ পারে পৌঁছিয়া শেষ হইবে তাহাও অনিশ্চিত। সমস্ত কবিতাটির মধ্যে এই আত্মসমর্পণ এবং অনিশ্চয়তার ভাব পূর্বাপর জাগিয়া আছে। কবিতার প্রথম পঙক্তিতেই কবি মূল সুরটি ধরিয়া দিয়াছেন। **হে সুন্দরী**—এখানে সুন্দরী নারীরূপে কবি যে সত্তাকে কল্পনা করিয়াছেন তিনি কবির নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তি। সোনার তরী কাব্যে ইহাকে

'মানসসুন্দরী', 'বিদেশিনী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন, 'চিত্রা' কাব্যে ইঁহারই রূপান্তর জীবনদেবতায়। কবির জীবন ও কাব্যসাধনার সকল অভিজ্ঞতাকে এই শক্তি একটা অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গ্রথিত করিয়া তোলেন। কবির অন্তরের এই কবি, এই জীবনদেবতা, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কবিকে চালনা করেন। কবি নিজেকে ইঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত হইয়াছেন। 'চিত্রা' কাব্যের 'অন্তর্যামী' কবিতায় ইঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন :

"এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।
....
নব নব রূপে—ওগো রূপময়,
লুন্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।
কখনো হৃদয়ে কখনো বাহিরে,
কখনো আলোকে কখনো তিমিরে,
কভু বা স্বপনে কভু সশরীরে
পরশ করিয়া যাবে।"

বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে তোমার মনে—জীবনদেবতার অভিপ্রায় কবির নিকট এখনো স্পষ্ট হয় নাই। জীবনসাধনা ও কাব্যসাধনা

সত্যই কোনো চরিতার্থতা লাভ করিবে কিনা কবি সে বিষয়ে এখনও অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তার ভাব দ্যোতনার জন্যই এখানে অন্তর্যামীকে রহস্যময়ী নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে যে বিদেশিনী বলা হইয়াছে, সেই বিশেষণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কবি এখনও যে নিশ্চিত সফলতার তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হয় নাই, সেই জগৎ তো কবির পক্ষে বিদেশ বটেই। এই যে সোনার তরীর নাবিক, ইনি হয়তো সেই সাফল্যের দিকেই কবিকে লইয়া চলিয়াছেন। কবির নিকট যে জগৎ অপরিজ্ঞাত বিদেশ, ইনি সেই জগতেরই অধিবাসিনী হয়তো। তাই কবি ইহাকে বিদেশিনী বলিয়া সম্বোধন করেন। **অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি**—সাফল্যের তীর্থে উপনীত হইবার পথে অনেক বিঘ্ন, অনেক বাধা। সেই বাধারই, সেই কঠিন সাধনারই রূপক রূপে আসে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের চিত্র।

[**দ্বিতীয় স্তবক**] **ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা**—সন্ধ্যা-প্রকৃতির একটি অপরূপ চিত্র। দিন শেষে রাত্রি আসে। অস্ত-সূর্যের আলোয় রাঙা পশ্চিম আকাশে যেন দিনের চিতা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ চিত্র অন্যত্রও আছে, যেমন 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যে পাই :

> "অতি ধীরে মৃদু হেসে, সিঁদুর সীমন্ত দেশে
> দিবা সে যেমন করে আসে
> মরিবারে স্বামীর চিতায়
> পশ্চিমের জলন্ত শিখায়।"

ঝলিতেছে জল ······ অম্বরতল—অস্তসূর্যের রক্তিম রশ্মির আভায় পশ্চিম আকাশ এবং সমুদ্র রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রের জলকে মনে হইতেছে যেন তরল অগ্নি, মনে হইতেছে যেন আকাশ গলিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। অর্থাৎ আকাশ ও সমুদ্র একাকার হইয়া গিয়াছে। **দিক্‌বধূ**—কবিকল্পনায় দিগন্তকে নারীরূপে কল্পনা করা হয়। সংস্কৃত কাব্যে এই বর্ণনা বহুল ব্যবহৃত। দূর দিগন্তে চাহিলে কেমন একটা বাষ্পময়তা চোখে পড়ে। এই দৃশ্যের বর্ণনায় এখানে কবি লিখিয়াছেন, যেন দিক্‌বধূর আঁখি ছলছল্ করিতেছে। দিনকে বিদায় দিবার জন্যই বেদনায় দিক্‌বধূর আঁখি বাষ্পময়। **মেঘচুম্বিত অস্তগিরির**—'অস্তগিরি'ও প্রসিদ্ধ কবি কল্পনার পর্বতবিশেষ, সূর্য যে পর্বতে অস্ত যায়। মেঘ স্পর্শ করিয়া আছে যে অস্ত গিরি।

[**তৃতীয় স্তবক**] **সংশয়ময় ঘননীল নীর**—কবিমানস আচ্ছন্ন হইয়া আছে সংশয়বোধে। সেই সংশয়িত মনোভাবেরই প্রতিফলন হইয়াছে সমুদ্র জলরাশির বর্ণনায়। **তরুণী হিরণ**—সোনার তরণী।

[**চতুর্থ স্তবক**] **পশ্চিমপানে অসীম, সাগর, চঞ্চল আলো আশার মতন**—মোহিতলাল 'পশ্চিম সাগর' প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের অর্থাৎ য়ুরোপের কথা বলিয়াছেন। "অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যের কাব্য-সিদ্ধিই কবির নিকট আদর্শরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এই অর্থ কষ্টকল্পিত মনে হয়। এই কবিতায় অন্যত্র মৃত্যুর কথা, জীবনসায়াহ্নের কথা আছে। জীবনের সকল পর্বেই রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এই অসন্ন সমাপ্তির চেতনা কাজ করিয়াছে দেখা যায়। জীবন তো শেষ হইয়া আসিতেছে, এখনও সাফল্যের দেখা মিলিল না এইরূপ একটা ভাব নিতান্ত কাঁচা বয়সের লেখাতেও আছে। এখানে এই সূত্রেই পূর্ব দিগন্ত বা সূর্যোদয়ের চিত্রের পরিবর্তে পশ্চিম ও অস্তসূর্যের কথা আসিয়াছে মনে হয়। আলোচ্য অংশের প্রধান কথা 'আশা'র উল্লেখ। যেদিন যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন সেদিন সাফল্যের চরিতার্থতার আশাই কবিকে উদ্বোধিত করিয়াছিল। সেই আশা আজ যেন সংশয়ে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। **আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে**—কবির বাঞ্ছিত চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।

[**পঞ্চম স্তবক**] **কভু উঠিয়াছে মেঘ কখনো রবি**—নৈরাশ্য ও আশার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। **মেঘ**—নৈরাশ্যের প্রতীক, সূর্য আকার প্রতীক। **স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়**—মরণ এখানে কোনো ভয়ংকর ব্যাপার রূপে কল্পিত হয় নাই। জীবনের সুস্নিগ্ধ পরিণামরূপেই মৃত্যুর কল্পনা আসিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে এবং রীবন্দ্র সংগীতে বহু জায়গায় মৃত্যুকে এমন সুস্নিগ্ধভাবে কল্পনা করা হইয়াছে দেখা যায়। তুলনীয়, 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে মৃত্যুর রূপবর্ণনা :

"মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজূট,
রক্তকমল কর, রক্ত অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।"

কিংবা গানে :

"সমুখে শান্তি পারাবার—
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী,
লও লও হে ক্রোড় পাতি
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার।"

[**ষষ্ঠ স্তবক**] **শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ**—আকাশের আলো যখন অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া যাইবে, সংশয় নৈরাশ্যে চিত্ত ছাইয়া আসিবে তখনকার কথা। সোনার তরীর নাবিকা কখনোই স্পষ্টভাবে কোনো কথা উচ্চারণ করেন নাই, কিন্তু কবি তাঁহার মুখে ভরসা জাগানো নীরব হাসি লক্ষ্য করিয়াছেন। অন্ধকারে সেই হাসিটুকু আর দেখা যাইবে না। বাতাসে শুধু দেহসৌরভ ভাসিয়া আসিবে, এলোচুল উড়িয়া গায়ে পড়িবে। অর্থাৎ তিনি যে আছেন এই অনুভূতিটুকু থাকিবে, কিন্তু তাঁহার মনোভাব বুঝিবার কোনো উপায় থাকিবে না।

ব্যাখ্যা

[**এক**] হেথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না ব'লে। [দ্বিতীয় স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের এই শেষ কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে এক দ্বন্দ্বময় মানবিকতা। কবি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছেন যে বিদেশিনী সুন্দরীর সহিত, তিনি স্পষ্টভাবে যাত্রার লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো কথাই বলেন নাই। তবে প্রতিবারেই কবির উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার মুখে নীরব হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই অর্থপূর্ণ হাসিতে

আশ্বাসের ভাবটুকু স্পষ্ট। কবি এই কবিতার একস্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন, বিদেশিনীর ডাক শুনিয়া যখন তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন তখন অস্পষ্টভাবে হইলেও মনে ছিল আশা। আশা ছিল, একদিন এই যাত্রার শেষ হইবে, কবি উত্তীর্ণ হইবেন সার্থকতার তীর্থে। কিন্তু সেই সাফল্যের মুহূর্ত এখনও সুদূর। এখন বরং সংশয়ই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। সত্যই এই যাত্রার শেষে কোনো সফলতা অপেক্ষা করিয়া আছে কিনা সে বিষয়ে কবির মনে সন্দেহের ভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আলোচ্য অংশে এই সংশয়িত মনোভাবেরই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি।

সূর্য অস্তায়মান। পশ্চিম দিগন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে অস্ত-সূর্যের আলোয়। অচিরেই রাত্রির অন্ধকার দিক্‌দেশ আবৃত করিবে। সমুদ্রের নীল জলের উপরে প্রতিফলিত হইতেছে রাঙা আলো। তাহার উপর দিয়া সোনার তরী ভাসিয়া চলিয়াছে পশ্চিম দিগন্তের পানে। কবি তাঁহার সঙ্গিনীকে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করিয়াছেন, তবে কি ওই পশ্চিম সাগরের ওপারে কোনো অস্তগিরি মূলে তোমার আলয়? সেই আলয়ের উদ্দেশ্যেই কি এই যাত্রা। এই সহযাত্রিনী তো কবিরই জীবনদেবতা। তাহার আলয় বলিতে কবি সর্বসাফল্যের তীর্থই বোঝান। সেখানে উপনীত হইতে পারিলেই চরিতার্থ হইবেন। জীবনদেবতাকে যদি কবির জীবন-সাধনা ও কাব্য-সাধনার নিয়ন্ত্রীশক্তি মনে করা যায় তবে সেই নিয়ন্ত্রীশক্তির আলয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ অর্থ নিজের জীবনের ও কাব্যসাধনার সাফল্য সম্পর্কেই সংশয় প্রকাশ। কবি এইরূপ সংশয়ই প্রকাশ করিয়াছেন। মনে মনে জানেন আরও বহু পথ উত্তীর্ণ হইতে হইবে, আরও কঠিন সাধনা অপেক্ষা করিয়া আছে। চরম সিদ্ধির সাক্ষাৎলাভ করিতে করিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

[**দুই**] দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হেথায় নবীন জীবন

আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে ?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না ব'লে। [তৃতীয় স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' নামক কাব্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবির কাব্য-সাধনার একটা পর্যায়ে আশা-নৈরাশ্যে আন্দোলিত মানবিকতার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায়। জীবনদেবতা, যদি কবির জীবনের মধ্য দিয়া আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন, তিনি (এখানে নারীরূপে কল্পিত) কোন্ সকালে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন 'কে যাবে সাথে'। সেই নবীন প্রভাতে অনেক আশায় কবি তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিলেন। আজ বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াও নিশ্চিত সিদ্ধির সাক্ষাৎ যখন মিলিল না, সেই সংশয় ও নৈরাশ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া মনে পড়িতেছে যাত্রা আরম্ভের মুহূর্তের কথা।

সোনার তরণীর কর্ত্রী সেদিন সম্মুখে কর প্রসারিত করিয়া যেন দূর সিন্ধুর ওপারের কোনো নতুন দেশের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছিল। স্পষ্টভাবে কিছুই তিনি বলেন নাই, তবুও কবির মনে হইয়াছে ওই অসীম সাগরের ওপারে নিশ্চয়ই কোনো নতুন দেশ আছে। এখানে সমুদ্র এবং ওপারের কোনো দেশ এইসব চিত্র রূপকার্থেই গ্রহণ করা সঙ্গত। সমুদ্রলঙ্ঘন অর্থ দীর্ঘ সাধনা। সমুদ্রের পরপারের নবজীবন অর্থ পরম সিদ্ধি। 'চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে'—এই পঙক্তিটিতেই কবির মনের আশাময় উদ্দীপনার ভাবটুকু প্রকাশ পাইয়াছে। ইহারই সূত্র ধরিয়া আসে 'নবীন জীবন', 'সোনার ফল', ইত্যাদি প্রসঙ্গ। সমগ্র অংশটুকুতে যাত্রারম্ভক্ষণের প্রত্যাশার কথাই প্রাধান্য পাইয়াছে। সেই প্রত্যাশার বৈপরীত্যে বর্তমানের নৈরাশ্য স্পষ্টতর করিয়া তোলাই কবির অভিপ্রায়।

দীর্ঘদিন যিনি কোনো সাধনায় নিরত, তাঁহার জীবনের বিশেষ পর্বে নিজের কাজের মূল্য সম্পর্কে সংশয়ের ভাব জাগা নিতান্তই স্বাভাবিক। এদিক হইতে কবির সংশয়াতুর মনোভাব কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। কিন্তু নিজের জীবনের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া তাহার সহিত নিজের পরস্পরসাপেক্ষ সম্পর্কের পটভূমিতে এখানে সেই সংশয়কে যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাৎপর্যপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের বিবর্তনের দিক হইতে। এবং এই তাৎপর্যময় বক্তব্য তিনি অপূর্ব কাব্যরসে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়াই কবিতাটি বিশেষভাবে আমাদের আকৃষ্ট করে। নবীন জীবনের প্রত্যাশায় কবির যাত্রারম্ভ এবং মধ্যপথের সংশয়ের প্রসঙ্গ তাঁহার সমগ্র কবিজীবনের পটে গুরুত্বপূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়। জীবনদেবতা যাত্রারম্ভে কোনো কথা না বলিয়া নীরবে আসিয়াছিলেন। সে হাসিতে নিশ্চিত সিদ্ধির ভরসাই ছিল। সে ভরসা কবির জীবনে সত্যই ব্যর্থ হয় নাই।

[**তিন**] বেলা বহে যায়, পাল লাগে বায়—
সোনার তরণী কোথা চলে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি আছে কি সুপ্তি
তিমির তলে ?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না বলে। [পঞ্চম স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতাটি কবির জীবনদেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত। আপন জীবন ও কাব্য-সাধনার এক নিয়ন্ত্রী শক্তি কল্পনা করিয়া তাঁহারই উপরে কবি সর্বতোভাবে নির্ভর করিয়াছেন। কবির সকল চিন্তা ও চেষ্টা সেই শক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং সাফল্য অসাফল্য সবই নির্ভর করে তাঁহার উপর। তাঁহারই আহ্বানে সাড়া দিয়া কবি কোন নবীন প্রভাতে যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন। তারপর কতো প্রহর কাটিয়া গেল। কখনো নৈরাশ্যের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, কখনো বা দেখা দিয়াছে আশার সূর্যালোক। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া এখনও কবি সিদ্ধির নিশ্চিত তীরভূমিতে উপনীত হইতে পারিলেন না। আদৌ পারিবেন কিনা সে বিষয়ে এখন প্রগাঢ় সংশয় জাগিতেছে।

কবিতাটি বারবার সূর্যাস্তের এবং আসন্ন অন্ধকারের কথা আছে। এই আসন্ন অন্ধকারকে কবির জীবনসায়াহ্নের প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু একথাও ঠিক যে রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্বে, এমনকি নিতান্ত অল্প বয়সের কবিতাতেও বারবার মৃত্যুর প্রসঙ্গ আসিয়াছে। এখানে, আলোচ্য অংশেও কবি স্পষ্টতঃই মৃত্যুর প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। প্রাকৃতিক অন্ধকার এবং মৃত্যুর অন্ধকার যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। কবি প্রশ্ন করিতেছেন, তবে কি দিনান্তে সকল চেষ্টা সকল আকাঙ্ক্ষার শেষে মৃত্যুর মধ্যেই শান্তি খুঁজিয়া পাইবেন? জীবনদেবতার নিকট এই অন্তিম আশ্বাস প্রত্যাশা করিতেছেন। অস্তায়মান সূর্যের দিকে চাহিয়া মনে হইতেছে, দিন তো শেষ হইল। এখনও পরমসিদ্ধি কিছুই অর্জিত হয় নাই। সারাজীবনের কাব্য-সাধনায় নিত্যবস্তু কতটা সৃজিত হইয়াছে তাহা কবি নিশ্চিতভাবে জানেন না। এই সংশয় এবং অনিশ্চয়তার পালা শেষ হইয়া যদি মৃত্যুর শান্তি ও স্নিগ্ধতা মেলে—তবে তাহাও কাম্য।

কিন্তু জীবনদেবতা এ জিজ্ঞাসারও কোনো স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। তাহার নয়ন তুলিয়া হাসার দৃশ্যে এই ভাবই অভিব্যক্ত হয় যে, এখনও অনেক পথ বাকি, অনেক সাধনার দুঃখ অপেক্ষা করিয়া আছে। চলার শেষ হইবে এমন কোনো আশ্বাস নাই তাঁহার হাসিতে বা নয়নের দৃটিতে।

[চার] শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি।'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাবনা
নীরব হাসি। [ষষ্ঠ স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। অস্ত-সূর্যের রাঙা আলোয় ভাসমান সোনার তরী কবিকে লইয়া চলিতেছে সুদূর পশ্চিমের দিকে। অচিরেই রাত্রির অন্ধকার নামিবে। সেই যাত্রারম্ভক্ষণ হইতে কবি যতবার তাঁহার সঙ্গীনীকে যাত্রার লক্ষ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন, ততবারই তাঁহার মুখে নীরব হাসি। স্পষ্ট কোনো উত্তর না পাইলেও সেই হাসিতে একটা ভরসার ভাব জাগে। মনে হয়, এই দীর্ঘযাত্রা হয়তো নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন নয়। যাত্রাশেষে কোথাও একটা পরম সিদ্ধির তীর্থে উপনীত হইবেন। কিন্তু কবিতার শেষ অংশে সেই ভরসার ভাবটুকু ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। তাহার পরিবর্তে জাগিয়াছে আশঙ্কা ব্যাকুলতা। ক্রমেই সংশয় ও নৈরাশ্য গাঢ় হইয়া আসিয়াছে।

আলোচ্য অংশে কবি আসন্ন রাত্রির পরিবেশ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই আলোকবিহীন অন্ধকারে তিনি সোনার তরীতে ভাসিয়া চলিবেন। সঙ্গে যে আর একজন আছেন তাহা শুধু আভাসে ইঙ্গিতে অনুভূত হইবে। বাতাসে তাঁহার দেহ-সৌরভ ভাসিয়া আসিবে, কেশরাশি উড়িয়া গায়ে পড়িবে, কিন্তু তাঁহাকে কবি দেখিতে পাইবেন না। নৈরাশ্যে উৎকণ্ঠায় যতোই কাতরভাবে তাঁহার স্পর্শ কামনা করুণ না কেন, সে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না। দিবালোকে যে হাসিটুকু চোখে পড়িত, হাসি দেখিয়া যে ভরসা জাগাইয়া রাখা সম্ভব হইত তাহাও আর সম্ভবপর হইবে না।

কবির জীবনদেবতার উদ্দেশে উচ্চারিত এই কয়েকটি কথায় যে সংশয় ও নৈরাশ্য প্রকাশ পাইয়াছে ইহাই সোনার তরী কাব্যের শেষ কথা। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে ইহা কবির একটা সাময়িক মানসিক অবস্থা মাত্র। দীর্ঘদিন তিনি একাগ্রভাবে নিজেকে কাব্যসাধনায় নিবিষ্ট রাখিয়াছেন, তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা নিশ্চয়ই চরিতার্থতার আশীর্বাদধন্য। কিন্তু জীবনের পর্ববিশেষে সাময়িকভাবে যখন নিজের সাফল্য বিষয়ে প্রশ্ন জাগিয়াছে তখন সত্যই কোনো স্থায়ী কাজ করিতে পারিয়াছেন কিনা এ বিষয়ে সংশয় দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। এইরূপ একটি মানসিকতার সুরই এ কবিতায় ধরা পড়িয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

[এক] 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ কর এবং কবিতাটির নামকরণের তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। "আমি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।" রবীন্দ্রকাব্যের দুই বিপরীতমুখী প্রবণতার ইঙ্গিত আছে কবির নিজেরই এই উক্তিতে। বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানবজীবনের প্রতি মমতার টানে কবি সংলগ্ন হইতে চান এই বিশ্বের প্রত্যক্ষজীবনের সহিত। কবির এই মনোভাবকেই বলা যায় মর্ত্যপ্রীতি ও মানবজীবন প্রীতি। কিন্তু মাঝে মাঝে কবির চিত্রে জাগে অপর এক পিপাসা। মর্ত্য ধরণীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার কল্পনা উধাও পাখা মেলে কোনো এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের আদর্শলোকের উদ্দেশ্যে। সুদূরের পিয়াসী কবিচিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। কবি ইহাকে বলিয়াছেন সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা। 'সোনার তরী' কাব্যেও এই দুই বিপরীত মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রবল মর্ত্যপ্রীতির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। আর কাব্যের শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে অপর প্রবৃত্তি, সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের ভুবনে উপনীত হইবার জন্য কবি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছেন। তাঁহার জীবনদেবতার আহ্বানে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন, বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সোনার তরীখান ভাসিয়া আসিয়াছে। এ যাত্রার দায়-দায়িত্ব জীবনদেবতার উপরেই অর্পিত। কোন্ সকালে যাত্রা সুরু হইয়াছে। যাত্রাক্ষণে কবিচিত্ত ভরিয়া তুলিয়াছিলেন আশার রাগিনীতে। মনে হইয়াছিল, "চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।" জীবনদেবতার নিকট হইতে কোনো নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পাইলেও তাঁহার নীরব হাসিতে ভরসা বোধ করিয়াছিলেন।

তারপরে কতো প্রহর কাটিয়া গেল। তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর দিয়া অনেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। কখনো নৈরাশ্যের মেঘ চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে, কখনো আশার আলো ফুটিয়াছে। কবির উৎকণ্ঠার অন্ত

ছিল না। আশা নৈরাশ্যের আন্দোলিত চিত্তে বার বার প্রশ্ন করিয়াছেন। পরপারে কী অপেক্ষা করিয়া আছে জানিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু স্পষ্ট কোনো উত্তর মেলে নাই। উত্তর না মিলিলেও ওই নীরব হাসিতেই এক ধরনের আশ্বাসের সুর বাজিয়াছে মনে।

এখন সূর্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। অস্ত-সূর্যের আলোয় আকাশসমুদ্র রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটিতে এই দিনাবসানের চিত্রটি অপূর্বভাবে আঁকা হইয়াছে। দিবাবসানের প্রাকৃতিক চিত্রের সহিত মিশিয়াছে কবির নৈরাশ্য-উদ্‌বিগ্ন মানসিকতার কারুণ্য—

"ঝলিতেছে জল তরল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি
অশ্রুজলে,"

সন্ধ্যার কূলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে দিনের চিতা। 'ছলছল আঁখি', 'দিনের চিতা' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে কবিমনের নৈরাশ্যময় কারুণ্যই ভাষা পায়। রাত্রি অত্যাসন্ন, কিন্তু এখনো কূলের চিহ্ন নাই। কবি যেখানে উত্তীর্ণ হইতে চান সেই সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ লোক সত্যই কোথাও আছে কিনা এ বিষয়ে সংশয় তীব্র হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকার যখন নিবিড় হইয়া আসিবে তখন জীবন-দেবতার মুখের ভরসা জাগানো হাসিটুকুও আর দেখিতে পাইবেন না। সেই ভরসাহীন সংশয়ের চাপ কবি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন—ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত। এই উৎকণ্ঠার অভিব্যক্তিতেই কবিতাটি শেষ হইয়াছে।

সমগ্র কবিতাটিতে পরিচিত জগৎ হইতে কোন এক কল্পিত জগতে উত্তীর্ণ হইবার সুতীব্র বাসনা অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই বাসনা সংশয়ের মেঘে আচ্ছন্ন। একদিকে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা, অপরদিকে সংশয় নৈরাশ্যের বেদনা কবিতাটিতে পরস্পর বিজড়িত হইয়া একটা অভিনব সমাবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। তবুও কবি কোনো অপরিজ্ঞাত জগতে উপনীত হইবার জন্য একান্তভাবে ব্যাকুল; এই ব্যাকুলতাই কবিতাটির মূল সুর। পরিচিত জগৎ হইতে সুদূরে যাত্রার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই এ কবিতার কেন্দ্রীয় ভাব। কবির কাম্য সেই জগৎ, কী তাহার প্রকৃত রূপ তাহা কবির নিকটও স্পষ্ট নয়। যদি তাহাকে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ ভুবন বলা যায় তবুও প্রশ্ন থাকে, সেই পরিপূর্ণতা কি সত্যই

আয়ত্ত করা যায়? যাহা প্রত্যক্ষ নয়, সুপরিজ্ঞাত নয়, তাহার সম্পর্কেই 'নিরুদ্দিষ্ট' বা 'নিরুদ্দেশ'—এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা যায়। কবি তাঁহার কল্পনার পরিপূর্ণ সৌন্দর্যজগৎ সম্পর্কে সঙ্গতভাবেই তাই 'নিরুদ্দেশ' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এই যাত্রাকে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কবিতার কেন্দ্রীয় ভাববস্তু যথার্থভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে এই নামকরণে।

[দুই] 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় কবি 'বিদেশিনী সুন্দরী' নামে যাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছেন তিনি কে? ইঁহার স্বরূপ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটিতে কবির সকল বক্তব্যের উদ্দেশ্য একজন নারী, ভাষার ইঙ্গিতে প্রকাশ পায়—ইনি সুন্দরী এবং কবির প্রতি সহানুভূতিশীল। কবি সর্বতোভাবে ইঁহার নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছেন। ইঁহার আহ্বানে তরণীতে আরোহণ করিয়া দূর সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়াছেন। একবার কবি ইঁহাকে বিদেশিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কবির সহিত যে তাঁহার একটা নির্ভরতার নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে কবিতা হইতেই তাহা অনুভূত হয়। স্বভাবতঃই নারীরূপে কল্পিতা এই যাত্রা-সহচরীর স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে।

এই প্রসঙ্গটি আলোচনার সময়ে 'সোনার তরী' কাব্যের অপর দুটি কবিতার কথা মনে রাখা উচিত। একটি এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'সোনার তরী' অপরটি 'মানসসুন্দরী'। 'সোনার তরী'তে এক মেয়ের কথা আছে, যে কবির সাধনার ধন সোনার ফসল সব নৌকায় তুলিয়া লইয়া যায় কিন্তু কবিকে গ্রহণ করে না। 'মানসসুন্দরী'তে মানসীর সহিত ক'বির পরিপূর্ণ মিলনের চিত্র পাই। এই মিলন-লীলাই কবির জীবন-সাধনা বা কাব্য-সাধনাকে বিচিত্র আনন্দরসে উজ্জীবিত করিয়া সফলতায় ভরিয়া তোলে। উভয় কবিতাতেই এক কাল্পনিক স্বতন্ত্র সত্তার বিগ্রহ আছে। এই সত্তা কবির জীবনের, তাঁহার ভাবনা-বেদনার জগতের বাহিরের কেহ নয়। নিজে যাহা কিছু করিতেছেন—জীবনের কর্মে এবং কাব্যে সৃষ্টিশীলতায় নিজেকে যে ভাবে প্রকাশ করিতেছেন—তাহার মধ্যে কবির সচেতন ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা ভিন্ন অপর এক শক্তির উপস্থিতি অনুভব করেন। এই শক্তি যেন তাঁহাকে চালনা করিতেছে। এই শক্তিই কখনো সোনার তরীর মেয়ে, কখনো মানসসুন্দরী, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রায়

রহস্যময়ী বিদেশিনীরূপে কল্পিত হইয়াছে। আরও পরে চিত্রা কাব্যে এই শক্তিকেই কবি 'জীবনদেবতা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই জীবন-দেবতার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন, "যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি।...... অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।" জীবনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার এই কল্পনা কবির মনে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া একটা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বরূপ লাভ করিয়াছে চিত্রা কাব্যে। সুতরাং সোনার তরী কাব্যের প্রায় চেনা নেয়ে, মানসসুন্দরী বা নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গিনী যে কবির ওই জীবনদেবতা কল্পনারই পূর্বতন স্তর তাহা বুঝিতে কিছু অসুবিধা হয় না।

কবি বহুবার বলিয়াছেন, তাঁহার মন দুটি বিপরীত শক্তির আকর্ষণে সাড়া দেয়। একদিকে হাসি-কান্নায় ভরা এই মর্ত্য ধরণী, অপরদিকে সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা। কোনো এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কাল্পনিক জগতের প্রতি তাঁহার মনের আকর্ষণ মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নিরুদ্দেশ যাত্রা এই শ্রেণীর কবিতা। কে এমনভাবে সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে কবির মনে, এই জিজ্ঞাসার উত্তরেও তিনি জীবনদেবতারই প্রভাব দেখিয়াছেন। সেই কল্পিত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ভুবনের স্বরূপ কবি স্পষ্ট-ভাবে জানেন না, সেখানে উপনীত হওয়া সম্ভব কিনা তাহাও অনিশ্চিত। তবুও ইহার আকর্ষণ কবির পক্ষে সত্য। এই নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষার যে অনির্দেশ্যতা, ইহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবনদেবতাকেও কবি এক রহস্যময়ী নারীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইনি নীরব হাসিতে ভরসা দেন কিন্তু স্পষ্টভাবে কোন প্রতিশ্রুতি দেন না। কবি ইঁহার উপরে সর্বতোভাবে নির্ভর করিতে পারেন, কিন্তু সংশয় ঘোচে না। বহুদূর পথ তিনি অতিক্রম করিয়াছেন চরিতার্থতার আশায়। তারপর সংশয় দেখা দিয়াছে। কিন্তু সংশয় যতোই প্রবল হোক, কবি জানেন জীবনদেবতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহার দেহসৌরভ অনুভব করিবেন, কেশরাশির স্পর্শে তাঁহার উপস্থিতি সম্পর্কে নিঃসংশয় হইবেন। কবি ইঁহাকে বিদেশিনীরূপে সম্বোধন করিয়াছেন। যে অপরিজ্ঞাত জগতের উদ্দেশ্যে কবি যাত্রা করিয়াছেন

তাহা আপন অভিজ্ঞতার বাহিরে বলিয়াই বিদেশ। কিন্তু যিনি সেইদিকে কবিকে চালনা করিতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই সে জগতের স্বরূপ জানেন। কবির পক্ষে ওই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের ভুবন যেমন বিদেশ, সেই ভুবনের অধিষ্ঠাত্রীও সেইরূপ বিদেশিনী। এইদিক হইতে 'বিদেশিনী' শব্দটি ব্যবহারের একটা অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু বিদেশিনী কবির প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁহার হাসিতে, তাঁহার ইঙ্গিতে যে বরাভয় ছিল—সেই ভরসাতেই কবি অকূল সমুদ্রে ভাসিয়াছেন।

[তিন] 'সোনার তরী' কাব্যের প্রথম ও শেষ কবিতায় (সোনার তরী এবং নিরুদ্দেশ যাত্রা) 'বিদেশিনী'রূপে কাহাকে সম্বোধন করিয়াছেন ? এই কবিতা দুটির মধ্যে কোনো ভাবগত সাদৃশ্য থাকিলে তাহা পরিস্ফুট কর।

অথবা, কোন কোন সমালোচকের মতে 'সোনার তরী' (নাম-কবিতা) ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্বের পূর্বাভাস। উক্তিটির যাথার্থ্য আলোচনা কর।

উত্তর। 'সোনার তরী' কাব্যের প্রথম ও শেষ কবিতা দুটিতে কবি নিজের কীর্তি ও জীবনের উপরে ভিন্নতর কোনো শক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম কবিতায় কোনো এক নেয়ে আবির্ভূত হন, তিনি কবির আহ্বানে অগ্রসর হইয়া আসেন। কবির সোনার ধান, অর্থাৎ তাহার সৃষ্ট কাব্যসম্ভার নৌকায় তুলিয়া লন, কিন্তু কবির জন্য সে নৌকায় স্থান হয় না। শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় আবার সোনার তরীর উল্লেখ আছে, এই তরণীর অধিষ্ঠাত্রী এক রূপসী নারী। তাহার মৌন আহ্বানে কবি তরণীতে আরোহণ করিয়াছেন। বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যা সমাসন্ন। একটু পরেই রাত্রির অন্ধকার দিকদেশ আচ্ছন্ন করিবে। কবিচিত্ত আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় কোন চরিতার্থতার তীর্থে এ যাত্রা শেষ হইবে তিনি জানেন না। সেই পরপারে কি অপেক্ষা করিয়া আছে তাহাও জানেন না। সহযাত্রীণীকে প্রশ্ন করিয়া কোনো উত্তর পান না। তবুও তাঁহার হাসিতে তাঁহার করমুদ্রায় বরাভয় অনুভব করেন কবি।

লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রথম কবিতায় নেয়ে একজন 'পুরুষ', দ্বিতীয় কবিতায় কবি যাহার কথা বলিয়াছেন তিনি 'নারী'। প্রথম কবিতায় নেয়ে কবিকে

তাঁহার নৌকায় স্থান দেন নাই, শুধু কাব্যসম্ভার তুলিয়া লইয়াছিলেন (আমারি সোনার ধান গিয়েছে ভরি)। শেষ কবিতায় কবি নিজেই নৌকায় আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। সতর্ক দৃষ্টিতে কবিতা দুটিতে এইরূপ ছোটখাট বৈসাদৃশ্য ধরা পড়িলেও রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের বিবর্তন ও তাঁহার ভাবনা বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে কবিতা দুটির মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্যের দিকটিই বিশেষভাবে আলোচ্য।

সোনার তরী-চিত্রা পর্যায়ের বহু কবিতায় দেখা যায় কবি বারবার নিজের জীবন ও কাব্যসাধনার উপরে কোন এক অন্তর্যামী শক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। একদিকে আছে বৈচিত্র্যময় বিশ্বসংসার, অন্যদিকে কবির ব্যক্তিজীবন। বিশ্বের নিরন্তর স্পর্শ কবির মনে যে সব অনুভূতির তরঙ্গ তোলে—তাহাই কবি প্রকাশ করেন তাঁহার কাব্যে। সেই কাব্যের সম্ভার বিশ্বজনের মনে আশ্রয় লাভ করিবে, তাহাদের আনন্দ বেদনার উৎসরূপে মর্যাদা পাইবে—কবি ইহাও নিশ্চয়ই কামনা করেন। এই যে একটি সৃষ্টিশীল জীবন-বৃত্ত, ইহার বিচিত্র কর্মকাণ্ড বিবাহিত হইতেছে কিরূপে? কেবল কি কবির ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির বশে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সুসম্পন্ন হইতেছে? কবির মনে মাঝে মাঝে এই চিন্তার উদয় হয়। এই জিজ্ঞাসা তাঁহাকে একটি তত্ত্বভাবনায় উপনীত করে। তিনি নিজের জীবনসাধনা ও কাব্যসাধনার মধ্যে অন্তরতর কোনো শক্তির অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে অনুভব করেন। এই শক্তি ঈশ্বর নয়, কবির ব্যক্তিজীবনের দেবতা, ইহাকে কবি জীবনদেবতা, নামে সম্বোধন করিয়াছেন। বলিয়াছেন, "এই যে কবি যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার জীবনদেবতা নাম দিয়াছি।" এই জীবনদেবতার তত্ত্বগত ধারণাটি যে অকস্মাৎ একদিন কবির মনে আসিয়াছে এমন নয়। নানারূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়া এই তত্ত্ব চিত্রা-কাব্যে বিশেষভাবে ওই কাব্যের 'অন্তর্যামী' কবিতায় পূর্ণ রূপলাভ করিয়াছে। বলা যাইতে পারে সোনার তরী কাব্যের প্রথম কবিতা হইতেই এই একটি নতুন ধারণার সূচনা হইয়াছিল। সোনার তরী 'নেয়ে'তে জীবনদেবতারই পূর্বাভাস। অনতিস্ফুট-ভাবে ওই তত্ত্বধারণাই এখানে ক্রিয়াশীল। এখানে 'নেয়ে' বা জীবনবেদতা কবি ও বিশ্বমানবের মধ্যে দৌত্য করিয়াছেন। কবি আপন জীবনের দুঃখ বেদনার অভিজ্ঞতা নিঙড়াইয়া যে কাব্যফসলগুলি ফলাইয়া তুলিয়াছেন, জীবনদেবতা সেই

বেদনার ধনগুলি ব্যর্থ হইতে দেন নাই। তিনি সেই কাব্যসম্ভার বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কাব্যসাধনার সার্থকতা বিষয়ে কবির প্রত্যয়বোধই প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতায়। অবশ্য বেদনাবোধও আছে। সংসার কবির সৃষ্টিকে গ্রহণ করে, কিন্তু কবিকে গ্রহণ করে না। ওই নৌকায় কবির নিজের জন্য স্থান হয় নাই। শিল্পীকে যে সাধনা করিতে হয়, সেই সাধনার দুঃখ বেদনা যে একাকী বহন করিতে হয়,—এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে কবিতার শেষ অংশে।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় 'জীবনদেবতা' কল্পনা আরও পূর্ণতর পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। এখানে তিনি অন্তর্যামী শক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কবি ইঁহার উপরে নিজের জীবনের পূর্ণভার তুলিয়া দিয়া একান্ত-ভাবে নির্ভর করিয়া আছেন। তাঁহারই তরণীতে আরোহী হইয়া চলিয়াছেন। এ যাত্রার উদ্দেশ্য কি, ইহার শেষ কোথায়—নিজে কিছুই জানেন না। আপন জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সঙ্গলাভ করিয়াছেন, ইহাই একটা বড়ো ভরসা অনেক বাধা বিঘ্ন আছে। সামুদ্রিক অভিযাত্রার দুরূহতার চিত্রে এবং আসন্ন রাত্রির উল্লেখে এইসব বাধাবিঘ্নের অনুভূতিই আভাসিত হয়। কবি এই আশঙ্কা ব্যাকুলতার মধ্যেও যে ভরসা পান, বরাভয় অনুভব করেন—তাহাও বোঝা যায়। সঙ্গিনীর নীরব হাসি সেই ভরসার ভাবটুকু অবলুপ্ত হইতে দেয় নাই।

দেখা যাইতেছে, কবিতা দুটিতে আপাত বৈসাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য আছে। একই কল্পনার ভিন্ন প্রকাশ কবিতা দুটি। রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ তত্ত্বভাবনার বিকাশস্তরের সাক্ষ্য হিসাবে কবিতা দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং একই সূত্রে গ্রথিত।

॥ যেতে নাহি দিব ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য ঃ

'সোনার তরী' কাব্যের দীর্ঘ কবিতাগুলির অন্যতম 'যেতে নাহি দিব'। কবির জীবনভাবনা প্রকাশের দিক হইতেও কবিতাটি গুরুত্বপূর্ণ। নিতান্ত ঘরোয়া একটি পরিবেশ বর্ণনায় শুরু হইয়া কবিতাটির সুর ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠিয়াছে, আসিয়াছে গভীরতর বক্তব্য। এই কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ইহাতে "একটি ক্ষুদ্র সংসার-জীবনের ব্যর্থ স্নেহ, অসহায় মানুষের একটি সাধারণ অনিবার্য হৃদয়বেদনা অপূর্ব কল্পনাশক্তির যাদুমন্ত্রে নিখিল বিশ্বের অন্তর্লীন মর্মব্যথায়, আদি মাতা ধরিত্রীর বেদনাপীড়িত সন্তানমমতার এক সর্বব্যাপী বিষাদ-সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কবিতাটির প্রারম্ভে গার্হস্থ্য-ব্যবস্থার ছোটখাট, প্রীতিমধুর, সেবা-স্নিগ্ধ হাজার বস্তু সঞ্চয় যেন ধূলিমলিন মর্ত্যলোকের সর্বনিম্ন স্তরে উহার ভূমিকা রচনা করিয়াছে। মধ্যভাগে একটি চার বৎসরের শিশু বালিকা অবোধ স্নেহের ব্যর্থদাবীভরা, নির্মম বিশ্ববিধানের দ্বারা উপহাসিত, অথচ আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় এক অভিলাষ ঘোষণা করিয়াছে। সংসারের সমস্ত বাস্তব ক্ষণভঙ্গুরতার বিরুদ্ধে দুর্বল মানুষের প্রেম উহার চিরন্তন স্থায়িত্বের দৃপ্ত দাবী তুলিয়াছে। এই করুণ, সুনিশ্চিত পরাজয় চেতনার অঙ্কুর হইতে কবিপ্রতিভা এক বিরাট, বিশ্বব্যাপী ভাব-মহীরুহের উদ্‌গম ঘটাইয়াছে। অবোধ, সংসারানভিজ্ঞ ছোট মেয়েটির শান্ত, নিঃসংশয় অধিকারবোধ সমস্ত নিখিলে বিকীর্ণ হইয়া বিরাট বিশ্বের হৃদপঞ্জর-বিদীর্ণকারী এক করুণ আবেদনে মুখরিত হইয়াছে। সমস্ত জগতের অণুপরমাণুতে এই রোদনভরা মর্মনিঃসৃত কামনা প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। বিস্তীর্ণ হেমন্ত শস্যক্ষেত্রে, বৃক্ষের আলোছায়ার হ্রস্বদীর্ঘতায়, নদীস্রোতের পরস্পর-অনুগামী তরঙ্গমালায়, চঞ্চল ঘটনাস্রোতের উপর নিক্ষিপ্ত এক অচঞ্চল মর্মকামনার স্থির আচ্ছাদনে—সর্বত্র এই বিষাদ-সঙ্গীত, আপাতব্যর্থ আশার অপ্রশমিত বেদনার সুর অনুরণিত হইয়াছে। সর্বশেষে মাতা বসুন্ধরার শোকম্লান, অপ্রতিবিধেয় নিয়তির প্রতি অনিমেষ বদ্ধদৃষ্টি উদার মূর্তিটিও অবিস্মরণীয় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ক্ষুদ্র হইতে

মহৎ, এই ভূমিতলনিবদ্ধতা হইতে উর্ধ্ব গগনচারিতায় সংক্রমণ কিরূপ অনায়াসে, কত অবলীলাক্রমে সম্পন্ন হইয়াছে—কোথাও সচেতনভাবে ভাবসমুন্নতিপ্রয়াস দেখা দেয় নাই। কল্পনার এই স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা, ভাবের এইরূপ নিবিড়, নিটোল, অনবদ্য রূপসংহতি, মননের এইরূপ অবাধ নিখিলব্যাপী প্রসারণ শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার রাজকীয় শিলমোহর স্বাক্ষরিত।”

শ্রীযুক্ত **প্রমথনাথ বিশীর** অভিমত, “ ‘যেতে নাহি দিব’ কবিতার মূল ভাবটি পৃথিবীর প্রতি জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি। আবার সে আসক্তি বিজ্ঞ বয়ঃপ্রাপ্তের নহে। জীবনের অভিজ্ঞতা যাহার খানিকটা জন্মিয়াছে সে জানে ‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে’, কিন্তু চারি বছরের মেয়ে বুঝিতেই পারে না কেন যে তাহার পিতা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে। তাহার হৃদয়ের ব্যাকুল আগ্রহ সত্ত্বেও স্নেহময় পিতা ছাড়িয়া যান। ইহাই দুঃখের রহস্য। এই শিশুকন্যার ক্রন্দন আমাদের সকলের জীবনেই রহিয়াছে। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় আমরা শিশু বই কি! এখানে কবির চিত্ত তাঁহার শিশুকন্যার মত বহুকালের পৃথিবীকে, প্রিয় বস্তুকে, অপস্রিয়মান সৌন্দর্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে······পৃথিবী দরিদ্রা, স্বর্গের অমৃত তাহার নাই, সে প্রাণপণ বলে সেই অমৃতের আভাস মাত্র দিতে পারে।”

‘যেতে নাহি দিব’ কবিতাটির ভাববস্তুর গদ্য বিবৃতি পাওয়া যায় ‘ছিন্নপত্রাবলী’ গ্রন্থের একটি চিঠিতে। চিঠিটি এই:

“ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি; ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল-নিস্তব্ধতা প্রভাত-সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম। স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা-দুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত। আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই-সমস্ত দরিদ্র মর্ত্যহৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারি না; নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই

পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ আছে, যেন এর মনে মনে আছে, 'আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নাই; আমি ভালোবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে, আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে পারিনে, জন্ম দিই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।' এইজন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি; এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতার বলেই।"

সারসংক্ষেপ:

পূজার ছুটির শেষে আজ কর্মস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করিবার দিন। দীর্ঘ-দিনের জন্য আবার সেই দূর প্রবাসে যাইতে হইবে। শরতের দ্বিপ্রহরে গ্রামবাসী সকলে বিশ্রামে মগ্ন, কিন্তু এই গৃহস্থের ঘরে বিশ্রামের অবকাশ নাই। প্রবাসযাত্রী গৃহস্বামীর জিনিসপত্র গুছাইয়া প্রস্তুত করিয়া দিতে সকলে ব্যস্ত। বিচ্ছেদ বেদনায় গৃহিণীর চিত্ত ভাঙিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাঁহার কাঁদিবার সময় নাই। ছোটো বড়ো নানা পাত্রে ভাণ্ডে শিশি বোতলে কতো যে সামগ্রী তিনি সাজাইয়া তুলিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বিদেশে কখন কখন জিনিসটির প্রয়োজন পড়িবে সেই চিন্তায় গৃহিণী ব্যাকুল। নিজের হাতে প্রস্তুত নানা আহার্য সাজাইয়া দিয়াছেন। সোনামুগ, সরুচাল, পাটালি, ঝুনা নারিকেল, কিছু সরিষার তেল—এমন টুকিটাকি নানা জিনিস। বোঝা জমিয়াছে পর্বতপ্রমাণ। কিন্তু কিছুই ফেলিয়া যাইবার উপায় নাই। প্রতিটি দ্রব্যের সঙ্গে জড়ানো আছে এই স্বামীগতপ্রাণা নারীর উৎসর্গিত ভালোবাসা। তাঁহার হৃদয়ের অপার মমতা। বিদায় মুহূর্ত আসিল। গৃহস্বামী বিদায় চাহিলেন। যাত্রাকালে অশ্রুপাত অমঙ্গলবহ, তাই গৃহিণী দ্রুত আঁচলে মুখ আড়াল করিয়া সরিয়া গেলেন।

দ্বার দিয়া বাহিরে যাইবার এমন সময়ে চোখ পড়িল চার বৎসরের কন্যাটির উপরে। কী ভাবিয়া সে দরজার কাছে বসিয়া আছে। অন্যদিন এতক্ষণে আহার সাঙ্গ করিয়া সে নিদ্রা যায়। আজ মাতা তাহার প্রতি চাহিবার সময় পান নাই। এতক্ষণ সে যাত্রার আয়োজন দেখিতেছিল, পিতার আশপাশে ঘোরাঘুরি করিয়াছে, শেষে দরজার ধারে গিয়া অন্যমনে বসিয়া আছে। পিতা কন্যার কাছেও বিদায় চাহিলেন। অকস্মাৎ মেয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'যেতে আমি দিব না তোমায়'। না যাইয়া উপায়

নাই, কিন্তু শিশুর হৃদয় সেই কর্তব্য-দায়িত্বের কথা বোঝে না। তাহার হৃদয়ের সরল সতেজ স্নেহের দাবি লইয়া সে উচ্চারণ করিল, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।' কিন্তু এমন প্রবল দাবিও উপেক্ষা করিতে হয়। যাইতে দিতে হয়।

শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত ওই স্নেহের অহমিকা, কবির মনে একটা দিব্য উপলব্ধির মতো বাজিয়া উঠিয়াছে। ওই একটি ধ্বনি তাহার চেতনায় জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি সত্যানুভূতি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। এখান হইতেই কবিতার দ্বিতীয় স্তরের সূচনা। কবিকণ্ঠের স্বরগ্রাম ক্রমেই উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইয়া কন্যার ওই স্নেহদর্পিত বাণীর সূত্রে বিশ্বের মধ্যে স্থিতি ও গতির দ্বন্দ্বময়তার দার্শনিক উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছে।

'যেতে নাহি দিব'—এই দাবী অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। সংসারে কাহারো যাওয়া কি রোধ করা যায়? কে রোধ করিতে পারে? স্নেহের প্রেমের এমন কি শক্তি আছে যে বিশ্বের নিয়মের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে?

প্রবাসযাত্রী কবি কন্যার সেই দর্পিত নিষেধ বাক্য কানে নিয়া যাত্রা করিলেন, গ্রামের পথ। দুইপাশে আনমিত শস্যক্ষেত্রের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। গঙ্গা বহিয়া যায়। দীপ্ত রৌদ্রে দিগন্তবিস্তৃত বহুপুরাতন এই পৃথিবীর দিকে চাহিয়া কবি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। বিশ্ব যেন এক পরিব্যাপ্ত বিষাদে মগ্ন। কেন এ বিষাদ? জগতের সর্বত্রই একই ধ্বনি যেন জাগিতেছে, অহরহ গুঞ্জরিত হইতেছে এই বাণী 'যেতে নাহি দিব'। ক্ষুদ্র তৃণগুলি বুকে ধরিয়া বসুন্ধরাকে বলিতেছে 'যেতে নাহি দিব'। নিবু নিবু শিখাটিকে প্রদীপ যেন ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে। ধূলিকণা হইতে মানুষের জীবন পর্যন্ত ওই এক ভালোবাসার বন্ধন রচিত হইয়া আছে। হৃদয়ের ধনগুলি কেহ ছাড়িতে চায় না। বন্ধন অক্ষয় করিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই। কোনো বন্ধনই চিরন্তন নয়। ওই প্রবল আকুলতার আলিঙ্গন ছিন্ন করিয়া সকলেই চলিয়া যাইতেছে। ইহাই জগতের নিয়ম।

কবির অকস্মাৎ মনে হইয়াছে, শিশুরকণ্ঠের ওই যে বাণী, উহা যেন বিশ্বের মর্মকেন্দ্র হইতে উত্থিত এক স্বর। এ বিশ্ব চিরকাল যাহা কিছু পায় সকলি হারায়। তবুও অবোধের মতো বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে চায়। অনিবার্য

বিশ্বনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যেন বিদ্রোহীর মতো বলে 'যেতে নাহি দিব'। প্রেমের দর্পে বার বার বলে, আমি যাহাকে ভালোবাসি সে কি কভু আমা হইতে দূরে যাইতে পারে? কিন্তু এই দর্পিত বিদ্রোহকে চূর্ণ করিয়া বিলুপ্তির অনিবার্যতা ঘনাইয়া আসে। চলিয়া যাওয়া সত্য। মৃত্যু সত্য। তবুও এ বিশ্বে সকলে উচ্চকণ্ঠে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। বলিতেছে, প্রেম সর্বজয়ী। এই মৃত্যুর গ্রাসে জীবনের ভালোবাসাগুলি কী করুণ বিষণ্ণতায় ভরা। আশাহীন শ্রান্ত যেন বিশ্বের উপরে বিষাদ-কুয়াশা টানিয়া রাখিয়াছে। চলমান জলের ধরার উপরে যেমন স্থির মেঘের ছায়াখানি পড়িয়া থাকে। তেমনি অবিরাম গতিশীল জীবনধারার উপরে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের ছায়া সঞ্চারিত হইয়া আছে। যাওয়া সে রোধ করিতে পারে না। শুধু সেই চলমানতার উপরে হৃদয়ের বিষণ্ণটুকু সঞ্চার করিয়া দেয়। আমাদের মাতা বসুন্ধরা যেন বিষাদমূর্তিতে উদার দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া আছেন। দেখিতেছেন, যাহা কিছু তিনি পরম মমতায় সৃষ্টি করিয়া তোলেন সকলি কেমন অবসিত হইয়া আসে। তাঁহার অনন্ত মমতা, অনন্ত ভালোবাসার জোরেও কিছুই ধরিয়া রাখিতে পারেন না। কবির উপলব্ধিতে শিশুকন্যা আর মাতা বসুন্ধরা একাকার হইয়া গিয়া একই সত্যকে প্রকাশ করে। উভয়েই বলিতেছে, 'যেতে নাহি দিব'। আর জীবন কেবলই সেই আকুল আলিঙ্গন এড়াইয়া বহিয়া চলিয়াছে।

মর্মার্থ:

এই কবিতায় কবি বাস্তব কাহিনীর আধারে জগতের মর্মগত একটি সত্যকেই রূপ দিয়াছেন। এ জগতে সবই অনিত্য, কোনো বন্ধনই চিরন্তন নয়। মৃত্যু সত্য, জীবনের অন্তহীন প্রবাহ সকল বাধাবন্ধ ছিন্ন করিয়া কেবলই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ প্রবাহ কেহ রোধ করিতে পারে না। তবুও এই সংসারে ভালোবাসা জাগে। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ প্রস্ফুট হইয়া ওঠে। ভালোবাসার ধন চিরদিনের মতো বক্ষের মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া রাখাই জীবনের ধর্ম, যদিও এ আকাঙ্ক্ষা কংনোই পূর্ণ হয় না। একদিকে স্থিতির মোহ নীড় বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে আছে গতির টান, নিরন্তর চলমানতা। এই স্থিতি ও গতির দ্বন্দ্বে বিশ্বসংসারে নিরন্তন বেদনার সুর জাগিতেছে। জীবদের সহিত এ বেদনার সুর চিরদিন জড়িত হইয়া আছে। মানুষের ভালোবাসা মাত্রেই তাই কেমন বিষাদ-আচ্ছন্ন। এই বিষাদ বেদনা

কবির অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। একটা সাধারণ ঘটনার দর্পণে কবি বিশ্বের মর্মগত বেদনা প্রতিফলিত দেখিয়াছেন। মানবকন্যার কণ্ঠে উচ্চারিত স্নেহার্তির মধ্যে বিশ্বসংসারের এবং বিশ্বমানবের অন্তরের আকুলতার স্বর গুঞ্জরিত হইতে শুনিয়াছেন। কবিতাটি একটি সাধারণ ঘটনার গদ্যময় বর্ণনায় শুরু হইয়া তাই বিশ্বসংসারের গভীর মর্মকেন্দ্র অবধি প্রসারিত হইয়াছে।

সমালোচনা ঃ

এই দীর্ঘ কবিতাটিতে স্তরান্বয়ে কবি-কল্পনা অতি সাধারণ জীবনের একটি অভিজ্ঞতা হইতে জাগ্রত প্রশ্নকে অবলম্বন করিয়া প্রসারিত হইয়াছে বিশ্বের মর্মবেদনার কেন্দ্রের দিকে। তুচ্ছ অভিজ্ঞতার স্তর হইতে গভীরতর সত্যানুভূতির স্তরে উত্তরণে কবি-কল্পনার গতি অনায়াস এবং স্বচ্ছন্দ। ফলে ভাবস্তরগুলির মধ্যে কোথাও ফাঁক নাই, কষ্টকল্পিত আরোপের চিহ্ন নাই।

কবিতার প্রথমদিকে বাঙালি গৃহস্থের সাংসারিক জীবনযাত্রার ছবিটুকু আঁকিয়াছেন বস্তুনিষ্ঠভাবে। এই অংশ পাঠ করিতে করিতে মনে পড়ে, সমসাময়িক কালে কবি তাঁহার গল্প রচনার ধারায় যে সাধারণ বাঙালি জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন তাহার কথা। একজন চাকুরিজীবি মধ্যবিত্ত বাঙালি, বৎসরের অধিকাংশ সময় তাঁহাকে প্রবাসে কাটাইতে হয়। পূজার ছুটি দেশে কাটাইয়া আবার সে কর্মস্থলে ফিরিতেছে। সেই বিদায় মুহূর্তে বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর গৃহিণীর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং সেবাবৃত্তির স্নিগ্ধ প্রকাশ কবি যথাযথভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। 'সোনামুগ', 'সরুচাল', 'গুড়ের পাটালি', 'রাই সরিষার তেল' —এইসব খাদ্যবস্তুর উল্লেখ, গৃহিণীর অনুনয়পূর্ণ বাচনভঙ্গি বাঙালি সংসারের আবহটি নিখুঁত বাস্তবভাবে উপস্থাপন করিয়াছে। কবি যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন একটি সাধারণ গদ্যময় স্তর হইতে কবিতাটি আরম্ভ করিয়াছেন। নিত্যকার জীবনের খুব তুচ্ছ ঘটনায় যে সব জীবনসত্য উন্মীলিত হইয়া ওঠে তাহাকে গোটা বিশ্বব্যাপারের বৃহৎ ভাবসত্যের সহিত গাঁথিয়া একাকার করিয়া দেখানোই কবির উদ্দেশ্য।

শিশুকন্যার চিত্রটিও এই বাস্তবসংসার জীবনের সহিত একান্তভাবে সংলগ্ন। আজ সে মায়ের পরিচর্যা পায় নাই, পিতার বিদায় উপলক্ষে সকলের ব্যস্ততা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছে। সেও এই সংসারের একটা বিশেষ অঙ্গ। স্নেহের অধিকারে বয়স্কদের উপরে তাহার দাবি বড় তুচ্ছ নয়। সেই দাবির জোরেই যেন অকস্মাৎ ঘোষণা করিয়াছে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'

এ বড়ো অসম্ভব দাবি। এ দাবি মানিবার উপায়ও নাই। কন্যার নিষেধ কানে লইয়া পিতা প্রবাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু শিশুকন্যার কণ্ঠের ওই প্রবল দর্পিত ঘোষণা যেন বিশ্বের মর্মে নিহিত এক সুপ্রাচীন ও চিরন্তন দ্বন্দ্ব বেদনার স্বরূপ মর্মের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছে। প্রবাসযাত্রীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আকুলতার সহিত মিশিয়াছে হেমন্ত দ্বিপ্রহরের উদাস নিঃস্তব্ধ প্রকৃতির চিত্র। এবং ওই প্রাকৃতিক দৃশ্যই প্রবাসযাত্রীর মনে ভাবান্তর সূচনা করিয়াছে। ধীরে ধীরে জগৎসত্যের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই ভাবান্তরের সূত্রেই আসে বিশ্বের মর্মগত স্থিতির আকাঙ্ক্ষা এবং গতির অনিবার্যতার দ্বন্দ্বজনিত প্রসঙ্গ।

শুধু ও শিশুকন্যাটি নয়, এ জগতে সকলেই তো আকুলভাবে ভালোবাসার ধনগুলি চিরদিনের মতো বুকের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে চাহিতেছে। ভালোবাসার জোরে চিরকালের মতো আলিঙ্গনের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে। কিছুই ধরিয়া রাখা যায় না। জগতে সবই চলিয়া যায়। বিলীন হয়। মৃত্যুর গ্রাসের দিকে অগ্রসর হয়। ভালোবাসার দর্প মৃত্যুকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করে। অপস্থিতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। সেই ভালোবাসার দর্প, প্রেমের শক্তি বড়ো বিস্ময়কর, কিন্তু বড়ো করুণ। করুণ, কারণ প্রেমের শক্তি যতো বড়োই হোক, মৃত্যুর কাছে, গতির কাছে তাহাকে পরাভব মানিতেই হয়। ভালোবাসার ধনকে ছাড়িতে হয়। আলিঙ্গন শিথিল করিতে হয়।

কবিতার শেষ অংশে কবি বসুন্ধরাকে স্নেহব্যাকুল মাতার মূর্তিতে উপস্থাপন করেন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে। মাতা বসুন্ধরা কতো স্নেহে, কতো ভালোবাসায় তাঁহার বুকের প্রাণসম্পদগুলি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু রক্ষা করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। তাই এই স্নেহময়ী জননীর মুখে একটা বিষাদের ছায়া জড়াইয়া আছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কেমন অনায়াসে, কেমন নিপুণভাবে কবি ওই গৃহস্থের চার বৎসরের শিশুকন্যার ছবিটিকে রূপান্তরিত করিয়াছেন বিশ্বমাতার স্নেহোৎকণ্ঠিত চিত্রে। এক ভাবগত সত্যোপলব্ধির সূত্রে একটা সাধারণ সংসারের বিচ্ছেদ-বিধুরতা বিশ্বের মর্মগত বিচ্ছেদ বেদনার সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। একই কবিতার মধ্যে তুচ্ছ সংসারের গন্ধময়তা যেমন নিখুঁতভাবে

অঙ্কিত, তেমনই কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত বিশ্বপ্রকৃতির বেদনাকাতর ভাবমূর্তি অপূর্ব কাব্য সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাষা ব্যবহারের এই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য কবির অসামান্য নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত।

টীকা, শব্দার্থ ও মন্তব্য

[**প্রথম স্তবক**] **হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর**—সঞ্চয়িতায় আছে 'শরতের রৌদ্র'। এই কবিতার অন্যত্রও আছে 'শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে'। উভয় বর্ণনার সহিত রক্ষার জন্য 'হেমন্ত' নয়, শরতের রৌদ্র'—এই পাঠ হওয়া উচিত। **যেন রৌদ্রময়ী রাত্তি**—মধ্যাহ্নের বর্ণনায় রৌদ্রময়ী রাতি বিশেষণটি ব্যবহৃত হইয়াছে নিঃস্তব্ধতা বুঝাইতে। রাত্রির মতো নিঃস্তব্ধ, কিন্তু রৌদ্রময়ী বলার সময়টা যে দ্বিপ্রহর তাহা স্পষ্ট হয়।

[**তৃতীয় স্তবক**] **অমনি ফিরায়ে মুখ……করিল গোপন**—বিদায় চাহিতেই গৃহিণীর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যাত্রার আয়োজন করিয়া দিবার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখিয়া উদ্বেলিত ক্রন্দন রোধ করিয়াছিলেন। এখন অশ্রু আর বাধা মানিল না। কিন্তু যাত্রার সময়ে অশ্রুপাত অকল্যাণকর, তাই দ্রুত আঁচলে চোখ ঢাকিয়া অশ্রুজল গোপন করিলেন। বর্ণনার নৈপুণ্যে গৃহস্বামীর বিদায় মুহূর্তে গৃহিণীর মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং বিচ্ছেদকাতরতার ভঙ্গিটুকু সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

[**চতুর্থ স্তবক**] **শুধু নিজ হৃদয়ের……দিব না তোমায়**—চার বৎসরের শিশুকন্যার কণ্ঠে উচ্চারিত 'যেতে আমি দিব না তোমায়' উক্তিটি এই কবিতার মধ্যে ধুয়ার মতো বারবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। এই উক্তিটিতেই কবিতাটির মূল সুর ধ্বনিত হয়। যাহাকে আমরা আপন জানি, প্রেমের দর্পে স্নেহের অধিকারে, তাহাকে নিজের কাছে রাখিতে চাই। কিন্তু এ অধিকার-বোধ পদে পদে ব্যাহত হয়। যাইতে দিতে হয়। কিছুই চিরদিনের মতো ধরিয়া রাখা যায় না। কন্যার কণ্ঠে উচ্চারিত ওই বাণীটি মুহূর্তে কবির মনে একটি সত্যানুভূতি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

[**পঞ্চম স্তবক**] **সংগ্রাম করিবি কার…… বুকভরা স্নেহ**—বিশ্বজগৎ এক অমোঘ নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিয়াছে। চলাটাই তাহার ধর্ম।

এখানে চিরন্তন বলিয়া কিছু নাই। নিয়ত পরিবর্তনশীলতাই জগতের ধর্ম। কোনো বন্ধনই স্থায়ী হয় না। স্নেহের অধিকারে ভালোবাসার সম্পদগুলি চিরদিনের মধ্যে আলিঙ্গনের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা তাই ব্যর্থ হয়। এই চলমানতা বা গতিই জগতের সার সত্যরূপে কবি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন পরবর্তী কালের 'বলাকা' কাব্যে। যেমন 'শাজাহান' কবিতায় বলেন :

"হায় ওরে মানবহৃদয়,
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।"

[**ষষ্ঠ স্তবক**] **শুভ্র মেঘখণ্ড……নীলাম্বরে শুয়ে**—একটি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ উপমা। আকাশে স্থির শুভ্র মেঘকে কবি নিদ্রারত গোবৎসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। **কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ**—এখান হইতে ক্রমে কবির দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে বিশ্বের অন্তর্গত এক দ্বন্দ্বের প্রতি। দুঃখ কেন? কারণ সমস্ত পৃথিবীতেই স্থিতির আকাঙ্ক্ষা গতিপ্রবাহে মিশিতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে অনিবার্যভাবে। শুধু মানুষ নয়, বিশ্বপ্রকৃতিও যেন তাহার বুকের দৃষ্টিগুলি ধরিয়া রাখিয়া চাহিতেছে, কিন্তু রাখিতে পারে না। বিশ্বের নিহিত নিয়ম মানিয়া লইতেই হয়। এই দ্বন্দ্বই বেদনা জাগায়, আকাশ-পৃথিবী এই বেদনায় ভারাক্রান্ত। সমস্ত পৃথিবী প্রাণের ধনগুলির প্রতি বাহু বাড়াইয়া বলিতেছে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়'। কিন্তু সকলকেই যাইতে দিতে হয়।

[**সপ্তম স্তবক**] **প্রলয় সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে**—ধ্বংস হইবে বলিয়াই যেন সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রতিমুহূর্তেই প্রাণের নিত্যনব রূপ সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু সবই বিলীন হয় প্রলয়ের সমুদ্রে। এ প্রবাহকে

বাধা দিবার সাধ্য কাহারো নাই। রবীন্দ্রকাব্যের বহুস্থানে এই ভাবটির অনুবর্তন ও পরিপুষ্টি লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'বলাকা' কাব্যে :

"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও ;
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়—
পথের আনন্দবেগে অবোধ পাথেয় কর ক্ষয় ॥
যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।"

কিংবা 'সেঁজুতি' কাব্যে :

"অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
চঞ্চলতার নাচে।
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলই যে
নেই নেই করে আছে।
ভিত কেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল
তারা বুঝিল না—অনন্তকাল
অচির কালেরই মেলা।"

পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্তকলরবে—বিশ্বের উপর দিয়া নিরন্তর প্রাণের ধারা বহিয়া চলিতেছে। প্রতিমুহূর্তে উত্থিত হইতেছে ওই এক ধ্বনি, 'যেতে নাহি দিব'। বিশ্ব তাহার সৃষ্টিগুলিকে ধরিয়া রাখিতে ব্যাকুল, কিন্তু বন্ধন টুটিয়া প্রাণপ্রবাহ প্রলয় সমুদ্রের দিকে বহিয়া যায়। শুধু বিশ্বে জাগিয়া থাকে আর্ত ক্রন্দন।

[অষ্টম স্তবক] সেই বিশ্বমর্মভেদী করুণ ক্রন্দন মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে—শিশুকন্যার কণ্ঠে উচ্চারিত স্নেহের অধিকারদ্যোতক বাণীই কবির মনে একটা নতুন উপলব্ধি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। কন্যার উক্তিটি তাই মনে হইয়াছে বিশ্বের মর্মগত বেদনারই অভিব্যক্তি। **আমি ভালোবাসি যারে**—

প্রেমের শক্তিতে নিয়মের বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিতেছে, আমি যাহাকে ভালোবাসি যে কখনো আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। প্রেমের এই দর্পিত ভঙ্গিতে একটা সৌন্দর্য ও মহিমা আছে। কিন্তু ইহার সহিত কারুণ্য জড়িত হইয়া আছে। করুণ, কারণ প্রেমের দর্প চূর্ণ হয়। তাহার দৃঢ় আলিঙ্গন শিথিল হয়। প্রাণপ্রিয়কেও বিদায় দিতে হয়। **মরণপীড়িত সেই চিরজীবি প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই অনন্ত সংসার**—সংসারে কিছুই চিরজীবী নয়। প্রেমও নশ্বর। কবিতাই প্রেমকে মরণপীড়িত বলিয়াছেন। কিন্তু তবুও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু যেমন সত্য, প্রেমও সেইরূপ জীবনের সত্য। প্রেমের উন্মীলন মৃত্যুর শাসনে ব্যাহত হয় না। তাই মৃত্যু-পীড়িত হইলেও প্রেম চিরজীবী। মরণপীড়িত চিরজীবি প্রেম অনন্ত সংসার আচ্ছন্ন করিয়া আছে। **আশাহীন শ্রান্ত ···বিশ্বময়**—ওই প্রেমের কারুণ্য বিশ্বপরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে। চিরজীবী হইবার আশা নাই বলিয়াই কবি 'শ্রান্ত আশা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কুয়াশা যেমন ধরাপৃষ্ঠ আবৃত করিয়া রাখে, এই আশাহীন প্রেমের করুণতা তেমনি পৃথিবীকে আবৃত করিয়া আছে। **দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে**—চলমান বিশ্বকে আলিঙ্গন করিয়া আছে প্রেম। এই প্রেম সবকিছু ধরিয়া রাখিতে চায়, আর বিশ্বের ধর্ম অবিরাম চলা। কিছুই যে ধরিয়া রাখা যায় না এ কথা মানে না বলিয়াই প্রেম অবোধ। ওই চার বৎসরের শিশুকন্যাটির মতোই অবোধ। **চঞ্চল স্রোতের নীরে পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া**—একই ভাবের ভিন্নপ্রকাশ বিশ্বজীবন জনস্রোতের মতো নিত্যবহমান। চির অস্থির। চির চলমান। তাহার উপরে প্রেম যেন একখানি স্থির মেঘের ছায়ার মতো বিস্তৃত হইয়া আছে।

[**নবম স্তবক**] **শুনিয় উদাসী বসুন্ধরা···মুখে নাহি বাণী**—বসুন্ধরাকে মানবীরূপে, মাতৃরূপে বর্ণনা। তুলনীয়: "আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি—বহুসন্তানবতী মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃকপাত করেন না, তেমমি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না; আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্ছি"

(ছিন্নপত্রাবলী)। দেখিলাম তাঁর সেই কন্যাটির মতো—দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট কন্যাটির উক্তিতেই কবির মনে একটা জগৎসত্য বিষয়ে একটা উপলব্ধি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র কবিতার মধ্যে শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত বাণীর সহিত বিশ্বের মর্মগত প্রেমার্তিকে মিলাইয়া দেখিয়াছেন। কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি কয়েকটিতে কন্যার মূর্তির সহিত বসুন্ধরার মূর্তি একাকার করিয়া দিয়া কবিতা শেষ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা

[এক] শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন। [পঞ্চম স্তবক]

আলোচ্য অংশটি 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'যেতে নাহি দিব' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতাটির আরম্ভ এক প্রবাসযাত্রী গৃহস্থের বিদায়দৃশ্যের বর্ণনায়। ঘরের বাহিরে পা দিতেই চোখে পড়িয়াছে দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট শিশুকন্যাটির প্রতি। পিতা তাহার নিকট বিদায় চাহিতেই চার বৎসরের শিশুকন্যাটি আপন স্নেহ-অধিকার ঘোষণা করিয়া বলিয়াছে, "যেতে আমি দিব না তোমায়।" সে নিষেধ শুনিবার সময় নাই। ঘরের বাহিরে পা দিতেই হয়,-কর্তব্যের দায়ে দূর প্রবাসের পথে যাত্রা শুরু করিতে হয়। কানে বাজিতে থাকে শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত ওই বাণী। সামান্য কয়েকটি কথা যেন ধীরে ধীরে মনকে আকর্ষণ করিয়া নেয় জীবনের মর্মে নিহিত এক বেদনার কেন্দ্রের দিকে। 'যেতে নাহি দিব'—এই দর্পিত নিষেধ কে শুনিবে এ পৃথিবীতে ? ভালোবাসার বন্ধনগুলি ছিন্ন করিতে মন চায় না সত্য। হৃদয়ের ধন চিরকালের মতো আলিঙ্গনের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার কি এত শক্তি আছে যে বিশ্বের অনতিক্রম্য নিয়মের বিরুদ্ধে নিজের অধিকার রক্ষা করিবে? চলমানতাই বিশ্বের নিয়ম। এ বিশ্বে

কিছুই স্থির হইয়া নাই। এই চলমান জীবনের মধ্যেই প্রেম জাগিতেছে। পথের উপরে বাসা বাঁধিতে চাহিতেছে। কিন্তু সে বাসা ভাঙিয়া যায়। স্নেহের প্রেমের বন্ধনগুলি শিথিল করিয়া, বেদনার সঞ্চার বুকে লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হয়। প্রবাসযাত্রী মানুষটির মনে ক্রমে এইরূপ ভাবুকতা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

বিদায় মুহূর্তে দেখা কন্যার সেই সজল নয়ন, সেই কাতর মূর্তি চোখে ভাসিয়া আসিতেছে। তাহার স্নেহের প্রবল গর্ববাণী উপেক্ষা করিয়া বিশ্বসংসার, তাহার পিতাকে দূর হইতে দূরে টানিয়া লইয়াছে। স্নেহের অধিকার কত তুচ্ছ।

[তুই] প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত-ব্যগ্র-বাহু জ্বলন্ত-আঁখিতে
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হু হু করে তীব্র বেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে। [সপ্তম স্তবক]

কবিতার পরবর্তী অংশে এই বেদনাই বিস্তৃততর পটভূমিতে, সমগ্র বিশ্বসংসারে এক নিহিত বেদনারূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। একদিকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার আকুলতা, অন্যদিকে নিত্য চলমান জীবন—এই দুইএর দ্বন্দ্বে বিশ্বে যে বেদনার সুর উত্থিত হইতেছে, শিশুকন্যার করুণ ছবিতে তাহারই ব্যঞ্জনা প্রস্ফুট।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রবাসযাত্রী পিতার উদ্দেশ্যে শিশুকন্যা বলিয়াছিল, 'যেতে আমি দিব না তোমায়'। সে নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া যাত্রা করিতে হইয়াছে। শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত ওই স্নেহের প্রবল গর্ববাণী কবির মনে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে একটা গভীর সত্যোপলব্ধি।

চলমানতা বিশ্বের ধর্ম। এ বিশ্বে কিছুই স্থির হইয়া নাই। যাহা কিছু জাত ও জীবিত, সকলেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে অনিবার্য গতিতে। এই গতিপ্রবাহ কেহ রোধ করিতে পারে না, ইহা কোনো প্রতিবন্ধক মানে না। বিশ্বজীবনের এই গতিশীলতা যেমন সত্য, তেমনি আবার স্থিতির আকাঙ্ক্ষাও সত্য। এই বহমান জীবনস্রোতের মধ্যেই আমরা

ভালোবাসার, স্নেহের, প্রেমের বন্ধন রচনা করি। সুখের নীড়টি রচনা করিয়া বসিতে চাই। প্রাণের ধনগুলি আলিঙ্গনের মধ্যে বাঁধিয়া চিরন্তন করিয়া রাখিতে চাই। শুধু মানব জীবনে নয়, কবি সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতেই এই প্রেমের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। মৃত্তিকাও বুকের তৃণ-তরুলতাগুলি ধরিয়া রাখিতে চায় চিরদিনের মতো। এই যে ভালোবাসার বন্ধন রচনার আকাঙ্ক্ষা, পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে এ আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত হইতেছে, ভীরু বাসনা করুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে। জীবনপ্রবাহ অবিশ্রাম চলিয়াছে প্রলয় সমুদ্রের দিকে। তাহার থামিবার সময় নাই, পিছু ফিরিয়া চাহিবার সময় নাই। কবি অনুভব করেন, এ বিশ্বে প্রতি মুহূর্তে এই গতি ও স্থিতির আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে আর্ত বেদনা জাগিতেছে। বিশ্বতট বা পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে সেই বেদনার ক্রন্দনে। সকলেই ব্যাকুল ব্যাগ্র বাহু প্রসারিত করিয়া বলিতেছে 'দিব না দিব না যেতে', কিন্তু বিশ্বের নিয়মে তাহারা সকলেই ছুটিয়া চলিয়াছে, কেহ স্থির হইয়া নাই।

কবির দৃষ্টিতে তাই জগতে প্রতিমুহূর্তে স্থিতি ও গতির দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বে যে বেদনা জাগে, সেই বেদনায় বিশ্ব আবিষ্ট। এ বিশ্ব বেদনায় করুণ। আলোচ্য অংশে কবি জীবনকে একটা নদীস্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, এই স্রোত তীব্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছে বিশ্বের উপর দিয়া। এ বিশ্ব ওই বহমান স্রোতকে ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু সে প্রয়াস ব্যর্থ হয় পদে পদে। ব্যর্থতার বেদনায় জাগে আর্ত কলরব।

[**তিন**] 'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার-লিপি।'—তাই স্ফীত বুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে 'মৃত্যু তুমি নাই'।—হেন গর্বকথা!
মৃত্যু হাসে বসি। [অষ্টম স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্যের অন্তর্গত 'যেতে নাহি দিব' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের একটি বিদায় দৃশ্যের বিষণ্ণতার বর্ণনা হইতে কবির ভাবনা উত্তীর্ণ হইয়াছে এক সার্বভৌম

জীবন-সত্যের উপলব্ধিতে। একদিকে প্রেমের দুর্জয় শক্তি, প্রেমের প্রবল অধিকারবোধ, অপরদিকে মৃত্যুর অনিবার্যতা। এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব চলিতেছে অহরহ। আলোচ্য অংশটিতে এই দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেম স্থিতি চায়। ভালোবার ধন বুকে বাঁধিয়া রাখাই তাহার ধর্ম। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে জীবনের স্রোত তীব্রবেগে সম্মুখের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই চলমান, বহমান জীবনে স্থিতির স্থান কোথায়। সেই নীড় বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা তাই প্রতিপদে প্রতিহত হয়। তবে কি প্রেম মিথ্যা? কবি তাহা মনে করেন না। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে প্রেম জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। জীবন যেমন সত্য, পরিবর্তন যেমন সত্য, প্রেমও তেমনই সত্য। প্রেমের শক্তিও অমোঘ। বিধাতার সৃষ্টিরূপেই প্রেম জীবনে আবির্ভূত। জীবনে তাহার অধিকার চিরস্বীকৃত। তাই প্রেম যেন বলে, আমি বিধাতার স্বাক্ষর দেওয়া মহা অঙ্গীকারসূচক চির অধিকারলিপি লাভ করিয়াছি। জীবনে প্রেমের অস্তিত্বে কোনো সংশয় নাই। কিন্তু সংশয় জাগে চির অধিকারের প্রশ্নে। মরণের মুখের উপরে দাঁড়াইয়া প্রেম যে আত্মঘোষণা করে, মৃত্যুকে সদর্পে অস্বীকার করিতে চায়, ইহাতে প্রেমশক্তির অমোঘতাই প্রকাশ পায় সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে এ বিশ্বে মৃত্যুর গ্রাস হইতে কাহারো পরিত্রাণ নাই। জীবনই যে সৃজন মুহূর্ত হইতে প্রলয় সমুদ্রের দিকে, অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। জীবনের সহিত সম্পৃক্ত প্রেম তবে চিরজীবী হইবে কিরূপে? প্রেমের আত্মঘোষণায় যে দীপ্তি প্রকাশ পায় তাহার সৌন্দর্য ও মহিমা আশ্চর্য সন্দেহ নাই, কিন্তু মৃত্যুর অন্ধকার তাহাকেও গ্রাস করে। এই দর্প দেখিয়া তাই 'মৃত্যু হাসে বসি'।

[চার] মরণপীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা
বিশ্বময়। [অষ্টম স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'যেতে নাহি দিব' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের একটি করুণ বিদায় দৃশ্যের বর্ণনা হইতে কবির কল্পনা উত্তীর্ণ হইয়াছে এক সার্বভৌম জীবনসত্যের উপলব্ধিতে। একদিকে প্রেমের দুর্জয় শক্তি, প্রেমের অধিকারবোধ, অন্যদিকে মৃত্যুর অনিবার্যতা। বিশ্বে অহরহ এই দুই শক্তির মধ্যে অহরহ দ্বন্দ্ব চলিতেছে। প্রেমের শক্তি যতো প্রবলই হোক, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর শাসন তাহাকে মানিতেই হয়। জীবনপ্রবাহ অনিবার্যভাবে মৃত্যুর দিকে বহিয়া চলিয়াছে। তাই জীবনের সহিত সম্পৃক্ত প্রেম ও চিরজীবী হইতে পারে না। কবি তাই প্রেমকে বলিয়াছেন 'মরণপীড়িত'। আবার জীবন যেমন মৃত্যুর মতোই সত্য, তেমনি প্রেমও সত্য। বিশ্বে কোনো বন্ধন চিরস্থায়ী হয় না জা নয়াও আমরা হৃদয়বন্ধনে প্রাণপ্রিয়কে বাঁধিতে যাই। মৃত্যু আছে জানিয়াও এ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। তাই মরণপীড়িত হইলেও প্রেম চিরজীবী। একদিকে নিরন্তর ভালোবাসার বন্ধনগুলি রচিত হইতেছে, আর অন্যদিকে সেই বন্ধন টুটিয়া পড়িতেছে। প্রেম সব শক্তি দিয়াও ভালোবাসার ধনগুলি রক্ষা করিতে পারে না, এখানেই তাহার অসম্পূর্ণতা। এইজন্যই বিশ্বে বেদনার সুর জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। প্রেমের করুণ অবসান যে বিষাদ জাগায় তাহা চোখের উপরে সঞ্চারিত অশ্রুবাষ্পের মতো বিশ্বসংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। শেষ অবধি আশাভঙ্গ হইবেই। তাই আশাকে কবি শ্রান্ত আশা বলেন। এই শ্রান্তি যেন বিশ্বের উপর বিষাদ-কুয়াশার মতো ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।

প্রেমের করুণ আর্তিতে পরিপূর্ণ এ বিশ্বসংসার কবির দৃষ্টিতে বিষাদময়ীরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। কবিতার শেষ অংশে কবি বসুন্ধরার বিষাদময়ী বিগ্রহটিই মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন এবং এই চার বৎসরের শিশুকন্যার সহিত তাহাকে একাকার করিয়া দিয়াছেন।

[পাঁচ] বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল

দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ, মর্মাহত,
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো। [নবম স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্যের অন্তর্গত 'যেতে নাহি ব' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। চার বৎসরের শিশুকন্যার ণ্ঠে উচ্চারিত 'যেতে আমি দিব না তোমায়'—এই স্নেহের অধিকারবোধচক নিষেধ বাক্যটিকে কবি বিশ্বের এক চিরন্তন মর্মবেদনার সহিত গ্রথিত রিয়া দিয়াছেন। স্নেহের প্রেমের অধিকারে আমরা প্রাণের ধনগুলি বুকে াধিয়া রাখিতে চাই। কিন্তু চিরদিন কাহাকেও ধরিয়া রাখা যায় না। শ্বের নিয়মে সৃজন মুহূর্ত হইতে প্রাণধারা মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইতেছে। কহ এই প্রবাহ রোধ করিতে পারে না। স্নেহ প্রেমের সে শক্তি নাই। ই বসুন্ধরা কতো প্রয়াসে প্রাণ সৃষ্টি করিয়া তোলে। কিন্তু প্রাণসম্পদ যে চরদিনের মতো বুকে ধরিয়া রাখিবে এমন শক্তি তাহার নাই। অবিরত ত্যুর গ্রাসে প্রাণ বিলীন হইতেছে। বসুন্ধরা সৃষ্টি করেন, কিন্তু রক্ষা করিতে ারেন না। কবি বসুন্ধরাকে তাই এক স্নেহময়ী অথচ শক্তহীনা মাতারূপে দখিয়াছেন। বসুন্ধরার বিষাদময়ী মূর্তিই কবির চোখে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। ই বেদনা বুকে লইয়া বসুন্ধরা বসিয়া আছেন উদাসিনী মূর্তিতে। ছড়ানো লুদ রৌদ্র দেখিয়া মনে হইতেছে যেন একখানি বস্ত্রাঞ্চল বুকে টানিয়া বসুন্ধরা র নীল আকাশে দৃষ্টি মেলিয়া মৌনভাবে বসিয়া আছেন। এই বিষাদময়ীর র্তির সহিত অশ্রুমুখী শিশুকন্যাটিকে একাকার করিয়া দেখিতেছেন। শিশুকন্যাটি যেমন স্নেহ অধিকার ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিল, 'যেতে আমি দিব না তামায়' বসুন্ধরাও সেইরূপ বারবার করিয়া তাহার প্রাণের ধনগুলিকে লেন 'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু বিশ্বের অমোঘ নিয়মে সকলেই চলিয়া যায়। চরদিনের জন্য কাহাকেও ধরিয়া রাখা যায় না। এই অনিবার্য সত্যের নিষ্ঠুরতার সম্মুখে শিশুকন্যা বা বসুন্ধরা উভয়েই মর্মাহত, বিষণ্ণ।

প্রশ্নোত্তর

[এক] **মানবজীবন যে একটা ট্র্যাজিডি মাত্র, শুধু এই পুরাতন কথাটারই কি অভিনব কাব্যরূপ 'যেতে নাহি দিব'? যুক্তিপূর্ণ উত্তর দাও।** [ক. বি. ১৯৫৭]

উত্তর। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, জন্মিলে মরিতে হয়—ইহা একটি পুরাতন ধারণা। যতোই নিবিড় আলিঙ্গনে ভালোবাসার মানুষগুলিকে বাঁধিয়া রাখিতে চাই না কেন, বিশ্বের অনিবার্য নিয়মে সে বাঁধন শিথিল করিতে হয়। জগতে তাই নিয়ত বেদনা জাগিতেছে আর্ত হাহাকারে বিশ্বচরাচর পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় যে উপলব্ধি প্রকাশিত হইয়াছে—তাহার মূলে এই পুরাতন সত্যটিই প্রচ্ছন্ন আছে এ কথা মিথ্যা নয়। কবিতার 'আইডিয়া'টিকে তাই অভিনব বলা চলে না। তবুও এই পুরাতন সত্য কবির কল্পনার রসে সঞ্জীবিত হইয়া যে মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার রসগত চমৎকারিত্ব আমাদের আবিষ্ট করে এবং একটা নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে। কবিতাটি যে এমন অভিনব মনে হয় তাহার কারণ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির স্বকীয় উপলব্ধির বিশিষ্টতা ইহার মধ্যে প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানবজীবনের একটি সাধারণ অভিজ্ঞতাকে কবি সমগ্র বিশ্বের পটে স্থাপন করিয়া ওই সাধারণ অভিজ্ঞতাকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন।

কবিতাটির সূচনায় একটি ঘরোয়া জীবনের বাস্তব ছবি আছে। পূজার ছুটি শেষ হইয়াছে। আবার দীর্ঘদিনের জন্য প্রবাস জীবন যাপন করিতে হইবে। গৃহস্বামীর যাত্রার আয়োজনে গৃহিণীর মমতার অভিব্যক্তি অতি সাধারণ একটা দৃশ্যের উপরে ভাবের বাতাবরণ রচনা করিয়া দৃশ্যটিকে বেদনার রসে আপ্লুত করিয়াছে। যাত্রার মুহূর্তে প্রবাসযাত্রী শিশুকন্যাটির নিকট বিদায় চাহিয়াছে। কী ভাবিয়া কে জানে, শিশুটি বলিয়া উঠিল যেতে আমি দিব না তোমায়'। নিত্য সংসারে এই স্নেহের দাবী উচ্চারিত হইতেছে। কিন্তু কর্তব্যের দায়ে এই সব হৃদয়ের দাবী তুচ্ছ হইয়া যায়। যাইতে দিতে হয়। এই পর্যন্ত কবিতাটিতে অসাধারণ কিছু নাই। "তবুও সময় হল শেষ, তবু হায় যেতে দিতে হল"—এই মন্তব্যটিও একটা সাধারণ মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু ইহার পরে কবিতাটিতে ভিন্নতর সুর বাজিয়াছে। কবি-

ল্পনা ওই স্নেহের গর্ববাণীর প্রভাবে জাগ্রত হইয়া বিশ্বের মর্মগত এক বেদনার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কবিতার এই অংশে কবি প্রসারিত কল্পনায় মগ্র বিশ্বকেই কাব্যের বিষয়ভূত করিয়াছেন। এই মত্তধরণী প্রতি মুহূর্তে াণ সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছেন। কবি যখনই সৃজনশক্তিময়ী ধরিত্রীর কথা াবেন তখনই ধরিত্রী তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় মাতৃমূর্তিতে। মাতা সুন্ধরা মানবমাতার মতোই তাঁহার সন্তানগুলি স্নেহের বাঁধনে নিজের কাছে াধিয়া রাখিতে চাহিতেছেন। তৃণ তরু হইতে জীব-সমস্ত—সবই এই িশ্বমাতার স্নেহের পুত্তলি। কিন্তু তাঁহার ভালোবাসার ক্ষমতা কতো ীমাবদ্ধ। কিছুই তিনি ধরিয়া রাখিতে পারেন না। জন্মমুহূর্ত হইতে কলে মৃত্যুর দিকে চলিতেছে। বিশ্বের বুকের উপর দিয়া বহমান প্রাণধারা টিয়া চলিয়াছে প্রলয় সমুদ্রের দিকে। এ গতি কেহ রোধ করিতে পারে া। স্নেহের প্রেমের বন্ধন যতো বড়োই হোক, মৃত্যুর কাছে তাহাকে রাভব স্বীকার করিতেই হয়। এই বেদনায় বিশ্বের উপরে এক বিষাদ-য়াশার আস্তরণ সর্বক্ষণ সাঞ্চিত হইয়া থাকে। কবির দৃষ্টিতে মাতা বসুন্ধরা ক বিষাদময়ী মাতৃমূর্তিতে ধরা দিয়াছেন। ইনি সৃষ্টি করেন, কিন্তু রক্ষা রিতে পারেন না। প্রতি মুহূর্তে তাঁহার হৃদয়ের ধনগুলি কোথায় মৃত্যু-বনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে।

মানবজীবনের একটা সাধারণ দুঃখাবহ অভিজ্ঞতার বিবরণে শুরু হইয়া বিতাটি ক্রমে বিশ্বব্যাপী বেদনার ব্যাপকতর পরিধির মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ই উত্তরণের সূত্রে কবিতার মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্য। স দৃশ্যগুলি বেদনার ছবি, বেদনার রসে ভারাক্রান্ত। সংকীর্ণ অর্থে মানব-ীবনের ট্র্যাজিডি নয়, এই ট্র্যাজিডিকে কবি সমগ্র বিশ্বজীবনের মর্মের সহিত ক্ত করিয়া দিয়া কবিতায় গভীরতর জীবন রহস্যের প্রতিফলন ঘটাইয়াছেন। ানবজীবনের বিচ্ছেদ বেদনা বিশ্বজীবনের পটে সংস্থাপিত হওয়ায় ব্যাপকতর াৎপর্যে মণ্ডিত হইয়া হইয়া উঠিয়াছে।

জীবনে স্থিতির আকাঙ্ক্ষা যেমন সত্য তেমনই সত্য ইহার নিত্য চলমানতা। স্নেহের প্রেমের নীড় রচনা করিয়া ভালোবাসার সম্পদগুলি চিরদিন রক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা জীবনের সহজাত। কিন্তু জীবনে এই ভালোবাসার জন্য, সেই জীবনেরই ধর্ম নিত্য চলমানতা। তাই দেখা দেয় বিরোধী প্রকৃতির দ্বন্দ্ব।

এ দ্বন্দ্বে গতিই জয়ী হয়, স্থিতির আকাঙ্ক্ষা অনিবার্য পরাভব স্বীকার করে। হৃদয়ের করুণ কোমল বাসনাগুলিই যে প্রতিমুহূর্তে পরাভূত হইতেছে, ভালোবাসার বন্ধন টুটিয়া যাইতেছে, জীবনের এই বেদনার দিকটিই আলোচ্য কবিতায় বিশেষভাবে কবি-কল্পনার অবলম্বন। জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াসে কবির নিকট গতির অনিবার্যতা একটা তর্কাতীত সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে ঠিকই। এই প্রাণধর্মকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু কবির ভাবনা-কল্পনা আচ্ছন্ন করিয়াছে এই গতির আঘাতে বিচূর্ণিত ভালোবাসার জন্য দুঃখবোধ। সেই দুঃখবোধে আক্রান্ত দৃষ্টিতে শুধু মানবজীবন নয়, সমগ্র বিশ্বই দেখা দেয় বিষাদমগ্ন মূর্তিতে। বিশেষভাবে কবিতার শেষ অংশে কবি বেদনাবিধুর শিশুকন্যার সহিত বিষাদময়ী ধরিত্রীকে একাকার করিয়া দিয়াছেন। মাতা বসুন্ধরার উদাসিনী বিষাদমূর্তির অপূর্ব ভাষাচিত্রে কবিতাটি সমাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতির উপরে মানবিক ভাব আরোপের নৈপুণ্যের দিক হইতেও কবিতাটি একটি আশ্চর্য রচনা। বিদায় মুহূর্তে শিশুকন্যার ম্লান মুখখানির বিষাদময়তা কবি অনায়াসে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির উপরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। চিরদিনের চেনা এই পৃথিবীটা কবি-কল্পনার ভিতর দিয়া আমরা নতুনরূপে দেখি। সে যেন এক মাতৃমূর্তি।

অপ্রতিবিধেয় নিয়তির আঘাতে কাতর, শোকম্লান বিশ্বমাতার উদাসিনী মূর্তি আমাদের চিত্তপটে গভীর রেখায় অঙ্কিত হইয়া যায়। নিজেদের প্রাত্যহিক সাংসারিক অভিজ্ঞতার মধ্যেই আমরা বিশ্বজীবনের এক গভীর রহস্য প্রতিফলিত দেখি। বেদনার অভিজ্ঞতার বিশ্ব মিলিত হয় আমাদের মানবিক অনুভূতির স্তরে।

[দুই] "একটি ক্ষুদ্র সংসারজীবনের ব্যর্থ স্নেহ, অসহায় মানুষের একটি সাধারণ অনিবার্য হৃদয়বেদনা অপূর্ব কল্পনাশক্তির যাদুমন্ত্রে নিখিলবিশ্বের অন্তর্লীন মর্মব্যথায়, আদিমাতা ধরিত্রীর বেদনাপীড়িত সন্তানমমতার এক সর্বব্যাপী বিষাদ সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।"—আলোচনা কর।

উত্তর। 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির প্রকাশভঙ্গিতে একটা পরিকল্পনা-গত বৈশিষ্ট্য আছে। গল্প বলার ভঙ্গিতে কবিতাটি শুরু হইয়াছে। চাকুরিজীবী বাঙালী গৃহস্থের সাংসারিক জীবনের চিত্র বর্ণনায় কবি নিতান্ত গদ্যময় ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ছুটির শেষে গৃহস্বামী চাকুরিস্থলে ফিরিতেছেন। গৃহিণী

যাত্রার আয়োজন করিয়া দিতে ব্যস্ত। কাজের ব্যস্ততায় আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখ চাপা দিয়া বেচারি গোছগাছ করিতেছে। প্রবাসে কখন কি প্রয়োজন পড়িবে—ভাবিয়া টুকিটাকি নানা জিনিস জড়ো করিয়া তুলিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য হইতে ওষুধপত্র কিছুই বাদ পড়ে নাই। স্বামীর বিদেশ যাত্রার এই আয়োজনের মধ্যেই গৃহিণী হৃদয়ের মমতা উজাড় করিয়া দিয়াছে। সঞ্চিত দ্রব্যগুলির বর্ণনায় কবি অনেকটা জায়গা নিয়াছেন। 'সোনামুগ', 'সরু চাল', 'গুড়ের পাটালি', রাই সরিষার তেল—এমন সব খাদ্যবস্তুর উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য গৃহস্থ জীবনের পরিবেশটি যথাযথভাবে ফুটিয়া ওঠে। কবিতার এই গদ্যময় বাস্তবতার বর্ণনায় ভাষাও আবেগবর্জিত, অকাব্যিক। ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ যে ভঙ্গিতে সাধারণ জীবনের ছবি পরিস্ফুট করেন—এই বর্ণনা সেই ধরণের। কবিতাটি এইভাবে একটা অতি সাধারণ জীবন-স্তর হইতে শুরু হইয়াছে। বিদায় মুহূর্তে উদ্বেলিত অশ্রুজল গোপনের চেষ্টায় গৃহিণীর ব্যথিত মূর্তিটি একবারের জন্য একটা বেদনার সুর জাগাইয়া তোলে।

ইহার পরে আসে আর একটি চিত্র। এই পরিবারে আর একটি মানুষ আছে। কাজের ব্যস্ততায় সেই মানুষটির প্রতি, চার বৎসরের সেই শিশু কন্যাটির প্রতি আজ আর কেহ দৃষ্টি দিবার সময় পায় নাই। অন্যদিন এতক্ষণে মায়ের পরিচর্যায় স্নানাহার সাঙ্গ করিয়া নিদ্রা দিত। আজ কী ভাবিয়া দ্বার-প্রান্তে গিয়া বসিয়া আছে। দ্বার দিয়া বাহিরে যাইবার সময় পিতা কন্যার নিকট বিদায় চাহিল। মেয়েটি বিষণ্ণ চোখে পিতার দিকে চাহিল। দ্বার রোধ করিল না, উঠিল না, শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার ঘোষণা করিয়া বলিল, 'যেতে আমি দিব না তোমায়'। শিশুর সামান্য আবদারের কথা, কে তাহার মূল্য দেয়? যাইতে দিব না বলিলেই যাওয়া বন্ধ হইবে—একথা আর কে ভাবে? পিতা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যান। এই পর্যন্ত কবিতার বক্তব্য একটা সাধারণ বিদায় দৃশ্য বর্ণনার চেয়ে বেশি কিছু নয়। প্রথম পাঠের সময়ে এই পর্যন্ত পড়িয়া বুঝিতেও পারা যায় না যে ওই শিশুকণ্ঠের স্নেহের দাবীসূচক উক্তিটির মধ্যে কোনো গভীরতার তাৎপর্য থাকিতে পারে।

পিতা বিদায় লইয়া পথে বাহির হইয়াছেন। পথের দুধারে শরতের ভরা ফসলের খেতের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। আকাশে শুভ্র মেঘ পুঞ্জ পুঞ্জ জমিয়া আছে। প্রকৃতি কেমন নিস্তব্ধ, মৌনতায় ভরা। এমন নির্জন নিস্তব্ধ পথে চলিতে চলিতে প্রবাসযাত্রীর মনে কন্যার সেই উক্তিটি গুঞ্জরিত হইতেছে। ভাবিতেছেন, অতটুকু মেয়ে কোথা হইতে কী শক্তিলাভ করিয়া

এমন প্রবল অধিকার ঘোষণা করিল। সংসারে চলিয়া যাওয়া কেহ কি রোধ করিতে পারে? আমরা হয়তো শুধু ইচ্ছাটুকু প্রকাশ করিতে পারি, বলিতে পারি, 'যেতে দিতে ইচ্ছা নাহি', কিন্তু যাইতে দিব না এমন প্রবল গর্ববাণী উচ্চারণ করিব কী করিয়া? সেই গর্ব যে পদে পদে চূর্ণ হয়। যাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাই বহমান জীবনের স্রোত তাহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া যায় কে জানে।—এই পর্যন্ত কবিতাটি সাধারণ ভাবুকতায় সুরে নিবদ্ধ। যে কোনো মানুষের মনেই এ জাতীয় ভাবনা উদয় হওয়া সম্ভব এবং ইহাতে কোনো গূঢ় গভীর কল্পনার স্বাক্ষর নাই। কিন্তু ইহার পর হইতেই কবিতায় ভিন্নতর সুর লাগিয়াছে। সাধারণ বিচ্ছেদ বেদনা কল্পনাশক্তির ইন্দ্রজালে রূপান্তরিত হইয়াছে বিশ্বের অন্তর্নিহিত এক চিরন্তন বেদনায়। নিতান্ত সাধারণ জীবনের কথা হইতে এইভাবে গভীরতর জীবন জিজ্ঞাসায় উত্তীর্ণ হইবার এই ভঙ্গিটুকু অভিনব। ইহাই কবিতাটির পরিকল্পনাগত বৈশিষ্ট্য।

"কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।" এখান হইতে ভাবাভঙ্গির রূপান্তর লক্ষণীয়। অকস্মাৎ কবির দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যেন বাস্তব সংসারের, ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনার পর্দাখানি সরিয়া গিয়াছে। দূর প্রসারিত আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি কবির দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ পৃথিবী প্রতিমুহূর্তে নব নব রূপে প্রাণ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। ধরিত্রীর বুক ভরিয়া আছে এই প্রাণ-সম্পদে। মাতার মতো স্নেহ-ব্যাকুলতায় বসুন্ধরা তাঁহার এই হৃদয়ের ধনগুলি নিবিড় আলিঙ্গনে ধরিয়া রাখিতে চান। যেন তাঁহার বক্ষের সেই স্নেহোৎকণ্ঠা সেই আকাঙ্ক্ষা 'যেতে নাহি দিব' এই বাণীরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু এই ভালোবাসার বন্ধন শিথিল করিতেই হয়। কিছুই ধরিয়া রাখা যায় না। প্রাণপ্রবাহে সৃজনের মুহূর্ত হইতে মৃত্যুর দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে অনিবার্য গতিতে। কবির নিকট শিশুকণ্ঠের আর্তস্বর এবং বসুন্ধরার এই মর্মবিদারী হাহাকার একসূত্রে গ্রথিত হইয়া একই অর্থ বহন করে। স্নেহ-প্রেম ভালোবাসার সম্পদগুলি বুকে ধরিয়া রাখিতে চায়। প্রেমের ধর্ম চিরদিনের মতো ধরিয়া রাখা। কিন্তু এ বিশ্বে স্থিতির কোনো স্থান নাই। অবিরাম গতিতে জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এ বিশ্ব-নিয়মের সম্মুখে অবরোধ রচনা করিবে—স্নেহ-প্রেমের শক্তি এত বড় নয়। বিশ্বে নিরন্তর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে 'যেতে নাহি দিব', কিন্তু প্রলয় সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে জীবনধারা ছুটিয়া চলিয়াছে। ব্যর্থ ভালোবাসার ক্রন্দনে তাই আকাশ পৃথিবী আচ্ছন্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বসুন্ধরার বিষাদমূর্তিই এ কবিতায় বড় হইয়া উঠিয়াছে।

জীবনে প্রেম জাগে, প্রেম মিথ্যা নয়, কিন্তু সেই চিরজীবী প্রেম মরণ-পীড়িত। চলমান জীবন-প্রবাহের উপরে অচঞ্চল মেঘের ছায়ার মতো প্রেম যেন আপনার ছায়া বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। এই বিষাদ ও বেদনা বিধুরতার বর্ণনায় কবির ভাষা ব্যঞ্জনায় নতুন শক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কবিতার শেষ অংশে। 'আশাহীন শ্রান্ত আশা টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ কুয়াশা বিশ্বময়'। 'চঞ্চল স্রোতের নীরে পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া—অশ্রু-বৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া'—এইসব অংশে বাঙলা ভাষাকে যেন প্রকাশ ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত করা হইয়াছে। কবিতার প্রথম অংশের ভাষার সহিত তুলনা করিলে বোঝা যায় কেমনভাবে কবি নিতান্ত সাধারণ জীবনের গদ্যময় বাস্তবতা হইতে অনায়াসে গভীরতর অনুভূতির স্তরে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। এই স্তরে বসুন্ধরাকেই কবি প্রকাশ করিয়াছেন বিষাদমগ্ন উদাসিনী মাতৃমূর্তিতে। এই মাতা, ইনি সৃষ্টি করেন, কিন্তু রক্ষা করিতে পারেন না। হৃদয়ের ভালোবাসা উজাড় করিয়া দেন কিন্তু মৃত্যুর আঘাত হইতে নিজের হৃদয়ের ধনগুলিকে বাঁচাইতে পারেন না। সত্যই শেষ পর্যন্ত কবিতাটি এক সর্বব্যাপী বিষাদ সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

॥ ঝুলন ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য :

'সাহিত্যের পথে' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে প্রসঙ্গত কবি **'ঝুলন'** কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সেই আলোচনা এখানে উল্লেখযোগ্য :

"পূর্বেই বলেছি রসমাত্রেই, অর্থাৎ সকলরকম হৃদয়বোধেই, আমার বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ।······দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটু স্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু এর মধ্যে ভালো কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয়, একথা মানতেই হবে। তবু এই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহুকাল থেকে চলে আসছে, ভিড় জমেছে কত, আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি। বদ্ধজল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি যা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করিতে চায়।

"একদিন এই কথাটি আমার কোন একটি কবিতায় লিখেছিলাম। বলেছিলাম, আমার অন্তরতম আমি আলস্যে, আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

"······আমাদের শাস্ত্র বলেন: তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয়।"

বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে, অর্থাৎ পারসন্যালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবাহত অনুভূতি দিয়ে

জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কী হয়। মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়। কেননা বেদনীয় পুরুষের বোধ, পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধে।"

এই কবিতাটি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন: "এখানে বিশ্বজীবন ও মানবজীবনের অতিপ্রসার সঙ্কুচিত হইয়া কবির ব্যক্তিসত্তার দুই বিরুদ্ধ আকৃতির দ্বন্দ্বক্ষেত্রে সীমিত হইয়াছে। এই স্বল্প পরিসরে কবির আবেগমথিত অন্তর-আলোড়ন সমুদ্র-ঝটিকার দুর্নিবার বেগমত্তায় যেন ফাটিয়া পড়িয়াছে। এখানে জীবনের তত্ত্ব আছে, কিন্তু তত্ত্ব-মন্থরাকে ছাড়াইয়া জীবনসংবেগ কলরোল তুলিয়াছে। সমস্ত অলস কল্পনা-বিলাস, সৌন্দর্যস্বপ্নাবেশ, প্রাণচেতনার স্তিমিত আচ্ছন্নতা কাটাইয়া জীবনের প্রমত্ত গভীরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার বাসনা কবির মনে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। হ্রস্বদীর্ঘ পংক্তিগঠিত ছন্দে, মুহুর্মুহু ধ্বনিসঙ্গীতের পরিবর্তনে, আবেগের উদগ্র চাঞ্চল্যে, সমস্ত কবিতাটির মধ্য দিয়া যেন ঝটিকামথিত সমুদ্রের অশান্ত বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 'মানসী'র 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় কবি এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের বর্ণনা করিয়া উহাকে জড় ও চেতনার বিক্ষুব্ধ আদর্শপ্রণোদিত সংগ্রামের পটভূমিকায় বিন্যস্ত করিয়াছেন। যেখানে মননসাহায্যে প্রকৃতি-তাণ্ডবের তাৎপর্য-অনুধাবন প্রয়াস। বর্তমান কবিতায় এই তাণ্ডবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, অন্তরের মধ্যে উহার দুর্দম বেগকে গ্রহণ করিবার আকৃতি। সমুদ্র কবিমনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করিয়াছে—কখনও জড়, চেতনার সংগ্রামক্ষেত্র, কখনও কবির জন্মজন্মান্তর স্মৃতির রহস্যের, পৃথিবী ও কবিপ্রাণের সহিত নিগূঢ় ভাবসম্পর্কের বাহনে, কখনও নিজ অন্তরদ্বন্দ্বের দুর্বার বেগচ্ছন্দের প্রতীকস্বরূপ। কবির জীবনী হইতে জানা যায় যে এই কবিতা-রচনার কয়েকদিন পূর্বে তিনি পুরীতে দুর্যোগময় সমুদ্রদৃশ্য নিজের চোখে দেখিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতারই কাব্যরূপ 'ঝুলন' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়। একটিতে সমুদ্রের চির-অশান্ত অন্তপ্রেরণাময় আক্ষেপ, অন্যটিতে কবির বিশ্বাসবোধমূলক জীবনসংস্কারের প্রশান্ত প্রকাশ।"

ভাবার্থ:

অভ্যাসের জড়ত্ব ক্রমে চৈতন্যের প্রসার সংকীর্ণ করিয়া আনে। মন জড়তায় ঠেকে। তারপর একদিন আকস্মিকের আঘাতে দেখা দেয় সত্তার পূর্ণ জাগরণ। সেদিন জাগ্রত চিত্ত ভয় ভীতি অগ্রাহ্য করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

সেই জাগ্রত, উদ্দীপিত চিত্ত কোন বিঘ্নকেই আর বিঘ্ন বলিয়া মানে না। বলিতে পারে মরণ খেলাতেই আমার আনন্দ; কবিতাটির প্রারম্ভ হইতেই এই উদ্বোধিত চিত্তের প্রবল উল্লাস ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। দুর্যোগের রাতে এই যে অকুতোভয় মরণ খেলার কথা কবি বলেন, যে তীব্র দ্বন্দ্বের ভীষণতার কথা আসে, তাহা কবির অন্তর জগতেরই দ্বন্দ্ব। বাহিরের কোনো প্রতিপক্ষের সহিত দ্বন্দ্ব নয়। এতদিনের অবসন্ন চিত্ত যেন জাগ্রত হইয়া উঠিয়া আপন প্রাণের সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়াছে। কবির অন্তর জগতের ঝটিকাক্ষুব্ধ পরিবেশই প্রকাশ পায় দুর্যোগময় রাত্রি এবং ঝটিকাক্ষুব্ধ প্রকৃতির রূপকে।

কবির মানস পরিবেশ আজ দুর্যোগে পূর্ণ। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব চলিতেছে। স্বপ্নজড়িমা ত্যাগ করিয়া কবির চিত্ত জাগিয়া উঠিয়াছে। মনের জগতের আকাশ বাতাসে প্রলয়গর্জন শুনিতে পাইতেছেন। সেই প্রলয় দোলায় চিত্ত আন্দোলিত হইতেছে। কিন্তু এ প্রলয়ে, এ ক্ষুব্ধতায় ভয় নাই, আশঙ্কা নাই। জাগ্রত প্রাণ বুকের কাছে আনন্দ-উল্লাসে নাচিয়া উঠিতেছে। ত্রাসের মধ্যেও মিশিতেছে উল্লসিত অনুভূতি।

বরং ক্ষোভ অনুভব করিতেছেন এইজন্য যে এমন বিপুল আনন্দ হইতে কবি বঞ্চিত ছিলেন। এতদিন প্রাণকে প্রলুব্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আঘাতের বেদনার আশঙ্কায় এতদিন যেন প্রাণকে কুসুমশয্যায় সন্তর্পণে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাণকে এতদিন মধুর সঙ্গীতে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। মাধুর্যের রসাবেশে তাহাকে আবিষ্ট রাখিয়াছিলেন। শেষে সেই আলস্যমদিরা প্রাণকে শান্ত, নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিয়াছে। স্পর্শ করিলেও সে আর সাড়া দেয় না। সকল চেতনা যেন অবসিত হইয়া গিয়াছে। শুধুই নির্বিরোধ বিরাম প্রাণের শক্তিকে জড়ত্বে আচ্ছন্ন করে। প্রাণকে বধূর রূপকে কল্পনা করিয়া কবি সেই মধুররসাবিষ্ট মানসিকতার বিবরণ দেন। পুষ্পশয্যার ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। সেই রাশি রাশি শুষ্ক কুসুমের মধ্যে বধূকে, অর্থাৎ প্রাণকে যেন আর খুঁজিয়া পান না। অতল স্বপ্নসাগরে সে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে নতুন চেতনা আসে জাগ্রত হয় নতুন জীবনদৃষ্টি। শুধু মাধুর্যের রসে প্রাণমন তৃপ্ত হইতে পারেনা—কবি একথা অনুভব করেন। অনুভব করেন বিরোধ-বিপ্লবের দুঃখকে এড়াইয়া গিয়া নিজের কাছে নিজের সত্তার স্পষ্ট রূপটি কখনো ধরা পড়ে না। আত্মোপলব্ধি সম্পূর্ণ হয় না। এই উপলব্ধির দিক হইতে কবিতাটিতে আসিয়াছে জাগ্রত প্রাণের প্রবল উদ্বোধনের প্রসঙ্গ। কবি বলেন, মরণ দোলায় বসিয়া প্রাণের সহিত ঝুলন খেলায় এতদিনের সঞ্চিত

অবসাদ ঘুচাইয়া লইবেন। ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্টহাস্যে সেই মরণদোলাকে প্রবল বেগে আন্দোলিত করুক। সেই আন্দোলনে জাগ্রত প্রাণকে নতুন করিয়া উপলব্ধি করিবেন। প্রাণের সহিত নতুন করিয়া মিলন হইবে।

এই মিলনানন্দের, প্রবল আত্মোপলব্ধির আনন্দ-উল্লাস অভিব্যক্ত হইয়াছে কবিতাটির শেষ অংশে। অকস্মাৎ জড়তায় আচ্ছন্ন অবলা প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে। কবি সেই জাগ্রত প্রাণকে কখনো প্রিয়া কখনো বধূরূপে সম্বোধন করিয়াছেন। সেই প্রেয়সীর রূপকেই প্রাণের সহিত নূতন করিয়া মিলনের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এই উদ্দীপিত চেতনার আলোকে কবি আপন প্রাণের স্বরূপ চিনিয়া লইতে চান। আলস্য জড়িমা টুটিয়া গিয়াছে, কবি নতুন করিয়া আপন শক্তির সন্ধান লাভ করিয়াছেন, এই আত্মোলপব্ধির আনন্দেই কবিতাটির সমাপ্তি।

সমালোচনা:

'ঝুলন' কবিতাটিতে কবির অন্তর্মুখী কল্পনার পরিচয় মেলে। বিশ্বপ্রকৃতি বা মানবজীবনের সহিত নিজেকে মিলিত করার প্রয়াস নয়, এ কবিতায় কবি মানবস্বভাবেরই একটি বিশিষ্টতাকে কাব্যবিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষ সুখালসের প্রতি স্বভাবতঃ আসক্ত, জীবনের মধুর ও কোমল দিকগুলিই তাহাকে বেশি আকর্ষণ করে। এই প্রবণতার বশে সে বিপদ-বিঘ্ন এড়াইয়া চলিতে অভ্যস্ত হয়। ক্রমে আলস্যজড়িমায় প্রাণশক্তি অবসিত হইয়া আসে। সেই নিরাবেগ আচ্ছন্নতা নিজের অস্তিত্ববোধকে স্তিমিত করিয়া আনে। যেমন কবি অন্যত্র বলিয়াছেন:

> "অভ্যাসের সীমাটানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
> ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।
> মন জড়তায় ঠেকে নিখিলের জীর্ণ দেখে,"
>
> (নীলমণিলতা, বনবাণী)

এই জড়ত্ব ক্রমে মানুষকে বিশ্বমুখ, জীবনবিমুখ করিয়া তোলে। এমন মানসিক নিশ্চেতন দশাকেই বলা যায় 'মরণের অধিক মরণ'। 'ঝুলন' কবিতায় এইরূপে নিশ্চেতন দশা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিবার কথাই বলা হইয়াছে। বহুদিনের আলস্য জড়িমা ভাঙিয়া প্রাণশক্তির প্রবলতা অনুভব করিবার যে উল্লাস—তাহাই এ কবিতায় ঝুলন খেলার এবং ঝড় ও সমুদ্রের রূপকে প্রকাশিত

হইয়াছে। কবিতাটিতে বহির্জাগতিক দৃশ্যাদির যে বর্ণনা আছে তাহাকে কোনো অর্থেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা বলা যায় না। বর্ণনাগুলি রূপকার্থেই গ্রহণীয়। কবিতার বিষয় সম্পূর্ণতঃই কবির অন্তর্লোকের এক আকস্মিক উপলব্ধি। অন্তর্মুখী উপলব্ধির তীব্রতা একটি উৎকৃষ্ট লিরিকের রসরূপ লাভ করিয়াছে এই কবিতায়। মোহিতলাল মজুমদার ঠিকই বলিয়াছেন, "ভাষায়, ভাবে ও ছন্দে একটি উৎকৃষ্ট রবীন্দ্রীয় লিরিক; ভাবও যেমন অখণ্ড, তেমনই প্রথম হইতে আবেগের অধীরতা সুরু হইয়াছে, এবং পর্দায় পর্দায় উঠিয়া তাহা একটি চরম উন্মাদনায় নিঃশেষ হইয়াছে। কবিতার ভাববস্তু খুব নূতন নয় বটে, কিন্তু ঐ রূপকের ছলে, আলস-বিলাসের একটি নিবিড় রসাবেশ ভাষায় উচ্ছল হইয়া ভাবকে লিরিক-মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হইয়াছে।"

জাগ্রত প্রাণশক্তির প্রেরণা জীবনকে নতুনভাবে আস্বাদন করিতে উদ্বুদ্ধ করে। বিপদ ও দুঃখের তীব্রতার মধ্যেই আপনার শক্তির যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব। সঙ্কট এড়াইয়া চলিবার প্রয়াসে জীবনের সত্যস্বরূপকেই পাশ কাটাইয়া যাওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ জীবন দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না কখনো। সতর্কভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় কাব্যে গানে এবং বহু গদ্য রচনায় তিনি বারবার দুঃখে আলোড়িত বেদনায় বিদ্ধ জীবনের তীব্রতাকেই বরণীয় ঘোষণা করিয়াছেন। সহজ সুখের কাঙালপনাকে ধিক্কার দিয়াছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের রচনা হইতে কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া কবির মনোভাব স্পষ্ট করা যাইতে পারে :

"করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়; পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের লালিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।"

"বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা!
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা!

টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।"

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান;
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে,
সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।"

কথাটা এই অশান্তি ও দুঃখ বেদনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই গভীরতর পূর্ণতর শান্তির দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। জীবনের সামগ্রিক সত্য পরিচয় লাভই মানবধর্ম, কবি এই পূর্ণতার ধর্ম বিশ্বাস করিতেন। তাই নিরাবেগ নিরুদ্যম আলস্যমগ্নতাকে তিনি বার বার ধিক্কার দিয়াছেন। যেমন এক গদ্য রচনায় বলেন, "জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে

ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটি দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন দেখি, যে সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।"

এইসব দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাইতে পারে, 'ঝুলন' কবিতায় ভাব-প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবনদর্শনসঞ্জাত এবং তাঁহার অন্যতম প্রধান ভাবধারারই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে এই কবিতায়।

কাব্যভাষা এবং প্রকাশভঙ্গির উৎকর্ষেও 'ঝুলন' কবিতাটি একটি বিশিষ্ট রচনা। কখনো আলস্যমদিরতার আবেশে ভাষা ললিতমাধুর্যে আবিষ্ট, কখনো বা আবেগের তীব্রতায় আলোড়িত। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাঙলা ভাষার ভাববহন ক্ষমতা কী ভাবে প্রসারিত হইয়াছে—এই সকল কবিতার দৃষ্টান্তেই তাহা বিশেষভাবে বোঝা যায়। বিহারীলাল বা নবীনচন্দ্র সেনের রচনায় আবেগের অসংযম কাব্যভাষাকে হাস্যকর করিয়া তুলিত। ভাষার উচ্ছ্বাসটাই যে ভাবের তীব্রতা বুঝাইবার একমাত্র উপায় নয়—এই চেতনা তাঁহাদের ছিল না। রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য কবিতায় ঢেউ ওঠা পড়ার মতো ভাবতরঙ্গের উত্থান পতন ভাষাকেও তরঙ্গিত করিয়াছে, কিন্তু অসংযত উচ্ছ্বাস প্রশ্রয় পায় নাই। তাই পূর্বাপর কবিতাটি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

টীকা, শব্দার্থ ও মন্তব্য

[**প্রথম স্তবক**] **ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা**—'ভবতরঙ্গ' কথাটি এখানে বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ। ভবতরঙ্গ বা সংসারস্রোতে ভেলা ভাসানো অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তার অবসান ঘটাইয়া কর্মমুখর সংসারের বিঘ্নবিপদের মাঝ দিয়া জীবন-ভেলাখানি অগ্রসর করিয়া লইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন কবি। এই 'ভবতরঙ্গ' শব্দটির সূত্রে বোঝা যায় কবিতায় বার বার যে ঝড়-ঝঞ্ঝার কথা বলা হইতেছে তাহা রূপকার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ সংসারের কর্মময়তায় প্রতি পদে যে বিপদবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, কবি তাহাকেই কখনো ঝড়ের কখনো ক্ষুব্ধ সমুদ্রের রূপকে প্রকাশ করিয়াছেন। **বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা**—অবিমিশ্র মাধুর্য ও স্বপ্নের আবেশে আবিষ্ট চিত্ত এবারে ক্লান্তিবোধ

করিতেছে। জীবনের দুঃখ বেদনার অভিজ্ঞতা এড়াইয়া গিয়া সুখ-আলস্যে নিমজ্জিত হইয়া জীবনের সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। কবি সেই সুখের মোহ, সহজ শান্তি মোহ বর্জন করিতে চান।

[**দ্বিতীয় স্তবক**] **পবনে গগনে সাগরে আজিকে**—অকস্মাৎ এক নূতন চেতনা আবির্ভূত হইয়াছে। সত্য যে প্রাণাবেগ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার উন্মাদনাই প্রকাশ পাইয়াছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্রে। **লক্ষ যক্ষশিশুর অট্টরোল**—পৌরাণিক কল্পনায় যক্ষরা রাক্ষসস্থানীয়, দশবিধ দেবযোনির অন্যতম। ঝড়ের গর্জনকে কবি উপমা দিয়াছেন লক্ষ যক্ষশিশুর অট্টরোলের সহিত।

[**তৃতীয় স্তবক**] **পরান আমার বসিয়া আছে**—প্রাণকে আপনা হইতে পৃথক, যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে কল্পনা করিতেছেন। এইরূপ দ্বৈত কল্পনার ভিত্তিতেই পরে প্রাণকে 'বধূ' ও 'প্রিয়া' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। প্রাণের সহিতই আজ কবির নূতন প্রণয়লীলা। ইহার পর হইতে কবিতায় প্রাণকে নারীরূপে কল্পনা অব্যাহত আছে এবং প্রণয়ী প্রণয়িনীর ব্যবহারের রূপকেই কবির বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

[**চতুর্থ স্তবক**] **বাসর-শয়ন করেছি রচন কুসুম-থরে**—এতদিন প্রাণকে যেন ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। জীবনের দুঃখ বেদনা হইতে দূরে সরাইয়া আরামে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সুখালয়ে জড়িত দিনের কথায় বলিতেছেন, পরাণবধূর জন্য আমি বাসরশয্যা রচনা করিয়াছিলাম। অর্থাৎ জীবনে তখন কোনো বেদনার চাপ ছিল না, দুঃখের কারণ ছিলনা। এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখের আয়োজনে ভরা জীবনকে কবি এখন মনে করিতেছেন অসম্পূর্ণ। জীবনের পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে।

[**পঞ্চম স্তবক**] **যা-কিছু মধুর দিয়েছিনু তার**—শুধু মাধুর্যের সন্ধানেই ফিরিয়াছেন, প্রাণকে উপহার দিয়াছেন।

[**ষষ্ঠ স্তবক**] **কুসুমের হার লাগে গুরুভার**—সেই নিরবচ্ছিন্ন সুখের পরিবেশ প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার স্পর্শসচেতনতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমনকি ওই আরামের প্রয়োজন, ওই কুসুমহারের ভারটুকুও যেন তাহার সহ্য হয় না।

[**সপ্তম স্তবক**] **ঢালি মধুরে মধুর……পাই নে খুঁজি**—প্রাণকেই এখানে বধূ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। সুখ-মাধুর্যে অসাড় প্রাণ। তাই বলিতেছেন পরাণবধূকে আর খুঁজিয়া পাই না। অর্থাৎ প্রাণ আছে কিনা তাহা বুঝিতে পারি না। **অতল স্বপ্নসাগরে**—বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষতায় নয়, স্বপ্নের মধ্যে পরাণবধূকে সন্ধান করেন। জীবন হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া যে চরিতার্থতা লাভ সম্ভব নয় তাহাই বলা হইতেছে।

[**অষ্টম স্তবক**] **নূতন খেলা**—নূতন করিয়া প্রাণের পূর্ণশক্তি উপলব্ধির প্রয়াসকেই নূতন খেলা বলা হইয়াছে।

[**নবম স্তবক**] **বধূরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল**—নূতন করিয়া প্রাণশক্তি উপলব্ধি করিয়াছি। প্রাণশক্তির উন্মাদনা ফিরিয়া পাইয়াছি। **প্রিয়াকে আমার তুলেছে জাগায়ে প্রলয়রোল**—প্রত্যক্ষ জীবনের আঘাত সংঘাত (প্রলয়রোল) আমার প্রাণকে (প্রিয়ার) জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। **উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল**—দোলনে দুলিবার সময়ের চিত্র। প্রাণকে নারীরূপে কল্পনা করায় ওই অবস্থায় কোনো নারীর বর্ণনাই এখানে বাণীবদ্ধ হইয়াছে।

[**দশম স্তবক**] **প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আছ**—আত্মোপলব্ধির বা আত্মিক শক্তির উদ্বোধনের মুহূর্ত উপস্থিত। **স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ দুটো পাগল**—এতদিনের স্বপ্নজড়িমা কাটিয়া গিয়াছে। প্রাণের নবজাগ্রত শক্তি সকল মোহ ছিন্ন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। আর কোনো মোহই চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। এই জাগার প্রাণের আনন্দ—যেন পাগল করিয়া দিবার মতো আনন্দ।

ব্যাখ্যা

[এক] হায়, এতকাল আমি রেখেছিনু তারে
যতনভরে
শয়ন'পরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর-শয়ন করেছি রচন
কুসুম থরে ;
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে
গোপন ঘরে
যতন করে। [চতুর্থ স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'ঝুলন' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে কবির আকস্মিক আত্মোপলব্ধির আনন্দ। অভ্যস্ত সুখের মোহে জীবনের প্রত্যক্ষ ভূমির দুঃখ বেদনার পথ পরিহার করিয়া কবি নিজেকে আরামের আবেষ্টনে অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এই সুখ ও আরাম ক্লান্তি আনে। প্রাণমন জড়তায় আচ্ছন্ন হয়। তারপরে একদিন নিজেকেই ধিক্কার দিয়া পূর্ণপ্রাণের আনন্দে জাগ্রত হইয়া ওঠেন। 'ঝুলন' কবিতার বিষয় এই জানায় প্রাণের আনন্দ ও উন্মাদনা।

আলোচ্য অংশে অবশ্য এতদিনের অভ্যস্ত আলস্যমদির জীবনের কথাই বলা হইয়াছে। 'প্রাণ'কে কবি এ কবিতায় প্রেয়সী বধূরূপে কল্পনা করিয়া আপন সত্তার মধ্যে একটা দ্বৈততা স্থাপন করিয়াছেন। বলিতেছেন, এতদিন আমি অতি সতর্কতার সহিত আমার পরাণবধূর জন্য আরামের আয়োজন করিয়াছিলাম। লক্ষ্য ছিল, সে যেন কোনো আঘাত বেদনা না পায়, দুঃখ না পায়। বাসরশয্যায় কুসুম শয়নে তাহাকে সংগোপনে রক্ষা করিয়াছিলাম।

এই অংশে কবির মনের যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, দুঃখ বেদনা এড়াইয়া কেবল মাধুর্যের সন্ধানে জীবনের সত্য-

স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়—ইহা কবি বিশ্বাস করেন না। জীবনের পূর্ণতার জন্য দুঃখের অভিজ্ঞতা, আঘাত সহ্য করিবার সাহস ও শক্তি প্রয়োজন। নিরবচ্ছিন্ন আরাম ক্লান্তি আনে, শ্রান্ত করে। মন জড়তায় ঠেকে। প্রাণ যেন স্পর্শসচেতনতা হারাইয়া ফেলে। কবি এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আনন্দিত।

[দুই] তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা—
আমাতে প্রাণেতে খেলিবে দুজনে
ঝুলনখেলা
নিশীথবেলা।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'ঝুলন' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে কবির আত্মোপলব্ধির আনন্দ। কবি মনে করেন, জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য দুঃখ-বেদনার, আঘাত-সংঘাতের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। যে মানুষ নিরাপদ আরামের কাঙাল সে জীবনের সত্যরূপ চেনে না। নিরবচ্ছিন্ন আরামে, নিরাপদ সুখ মানুষের প্রাণাবেগ স্তিমিত করিয়া আনে। প্রাণের স্পর্শসচেতনতা বিনষ্ট হয়। সেই অসাড় প্রাণ সম্পর্কেই কবি বলিয়াছেন, 'পরশ করিলে জাগে না সে আর'। কবি এই আলস্যমগ্ন জড়ত্বের প্রতি তীব্র ধিক্কার দিয়া প্রাণের প্রবল আনন্দে যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন। সেই জাগরণের উল্লাস এবং উন্মাদনা কবিতাটির মধ্যে আন্দোলিত আলোড়িত হইয়াছে। কবিতার আলোচ্য অংশ হইতেই সূচিত হইয়াছে সেই নূতন উপলব্ধি।

নূতন খেলা, অর্থাৎ জীবনের প্রত্যক্ষ ভূমিতে আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়া নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার উদ্যোগ সুরু করিতে চান কবি। যে

দোলনায় প্রাণকে আলিঙ্গন করিয়া ঝুলন খেলার উদ্যোগ করিতেছেন তাহা মরণদোলা। অর্থাৎ অকুতোভয়ে মৃত্যুর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইতেও কবি প্রস্তুত। জীবনের সত্য ও পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি দুঃখ এড়াইয়া সম্ভব নয়। এই চেতনা হইতেই আসে দুর্যোগের কথা মৃত্যুর কথা রাত্রির পটভূমির প্রসঙ্গ।

কবি প্রাণকে এ কবিতায় প্রেয়সী বধূরূপে কল্পনা করিয়াছেন। এতদিন সেই পরাণবধূ নিদ্রিত ছিল, তাহার সাড়া ছিল না, চেতনা ছিল না। আজ সে জাগিয়া উঠিয়াছে। কবি যেন নূতন করিয়া পূর্ণ জাগ্রত প্রাণের শক্তি উপলব্ধি করিতেছেন। এই উপলব্ধির আনন্দই কবিতার চরণে চরণে ধ্বনিত আন্দোলনে অভিব্যক্ত লাভ করিয়াছে।

[তিন] প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল
দে দোল্ দোল্।
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরিছে আজ
দুটো পাগল।
দে দোল্ দোল্। [একাদশ স্তবক]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'ঝুলন' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতার এই শেষ স্তবকে প্রকাশ পাইয়াছে নব উপলব্ধি আত্মিক শক্তি সম্পর্কে কবিচিত্তের দৃঢ় প্রত্যয় এবং নব জাগরণের আনন্দ।

সহজ আরামের প্রলোভনে কবি জীবনের প্রত্যক্ষভূমি হইতে প্রত্যাবৃত হইয়াছিলেন। আঘাত সংঘাতে দুঃখ বেদনায় মানুষের জীবন পূর্ণতা পায়। জীবনকে এড়াইয়া গিয়া চরিতার্থতা লাভ, পূর্ণ মনুষ্যত্বের গৌরব অর্জন কখনো সম্ভব হয় না। সহজ আরামের পরিবেষ্টন কবির চিত্ত অসাড় করিয়া তুলিয়াছিল। জড়ত্বে আচ্ছন্ন প্রাণ স্পর্শ-সচেতনতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এই বিবশ দশার প্রতি ধিক্কার দিয়া কবি জাগিয়া উঠিলেন। প্রাণের শক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। আত্মশক্তির এই নব উদ্বোধনের উদ্দীপনাই 'ঝুলন' কবিতার বিষয়বস্তু।

প্রাণ আজ নবশক্তিতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সহিত নতুন করিয়া পরিচয় সাধনের দিন আজ। সকল মোহ বর্জন করিয়া কবি প্রাণকে, পরাণবধূকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাহার স্বরূপ জানিয়া লইতে চান। স্বপ্নমদিরতা টুটিয়া গিয়াছে। আবার জীবনের বাস্তবতায় ফিরিয়া আসিতে আগ্রহী কবি। উদার উন্মত্ত সবল প্রাণ বিশ্বের সকল বিরুদ্ধতা, সকল অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়া অগ্রসর হইয়া জীবনের সত্তাস্বরূপ উপলব্ধি করিবে ; ইহাই কবির আকাঙ্ক্ষা। এতদিনে যে ভীরুতা প্রাণশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা অবসিত হইয়া যাওয়ায় কবি বন্ধন মুক্তির প্রবল আনন্দ অনুভব করিতেছেন। চিত্ত আনন্দে যেন পাগল হইয়া উঠিতেছে।

প্রশ্নোত্তর

[এক] "আমার অন্তরতম আমি আলস্যে আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।" এই উক্তির আলোকে 'ঝুলন' কবিতার ভাবগত তাৎপর্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। 'ঝুলন' কবিতায় দুটি মানসিক অবস্থার কথা আছে। কবিতাটি রচনার মুহূর্তে কবির চিত্ত যে একটা প্রবল আত্মোপলব্ধির আনন্দে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কবিতার ভাষা ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য হইতেই অনুভব করা যায়। বহুদিন পরে কবি যেন নিজের মধ্যে একটি নব চেতনার উন্মেষ অনুভব করিয়াছেন। অকস্মাৎ আপনার প্রাণশক্তি পূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া পূর্বেকার অভিভূত দশা হইতে চেতনাকে মুক্তি দিয়াছে। স্বভাবতঃই তাই পূর্বেকার অভিভূত দশা এবং সেই অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া ওঠা—এই দুই স্তরের অনুভূতিই কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিচিত্তের বর্তমান উদ্দীপনার স্বরূপ বুঝিবার জন্য পূর্বতন মানসিকতা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। মানুষের মনে আঘাত সংঘাতের বেদনা এড়াইয়া সহজ সুখের জন্য একটা লালসা থাকে। একবার সেই সহজ সুখের স্বাদ যে পায়, সে ক্রমে জীবনের প্রত্যক্ষভূমি হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া নেয়।

প্রাণের যে শক্তি জীবনের সকল কর্মে মানুষকে পরিচালিত করে বিরুদ্ধতার বাধার জন্যই সেই শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়া আসার অভিজ্ঞতাতেই নিজের সামর্থ্য বিষয়ে সচেতনতা দেখা দেয়। কিন্তু এই শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া নিজেকে গুটাইয়া আনিলে ক্রমাগত আরাম ও আলস্য সেই প্রাণশক্তিকে জড়ত্বে অভিভূত করে। ব্যক্তিত্বশক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, প্রাণ অবসিত হয়। মন জড়তায় ঢাকে। ক্রমে আরামও ক্লান্তিকর হইয়া আসে। জীবনের এই অন্তর্মুখী ধারা আত্মবিনাশী। এই কথাই কবিতায় প্রকাশ পায় যখন কবি বলেন :

"শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান
আলসরসে
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুম জাগরণে মিশি একাকার
নিশিদিবসে।
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশবশে।

এইভাবে ক্রমে অন্তরতম প্রাণবৃত্তি, অন্তরের আমি স্পর্শসচেতনতা হারাইয়া জীবন্মৃত দশাগ্রস্ত হয়। কবি এইরূপ একটি অবস্থার কথাই কবিতায় বলিয়াছেন বাসর শয়নের রূপকের মাধ্যমে।

তারপর আসে নব চেতনার কথা। নিজের উপরে ধিক্কার দিয়া সেই বিবশ দশা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আনেন। জাগ্রত প্রাণাবেগ আরামের মোহ বর্জন করিয়া প্রবলভাবে আঘাত সংঘাতময় তীব্র জীবনের প্রত্যক্ষভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায়। বেদনার আঘাতে আপনার অন্তরের অসাড়তা ঘুচাইয়া নিজেকেই নতুন করিয়া ফিরিয়া পান। অনুভব করেন, দুঃখের অভিঘাত যে তীব্র বেদনা জাগায় সেই বেদনায় নিজেকে সত্যরূপে চেনা যায়। বদ্ধ জল যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনই অভ্যাসজীর্ণ জীবনযাত্রা অস্বাস্থ্যকর। এই গণ্ডিবদ্ধ

জীবনে সত্তাবোধ স্তিমিত হইয়া আসে। নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতনতা অবলুপ্ত হয়। প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইয়া তীব্র সংঘাতের মধ্যে প্রাণশক্তি জাগ্রত করা সম্ভব। এই জাগরণে সত্তাবোধ ফিরিয়া আসে। জীবনকে মনে হয় অর্থবান, চরিতার্থ। কবি এইরূপ একটি নূতন চেতনার স্পর্শে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রাণকে বধূরূপে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

> "মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
> বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি
> ঝঞ্চা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
> মারিবে ঠেলা—
> আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
> ঝুলনখেলা
> নিশীথবেলা।"

পৌরাণিক ও ধর্মীয় অর্থে ঝুলন একটি মিলনোৎসব। এখানে কবি এই শব্দটিকে একটি নূতন তাৎপর্যে ব্যবহার করিয়াছেন। জাগ্রত প্রাণের সহিত আজ নূতন করিয়া কবির মিলনোৎসব। এই উৎসব সকল শঙ্কা সকল ভীতি ঘুচাইয়া এক আনন্দময় অনুভূতিতে কবির চিত্ত পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। মৃত্যুও এই আনন্দিত মুহূর্তে তুচ্ছ হইয়া যায়।

[দুই] 'ঝুলন' কবিতার রূপকার্থ বিশ্লেষণ করিয়া ভাববস্তু সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। আপাতদৃষ্টিতে 'ঝুলন'কে মনে হয় একটি প্রেমের কবিতা। জীবনের দুঃখ বেদনার অভিঘাত হইতে কবি যেন প্রেয়সীকে এতদিন আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ প্রণয় সম্পর্ক কোনো দুঃখের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই। কেবল সুখসম্ভোগ, কেবল বিলাসব্যসনে কাল অতিবাহিত হইয়াছে। অব্যাহত সুখ ও মাধুর্যরস শেষ পর্যন্ত চিত্তে আনে অসাড়তা। এই মাধুর্যের প্রতি কবির মনে দেখা দেয় তীব্র ধিক্কার। এই মানসিক প্রতিক্রিয়ায় কবি সুখবিলাসের জীবন পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মোহ দূর করিয়া দুঃখ-বেদনায় আলোড়িত তীব্রতর জীবনের স্বাদ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রত্যক্ষ জীবনের তীব্রতার মধ্যে আপন প্রেয়সীকে নূতনভাবে চিনিয়া লইবার

আনন্দে কবি আজ আত্মহারা। সমগ্র কবিতাটিতে এইভাবে একটি প্রেম সম্পর্কের রূপক রচিত হইয়াছে। কবিতাটির কাব্য সৌন্দর্য এই রূপক নির্মাণের দক্ষতার উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। কিন্তু আপাত অর্থের মধ্যেই কবিতার নিহিত অর্থ আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে শব্দ ব্যবহারের কুশলতায়।

অনায়াসেই বোঝা যায় কবি এখানে বধূরূপে যাহাকে সম্বোধন করিয়াছেন, সে কবির নিজেরই প্রাণ, পরাণবধূ বা অন্তরতর সত্তা। অর্থাৎ কবি আপন সত্তাকে যেন দ্বিধাবিভক্ত করিয়া লইয়া অদ্বৈত 'আমি'র মধ্যে দ্বৈত স্থাপন করিয়া এক লীলা বর্ণনার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রেমলীলা বাহিরের কাহারও সহিত নয়, কবির অন্তরের জগতে নিজের অন্তরতর সত্তার সহিত প্রেমলীলা। কবিতার প্রথম চরণেই এই তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়, 'আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা নিশীথবেলা'।

দুঃখ বেদনার অভিজ্ঞতা এড়াইয়া যে সহজ সুখের সন্ধান করে, সে কখনো জীবনের সত্যস্বরূপ চেনে না। জীবনকে সত্যভাবে পাইতে হইলে দুঃখের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ ধারণা তাঁহার বহু রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন। আধমরা অভ্যাসের একটানা পুনরাবৃত্তি জীবনে অবসাদ সঞ্চার করে। শুধুই মাধুর্য, শুধু সুখ শেষ পর্যন্ত প্রাণাবেগ স্তিমিত করিয়া সমস্ত চেতনাকে জড়ত্বে অভিভূত করে। আবার নির্দয় আঘাতে সেই অচেতন সত্তাবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই মেলে আত্মোপলব্ধির আনন্দ। ঝুলন কবিতার মূল বক্তব্য জীবন সম্পর্কে এই ধারণার উপরেই নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

কবিতাটিতে কবির মনোভাবের দুটি স্তরের পরিচয় পাই। আপন প্রাণশক্তির উদ্দীপনা নতুনভাবে উপলব্ধি করার মুহূর্তের উল্লাস কাব্যের মধ্যে আবেগবহ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সহিত সঙ্গতভাবেই আসিয়াছে পূর্বতন মানসিক অবস্থার কথা। কবি জীবনের মধুর দিকটির প্রতি এতকাল মোহগ্রস্ত ছিলেন। সহজ সুখের সন্ধানে ফিরিয়াছেন। নিজেকে আঘাত সংঘাত হইতে সর্বদা দূরে রাখিয়াছেন। এইভাবে জীবনধারা বহিতেছিল নিস্তরঙ্গ প্রবাহে। কোনো বিরুদ্ধতা, প্রতিকূলতা যেখানে নাই— সেখানে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও কেমন সন্দেহ দেখা যায়। বাধার মুখে দাঁড়াইয়া বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার সক্ষমতা নিজের সামর্থ্য বিষয়ে প্রত্যয়বোধ জাগ্রত হইয়া উঠে। আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য, আপনাকে

যথার্থভাবে উপলব্ধির জন্যই তাই জীবনের দুঃখ বেদনার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এতদিন কবি এ সত্য ভুলিয়াছিলেন। আজ ভুল ভাঙিয়াছে। নিস্তরঙ্গ জীব প্রবাহে জাগিয়াছে নতুন তরঙ্গোচ্ছ্বাস। যেন এতকালের সুপ্ত প্রাণ আজ ন শক্তিতে জাগিয়া উঠিয়াছে। নতুন করিয়া আপন প্রাণশক্তির পূর্ণ মহি কবি উপলব্ধি করিতেছেন। এই উপলব্ধির তীব্রতা সঞ্চারিত হইয়াছে কবিত ভাষা ও ছন্দে। প্রেমিক যেমন প্রেমের উচ্ছ্বাসে তীব্রভাবে প্রেয়সীকে আলি করে, কবিও সেইরূপ নিজের জাগ্রত প্রাণকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতেছে আজ প্রাণের সহিত তাহার ঝুলনখেলা। কবিতায় বারবার দুর্যোগময় রা ব্যঞ্জনা আছে। কিন্তু এই দুর্যোগ, এ অন্ধকার ভয় বা বিপদ জাগায় না। ব এই দুর্যোগকেই আজ কবির বরণীয় মনে হয়। দুর্যোগের চিত্রে প্রত জীবনের আঘাত-সংঘাতই আভাসিত। কবি যে সর্ববিধ দুঃখের অভিজ্ঞত জন্য আজ নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই বলেন :

"মরণ দোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা ;
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলনখেলা
নিশীথবেলা।"